সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন পঞ্চদশ বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ শক

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ শক
সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৮৮০ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

মূল্য তিন টাকা

চিত্রসূচী পরপৃষ্ঠায়

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পঞ্চদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮১ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

পসারিণী

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ শক

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

কাফি

আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে যদি (ও ভাই রে)
থাক্ বাইরে বাঁধন তবে নিরবধি।
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে
থাক্ তটের বাঁধন বাঁকে বাঁকে,
তবে বাঁধে বাঁধে গান গাবে নদী (ভাই রে)।

২

ভৈরবী

এতদিন পরে মোরে
আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তিডোরে।
সাবধানীদের পিছে পিছে
দিন কেটেচে কেবল মিছে,
ওদের বাঁধা পথের বাঁধন হতে
টেনে নিলে আপন ক'রে॥

৩

নূতন পথের পথিক হয়ে আসে পুরাতন সাথী,
মিলন-উষায় ঘোমটা খসায় চিরবিরহের রাতি।
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে
আজ প্রাতে তার দেখা পেলে
নূতন করে' পায়ের তলে দেব হৃদয় পাতি॥

৪

কাজ ভোলাবার কে গো তোরা!
রঙিন সাজে কে যে পাঠায়
        কোন্ সে ভুবন-মনোচোরা!
কঠিন পাথর সারে সারে
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে,
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে
        ঝরাও রসের সুধা-ঝোরা!
স্বপন-তরীর তোরা নেয়ে,
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
        পাগ্‌লা পরান চলে গেয়ে।
কোন্ উদাসীর উপবনে
বাজল বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে
        ঝঞ্ঝা ঘনায় ঘনঘোরা!

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই অপ্রকাশিত গানগুলি রবীন্দ্র-সদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কবি এই কবিতাবলি 'রক্তকরবী' নাটকের উদ্দেশে লিখিয়া, শেষ পর্যন্ত উহাতে ব্যবহার করেন নাই। শেষ রচনাটি 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে' ইত্যাদি পাঠান্তরে 'রক্তকরবী'র অন্তর্গত রহিয়াছে॥

চিঠিপত্র শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

দার্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

বাহিরের বাধাকে বড়ো কোরো না। অন্তরে তুমি যাঁকে গ্রহণ করেচ তাঁরি ভাবরূপ যদি আমার মধ্যে কল্পিত করে থাক তবে কিছুতেই ক্ষতি হবে না।

দেশের লোকের দ্বারে আমি অতিথি হয়েছিলুম, দ্বার ভালো করে খোলা হয় নি।— যদি সত্যের দূত হয়ে কোনো অমৃতবাণী নিয়ে এসে থাকি তবে দ্বারের বাইরে রেখেই বিদায় গ্রহণ করব। গৃহীরা যদি বা উপেক্ষা করে পথিকেরা তা দেশে দেশে নিয়ে যাবে, এমন আশ্বাস পেয়েছি। মানুষের কাছ থেকে মমত্ব মানুষ আকাঙ্ক্ষা না করে থাকতে পারে না— অতএব তোমরা যারা আমাকে প্রসন্ন মনের অর্ঘ্য দিতে পেরেচ তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অন্তরতম শান্তি ও সার্থকতা তোমার জীবনকে পূর্ণ করুক এই আশীর্ব্বাদ করি।
ইতি ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৮

দাদা

২

দার্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

"লেখন" নামক বইটা নিঃশেষিত। সংগ্রহ করে তোমার ছেলেকে দেব প্রতিশ্রুত ছিলুম। একখানা জীর্ণ মলিন বই পেয়েছি। অগত্যা এইটেই পাঠাতে হবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তোমার চিঠিপত্র থেকে তোমার ছেলের নাম পাইনি। নামটা জানিয়ে দিয়ো। আমি আগামী কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে কলকাতায় যাব— অপরাহ্ণে। তার পরদিন শুক্রবার যাত্রা করব ভূপাল রাজভবনে। তারপরে কবে ফিরব নিশ্চিত জানিনে; বইখানি কলকাতায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি যদি তোমার ছেলে সেখানি উদ্ধার করবার জন্যে দূত পাঠায় তাহলে সহজ হয়।

সেদিন তোমাকে দেখে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তোমার মুখশ্রী, ভক্তিতে সরস মধুর তোমার বাণী আমার মনে রইল। আমার যেটুকু শক্তি আছে সেই শক্তিতে তোমাকে কিছু যদি দিতে পারতুম খুসি হতুম কিন্তু তেমন গভীর অবকাশ পাবার সম্ভাবনা নেই, তাই কেবল চিঠিতে তর্ক করেচি। সে তর্ক যে পরিমাণে আঘাত করে সে পরিমাণে তৃপ্তি দেয় না। লেখার ভাষায় বাদ প্রতিবাদগুলো কঠোর হয়ে পড়ে— বাক্যের পশ্চাতে যে মন থাকে সে মনের সবটা প্রকাশ পায় না। ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার আশঙ্কা হচ্ছে অতি দীর্ঘকাল যে-ব্যবস্থার মধ্যে তোমার সমস্ত মন নিবিষ্ট হয়ে ছিল তার থেকে তোমাকে বিচলিত ক'রে কষ্টের কারণ ঘটিয়েছে। চিঠিতে যে সব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করেচি সে কেবল আমার কথাটি তোমার কাছে স্পষ্ট ক'রে বলবার জন্যে। যা আমার বলবার আছে তাকে হৃদয়ঙ্গম করানোই আমার স্বভাব এই কাজ করতেই এসেচি। আমাকে কবি ব'লে সাহিত্যিক ব'লে লোকে গ্রহণ করে। বাহবা দেয়, বলে আমি বেশ বলেচি— আমার রচনার প্রশংসা করে, কেউবা করেও না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত। দীর্ঘকাল এই কাজ ক'রে এসেচি— দেশের লোকের কাউকে কিছু বোঝাতে পেরেচি ব'লে বিশ্বাস করি নে— কথায় বুঝিয়েচি কিন্তু অন্তরে নয়। সেই জন্যে আমার স্বদেশে আমি একা। প্রথম প্রথম তা নিয়ে মনে খেদ ক'রেচি— এখন বুঝেচি আমার যা কর্ম্ম তা ক'রেচি, তার পরেকার উপসংহার আমার হাতে নয়। গাছের কাজ হচ্চে বীজকে পোষণ করা, তার পরে মাটির পালা। সেখানকার হিসাব তলব করবার দায় গাছের নয়। আজকাল এই কথা ভেবে শান্তি অবলম্বন করি। যদি দুর্ব্বলতাবশত কখনো নালিষের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পরক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত হই। তোমার মনে যে কঠিন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েচে এ আমি একটুও প্রত্যাশা করি নি। করলে হয়তো চিন্তা করতুম— হয়তো ভাবতুম, তোমার আশ্রয়কে দুর্ব্বল করে' তা'র পরিবর্ত্তে কোনো অবলম্বন তোমাকে দেওয়ার অবকাশ হয়তো ঘটবে না— এমন অবস্থায় তোমার মনে দ্বিধা জন্মিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তোমার বুদ্ধির 'পরে আমার আস্থা আছে। তুমি নিজের আলোকেই নিজের যথার্থ পথ খুঁজে পাবে— সে পথের সঙ্গে তোমার প্রকৃতির বিরোধ ঘটবে না।

চিঠি লিখতে যদি না পারি কিছু মনে কোরো না— তোমার প্রতি আমার ঔদাসীন্য কল্পনা ক'রে নিজেকে পীড়া দিয়ো না। ইতি ১৮ই শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

নানা খুচরো লেখার দায় পড়েচে আমার উপরে— তাতে সময় যায়, আনন্দ পাই নে। তার উপরে শ্রান্তি, এবং মনটা উদ্বিগ্ন। জোড়াসাঁকোয় দরবারী লোকের ভিড়ে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে এখানে আশ্রয় নিয়েচি। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে কাজগুলোও এসেচে। তাই তোমাকে অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি। তার উপরে কাল যখন শুনলুম তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে ফিরে গেছ আমার মনে বড় আঘাত লাগল। আগে যদি জানতুম তাহলে নিশ্চয়ই এখান থেকে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতুম।

আমি কাল বৃহস্পতিবার বিকালে জোড়াসাঁকোয় যাব। তার পরদিন সকালে পালাব শান্তিনিকেতনে। হয়ত বৃহস্পতিবারে তোমার আসা সম্ভব হবে না। না হোক্, কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত জেনো, তোমার পরে আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা সুগভীর। যদি আমি তোমার অন্তরের অভাব দ্বন্দ্ব বেদনা কোনো উপায়ে লাঘব করতে পারতুম বড়ো খুসি হতুম। কিন্তু আমার সে শক্তি নেই। আমি নিজে যদি বা কোনো সত্য উপলব্ধি করি সেটা আর কাউকে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। লেখবার ক্ষমতা হয়ত আছে কিন্তু লেখা এবং দেওয়া একই নয়। পরশ পাথর যার শক্তির মধ্যে আছে মানুষকে সেই তো সত্যকার দানে ধনী করে। অন্তরকে সোনা করতে যাঁরা পারেন তাঁদের দেখা পাওয়া দুর্লভ। সেইজন্যে আমার মতো ভাষানিপুণ লোকও হয়ত অল্প কিছু উপকার করতে পারে। ভাষার সাহায্যে হয়তো আমরা বুদ্ধিতে বুঝি কিন্তু অন্তরে পাইনে। সত্য জানা বড়ো কথা নয়, সত্য হওয়াই হচ্ছে চরম সিদ্ধি। সেই সত্যকরণের শক্তি যাঁর কাছে পাওয়া সম্ভব তাঁকেই প্রণাম করি। আমার কি প্রণাম প্রাপ্য? কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহদানের যদি কোনো মূল্য থাকে সে মূল্য তুমি পেয়েছ। ইতি ৬ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদা

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে আঘাত দিই, অবশেষে অনুতাপও হয়। কিন্তু আমার উপায় নেই। আমাদের দেশের ভক্তির সঙ্গে পূজার সঙ্গে সর্ব্বমানবের এমন বিচ্ছেদ, তা'র প্রতি এত ঔদাসীন্য যে সে আমি সইতে পারিনে। আচারবিচারের মূঢ়তায় সমস্ত দেশের বুক যে কী জোরে চেপে ধরেচে তা একখানা পাঁজি পড়লেই বোঝা যায়। অথচ এই পাঁজি তা'র নির্ব্বুদ্ধির স্তূপাকার বোঝাই নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরে বেড়াচ্চে— আমার তো লজ্জা বোধ হয়। অল্পদিন আগে আমাদের আশ্রমের কাছে একটি বিবাহ দেখেচি— তা'র স্ত্রীআচার বারো আনা বর্ব্বরতা। এই আচারের বর্ব্বরতায় সমস্ত দেশে আমাদের মনুষ্যত্বকে অবমানিত ক'রচে। বিধাতার দত্ত বুদ্ধির সম্মান একেবারে ঘুচে গেছে, আমাদের স্বরচিত চোখে ঠুলি দেওয়া অন্ধতাকে আমরা ধর্ম্মের নামে পূজা করি। এইখানে আমাদের পরাভব হতেই হবে। মানুষের দুঃখ আজ জগদ্ব্যাপী— তা'র মাঝখানে আমাদের সমাজ জুড়ে নিরর্থকতার বিপুল আয়োজন আমাকে লজ্জিত ও দুঃখিত করে। সে কথা তোমার কাছে লুকোতে পারিনে। তুমি মনে ক'রতে পারো এটা আমার মজ্জাগত বৈদেশিকতা, তা যদি সত্য হয় তাহ'লে স্বাদেশিকতা অশ্রদ্ধেয়। সম্প্রতি এখানে জগজ্জননীর নামে জীবরক্তের স্রোত ব'য়ে গেছে আর তাই নিয়ে যে উন্মত্ততা সে অনার্য্যের উন্মত্ততা— অথচ সেও ধর্ম্ম এবং মেয়েরাও এই রক্ত নিয়ে ছেলের কপালে ফোঁটা দেয়, মনে করে মা-এর আশীর্ব্বাদ পেলে। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩৮

দাদা

৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

খুচরো কাজের ভিড় প্রতিদিনই অত্যন্ত বেশি করে ঘনিয়ে আসচে। এ যেন রথের ভিড়ের মত— এক জনের সঙ্গে আরেক জনের সম্পর্ক নেই। অথচ ঠেসাঠেসিতে ফাঁক পাওয়া যায় না। আজ তোমাকে চিঠি লিখব না বলেই স্থির ছিল। কাল একটা চিঠি লিখেচি, অতএব কিছুদিনের ছুটির মেয়াদ দাবী করতে পারি। কিছুদিনের পূর্ব্বের পত্রে আভাস পেয়েচি— পত্রোত্তরের বিলম্বে রাগ করবার অভ্যাসটুকু তোমার আছে। বোধ হচ্চে তোমাদের উত্তরবঙ্গীয় মেজাজ তোমাদের লঙ্কারসিত চাপড়ঘণ্টর মতোই ঝাঁঝালো। দক্ষিণ বঙ্গের পলিমাটিতে আমরা মানুষ, আমরা ভীতু স্বভাবের— একান্ত ভালমানুষির সাহায্যেই আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি। "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর"।...

কে বলে তুমি আমাকে ঘরের কথা লেখ? ঘরের লোক ছাড়া কাউকে ঘরের কথা লেখাই যায় না। আমি যে ঘরকে কিছুই জানিনে সে ঘরে ত আমার দরজা বন্ধ। তোমার ভাষা দিয়ে তৈরী ঘরে তো পর্দ্দা খাটানো নেই, তার ফটোগ্রাফ নেওয়া যদি চলত তাহলে দেখতে ও একটা স্বতন্ত্র জিনিষ। কেননা ও ঘর তো আমি মনে মনে তৈরি করে নিই, কোন স্পষ্ট পদার্থের সঙ্গে ঠিকমতো ওর মিল হতেই পারে না। তুমি যে নামগুলি ব্যবহার কর সে তোমার চেনা, কিন্তু নামের পিছনকার রূপ তো আমারই তৈরি। তুমি ডাকঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে যা খুসি গল্প বলে যেয়ো তাতে কারো একটুকু আব্রু নষ্ট হবে না— আমার মন খুসি হবে। চিঠিতে এরকম বকে যাওয়া একটা বিশেষ বিদ্যা, সবাই পারে না, তুমি পারো। সহজ কথা সহজে বলার শক্তি খুবই দুর্লভ। আপন ভাষা সকলের আপন আয়ত্তে নেই। ইতি ১৮ অগ্রহায়ণ— ১৩৩৮

দাদা

৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা পিছিয়ে গেল। আপাততঃ আগামী শুক্রবারে কলকাতায় রওনা হবার কথা চলচে— অর্থাৎ গাড়ি প্রভৃতির জোগাড় হলে শনিবার জোড়াসাঁকোয় আমার আবির্ভাব হবে।

...তিনি যত দোষ চাপিয়েছেন শশাঙ্কের স্কন্ধে। দোষ প্রকৃতি মায়াবিনীর— মানুষের চলবার পথে তিনি চোরাফাঁদ পেতে রাখেন— বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে হঠাৎ সে পড়ে যায় গর্ত্তে। শশাঙ্কের সংসার-যাত্রার রাস্তাটা পাকারাস্তা ছিল না। হতভাগা একদিন ঘাড় মোড় ভেঙে পড়বার পূর্ব্বে সে কথাটা সকলেরই অগোচর ছিল— দিন চলছিল ভালোই কিন্তু তলায় ছিল ফাঁকা। নিশ্চিন্তমনে হাসতে হাসতে এক মুহূর্ত্তে হাসি গেল থেমে। শশাঙ্ক শর্ম্মিলায় জোড় মেলেনি— হঠাৎ একদিন বাইরে থেকে চাড় লাগবার আগে সে কথা কি সবাই জানতে পায়— যখন জানা গেছে তখন তো কপাল ভেঙেচে। নীতিবিদ্‌রা বলবে, ফাটা কপাল ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ভালোমানুষের মতো আবার সাবেক রাস্তায় উঁচোট খেতে খেতে লাঠি ধরে

খুঁড়িয়ে চলা কর্ত্তব্য। তাই সে চলত। কিন্তু শর্ম্মিলা বললে তেমন চলায় কোনোপক্ষেই সুখ নেই। সে তাই কোনো এক রকম করে স্বহস্তে ভাগ্যকে সংশোধন করবার প্রস্তাব করলে। কিন্তু ভাগ্যের উপর কলম চালানো এত সহজ নয়। সেটা বুঝেছিল উর্ম্মিমালা— ভূমিকম্পের কেন্দ্রের উপরে কাঁচা মসলায় তৈরি নড়নড়ে বাসায় সে আশ্রয় নিতে নারাজ হোলো— দিলে দৌড়। ঠিক তার পরে কী ঘটল তা কে বলবে। কালক্রমে কাটার দাগটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু ব্যথা? ব্যথা যারা পায় তাদেরই আমরা বিচার করি— কিন্তু সব সময়ে ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি তারাই? বজ্রাঘাতে মোলো মানুষটা, তুমি বললে কিনা ওরি পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। ওটাতে কেবল দোষ দেবার অন্ধ ইচ্ছের প্রমাণ হয় দোষের প্রমাণ হয় না। ইতি ১৯ জুন ১৯৩৩

দাদা

শান্তিনিকেতন

৮

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।

ডাকাতকে ভয় করবার মতো অবস্থা আমার এখন নেই। যদি ভ্রমক্রমে কেউ ঘরে পদার্পণ করে তবে চাঁদা তুলে তাকে নৈরাশ্য দুঃখ থেকে রক্ষা করতে হবে।

তোমার খাতাখানি শেষ করেছি। যেখানে বর্ণনা করেছ গল্প করেছ বেশ লাগল পড়তে। যেখানে তর্ক করেছ সেখানটা আমার কাছে ব্যর্থ হয়েছে। মনের প্রবল আক্ষেপে তুমি আমার অনেক কথা ভুল বোঝো। তোমাদের হিঁদুয়ানিতে অত্যন্ত বেশি আধুনিক ঝাঁজ— তাতে সাবেক কালের পরিণতির মোলায়েম রঙ লাগেনি। মিশনারিদের মতোই ভঙ্গী তোমাদের, যেন হিঁদুয়ানির মোল্লা-মৌলবী। গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ— আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ— সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্য দ্বারাই চিরশুচি,— সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।— তোমাকে কিছু বই দিতে চাই— রেজিষ্ট্রি না করলে পুজোর বাজারে বই গিয়ে পৌঁছয় ডাকবিভাগের অন্তঃপুরে— কোন্ ঠিকানায় পাঠানো চলবে জানিয়ো। বিজয়া দশমী ১৩৪০।

দাদা

৯

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমি তো মৃত্তিকাবিলাসী মাটির পৌত্তলিক নই। মর্ত্তোর মধ্যেই অতিমর্ত্ত্যকে যদি না উপলব্ধি করতুম তা হোলে গর্ত্তবাসী কীটবৃত্তি করে কি বাঁচতুম? জগৎ অসম্পূর্ণ তাই বলেই কি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সান্ত্বনা পেতে হবে? বীণাটার তার ঠিকমতো বাঁধা হয়নি, তাই বলেই কি নারদের বীণার ধ্যান করতে

হবে? যারা তাই করে তারা সুর বাঁধবার দায়িত্ব নেয় না। এই মর্ত্ত্য বীণাতেই শুদ্ধসুরের আদর্শ আছে সেই জন্যেই এত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে সুর বাঁধতে লেগেছেন— যথার্থ আনন্দ তাতেই। বৈকুণ্ঠপুরী যদি সত্যই কোথাও থাকে তাহোলে সেখানে মর্ত্ত্যের মানুষ টিঁকতে পারে না। এই পৃথিবীর মাটি নিয়েই আমাদের নিজের বৈকুণ্ঠ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে। সেই জন্যেই মানবসংসারে দ্বৈত আছে— যেমন আছে অপূর্ণতা তেমনিই আছে পূর্ণতার আদর্শ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই বস্তুগত জগতেই আত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিজের শক্তির দ্বারাই জয় করে নিতে হবে— পাণ্ডার শরণ নিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির আশা করব না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা নয় বীরযোগ্যা বসুন্ধরা। এই বসুন্ধরাকে নিজের বীর্য্য দিয়েই উদ্ধার করতে হবে। তোমরা আল্পনা কেটে লক্ষ্মীকে ডাকো লক্ষ্মী আসেন না— যাঁরা বীর্য্যের সহায় লক্ষ্মীকে আহ্বান করেন আজকের পৃথিবীতে তাঁরাই তো লক্ষ্মীকে পান।—

তোমাকে বিচিত্রিতা পাঠিয়েছিলুম— কালুঘোষের দরোয়ানের স্বাক্ষরিত রসিদ আছে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পাইনি। ইতি ১১ অক্টোবর, ১৯৩৩

দাদা

১০

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা ভালো নেই। ভাবছি বোটে করে গঙ্গাযাত্রা করব। খড়দহের সামনে বোট বাঁধা আছে। যদি যাওয়া নিশ্চিত স্থির করি কলকাতা হয়ে যেতে হবে তখন তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। মতামত নিয়ে তোমার সঙ্গে আর বাদানুবাদ করব না মনে করি, স্বভাবদোষে হঠাৎ বকুনির উদ্ভব হয়। তুমিও চুপ করে সহ্য করবার মেয়ে নও, তাই দ্বন্দ্ব বাধে। ওর চেয়ে তুমি যে খিচুড়ি রাঁধবার প্রণালী লিখে পাঠিয়েছ সেটা অনেক বেশি উপাদেয়। আমাদের এখানে একজন রন্ধনপটু ভোজনবিলাসী মানুষ আছে সে তোমার ডাল ও খিচুড়ির স্বাদ গন্ধ কল্পনা করে পুলকিত, আমাকে যথাবিধি রেঁধে খাওয়াতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। এমনি করে পরোক্ষে তোমার ভোজের নিমন্ত্রণ মাঝে মাঝে আমার ভাগ্যে জুটবে এমন একটা পন্থা পাওয়া গেল। সেই মানুষটা কিছুদিন থেকে নূতন প্রণালীর মোচার ঘণ্ট কোথা থেকে আবিষ্কার করে উত্তেজিত হয়ে আছে। একদা পদ্মার চরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র কিছুকাল আমার অতিথি ছিলেন— প্রতিদিন তাঁর জন্যে নূতন একটা করে ভোজ্য আমি উদ্ভাবন করেছি— সেটা প্রস্তুত করবার ভার ছিল যাঁর পরে তাঁরও কিছু কৃতিত্ব তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এসব তিনি লিখে রেখেছিলেন খাতায়, সেই খাতা দখল করেছিল আমার বড়ো মেয়ে— সেও নেই, খাতাও অদৃশ্য— গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ খাদ্য নিরবধি, তার উপায় রইল না, অথচ রইল কতকগুলো কবিতা! ইতি ২২ অক্টোবর ১৯৩৩— ৫ কার্ত্তিক ১৩৪০ সন।

দাদা

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠি ইতিপূর্বে প্রবাসীতে (১৩৩৯) 'পত্রধারা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যত্রও কিছু ছাপা হইয়াছে।

স্বর্ণকার-পরিবার

স্কেচ : শ্রীনন্দলাল বসু

সাকরা

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ

বিনয় ঘোষ

গোলদীঘির সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের দীর্ঘ দ্বাদশ বছর কেটেছে, বাল্যের ও কৈশোরের স্বপ্নময় পরিবেশে। পাশের মহাপাঠশালাও (হিন্দু কলেজ) তখন ইয়ং বেঙ্গলের কোলাহলে মুখর। ছাত্রজীবনের শেষে বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে এসে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগর কর্মজীবন আরম্ভ করেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্মজীবনের চাকুরিপর্ব শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ রাজপ্রতিনিধিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত, সেখানে স্বাধীন চিন্তা ও উদ্‌যোগ প্রকাশের প্রেরণা তেমন কিছু ছিল না। সংস্কৃত কলেজ তা নয়। এ দেশের লোকের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিদ্যা প্রসারের উচ্চ আদর্শ নিয়ে এই বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার সংকল্প নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত কলেজের কর্মজীবনে অগ্রসর হয়েছিলেন। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, কোনো আদর্শ নিয়ে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে চান, পদে পদে তাঁদের সহস্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কেবল বাধা নয়, ব্যর্থ ও অকর্মণ্য প্রতিযোগীদের অনেক আক্রোশ, স্বার্থান্বেষী সাধারণের দীনতার অনেক দংশন তাঁদের সহ্য করতে হয়। যাঁদের সহ্যগুণ বেশি, তাঁরা এসব উপেক্ষা করে নীরবে কাজ করতে পারেন। যাঁদের সহ্যগুণ কম তাঁরা তা পারেন না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই গুণটির যে বিশেষ অভাব ছিল তা তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। সংকল্প ও আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি বটে, কিন্তু বহুবার আঘাতে-দংশনে জর্জরিত হয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্যের পথ ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের কর্মজীবনের গোড়া থেকে শেষদিন পর্যন্ত এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করেছেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, কোনো ফল হয় নি। অবশেষে ধৈর্যচ্যুত হয়ে তিনি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছেন।

হাতেলেখা প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের উদ্‌যোগপর্বের এই করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে কাহিনীর মর্মটুকু আমরা জানি, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ অনেকটাই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে বলে আমাদের জানা নেই।[১]

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব সহকারী সম্পাদকত্বের, এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত, এক বছর তিন মাস। দ্বিতীয় পর্ব অধ্যক্ষতার, জানুয়ারি ১৮৫১ থেকে অক্টোবর ১৮৫৮, সাত বছর ন মাস। এই ন বছর শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার দুই কাজেই তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছেন। গোলদীঘির বিদ্যালয় থেকেই তিনি সমাজসংস্কার-আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। একই সময়ে দুই ফ্রণ্টে লড়াইয়ের মতো দুটি কঠিন কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। একটির জন্য অন্যটিতে

---

১ এই প্রবন্ধ সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন হাতেলেখা নথিপত্র (MS. Records) অবলম্বনে লিখিত। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী বিশেষ আগ্রহ সহকারে এইসব নথিপত্র দেখবার সুবন্দোবস্ত করে না দিলে এগুলি থেকে কোনো তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হত না। এজন্য তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।—লেখক

কোনো শৈথিল্য দেখা দেয় নি। সেইটাই বিস্ময়ের ব্যাপার, এবং সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র পড়তে পড়তে এই বিস্ময় আরও বাড়তে থাকে।

শিক্ষাসংসদ সহকারী সম্পাদকের পদে বিদ্যাসাগরের নিয়োগ মঞ্জুর করেন ২ এপ্রিল, ১৮৪৬। ৬ এপ্রিল বিদ্যাসাগর কাজে যোগ দেন। কলেজের নথিপত্র দেখে মনে হয়, ১৮৪৭এর এপ্রিল মাসেই বিদ্যাসাগর তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে তিনি পদত্যাগ করা সমীচীন মনে করেন। ১৮৪৭এর এপ্রিল মাসেই যে বিদ্যাসাগর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকদের একটি নিবেদনপত্র থেকে। এই অপ্রকাশিত নিবেদনপত্রটির অন্য দিক থেকেও গুরুত্ব আছে বলে এখানে সেটি আংশিক উদ্ধৃত করছি। নিবেদনপত্রটি ইংরেজিতে লিখিত এবং এইভাবে শুরু করা হয়েছে:

The memorial of the Pundits and
teachers of the Sanscrit College.

Respectfully Sheweth,

That your memorialists beg to express their sincere regret at learning that Essur Chunder Biddasagore, assistant secretary to the Sanscrit College has for reasons unknown to them resigned his situation as they are really afraid that his resignation at a time when the College is, as it were being altogether remodelled, will prove very much prejudicial to its true interests.· ·

বাকি অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হল:

"সহকারী সম্পাদক মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও উৎসাহ নিয়ে কলেজের উন্নতির জন্য যা করেছেন, এবং এর মধ্যেই এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এমন সব সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন, যার ফলে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ভিত অনেক বেশি দৃঢ় হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আবেদনকারীদের অভিমত এই যে বিদ্যাসাগরকে এই পদে নিয়োগ করে আপনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন একজনকে আপনি আপনার সহকারীর পদে নিয়োগ করেছিলেন যিনি সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী, এবং ইংরেজিতেও যাঁর চলনসই জ্ঞান আছে। আমাদের ধারণা, উভয় ভাষায় ও বিদ্যায় এই জ্ঞান থাকার জন্যই সহকারী সম্পাদকের পক্ষে শিক্ষাব্যবস্থার এই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। এই কারণে তাঁর পদত্যাগের বিষয় অবগত হয়ে আমরা দুঃখিত হয়েছি এবং যেহেতু এই সময় তাঁর অভাবে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, সেইজন্য আপনার কাছে আমাদের নিবেদন এই যে আপনি ঈশ্বরচন্দ্রকে এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করে তাঁকে কাজে নিযুক্ত রাখবার চেষ্টা করুন। তাতে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথ প্রসারিত হবে।

"পরিশেষে আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর পদত্যাগপত্র শিক্ষাসংসদের সেক্রেটারি ড. ময়েটের কাছে পেশ করেছেন বলে আমরা অনুরূপ আর-একখানি নিবেদনপত্র তাঁর কাছেও পাঠিয়েছি। পাঠাবার উদ্দেশ্য হল যাতে ময়েট সাহেব পদত্যাগপত্র পেয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত কিছু না করে

বসেন, এবং পদত্যাগ মঞ্জুর না করে যাতে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে তাঁর নিজের স্বার্থে না হলেও, অন্ততঃ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের স্বার্থে যেন তিনি কাজে নিযুক্ত থাকেন।"

তের জন পণ্ডিত ও শিক্ষক এই নিবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগোবিন্দ তর্করত্ন, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যোগধ্যান মিশ্র (হিন্দী স্বাক্ষর), রসিকলাল সেন ও শ্যামাচরণ সরকার (ইংরেজিতে স্বাক্ষর)। নিবেদনপত্রের তারিখ ১০ এপ্রিল ১৮৪৭। এপ্রিলের গোড়াতেই মনে হয় বিদ্যাসাগর পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। সেই পত্র গৃহীত হতে আরও প্রায় তিন সাড়ে-তিন মাস সময় লেগেছিল। এই তিন মাস সম্পাদক ও তাঁর সহকারীর মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল সংস্কৃত কলেজে। নথিপত্র থেকে অন্তত তাই মনে হয়। পদত্যাগের কারণ ইত্যাদি নিয়ে উভয়ের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছিল তা মধুর নয়। একটি-একটি করে পদত্যাগের সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বিদ্যাসাগর একখানি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন রসময় দত্তকে। পত্রখানি একখানি বহুমূল্য দলিল। তা ছাড়া, সংস্কৃত কলেজের পঠনপ্রণালীর যে উন্নয়ন-পরিকল্পনা নিয়ে সহকারী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সম্পাদক রসময়ের মতবিরোধ হয়েছিল, সম্পূর্ণ সেই পরিকল্পনাটিও আছে নথিপত্রের মধ্যে। এটিও দুষ্প্রাপ্য দলিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শালের সঙ্গে পরামর্শ করে যে এই পরিকল্পনাটি খসড়া করা হয়েছিল এবং মার্শাল সেটি খুব তারিফ করেছিলেন, তা আমরা জানি। তার বেশি কিছু জানি না। আসল পরিকল্পনা, যা সংস্কৃত কলেজের দলিলপত্রের মধ্যে রয়েছে, তার মর্ম এই :

ব্যাকরণের বিদ্যা আয়ত্ত করতে দু বছরের বেশি সময় লাগা উচিত নয়, অথচ বর্তমানের পঠনব্যবস্থার ফলে প্রায় তার দ্বিগুণ সময় ছাত্ররা অপব্যয় করে। শিক্ষাও ভালো হয় না। ব্যাকরণের পাঠ্য ও পঠনব্যবস্থা দুইই বদলানো প্রয়োজন। সাহিত্যবিভাগের পাঠ্যপুস্তক বদলাতে হবে। বর্তমানে স্মৃতির আগে ন্যায় পড়াবার যে রীতি আছে, তার বদলে স্মৃতি আগে পড়াতে হবে, কারণ স্মৃতি ন্যায়ের তুলনায় সহজবোধ্য। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান, কাব্য, দুটি অনুবাদ (সংস্কৃত ও বাংলা) এবং সংস্কৃত রচনার ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান কাব্য ও সংস্কৃত রচনা যেমন আছে থাকবে, দুটি অনুবাদ বাতিল করতে হবে। সংস্কৃত ও বাংলা দুই ভাষার রচনার ভিতর দিয়ে ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে, অনুবাদের প্রয়োজন হবে না। ইংরেজি বিভাগের পাঠ্য ও পঠনব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। এইভাবে বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠ্যবিভাগ সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শেষকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

I have carefully studied the working of the system, and the suggestions made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English learning combined, under the impression that such a training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our Vernacular dialects with the science and civilization of the Western world.

সমস্ত পরিকল্পনার সার কথাটুকু এই শেষ বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এ দেশের ক্লাসিকাল

সংস্কৃতবিদ্যার সঙ্গে নূতন পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটিয়ে, মাতৃভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ প্রসারিত করাই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যই তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কারের দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু তা পালন করতে পারলেন না, কাজে বাধা পেলেন। সম্পাদক রসময় দত্তের মনে হল, যে-কোনো কারণেই হোক, বিদ্যাসাগর তাঁর সহকারী হয়েও সর্বব্যাপারে বেশি কর্তৃত্ব দাবি করছেন, এবং সে-দাবি মেনে নিলে তাঁর নিজের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব দত্ত মহাশয়ও তাঁর সম্পাদকীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সজাগ হলেন এবং সহকারীর দৈনন্দিন 'রুটিন'-কাজের মাত্রা এমন বাড়িয়ে দিলেন যাতে চিন্তাভাবনার কোনো অবসরই তাঁর না থাকে। এই গতানুগতিক যান্ত্রিক কাজের বোঝা যে সহকারী বিদ্যাসাগরের স্কন্ধে কি পরিমাণে চাপানো হয়েছিল, কলেজের কাগজপত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। অতিবাধ্য কর্মচারীর মতো বিদ্যাসাগর যে সেইসব কাজকর্ম হৃষ্টচিত্তে করেছিলেন, তা মনে হয় না। তার উপর, কাজের বোঝার সঙ্গে ছিল অপমানের গ্লানি। ক্রমে সেই গ্লানি দুঃসহ হয়ে উঠল। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তিনি উন্নয়ন-পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। তার ছ মাসের মধ্যে, এপ্রিল ১৮৪৭এ, তাঁকে পদত্যাগপত্রও পেশ করতে হল।

কলেজের পণ্ডিতেরা ১০ এপ্রিল নিবেদনপত্র পেশ করলেন। দশ দিন পরে ২১ এপ্রিল দত্ত মহাশয় চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগরকে, তাঁর পদত্যাগের কারণগুলি পরিষ্কার করে জানাতে। চিঠির উত্তরে (৩ মে, ১৮৪৭) বিদ্যাসাগর লিখলেন :

Sir,

Agreeably to your instructions dated 21 April I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.

I studied the Sanscrit language and literature in the Government Sanscrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study, and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods, but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded, I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step.

এর পর দীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর সবিস্তারে কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল আশানুরূপ ভালো না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য ও পঠনব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তার জন্য কত পরিশ্রম করে তিনি কি কি সংস্কার করেছেন, তারও উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত বলেছেন : "সব সময় আমি আপনার অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা করে হয়তো সব কাজ করতে পারি নি। তার কারণ, আপনার অন্যান্য কাজকর্ম এত বেশি যে আপনি কলেজে নিয়মিত আসতেই পারেন না। বাধ্য হয়ে আমাকে তাই

পরীক্ষকের মতামতের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু আপনি সেটাও আদৌ সুনজরে দেখেন নি ('bad spirit' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে)। গত এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের সুশিক্ষার জন্য আমি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। অন্তত চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি। বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও ছাত্ররা সে কথা সকলেই স্বীকার করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত সব ব্যাপার যে করা হয়েছে, আপনি তার বিশেষ খোঁজই রাখেন না মনে হয়। একজন মানুষ যদি এত পরিশ্রম করেও তার কাজের সামান্য স্বীকৃতি না পায়, তা হলে সে কি করে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং কেমন করেই বা তার পক্ষে এত দায়িত্ব নিয়ে এই কাজ করা সম্ভব।"

পাঠ্যবিষয় সংস্কারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "আমার মনে হয়েছিল যে পাঠ্যবিষয়ের আমূল সংস্কার করতে না পারলে বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে এপ্রিল মে জুন (১৮৪৬) এই তিন মাস ধরে আমি সর্বদা চিন্তা করেছি এবং জুলাই মাসে (১৮৪৬) যখন অসুখবিসুখের জন্য তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে আমি দেশে যাই (বীরসিংহ গ্রামে), তখন অবসর পেয়ে আমার চিন্তাধারাকে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনায় আমি লিখিত রূপ দিই। কলকাতায় ফিরে এসে আমি কলেজের পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি এবং তাঁরা একবাক্যে আমার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং আপনার কাছে সেটি দাখিল করতে বলেন, যাতে আপনি সেটি শিক্ষাসংসদের মতামতের জন্য পাঠাতে পারেন। উৎসাহিত হয়ে আমি পরিকল্পনাটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই এবং অনুরোধ করি যাতে শীঘ্রই আপনি সেটি সংসদে পেশ করেন। আমার ইচ্ছা ছিল পুজোর তিন সপ্তাহ ছুটির পরে কলেজ খুললেই যাতে নূতন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। আপনি প্রথমে পরিকল্পনাটি আগাগোড়া পড়ে একদিন আমাকে বললেন যে সংসদে পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ নূতন ব্যবস্থা চালু করবার ক্ষমতা আপনার আছে এবং দরকার বুঝলে আপনি নিজেই তা করবেন। পুজোর ছুটির পরে আমি যখন আপনাকে বললাম, নূতন পাঠ্যবিষয় চালু করতে, তখন আপনি বললেন যে কেবল ব্যাকরণশ্রেণীর পাঠ্য সম্বন্ধে আপনি নিজে দায়িত্ব নিতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাসংসদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা সম্ভব হবে না। আবার তার পর একদিন আপনি আমার পরিকল্পনার খসড়াটি হাতে করে এনে বললেন যে, কোনো বিষয়ে, এমন কি ব্যাকরণ সম্বন্ধেও সংসদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা যাবে না এবং সংসদে আপনি কেবল ব্যাকরণের অংশটি আলাদা করে পাঠাতে চাইলেন। আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম, সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি পাঠাবার জন্য, কিন্তু আপনি তা করলেন না, এবং আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এত বড় রিপোর্ট সংসদ পড়ে দেখবে না, অতএব অল্প করে করাই ভালো। অতঃপর ১৬ অক্টোবর (১৮৪৬) আপনি ব্যাকরণের অংশটি পাঠান, কিন্তু তার ভিতর থেকেও তিনখানি এমন পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে দেন যার ফলে সেটি অকেজো হয়ে যায়।"

এই ঘটনার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর পরে যে অভিযোগ করেছেন তা আরও মারাত্মক। তিনি লিখেছেন: "মেজর মার্শাল বৃত্তিপরীক্ষার রিপোর্টে আমার পরিকল্পনা অনুমোদন করে সংসদকে তা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আপনি সংস্কৃত কলেজের বাৎসরিক রিপোর্টে (১৮৪৬-৪৭, প্যারা ১৬, পৃষ্ঠা ৬) এ বিষয়ে মন্তব্য করেন যে মেজর মার্শাল যে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন তা আপনার নির্দেশে এবং আপনার সংকলিত তথ্যাদি নিয়ে রচনা করা হয়েছে। আমি শুধু এইটুকু আপনাকে

জানাতে পারি যে আপনার কাছ থেকে এই পরিকল্পনা রচনার সময় কোনো তথ্য আমি পাই নি বা আপনি দেন নি, এবং নির্দেশের মধ্যে কেবল এইটুকুই বলেছিলেন যে বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণীসংখ্যা (sections) কমিয়ে নূতন ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না ভেবে দেখতে।”

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিদ্যাসাগর, আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে হলেও যার গুরুত্ব আছে। তিনি লিখেছেন : “হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মধ্যে মধ্যে তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষার সময় আমাদের সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাত্রদের টুল ও ডেস্ক নিয়ে যান এবং তিন-চার দিন পর্যন্ত আটকে রাখেন। আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনেককে তার জন্য খালি মেঝেতে বসতে হয়। মেঝেতে মাদুর ও বিছানা নেই। আপনাকে বহুবার এ বিষয়ে বলেছি এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের এই অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিকার করতে অনুরোধ করেছি। আপনি তাতে কর্ণপাত করেন নি।” এই কথা বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন : “Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful”.

পদত্যাগের এইসব কারণের ভিতর থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি হল, দত্ত মহাশয়ের অসহযোগিতা ও অনুদারতা বিদ্যাসাগরের গোড়া থেকেই ভালো লাগে নি। দ্বিতীয়টি হল, সম্পাদকের উদ্দেশ্য ছিল চাকুরি করা। আসল সরকারী কাজ বজায় রেখে তিনি কলেজের ঠিকা কাজ কোনোরকমে চালিয়ে যেতেন। সহকারীর লক্ষ্য ছিল, বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা। রসময় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ হল চাকুরের সঙ্গে আদর্শবাদীর বিরোধ। সম্পাদকের কোনো আদর্শের বালাই ছিল না, তাই পদলগ্ন ক্ষমতাটুকু তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। মনে মনে তাঁর আশঙ্কা ছিল, বিদ্যাসাগর নিজগুণে তাঁর চেয়ে বেশী প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠালাভ করবেন, এবং তাতে হয়তো তাঁর ঠিকা কাজের বাড়তি কর্তৃত্ব ও উপরি আয়টুকু বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগর তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন বলে, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে পদত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম পর্বের অফুরন্ত উদ্যমের প্রকাশ এইভাবে ব্যাহত হল। ঘটনাচক্রে এইখানেই অবশ্য তা শেষ হল না। সংস্কৃত কলেজেই আবার তাঁকে কয়েক বছর পরে নূতন কাজে যোগ দিতে হল। ডিসেম্বর ১৮৫০ থেকে তিনি কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এবারে রসময় দত্ত পদত্যাগ করলেন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। ১৬ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংসদের অনুরোধে আর-একবার তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত একটি শিক্ষাসংস্কার-পরিকল্পনা রচনা করলেন। আগের পরিকল্পনার (১৮৪৬) সঙ্গে এই পরিকল্পনার সাদৃশ্য আছে অনেক, মূল দৃষ্টিভঙ্গিরও মিল আছে। তবে আরও অনেক পরিণত চিন্তার ফল এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য বিদ্যাসাগরকে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হল। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করা হল এবং বিদ্যাসাগর সেই পদে নিযুক্ত হলেন (২২ জানুয়ারি, ১৮৫১)।

সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং সর্বাধিক কর্তৃত্ব পেয়েও বিদ্যাসাগর যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষারীতির উন্নতির চিন্তা থেকে মুক্ত হন নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নথিপত্র থেকে। “Notes on the Sanscrit College” শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ ২৬-‘প্যারা’ সম্বলিত রচনা সংস্কৃত কলেজের দলিলপত্রের মধ্যে

আছে। অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই 'Notes'এর রচয়িতা, রচনার তারিখ ১২ এপ্রিল, ১৮৫২। সম্পূর্ণ নোটটি উদ্ধৃত না করে এখানে কেবল সূচনা ও প্রথম পাঁচটি 'প্যারা' গুরুত্ববোধে উদ্ধৃত করছি :

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.

2. Such a literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.

3. An elegant expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good sanscrit scholars. Hence the necessity of making sanscrit scholars well versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make sanscrit their after study, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.

বিদ্যাসাগরের আসল শিক্ষাদর্শ এই নোট'টির মধ্যে যতটা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, সেরকম আর অন্য কোনো পরিকল্পনার মধ্যে ওঠে নি। তাঁর জীবনের জপতপধ্যান ছিল মাতৃভাষা বাংলার উন্নতিসাধন এবং সেই ভাষায় এক সুসমৃদ্ধ নূতন সাহিত্যের গোড়াপত্তন করা। গোড়া যাতে মজবুত হয়, ভিত যাতে দৃঢ় হয়, টবের শৌখিন ফুলের মত মনোহর রূপ নিয়ে ফুটে উঠে যাতে না তা ঝরে যায়, দেশীয় সুস্থ ঐতিহ্যের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে যাতে সেই সাহিত্য ভবিষ্যতে আত্মবিকাশের অফুরন্ত সুযোগ পায়, এই ছিল তাঁর সমস্ত শিক্ষাসংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক যেমন বীক্ষণাগারে তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই আদর্শের বীজ বপন করে নিজের হাতে আবাদ করতে চেয়েছিলেন। কিছুদূর তিনি সার্থক হয়েছিলেন, সম্পূর্ণ হতে পারেন নি, কারণ প্রতিপদে এত বাধা ঠেলে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল যে তাঁর পর্যাপ্ত উদ্যমও তাতেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে এই লিপিটি শিক্ষাসংসদে পাঠিয়েছিলেন তাঁর নিজের মন্তব্যসহ (৩০ জুন, ১৮৫২) :

The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanskrit College at my request.

It is the result of several consultations I have held with the Principal and I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration.

বিদ্যাসাগর নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার খানিকটা স্বাধীনতা পেলেন। সংসদের অনেক সাহেব সভ্য ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর গুণের জন্য এবং কিছুটা যে তাঁর রুক্ষ মেজাজ ও একগুঁয়েমিকে ভয়ও করতেন, তাও বোঝা যায়। আরও মনে হয়, শ্রদ্ধা করতেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রকে, কিন্তু তাঁর আদর্শকে তাঁরা সকলে খুব পছন্দ করতেন না। এক বছর না ঘুরতেই দেখা যায়, শিক্ষাসংসদ বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন সাহেবকে, একজন পণ্ডিতসহ, কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান (M. S. Proceedings of the Council of Education, 16 June 1853)। জুলাই-আগস্ট মাসে, একজন পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে, ব্যালাণ্টাইন কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে রিপোর্ট পেশ করেন। ৪০৩৲ টাকা তাঁদের যাতায়াতের খরচ বাবদ মঞ্জুর করা হয় (MS. Proceedings, 24 November 1853)।

বিদ্যাসাগর-ব্যালাণ্টাইন বিরোধপর্বের এই কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্যালাণ্টাইন ও বিদ্যাসাগরের বিচারভঙ্গির মধ্যে গরমিল ছিল বেশি। ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সাহেব-পণ্ডিতের সমালোচনায় সংসদের সাহেব সভ্যরা ক্ষুব্ধ তো হয়েছিলেনই, মনে হয় ক্রুদ্ধও হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমালোচনার পরেও তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করেন, তার মধ্যে সরাসরি সরকারী হুকুমের সুরটাই তীব্র হয়ে উঠেছে দেখা যায়: "সংসদের ইচ্ছা, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ড. ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসার ও অন্যান্য বই বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেন। তাঁর বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যেন সর্বদা তিনি ড. ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে পত্রযোগে পরামর্শ করেন" (Proceedings, 14 September 1853)। শিক্ষানীতি, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি নিয়ে যেখানে দুই অধ্যক্ষের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রয়েছে, সেখানে হঠাৎ এইভাবে হুকুম জারি করে বিদ্যাসাগরকে ব্যালাণ্টাইনের উপদেশ গ্রহণ করতে বলার কোনো যুক্তি ছিল না। ড. ময়েটকে একখানি পত্রে বিদ্যাসাগর পরিষ্কার তাই লিখে জানালেন (৫ অক্টোবর, ১৮৫৩): "এই আদেশ যদি আমাকে পালন করতে হয়, তাহলে সংসদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষাব্যবস্থা আমি প্রবর্তন করেছি, তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে।" বিরোধের সাময়িক নিষ্পত্তি করা হল বিদ্যাসাগরকে স্বাধীনতা দিয়ে। খুব বেশিদিন তা স্থায়ী হল না। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত তিন বছর বিদ্যাসাগর মোটামুটি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পেরেছিলেন মনে হয়। এই সময় কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের বছর থেকে সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধের আবার সূত্রপাত হতে থাকে। ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে বিরোধ। প্রত্যেক বিষয়ে, পদে পদে, তিনি বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন, এবং তাই নিয়ে বিরোধ ক্রমেই তীব্র হতে থাকে। সংস্কৃত কলেজের দলিলপত্র থেকে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর তাঁর মনোনয়নের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের কোনোরকম হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এ বিষয়ে দার্জিলিং থেকে লেখা গর্ডন ইয়ঙের একখানি পত্রে (১৭ এপ্রিল, ১৮৫৭) তার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। গর্ডন ইয়ং লিখছেন :

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter No 1114 dated 8th current. Upon the present occasion and on your reiterated recommendation, I have no objection to sanction the following appointments, but I would wish you to bear in mind that in future, before such recommendations are made, full publicity should be given to the fact of the vacancies··· and the rules referred to in my letter No 119 dated 26th ultimo should not be overlooked.

সাহিত্যের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, গণিতের অধ্যাপক মোহিনীমোহন রায়, দ্বিতীয় জুনিয়র শিক্ষক তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক প্রসন্নচন্দ্র রায়, এই চারজনের নিয়োগ সম্পর্কে গর্ডন ইয়ং এই চিঠি লেখেন। চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, নিয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য শিক্ষাবিভাগ আগেই তাঁকে জানিয়েছিলেন। কোনো অধ্যাপক ও শিক্ষকের পদ খালি হলে তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে উপযুক্ত লোক বাছাই করতে হবে, এই ছিল শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ। বিদ্যাসাগর এ নির্দেশও মানতে রাজি হন নি। চিঠির উত্তরে (৮ মে, ১৮৫৭) মনে হয় পরিষ্কার ভাষায় তিনি গর্ডন ইয়ংকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ গর্ডন ইয়ং প্রত্যুত্তরে লিখছেন (১৬ মে, ১৮৫৭) :

মহাশয়,

আপনার ৮ তারিখের ১১২১ নং চিঠি পেয়েছি। আমি স্বীকার করছি যে আপনি যেসব লোক বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছেন তাঁরা 'যোগ্য' ব্যক্তি, কিন্তু তার জন্য এ কথা মানতে আমি রাজি নই যে তাঁরাই 'যোগ্যতম' ব্যক্তি। কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি না দিলে যোগ্যতম ব্যক্তি নিয়োগ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আপনি যে এ ব্যাপারে তা করেন নি, তার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। তবে তার জন্য আমি আপনার উপর কোনো দোষারোপ করি নি। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এখনও এই নির্দেশ মানতে কেন সম্মত নন। আপনি যখন এই নিয়মের ঘোর বিরোধী দেখা যাচ্ছে এবং নিয়মটি মেনে চললে আপনার কাজকর্মের অসুবিধা হবে জানিয়েছেন, তখন এ বিষয়ে আর কোনো অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক না করে আমি আপনার সিদ্ধান্তই মেনে নেব ঠিক করেছি এবং আপনার পাত্রনির্বাচন অনুমোদনও করব। এবারেও তাই করলাম। ইতি—

বিদ্যাসাগরের এই আচরণ, বাইরে থেকে বিচার করলে সমর্থনযোগ্য মনে না হতে পারে। এই বিরোধ থেকে বোঝা যায়, সংস্কৃত কলেজের পরিচালনার ব্যাপারে, তাঁর অধ্যক্ষতার কালে তিনি বিশেষ কর্তৃত্ব দাবি করেছেন। আত্মমত প্রতিষ্ঠার এই একাগ্রতা এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দকে সবচেয়ে বড় করে দেখা, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের নিশ্ছিদ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা দিক মাত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন ছিল তখন, কারণ বাঁকা মেরুদণ্ড নিয়ে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে কাজ করে কোনো সুফল লাভের আশা করা

তখন সম্ভব ছিল না। বিদ্যাসাগর জানতেন, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজে কাজ করার পথে এমনিতেই অন্তরায়ের অভাব নেই, তার উপর তাঁর সহযোগীদের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের কর্তারা যদি প্রকাশ্য মনোনয়নের সুযোগ নিয়ে নিজেদের তাঁবের লোক দু-চারজন ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তা হলে কোনো কাজ করাই সম্ভব হবে না। এই কারণেই মনে হয় তিনি কলেজের অধ্যাপক-শিক্ষকাদি নিয়োগের ব্যাপারে নিজের পূর্ণ অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো রকম হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নি।

বাংলা স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যাপার নিয়েও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে গর্ডন ইয়ঙের বেশ বিরোধ হয়েছিল মনে হয়। গর্ডন ইয়ঙের একখানি চিঠিতে দেখা যায় (দার্জিলিং, ১৩ এপ্রিল, ১৮৫৭) তিনি বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব 'স্কুল বুক সোসাইটি'কে দেবার জন্য অনুরোধ করছেন। অর্থাৎ কতকটা সরকারী তত্ত্বাবধানে বই লেখা ও প্রকাশ করার দায়িত্ব তিনি নিতে চান। তাঁর যুক্তি হল, গ্রন্থকাররা বই লিখে বেশি মুনাফা করেন, বাইরের প্রকাশকরাও মুনাফার জন্য বই প্রকাশ করেন। জনশিক্ষার প্রসারের জন্য সুলভ মূল্যে বই প্রকাশ করা প্রয়োজন এবং তা করতে হলে স্কুল বুক সোসাইটির উপর তার ভার দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে বিদ্যাসাগর একজন অন্যতম পাঠ্যপুস্তক লেখক ও প্রকাশক ছিলেন তখন। তাঁর 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী' প্রতিষ্ঠান তখন বাংলাদেশের অন্যতম প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তারা বিদ্যাসাগরের এই স্বাধীন বৃত্তির সাফল্য বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। মনে হয়, গর্ডন ইয়ঙের এই জনশিক্ষা প্রসারের সদুদ্দেশ্যের মূলে আসল লক্ষ্য ছিল বিদ্যাসাগরের স্বাধীন বৃত্তিটিকে ব্যাহত করা। বিদ্যাসাগর তাই তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সমর্থন করেন নি। লেখক ও প্রকাশকের স্বাধীন বৃত্তিতে সরকারী হস্তক্ষেপে তিনি বাধা দিয়েছেন। গর্ডন ইয়ং তাঁর চিঠির উত্তর পেয়ে যে খুশি হন নি, তা তাঁর পরবর্তী চিঠির (২মে, ১৮৫৭) এই উক্তি থেকে বোঝা যায়: "...I am compelled to observe that it contains a very insufficient answer to the requisitions"...বোঝা যায়, গর্ডন ইয়ঙের প্রস্তাবের কোনো গুরুত্বই দেন নি বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সরকারী শিক্ষাবিভাগের এই ধরণের নানা বিষয় নিয়ে যখন বিরোধ চলছিল এবং ক্রমেই তা তীব্রতর হচ্ছিল, তখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রিটিশ শাসকরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। কলকাতা শহরের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের অট্টালিকাগুলি তাঁরা সৈন্যসামন্ত মজুত করার জন্য দখল করছেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের অট্টালিকাও তাঁরা দখল করার সিদ্ধান্ত করেন। বিদ্যাসাগর এই সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়ে মনে হয় গবর্নমেণ্টকে চিঠি লিখেছিলেন (১১ অগস্ট, ১৮৫৭)। কারণ বাংলা গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারি তাঁকে একখানি চিঠিতে লেখেন (১৭ অগস্ট, ১৮৫৭):

In reply to your letter No 952 dated 11th instant, I am directed to forward for your information copy of a letter from the Secretary to the Government of India in the Military Department No 611 dated 14th idem, and of its enclosure, from which you will see that the Hindu and Mudrissa College buildings are to be appropriated as a temporary measure for the accomodation

of troops shortly expected to arrive at Calcutta. You are accordingly requested to place the buildings at once at the disposal of the Garrison Commander...

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং পরদিন ১৮ অগস্ট বিদ্যাসাগরকে একখানি পত্রে লেখেন: "...you will report as soon as possible as to the best way of providing accomodation elsewhere for the classes which will be displaced in consequence of the occupation...by troops." মাসিক ১০৫৲ টাকা ভাড়ায় বিদ্যাসাগর দুটি বাড়ি ভাড়া করেন সংস্কৃত কলেজের জন্য এবং সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করেন:

The Right Honourable the Govenor-General in Council is pleased to sanction an expenditure of Rs 105 per mensem as rent for two houses hired for the use of the Sanskrit College at Calcutta during such time as the College Building is appropriated for the accomodation of troops (Proceedings of G.G. in Council in the Finance Dept., dated 28 September, 1857).

এর ঠিক এক বছর পরে, ১৮৫৮র ২৮ সেপ্টেম্বর (Letter No 1566, dated 28 September 1858), বাংলা সরকার বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করে লেখেন: "পণ্ডিত মহাশয়, কিছুটা অশোভনভাবে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন, এটা দুঃখের কথা।"[২]

দুঃখের কথা ঠিকই। বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তগুলি এত দৃঢ়, অনড় ও রূঢ় ছিল যে বাইরে থেকে তা অশোভনই মনে হত অনেক সময়। সংস্কৃত কলেজ ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রধান পরীক্ষাগার। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজে শিক্ষালাভ করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি পরিণত করতে চেয়েছেন। যখন তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন তখন থেকে তাঁর অধ্যক্ষতার শেষদিন পর্যন্ত তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাই। সেই লক্ষ্য চরিতার্থ করার পথে অনেক রকমের অন্তরায় দেখা দিয়েছে। নীতির অন্তরায়, চারিত্রিক দৈন্য ও বিদ্বেষের অন্তরায়। তার বিরুদ্ধে একাই তিনি সংগ্রাম করেছেন। নিজের স্বার্থে নয়, বাংলাদেশে নবযুগের নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থে। তাঁরই রচিত নানারকমের শিক্ষাসংস্কার-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে (১৮৪৬, ১৮৫০ ও ১৮৫২ সালের) তাঁর যে শিক্ষাদর্শটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, সেটি হল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং উন্নত ভাষার সাহায্যে মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা। বিদ্যাসাগরের সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল উৎস হল এই আদর্শ। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে পন্থা তিনি গভীর চিন্তা করে নির্ধারণ করেছিলেন, সেটি 'Notes on the Sanscrit College' খসড়ার পূর্বোদ্ধৃত প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদের মধ্যে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং নূতন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ—এই দুই কাজ যাঁরা করতে সক্ষম হবেন, তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের নূতন গোড়াপত্তনে সবচেয়ে বেশী সহায়

---

২ এখানে বিদ্যাসাগরকে লিখিত শিক্ষাবিভাগের চিঠিপত্রগুলিরই কেবল উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের খাতাপত্রে সেইগুলিই থাকা সম্ভব এবং আছেও। বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা চিঠিপত্র শিক্ষাবিভাগের (D. P. I. Records) দফতরে থাকা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষাবিভাগের মহাফেজগৃহ অনুসন্ধান করে তার কোনো হদিশ আমি পাই নি। যতদূর খবর পেয়েছি, সেগুলি নাকি 'বাজে কাগজপত্র' বলে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।—লেখক

হতে পারবেন। কেবল ইংরেজিবিদ্যা শিখে যাঁরা আধা-ফিরিঙ্গি হবেন, অথবা প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা অন্ধের মত আয়ত্ত করে টুলো পণ্ডিত হবেন, তাঁরা কেউ একাজের যোগ্য হতে পারবেন না। সংস্কৃত কলেজটিকে তাই বিদ্যাসাগর প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠী করতে চান নি, আবার সংলগ্ন হিন্দু কলেজের মত 'দেশী সাহেব' তৈরির প্রতিষ্ঠানও করতে চান নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার লেনদেনের ও মিলনমিশ্রণের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র করতে চেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেজকে। এই আদর্শের বীজবপন হয়তো তাঁর ছাত্রজীবনেই হয়েছিল। তার পর কলেজের কর্মজীবনে, ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত, যখনই তিনি এই আদর্শকে রূপ দেবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তার সদ্ব্যবহার করেছেন। সরকারী ও বেসরকারী বহু বাধাবিপত্তির জন্য তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারেন নি। যতটুকু পেরেছেন, তাতেই বাংলাদেশের নবযুগের নূতন শিক্ষার ভিত ও কাঠাম দুইই দৃঢ় হয়েছে।

দু হাজার বছরের একটি ক্ষুদ্র পুরানো গল্প

শ্রীসুকুমার সেন

দুহাজার বছর আগে আমাদের দেশে একজন বড় বৈয়াকরণ জন্মেছিলেন। তাঁর নাম পতঞ্জলি। মস্ত বড় পণ্ডিত ও মনীষী। তখন শুঙ্গ বংশের রাজত্ব চলছে। অশ্বমেধযাজী সম্রাট পুষ্যমিত্রের পুরোহিত ছিলেন পতঞ্জলি। মনে হয় ইহার নিবাস ছিল মগধে কেননা পাটলিপুত্র নগরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেকালে ভাষায় বেশভূষায় আহারে আচরণে— কোনো বিষয়েই মগধের সঙ্গে রাঢ়-বঙ্গের বিভেদ ছিল না। সুতরাং পতঞ্জলিকে সেকালের বাঙালী পণ্ডিত ধরলেও অন্যায় হয় না।

পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণের উপর একটি বড় থিসিস লিখেছিলেন। তার নাম 'মহাভাষ্য'। মহাভাষ্যের গৌরব পাণিনির ব্যাকরণ-সূত্রের পরেই।

চিরকালই ব্যাখ্যাতা বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণ বিচারে উদাহরণ দিয়ে থাকেন। পতঞ্জলিও এর অন্যথা করেন নি। তাঁর অধিকাংশ উদাহরণে 'দেবদত্ত' নামটি পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে এই নামটি পাওয়া গেছে সেই সেই উদাহরণগুলি আমি একদা কৌতূহলবশে সংগ্রহ করেছিলুম। সেগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে দেখেছিলুম যে কল্পিত দেবদত্ত মানুষটির বাল্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন-কাহিনী গল্পের মতো (ক্রাইম স্টোরিও বলতে পারি) খাড়া করা যায়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে একটি প্রবন্ধের আকারে গল্পটি উপস্থাপিত করেছিলুম। সেকালের সমাজ-জীবনের দুর্লভ খণ্ডচিত্র এতে মিলবে। এখন বাঙালী পাঠককে এই পুনর্গঠিত অতি প্রাচীন গল্পটি যথাযথ শোনাচ্ছি।

গল্পটির রচয়িতা পতঞ্জলি। তিনি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দে জীবিত ছিলেন। আমি শুধু পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দিয়েছি। অনুবাদ যথাযথ। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে মূলের সৌন্দর্যও খানিকটা উপলব্ধ হবে এই ভেবে পাদটীকায় মূলও দেওয়া গেল।

১ গোড়ার কথা

দেবদত্ত স্রুঘ্নের লোক।[১] দেবদত্ত গার্গ্যগোত্র।[২] দেবদত্তকে 'দত্ত' বলে ডাকে,[৩] 'দেবদত্তক' 'দেবক' 'দত্তক' বলেও।[৪] দেবদত্ত নামই ঠিক, 'দেবদিন্ন' ঠিক নয়।[৫] কেউ না মারলেও দেবদত্ত কাঁদে।[৬] খাওয়ার বেলায় দেবদত্তের লোভ মোয়ায়।[৭]...

---

১ স্রৌঘ্নো দেবদত্তঃ।
অর্থাৎ দেবদত্তেরা আসলে উত্তরাপথের স্রুঘ্ন শহরের বাসিন্দা ছিল।

২ গার্গ্যো দেবদত্তঃ।

৩ দেবদত্তো দত্তঃ।

৪ দেবদত্তকঃ দেবকঃ...দত্তকঃ।

৫ দেবদত্তশব্দো দেবদিন্নশব্দং বারয়তি।
অর্থাৎ, দেবদত্ত নামটিই শুদ্ধ, দেবদিন্ন প্রাকৃতজ সুতরাং অশুদ্ধ।

৬ অনাহতো নদতি দেবদত্তঃ।

৭ অভিপ্রায়ো দেবদত্তস্য মোদকেষু ভোজনে।

বেশ পড়াশোনা হচ্ছে দেবদত্তের।[৮]...যে-ছেলেটি বসে বসে পড়ছে ওই দেবদত্ত।[৯]...

২ সংসার কর্ম

দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত দুজনেই বুদ্ধিমান্, ধনী, দেখতে ভালো, দলে ভারি। তবে বেদপাঠে দেবদত্তই ভালো।[১০]...

দেবদত্তের ক্ষেত নদীর ধার পর্যন্ত।[১১]...দেবদত্ত নিজের হাতে কিনেছে।[১২]...

দেবদত্তের ধান ওরা আপসে কাটছে।[১৩]...

ভোল জমির ধান যেন আপনিই কাটা হয়ে যাচ্ছে, যেখানে ওই দেখা যাচ্ছে দেবদত্ত কাস্তে-হাতে দ্রুতগতি এদিক ওদিক চার দিকে চলে বেড়াচ্ছে।[১৪]

দেবদত্ত চাটাই বোনাচ্ছে।[১৫]... চাটাই খাটিয়ে রাখছে দেবদত্ত।[১৬] দেবদত্ত ভাল করে চাটাই করেছে।[১৭]...

৩ খাওয়ার অনিয়ম ও রোগভোগ

তৃপ্তি করে জাউ খাচ্ছে দেবদত্ত।[১৮]...দই-কাঁকুড়ে গন্ধ সদ্য জ্বর।[১৯]...

দেবদত্তের কিছুই ভালো লাগছে না। ক্ষুধার্তের কিছুই ভালো লাগে না।[২০]...

এমনি একজন আর অপরকে জিজ্ঞাসা করছে, দেবদত্তের অসুখ কিরকম? একজন বললে, কমে যাচ্ছে। আর একজন বলে, সেই রকমই।[২১]...

দেবদত্ত মণ্ড খাচ্ছে।[২২]..

---

৮ পঠ্যতে বিদ্যা দেবদত্তেন।

৯ যোঽধীয়ান আস্তে সো দেবদত্তঃ।

১০ দেবদত্তযজ্ঞদত্তাবাঢ্যাবভিরূপৌ দর্শনীয়ৌ পক্ষবন্তৌ। দেবদত্তস্তু স্বাধ্যায়েন বিশিষ্টঃ।

১১ নদ্যন্তং দেবদত্তস্য ক্ষেত্রম্।

১২ দেবদত্তেন পাণিনা ক্রীতম্।

১৩ দেবদত্তস্য ধান্যং ব্যতিলুনন্তি।

১৪ লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি যত্রাসৌ দেবদত্তো দাত্রহস্তঃ সমন্ততো বিপরিপতন্ দৃশ্যতে।

১৫ কারয়তি কটং দেবদত্তঃ।

১৬ উচ্ছ্রয়তি কটং দেবদত্তঃ।

১৭ প্রকৃতম্ কটং দেবদত্তেন।

১৮ স্বাদুংকারং যবাগুং ভুঙ্ক্তে দেবদত্তঃ।

১৯ দধিত্রপুসং প্রত্যক্ষং জ্বরঃ।

২০ ন দেবদত্তং প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ। বুভুক্ষিতং ন প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ।

২১ এবং হি কশ্চিৎ কঞ্চিৎ পৃচ্ছতি কিমবস্থো দেবদত্তস্য ব্যাধিরিতি। অপর আহ অপক্ষীয়ত ইতি। অপর আহ স্থিত ইতি।

২২ ভক্ষয়তি পিণ্ডীং দেবদত্তঃ।

৪ বিবাহ ও সন্তান লাভ

দেবদত্তের মনে হচ্ছে যজ্ঞদত্তা দেখতে বেশ।[২৩]...

কনেকে দেবদত্ত এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করলে।[২৪]...

পিতামহের কোলে বসা ছেলেটির সম্বন্ধে একজন জিজ্ঞাসা করছে, কার এটি? সে বললে, দেবদত্তের।[২৫]...

৫ পাটলিপুত্র

পাটলিপুত্রের খুব প্রশংসা করে সুকোশলা—এই রকম সেখানের নগর প্রাচীর।[২৬] শোণনদের তীর বরাবর পাটলিপুত্র।[২৭] পাটলিপুত্রেরই প্রাসাদ, পাটলিপুত্রেরই প্রাচীর।[২৮] পাটলিপুত্রের লোকেরা সাংকাশ্যের লোকেদের চেয়ে অনেক সুন্দর।[২৯]

৬ অপরের চোখে দেবদত্ত

গ্রামে একজনকে বলা হল, ভিক্ষায় যাও আর দেবদত্তকেও এনো।[৩০]

(সে বললে,) দেবদত্ত কে ও কেমন আমাকে হদিশ দিন।[৩১]

সে সেখানে থেকেই পাটলিপুত্রস্থ দেবদত্তকে বর্ণনা করছে। দেবদত্ত এমনি (দেখতে)—অঙ্গদ কুণ্ডল ও কিরীট পরা, পাটাবুক, সুডোল-হাত, লাল-চোখ; উঁচু-নাক, বিচিত্র আভরণ ভূষিত।[৩২] দেবদত্তের বাড়ি প্রাসাদ হওয়াই সম্ভব।[৩৩] দেবদত্তের ঘর সব উঁচু।[৩৪] দেবদত্তের গোরু ঘোড়া সোনাদানা (প্রচুর), ধনবান্ সে বিধবার পুত্র।[৩৫] তাকে আমন্ত্রণ কর।[৩৬]...

---

২৩ দর্শনীয়াং মন্যতে দেবদত্তো যজ্ঞদত্তাম্।

২৪ উপাশ্লেষি কন্যা দেবদত্তেন।

২৫ পিতামহস্যোৎসঙ্গে দারকমাসীনং কশ্চিৎ পৃচ্ছতি কস্যায়মিতি। স আহ দেবদত্তস্য।

২৬ পাটলিপুত্রস্য ব্যাখ্যানী সুকোশলা···ঈদৃশা অস্য প্রাকারা ইতি।

২৭ অনুশোণং পাটলিপুত্রম্।

২৮ পাটলিপুত্রকাঃ প্রাসাদাঃ পাটলিপুত্রকাঃ প্রাকারাঃ।

২৯ সাংকাশ্যেভ্যঃ পাটলিপুত্রকা অভিরূপতরাঃ।

৩০ কশ্চিদুক্তো গ্রামে ভিক্ষাং চর দেবদত্তঞ্চানয়েতি।

৩১ দেবদত্তং মে ভবানুদ্দিশতু।

৩২ স ইহস্থঃ পাটলিপুত্রস্থং দেবদত্তমুদ্দিশতি। অঙ্গদী কুণ্ডলী কিরীটী ব্যূঢ়োরস্কো বৃত্তবাহু র্লোহিতাক্ষ স্তুঙ্গনাসো বিচিত্রাভরণ ঈদৃশো দেবদত্ত ইতি।

৩৩ প্রাসাদো দেবদত্তস্য সাং।

৩৪ উচ্চানি দেবদত্তস্য গৃহাণি।

৩৫ দেবদত্তস্য গাবোঽশ্বা হিরণ্যং চ আঢ্যো মহাধনঃ।

৩৬ আমন্ত্রয়স্বৈনম্।

৭ ভোজে আমন্ত্রণ

'ওগো, আমি দেবদত্ত।'[৩৭]

'ওহো, আয়ুষ্মান্ হও দেবদত্ত। দেবদত্ত, কুশলে আছ?'[৩৮]...

'এস দেবদত্ত গ্রামে, ভাত খাবে।'[৩৯]

'গ্রামান্তরে যাব, আপনি আমাকে রাস্তা বলে দিন।'[৪০]

সে তাকে বলে দিলে, অমুক স্থানে ডানহাতি যেতে হবে অমুক স্থানে বাঁহাতি।[৪১]

'পথ আমার বোঝা গেল।'[৪২]...

৮ ভোজে গমন

ভাতের ভোজে (লোক) চলেছে।[৪৩]...

৯ ভোজবাড়িতে আগমন

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে দেবদত্ত।[৪৪]...

'কোথা থেকে, মহাশয়?'[৪৫]

'পাটলিপুত্র থেকে।'[৪৬]

এ বড় আশ্চর্য, যেই মাত্র ভাত রান্না হল অমনি ব্রাহ্মণদের হাজরি![৪৭]...

ধনী লোকেরা যখন ভোজনে ব্যাপৃত গরীবেরা তখন বসে থাকে। ব্রাহ্মণেরা যখন ভোজনে ব্যাপৃত শূদ্রেরা তখন বসে থাকে।[৪৮]...

১০ ভোজ পরিবেশন

'ব্রাহ্মণদের খাওয়ানো হোক। মাঠর আর কৌণ্ডিন্য পরিবেশন করুক। ওরা দুজন এখন খাবে না।'[৪৯]..

'দই ব্রাহ্মণদের দেওয়া হোক, ঘোল কৌণ্ডিন্যকে। ব্যঞ্জন কিন্তু নটভার্যার মতো হবে।'[৫০]...

---

৩৭ দেবদত্তোঽহং ভোঃ।

৩৮ আয়ুষ্মানেধি দেবদত্ত ভোঃ। দেবদত্ত কুশল্যসি।

৩৯ আগচ্ছ দেবদত্ত গ্রামমোদনং ভোক্ষ্যসে।

৪০ গ্রামান্তরং গমিষ্যামি পন্থানং মে ভবানুপদিশতু।

৪১ স তস্মা আচষ্টে। অমুষ্মিন্নবকাশে হস্তদক্ষিণো গন্তব্যোঽমুষ্মিন্নবকাশে হস্তবাম ইতি।

৪২ উপদিষ্টো মে পন্থাঃ।

৪৩ ওদনং ভোজকো ব্রজতি।

৪৪ পুত্রেন সহাগতো দেবদত্তঃ।

৪৫ কুতো ভবান্।

৪৬ পাটলিপুত্রাৎ।

৪৭ আশ্চর্যমিদং বৃত্তমোদনস্য চ পাকো ব্রাহ্মণাণাং চ প্রাদুর্ভাব ইতি।

৪৮ ঋদ্ধেষু ভুঞ্জানেষু দরিদ্রা আসতে। ব্রাহ্মণেষু ভুঞ্জানেষু বৃষলা আসতে।

৪৯ ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তাম্। মাঠরকৌণ্ডিন্যৌ পরিবেবিষ্টাম্...নেদানীং তৌ ভুঞ্জাতে।

৫০ দধি ব্রাহ্মণেভ্য দীয়ন্তাং তক্রং কৌণ্ডিন্যায়। ব্যঞ্জনানি পুন নটভার্য্যাবদ্ ভবন্তি।
নটভার্যাবৎ মানে যার খুশি যথেচ্ছ নিতে পারে।

'থাক দই, খাও তুমি শাক দিয়ে।'[৫১]...

'ঝোল আলুনি, শাকও আলুনি।'[৫২]...

'সরু চালের ভাত খাচ্ছে মুগের দাল দিয়ে।'[৫৩]...

'দেবদত্ত ক্ষীর খেলে না।'[৫৪]...

'এ অতিথিকে মাংসভাত দিতে হয়।'[৫৫]...

'খেতে পারতেন আপনি মাংস দিয়ে (ভাত), যদি আমার কাছে বসা হত।'[৫৬]...

'মনে পড়ে দেবদত্ত যখন আমরা কাশ্মীরে ছিলুম। সেখানে কেমন ভাত খেয়েছিলুম।'[৫৭]...

'মনে পড়ে দেবদত্ত আমরা কাশ্মীরে গিয়েছিলুম সেখানে ছাতুগোলা খেয়েছিলুম।'[৫৮]...

১১ আলাপচারি

'অব্রাহ্মণ সে যে দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করে। অব্রাহ্মণ সে যে চলতে চলতে খায়। শুচি-আচার গৌরবর্ণ, অথবা কটারঙ, কটাচুল দেখলে আন্দাজ করা যায় ইনি ব্রাহ্মণ। তার পরে বোঝা যেতে পারে ইনি ব্রাহ্মণ নন, অব্রাহ্মণ।'[৫৯]...

'একে শূদ্রর মতো দেখাচ্ছে। হয়ত এ পেঁয়াজের চাট দিয়া মদ খায়।'[৬০]...

'একে চোরের মতো দেখাচ্ছে। এ চোখের কোল থেকে কাজল চুরি করতেও পারে।'[৬১]...

'একে দস্যুর মতো দেখাচ্ছে। পলাতকের রক্ত পান এ করতে পারে হয়ত।'[৬২]...

'পাটলিপুত্র পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে।'[৬৩]...

'সংসারের সব লোকই অল্প খেটে অনেক লাভ চায়, এক মাষায় লক্ষ (মুদ্রা), এক কোদালে হাজার মণ (ধান)।'[৬৪]...

---

৫১ তিষ্ঠতু দধ্যশান ত্বং শাকেন।

৫২ অলবণঃ সূপঃ অলবণং শাকম্।

৫৩ শালীন্ ভুঙ্‌ক্তে মুদ্‌গৈঃ।

৫৪ অপীতং ক্ষীরং দেবদত্তেন।

৫৫ মাংসৌদনিকোঽতিথিঃ।

৫৬ অভোক্ষ্যত ভবান্ মাংসেন যদি মৎসমীপমাসিষ্যতে।

৫৭ অভিজানাসি দেবদত্ত যৎ কশ্মীরেষু বৎস্যামঃ। যৎ তত্রৌদনান্ ভোক্ষ্যামহে।

৫৮ অভিজানাসি দেবদত্ত কশ্মীরানগচ্ছাম তত্র সক্তূনপিবাম।

৫৯ অব্রাহ্মণোঽয়ং যস্তিষ্ঠন্ মূত্রয়তি। অব্রাহ্মণোঽয়ং যোগচ্ছন ভক্ষয়তি। গৌরং শুচ্যাচরং পিঙ্গলং কপিলকেশং দৃষ্ট্বাধ্যবস্যতি ব্রাহ্মণোঽয়মিতি। ততঃ পশ্চাদ্ উপলভ্যতে নায়ং ব্রাহ্মণোঽ ব্রাহ্মণোঽয়মিতি।

৬০ বৃষলরূপোঽয়ম্। অপ্যয়ং পলাণ্ডুনা সুরাং পিবেৎ।

৬১ চোররূপোঽয়ম্ অপ্যয়মক্ষোরঞ্জনং হরেৎ।

৬২ দস্যুরূপোঽয়ম্। অপ্যয়ং ধাবতো লোহিতং পিবেৎ।

৬৩ আ-পাটলিপুত্রাদ্ বৃষ্টো দেবঃ।

৬৪ ইহ হি সর্বে মনুষ্যাঃ অল্পেন যত্নেন মহতোঽর্থানাকাঙ্ক্ষন্তি। একেন মাষেণ শতসহস্রম্। একেন কুদ্দালকেন খারীসহস্রম্।

'ওই যে পাশে জলপাত্র ওটা আন।'[৬৫]...

'উঠে নাও, দূরে (আছে), পারব না আমি।'[৬৬]...

'মথুরা থেকে পাটলিপুত্র দূর।'[৬৭]...

'দূর নয়, নিকট।'[৬৮]...

'আমরা সেই ধুতি পরি যা মথুরায় (তৈরি)।'[৬৯] ..

'একরাত্রির জন্য এক আশ্রয়স্থলে রাত কাটিয়ে পথিকদল যেমন সকালে উঠে চলে যাবার সময়ে পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। এই রকমই হয় ভ্রাতৃসম্পর্ক।'[৭০]...

১২ একজন গল্প বলছে

'থুবড়ো আইবুড় মেয়েকে ইন্দ্র বললে, বর মাগ। সে বর চাইলে, আমার ছেলেরা যেন কাঁসার থালায় করে অনেক দুধ ঘি দিয়ে ভাত খায়।

তার স্বামীই জোটে নি, কোথায় তার ছেলে কোথায় গোরু কোথায় ধান! তাই তখন তার এক কথায় স্বামী পুত্র গোরু ধান সব একসঙ্গে জোগাড় হল।'[৭১]

১৩ নিমন্ত্রিতেরা দক্ষিণা নিয়ে বিদায় হচ্ছে

'দেবদত্তকে গোরু দাও। যজ্ঞদত্তকে বিষ্ণুমিত্রকেও (দাও)।'[৭২]...

'বোধ হচ্ছে এইটিই আপনার সেই কার্ষাপণ মুদ্রা যা মথুরায় মিলেছিল।'[৭৩]...

১৪ দেবদত্ত লোক খাওয়াচ্ছে

'দেবদত্ত আপনাদের আমন্ত্রণ করছে।...দেবদত্ত আপনাদের নিমন্ত্রণ করছে।'[৭৪]...

৬৫ এষ পার্শ্বতঃ করকস্তমানয়।

৬৬ উত্থায় গৃহাণ দূরং ন শক্ষ্যামি।

৬৭ দূরং মথুরায়াঃ পাটলিপুত্রম্ '

৬৮ ন দূরমন্তিকম্।

৬৯ তানেব শাটকানাচ্ছাদয়ামো যে মথুরায়াম্।

৭০ সার্থিকানামেক প্রতিশ্রয় উষিতানাং প্রাতরুত্থায় প্রতিষ্ঠমাণানাং ন কশ্চিৎ পরস্পরং সম্বন্ধো ভবতি। এবং জাতীয়কং ভ্রাতৃব্যং নাম।

৭১ বৃদ্ধকুমারীন্দ্রেণোক্তা বরং বৃণীষ্বেতি। সা বরমবৃণীত পুত্রা মে বহুক্ষীরঘৃতমোদনং কাংস্যপাত্র্যাং ভুঞ্জীরন্নিতি। ন চ তাবদস্যাঃ পতির্ভবতি কুতঃ পুত্রাঃ কুতো গাবঃ কুতো ধান্যম্। তত্রানয়ৈকেন বাক্যেন পতিঃ পুত্রা গাবো ধান্যমিতি সর্বং সংগৃহীতং ভবতি।

৭২ দেবদত্তায় গৌর্দীয়তাম্। যজ্ঞদত্তায় বিষ্ণুমিত্রায়।

৭৩ 'তদেবেদং ভবতঃ কার্ষাপণং যন্মথুরায়াং গৃহীতম্।'

৭৪ দেবদত্তো ভবন্তমামন্ত্রয়তে। দেবদত্তো ভবন্তং নিমন্ত্রয়তে।

আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের মধ্যে তফাৎ ছিল। আমন্ত্রণে আসা না আসা ইচ্ছাধীন, নিমন্ত্রণে না এলে প্রত্যবায় অর্থাৎ অধর্ম বা অন্যায় হত।

'দেবদত্ত কি করছে?'[৭৫]

'পাক করছে।'[৭৬]...

'ভাত রাঁধাচ্ছে দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে দিয়ে।'[৭৭]

'দেবদত্ত যোগাড় করে নিয়ে এস সরু চালের ভাত, যজ্ঞদত্ত সে সব খাবে।'[৭৮]...

১৫ দেবদত্ত খুন হ'ল, খুনী ধরা পড়ল

'দেবদত্তকে যে খুন করেছে তাকে খুন করলে তো আর দেবদত্ত ফিরবে না।'[৭৯]

১৬ যজ্ঞদত্তের বিষাদ

'এ কাজ দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত দুজনে মিলে করবার ছিল। দেবদত্তের মৃত্যুতে যজ্ঞদত্তও করবে না।'[৮০]

---

৭৫ কিং দেবদত্তঃ করোতি।

৭৬ পচতীতি।

৭৭ পাচয়ত্যোদনং দেবদত্তো যজ্ঞদত্তেন।

৭৮ আহর দেবদত্ত শালীন্ যজ্ঞদত্ত এনান্ ভোক্ষ্যতে।

৭৯ ন হি দেবদত্তস্য হন্তরি হতে দেবদত্তস্য প্রাদুর্ভাবো ভবতি।

৮০ দেবদত্তযজ্ঞদত্তাভ্যামিদং কর্ম কর্তব্যম্। দেবদত্তাপায়ে যজ্ঞদত্তোঽপি ন করোতীতি

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী জন্ম ১৮৫৮ মৃত্যু ১৯২৪

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী যে-সময় কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন, মহাকাব্য বাদ দিলে সে-সময়ে কবিতা লিখে পরিচিত হয়েছিলেন বিহারীলাল। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিতাহার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে। তার আগে বিহারীলালের প্রেমপ্রবাহিণী (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০) ছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল হেমচন্দ্রের কবিতাবলী প্রথম খণ্ড (১৮৭০) এবং মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)। এসব ছাড়াও নবীনচন্দ্র সেনের অবকাশরঞ্জিনী যদিও বেরিয়েছিল ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে তার কবিতাগুলি তার আগেই এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যাকে আত্মভাবমূলক কাব্য বলে গিরীন্দ্রমোহিনীর সময়ে তার আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেই আদর্শ প্রথম দেখা গেল সারদামঙ্গলে এবং সাধের আসনে। সারদামঙ্গলের প্রকাশকাল ছিল ১৮৭৯। বিহারীলালের আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের যে প্রচলিত রীতির উল্লেখ করেছিলেন, মধুসূদন-হেমচন্দ্র ছিলেন তার অগ্রগামী কবি। অন্যান্য কবিরা মূলত তাঁদেরই অনুসরণ করেছিলেন। এসব কাব্যের মধ্যে কতকগুলি সর্বজনবোধ্য সমাজকল্যাণকর বক্তব্যকে অনুসরণ করা হত। দেশপ্রেম নারীপ্রগতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি বিষয় সমষ্টিচেতনা থেকেই উৎপন্ন। শুধু ব্যক্তির নয়, সমগ্র সমাজের কল্যাণ-চিন্তা যেখানে প্রবল, সমাজের মধ্যে যেখানে চিন্তা বা ভাবনার ঐক্য এসেছে, কবিতা সেখানে বহির্জগৎ-সচেতন। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর দেশপ্রীতিমূলক বিখ্যাত কবিতায় কিংবা অন্যান্য সমাজাশ্রয়ী কবিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এই সমষ্টিচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল। হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের মধ্যেও জাতীয়তা স্বার্থবিসর্জন নারী-আন্দোলন প্রভৃতির তৎকালচলিত চিন্তাধারার প্রবেশ ঘটেছিল। এইসব বিষয়ের উপস্থাপনাই আসলে কাব্যের উৎকর্ষের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং কাব্যের ভাববস্তুতে কবির স্বগত কল্পনা বা আদর্শের সৃষ্টি নেই। কাঠামোটা ছিল নির্দিষ্ট— কাহিনীটা পুরাণ অথবা প্রাচীন মহাকাব্যে সকলের ছিল সহজজ্ঞাত আর ভাবের নবীনতাটুকুও পাওয়া সম্ভব ছিল সাময়িক কালের মধ্যেই। মোটামুটি এ কথা বোধ হয় বলা চলে সেকালে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টিই সাহিত্যসৃষ্টির মানদণ্ড রূপে গৃহীত হয়েছিল। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে কাহিনীর কাঠামোটুকু বাদ গিয়েছে বটে, কিন্তু প্রাচীন পয়ারের ছাঁদে লৌকিক ভাবোচ্ছ্বাস সেকালের পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। এ সময়টাকে বলা হয়েছে জাতিগঠনের সময়; তার উদ্যম নানাদিক দিয়েই পাওয়া যাচ্ছিল। বাংলা কাব্যকেও সেকাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যে লক্ষ্যটা ছিল নীতির, তাকে প্রযুক্ত করা হচ্ছিল কাব্যের ক্ষেত্রেও। যে পন্থায় সমাজ-কল্যাণকামীর উৎসাহ জাগতে পারত, কাব্যসৃষ্টির সার্থকতা খোঁজা হয়েছিল সেই পন্থাতেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমষ্টিচিন্তা মুখ্য হয়ে উঠেছিল বলে সাহিত্যেও সেটা প্রতিফলিত হয়েছিল; নইলে নবজাগরণের সাহিত্যিক দিকটা বিচার করলে আরো একটা বড়ো ফল আমাদের চোখে পড়ে— ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন। যে নতুন দৃষ্টির ফলে ব্যক্তির মূল্য স্বীকৃত হল, সেই দৃষ্টিতেই ব্যক্তির কল্পনা ও ব্যক্তিমনের স্বাধীন অনুভবশক্তি সমানভাবেই সত্য বলে গৃহীত হল। বিহারীলালের কাব্যের

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১৮৫৮ - ১৯২৪

সার্ জন মার্শাল

১৯ মার্চ ১৮৭৬ - ১৮ অগস্ট ১৯৫

রসমাধুর্যের সঙ্গে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সগোত্রতা থাকলেও সেটা ঠিক এক রকমের হল না। তার কারণ বিহারীলালের কাব্য ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিরই সৃষ্টি, আর বৈষ্ণব পদাবলী ছিল ধর্মসাধকদের ধর্মভাবনারই সৃষ্টি। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি আধুনিক যুগের সূচনাতেই ঘটে নি ; এমন এক সময়ে ঘটল যখন সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্ছ্বসিত আবেগকে দমন করে আমাদের চিন্তা এবং কল্পনাকে সমগ্র সমাজের অনুগামী করে তোলা হচ্ছিল। এখানে মনে পড়া স্বাভাবিক, মধুসূদনের মহাকাব্য একটি সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বন করলেও কল্পনার স্বাধীন আবেগ কবিকে চালিত করেছিল ভিন্ন পথে। মেঘনাদবধ গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হলেও এই কাব্যটা আসলে হিন্দু কলেজের ভাবপ্লাবনের শেষ ফসল। হিন্দু কলেজের যে ছাত্রদল নতুন দৃষ্টি নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা আমাদের আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তানায়ক। ডিরোজিয়োর 'ফকীর অব জঙ্গীরা' ছাড়া এই মানসিকতার আর-কোনো কাব্যসৃষ্টি হল না বটে, কিন্তু ব্যক্তির পরম মূল্য তাঁরা দিয়ে গেলেন। মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তার একটা গীতিকাব্যিক রূপ রচনা করে গেলেন। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই বিহারীলালের আবির্ভাব। বলা বাহুল্য, তিনি মধুসূদনের মতো সজ্ঞানে বিদ্রোহাচরণ করেন নি। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ ভাবজগতেই ছিল বদ্ধ। বিহারীলালের এই নিভৃত নির্জন ভাববিলাসের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ধৃতি থেকে—

আর কারে করি ভয়
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়
মানুষ-জন্তুকে যত ডরি।

মানব সমাজ এবং -জীবনের সঙ্গে কবির বিরোধের মীমাংসা হল কল্পনার জগতে। মধুসূদন সিদ্ধরসের বিরুদ্ধাচরণ করে সজ্ঞানে বিদ্রোহী হলেন, সমষ্টিচেতনার প্রাচীন মূল্যমানকে তিনি অস্বীকার করলেন। আর বিহারীলাল নগরসমাজের কাছ থেকে বিদায় নিলেন অন্যভাবে। বিশ্বের খণ্ডিত বস্তুরূপকে অখণ্ড সৌন্দর্যচেতনার সূত্রে গেঁথে নেওয়ায় প্রচলিত কাব্যপদ্ধতি হল অতিক্রান্ত কিন্তু মধুসূদনের কাব্যের মত অত সমালোচনা জাগাল না। কারণ এটা বিহারীলালের নিজস্ব রীতি, প্রচলিত কাব্যপদ্ধতির বিকৃতি নয়। কিন্তু 'সারদা' নামক এক অলৌকিক কল্পনা প্রখর আত্মভাবমগ্নতারই পরিচয় দেয়। এর মূলে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের লক্ষণ আছে, সে যুগে সেটা কারও চোখে হয়তো পড়ে নি কিংবা পড়লেও বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয় নি। সবাই তখন দেশ সমাজ ও জাতির ভাবনায় প্রমত্ত। সেই সময় বিহারীলাল সমাদরে গৃহীত হলেন রবীন্দ্রনাথের পরিবারে। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায় যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনাতেও তেমনি ব্যক্তিমুখিতা প্রথম থেকেই অব্যাহত ছিল।

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম যুগের পটভূমির কথা বলতে গিয়ে আরও একটি বিশেষত্বের কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা কাব্যের সেই যুগটা ছিল বিষাদের সুরে আচ্ছন্ন। মহাকাব্যগুলির উপসংহারই শুধু যে বিয়োগান্তিক তা নয়, খণ্ড কবিতাতেও ছিল প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণ বেদনা। জীবনস্মৃতির 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে সেকালের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌সপীয়র মিলটন ও বায়রন। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে-জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা।' হৃদয়াবেগের প্রবলতার ফলে স্পর্শকাতরতা এবং তার,

ফলে বেদনাবোধের জন্ম। যেখানে অনুভূতির তীব্রতা আছে, সেখানেই আছে অপরিতৃপ্তির দুঃখ। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার বিফলতা এবং তার কারণস্বরূপ কোনো একটি অনমনীয় শক্তির কল্পনা— এ সবই একধরণের আত্মগত ভাষণের খণ্ডকবিতার সৃষ্টি করছিল। মধুসূদনের একাধিক সনেটে নিঃসঙ্গ চিত্তের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের কোনো কোনো কবিতায় এবং নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর কতকগুলি প্রেমের কবিতায় উচ্ছ্বাসপূর্ণ হতাশ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। দীর্ঘ মহাকাব্যগুলিতেও কোনো কোনো অংশে মহৎ কাহিনী এবং বৃহৎ ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে করুণ বিলাপধ্বনি বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্য যেমন উজ্জ্বল আশাবাদিতার প্রসন্ন দিবালোকে পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনাও তেমনি নৈরাশ্যের শ্রান্তস্বরে পূর্ণ। জীবনস্মৃতিতে তিনি একে যুগপ্রভাবই বলেছেন। তাঁর মতে আমাদের জীবনে এই প্রবল হৃদয়াবেগ সত্য ছিল না। এ বিষয়ে আমরা বিদেশী সাহিত্যদেবতাদেরই অনুসরণ করেছিলাম অর্থাৎ দুঃখবোধটা আসলে ছিল দুঃখের বিলাস মাত্র। নবীনচন্দ্রের প্রণয়-কবিতা যে অত্যন্ত নাটকীয় ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ কিংবা হেমচন্দ্রের হতাশের আক্ষেপও যে অনেকটা বুদ্বুদোচিত শূন্যতায় পূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্রের বহুপরিচিত কবিতা—

> ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অবলার
> কার ধন কারে দিলি আমার সে হল না।

এই বিলাপে লক্ষ্য করবার এই যে দেশাচারকেই কবি প্রণয়ের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছেন; অর্থাৎ এমনি কোনো এক নীতি বা বিধি প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে— এই কল্পনাভঙ্গি নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীতেও স্পষ্ট। কবিহৃদয়ের ব্যক্তিগত কল্পনার সঙ্গে সমাজ নামক কোনো একটি প্রবল শাসকের চেতনা মিশে গিয়েছে। সুতরাং এই ভাবনারীতি সম্পূর্ণ আত্মভাবমগ্নতার রীতি নয়, সমাজ-উদাসীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টিও এটা নয়। বিহারীলালের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য নেহাত কম নয়। তাঁর কাব্যে মধুর বিরহবেদনা আবার মধুসূদনের সনেটেও ব্যক্তিজীবনের নিস্ফলতার আর্তধ্বনি। তাঁদের দুঃখবোধের একমুখীনতা তাঁদের কাব্যকে সরস আন্তরিকতায় অভিষিক্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি বোধ হয় সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য নয়।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের আলোচনার ভূমিকায় কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যরচনাকাল মুখ্যত এই যুগে। সেজন্য তাঁর রচনা যুগের সাধারণ লক্ষণগুলির বাইরে নয়। তাঁর কাব্যধারা অনুসরণ করলে বাংলা কাব্যের প্রথম যুগ থেকে পরবর্তী যুগে অতিক্রমণের লক্ষণও চোখে পড়ে। গিরীন্দ্রমোহিনী কবি হিসাবে অমরলোকে স্থান হয়তো পাবেন না, কিন্তু তাঁর কবিমানসের ক্রমপরিণতি যে জীবন্ত শিল্পচেতনার পরিচয় দেয় সে কথাও সত্য। এ দিক থেকে গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য আজকের পাঠকের কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যকর হবে বলেই মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চেতনামূলক ও আত্মচেতনামূলক কাব্যের মধ্যে দ্বিতীয় ধারাটি বল সঞ্চয় করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু একটা যুগ ছিল, যখন প্রথমটি ছিল সুলভ। গিরীন্দ্রমোহিনী যুগোচিত আদর্শের দ্বারাই প্রথমে চালিত হয়েছিলেন, তার পর তিনি ফিরে গেলেন আপন আদর্শে এবং সেইখানেই তিনি হলেন অচলপ্রতিষ্ঠ।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কবিতাগ্রন্থের নাম কবিতাহার। ইতিপূর্বে তাঁর আর একটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল— জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী। এই বইটি দুষ্প্রাপ্য। এর সঙ্গে তাঁর কাব্যধারার বিশেষ যোগ

আছে কিনা বলতে পারি না, শুধু কবিতাহারের লেখক-পরিচয় দেওয়া হয়েছিল 'জনৈক হিন্দু মহিলা' বলে। কবিতাহারের সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) প্রশংসা করে তিনি লিখেছিলেন 'প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। ইহার অনেক স্থান এমন যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।' কথাটা একদিক দিয়ে সত্য। কবিতাহারের কবিতাগুলির বিষয়বস্তু এবং রচনাভঙ্গিতে সেকালের কবিদেরই অনুসরণ করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত সমসাময়িক কবিদের আদর্শ মনে রেখেই এই উক্তি করেছিলেন। কবিতাহারে পাঁচটি কবিতা ছিল, উষাবর্ণন, বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা, শরৎ বর্ণন, সঙ্গিনীর বৈধব্য এবং লর্ড কার্জনের অপমৃত্যু। বিষয়বস্তু এবং বর্ণনারীতির দিক দিয়ে পূর্ববর্তী বিভিন্ন কবিদের প্রভাব এই কবিতাগুলির উপর পড়েছে; যেমন শরৎ বর্ণনায় ঈশ্বর গুপ্তের, সঙ্গিনীবৈধব্যে বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ কাব্যের ছায়া পাওয়া যাবে। তা ছাড়া হেমচন্দ্রের অনুকরণ তো সুস্পষ্ট। বঙ্গমহিলাদের সম্বোধন করে কবি বলছেন,

> এস এস ভগ্নী সব বঙ্গ কুলনারী
> জগদীশ কাছে এস প্রার্থনা করি।
> দিন দিন বাড়ে যেন বিদ্যার উৎসাহ
> মহিলা কুলেতে বহে আনন্দপ্রবাহ।
> দেখ ইউরোপখণ্ডে যতেক কামিনী
> বিদ্যাধন লভি সবে সদা আমোদিনী
> লভিয়াছে স্বাধীনতাসুখ নিরমল
> শুনিলেও হায়! মন হয় সুশীতল।

কোনো এক নারী-কবি স্বজাতির উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন বলেই যে এই কবিতা বিশেষ অবধানের বস্তু, তা নয়। সহমরণ নিবারণের পর, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক আলোড়নের মধ্য দিয়ে নারী-ব্যক্তিত্বের ক্রমোন্মেষ ঘটে এসেছে; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মুখে তারই সবল উক্তি শোনা গেল। ইতিমধ্যে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী নারী-প্রগতির উচ্ছ্বাসময় পদ্যভাষণে মুখর হল। হেমচন্দ্রের ভারতকামিনী, বিধবা রমণী, কামিনীকুসুম, বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে, বাঙ্গালীর মেয়ে— কবিতাগুলি খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। কাব্যরসসৃষ্টি হিসাবে এদের মূল্য আজ যাই হোক, জনরুচির তৃপ্তিবিধানে এরা সার্থক হয়েছিল। বলা বাহুল্য সাধারণ বাঙালী সকলেই যে নারীপ্রগতিকে সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছিল তা নয়, কিন্তু বাধা অনেকটাই কেটে যাচ্ছে। হেমচন্দ্র ছিলেন সেই শিক্ষিত নাগরিক সমাজের কবি। উপরে উদ্ধৃত পদ্যাংশের সঙ্গে তুলনীয় হেমচন্দ্রের

> দেখ চেয়ে দেখ হেথা একবার
> প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার
> য়ুনানী মহিলা হয় পারাপার
> অকূল জলধি অকুতোভয়ে।—ভারতকামিনী

গিরীন্দ্রমোহিনীর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম ভারতকুসুম। এই নামকরণেও হেমচন্দ্রকে মনে পড়ার কথা। ভারতকুসুম গ্রন্থে অবশ্য শুধু যে সমাজবিষয়ক কবিতাই আছে, তা নয়। কিছু কিছু অন্য ধরণের কবিতাও

আছে। ব্যক্তিগত চিন্তা ও অনুভূতির স্পর্শ কোনো কোনো কবিতায় পাওয়া গেলেও কবির রচনারীতিতে তখনও স্বকীয়তা আসে নি। তখনও হেমচন্দ্রই তাঁর আদর্শ।

কবিতাহার এবং ভারতকুসুম যে-সময়ের রচনা সে-সময়টাকে বলা যায় কবির কাব্যরচনার প্রথম যুগ। এই যুগের সঙ্গে কবির পরের যুগের কাব্যের আসলে বিশেষ যোগ নেই। গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বদলে গিয়েছিল। তাঁর নিজস্ব রীতি তিনি পেয়েছেন পরের কাব্য 'অশ্রুকণা'তে। হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কবিতার যে সাদৃশ্য প্রথম যুগে দেখা যায়, তা গিরীন্দ্রমোহিনীকে কোনো দিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা সার্থক করে নি। ভাবসাম্য সত্ত্বেও গিরীন্দ্রমোহিনীর এ যুগের কাব্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল। এ কথা হেমচন্দ্র সম্পর্কে অবশ্য বলা যাবে না। হেমচন্দ্রের কবিতার বা কবিদৃষ্টির মৌলিক কোনো পরিবর্তন তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনে আসে নি। যুগের প্রেরণাই তাঁর কাছে ছিল বাস্তব সত্য। সমাজকে অতিক্রম করে ব্যক্তির নিভৃত অনুভূতির ছায়ালোক তাঁর কাব্যে গড়ে উঠতে পারে নি। বিহারীলালে সেটা সম্ভব হয়েছিল; গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিমানসেরও ক্রমবিকাশ হয়েছিল। প্রথম যুগের কাব্যে তাঁর বিশেষত্ব ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর প্রচণ্ড ব্যক্তিগত শোকের আঘাতে তাঁর অন্তরের দ্বার খুলে গেল, তার পরেই আমরা পেলাম অশ্রুকণা কাব্য। গিরীন্দ্রমোহিনী সংসারের ক্ষেত্রে বহির্মুখী ছিলেন বলে জানা যায় না। বাল্যকালে পিতার কাছে কাব্যপাঠে কিছু দীক্ষা পেলেও ইংরেজি সাহিত্যের মর্মস্থলে তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। দশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো থাকত না বলে স্বামীর ছায়াস্বরূপিণী হয়েই বৈধব্য পর্যন্ত তিনি জীবন কাটান। অতঃপর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামী নরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক আন্দোলনের বাস্তব প্রেরণা তাঁর কাছে আন্তরিক হয়ে ওঠবার সুযোগ ঘটে নি। পরে যদি-বা তাঁর সেই অবকাশ এসে থাকে, অশ্রুকণাই তাঁর কবিমানসের গতিপথ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

ইতিপূর্বে বাংলা কাব্যে নিছক ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি ও বেদনাকে কাব্যে ধরে দেবার চেষ্টা করেছিলেন কবি বিহারীলাল।[১] বন্ধুবিয়োগ কাব্য কবির বাল্যবন্ধুদের স্মৃতি নিয়ে লেখা। বিহারীলালের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের আলোচনা করেন নি। সত্যিকারের সাহিত্যিক উৎকর্ষের অভাবই বোধ হয় এর কারণ। বন্ধুদের স্মৃতি কতকগুলি সাময়িক ঘটনার সীমাকে ছাড়িয়ে ভাবময় হয়ে ওঠে নি বলে এই কাব্যের গদ্যগন্ধ এবং বিবরণ-ধর্ম কখনো কখনো হাস্যকর হয়ে ওঠে। সমালোচক মোহিতলাল বিহারীলালের সমগ্র কবিমানসের সন্ধান করতে গিয়ে বন্ধুবিয়োগ কাব্যখানাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। Declamation নেই বলে বাঙালী পাঠক বিহারীলালের এই রচনাকে সমাদর করে নি, মোহিতলালের এই অনুযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু ঠিক শিল্পসৃষ্টি হিসাবে না হলেও বাংলা কাব্যপাঠের এবং কবিমানসের পূর্ণ পরিচয়ের পক্ষে এগুলি ঠিক পরিহার্য নয়।

এতে অন্তত: এটুকু অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, লোককল্যাণমূলক উদ্দেশ্য ছাড়াও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পদ্যে রূপ দেবার মূলে অন্তরের দুঃসাহসিক অকৃত্রিমতা আছে। কাব্য হিসাবে সারদামঙ্গল যে ভিন্ন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার সূচনা বন্ধুবিয়োগ কাব্যে সন্ধান করা কি অযৌক্তিক হবে?

---

১ বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের পর গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা'র আগে রচিত আর-একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য মানকুমারী বসুর 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪)। স্বামীর মৃত্যুতে এই গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গ্রন্থ লিখিত হয়।—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৫৯ দ্রষ্টব্য

ব্যক্তিহৃদয়ের এমন অবাধ অনাবরণ প্রথমে ততটা সমাদৃত না হলেও লিরিকের উপযুক্ত ভূমিকা রচনা করেছিল। বাস্তব পৃথিবীর দিকে এমন কৌতূহলপূর্ণ ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে তাকানোয় আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের মুক্তি ঘটেছিল। বস্তুতঃ সারদামঙ্গলের স্বপ্নসঞ্চরণের মূলে যে ব্যক্তিচেতনার অকুণ্ঠ প্রকাশ আছে, তার প্রথম ইঙ্গিত এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা' কাব্যখানাও মূলত তাই— তাঁর শোকবেদনাকে কাব্যে ধরে দেওয়া। সে দিক থেকে গিরীন্দ্রমোহিনী ভারতকুসুমের পর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পদার্পণ করলেন। সে পথ ব্যক্তিগত লিরিক রচনার পথ। আমাদের আধুনিক বাংলা কাব্যের দুটি আদর্শের যে আদর্শ টি শক্তিশালী হয়েছিল, তিনি সেই পথেই অগ্রসর হলেন। এতে এই মহিলা-কবির একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল। কোনো শিল্পোৎকর্ষ আয়ত্ত করার এবং সাহিত্যপাঠকের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে অশ্রুকণার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ সেনের তিনটি, অক্ষয়কুমার বড়ালের দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। কড়ি ও কোমল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বইগুলিও প্রকাশিত হয়েছে। যতদূর মনে হয়, অশ্রুকণায় অক্ষয়কুমারের কিছু প্রভাব থাকতে পারে— তাও ভাষার দিক দিয়ে। অক্ষয়কুমার বড়ালই অশ্রুকণার কবিতাগুলি নির্বাচন করেছিলেন, ভূমিকায় তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। নিয়তির পরিহাসে দীর্ঘকাল পর অক্ষয়কুমার নিজেই একটি শোককাব্য রচনা করেছিলেন পত্নীবিয়োগ উপলক্ষে ; তার নাম এষা।

অশ্রুকণায় গিরীন্দ্রমোহিনী বেদনার্ত হৃদয়কে ভাষা দিয়েছেন সত্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার এই বেদনাবোধ যেমন কবির একান্ত ব্যক্তিগত, তেমনি এর সঙ্গে সে যুগের পূর্বোল্লিখিত বিষাদপ্রবণতার কোনো যোগ ছিল না। অবশ্য যুগের পরিবেশের সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিষণ্ণ কল্পনা হয়তো খাপ খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কবি যে এটা প্রথা হিসাবে গ্রহণ করেন নি, তা বলাই বাহুল্য। সেইজন্যই গিরীন্দ্রমোহিনীর কবি-ব্যক্তিত্ব অশ্রুকণায় অনায়াসমূর্তি লাভ করেছে। যুগের কণ্ঠের সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর ভঙ্গির দিক দিয়ে মিললেও ভাবের দিক দিয়ে মেলে নি। গিরীন্দ্রমোহিনীর দুঃখবোধ কাল্পনিক নয়। অন্যান্য কবিদের দুঃখবোধ কল্পনা ও বাস্তবের বিরোধের ফলে উৎপন্ন। গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁর বিরহবেদনাকে প্রাত্যহিকতার বাস্তবতীক্ষ্ণতা থেকে উদ্ধার করে নিয়েছিলেন বটে কিন্তু কোনো আদর্শের স্থির দীপ্তি তাতে জ্বলে নি। যে আইডিয়ালিজমের ফলে বাস্তবের অপূর্ণতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, গিরীন্দ্রমোহিনীর বিরহ-বেদনায় সেই উপলব্ধি আসে নি।

তবু এ কথাও ভুলতে পারি না বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ কাব্যের মতো খণ্ডিত বাস্তব-চেতনার পরিচয় তিনি দেননি। অশ্রুকণার কবিতাগুলি প্রাত্যহিক নিত্যসান্নিধ্যের উল্লেখে পূর্ণ নয়। মিলনের স্মৃতি, অনন্ত বিরহলোকে প্রসারিত ভবিষ্যৎ দুর্বহ ক্লান্ত শ্বাসভারাতুর ক্ষণ আর আছে প্রতীক্ষার পরম ব্যাকুলতা

> জীবনের বিভাবরী দীর্ঘশ্বাসে শেষ করি
> চেয়ে আছি হায় সেই প্রভাত-আশায় ;
> আশা তৃণগাছি ধরি বিরহ পাথার তরি
> সেই উপকূল স্মরি ; পাইব কি তায় ?
> —ধ্রুব, অশ্রুকণা

এই ব্যাকুলতা নৈর্ব্যক্তিক, বাস্তবের ম্লানস্পর্শ এই প্রতীক্ষাকে সময়ের সীমায় বাঁধেনি। এই নিভৃত

আত্মগুঞ্জন কখনো বৈষ্ণব কাব্যের রাধিকার ধ্যানলীনতন্ময়তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়; কখনো সারদামঙ্গলের অবাস্তব বিরহ-ব্যথার অনুরণন তোলে—

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবনজ্বালা স'ব অকাতরে!
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে!

বহু প্রাচীন এক মহিলা কবি স্যাফোর কণ্ঠেও সেই নিঃসীম নিঃসঙ্গতার বেদনা-বাণী—

The Moon and Pleides have set
Midnight is nigh,
The Night is passing, passing
Yet alone I lie.

এই শ্রেণীর বিরহ-গানে মানবমনের চিরন্তন আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়। এর মধ্যে বস্তুজীবনের খণ্ডিত অভিজ্ঞতা নয়, মানবহৃদয়ের ভাবময় অন্তর্বেদনার সুর আছে। এ সুরে আছে চিরন্তনতা। গিরীন্দ্রমোহিনীর এই কাব্যটিতে প্রেমের সেই অচরিতার্থ আবেগের দীপ্ত দাহন আছে। সাংসারিক সম্পর্কের অতীত হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় যখন মানবাত্মার অসীম কান্নায় আমাদের কল্পনাকে করে উদ্বেলিত, তখন কাব্যে আসে নির্বিশেষত্বের স্পর্শ। গিরীন্দ্রমোহিনীর কোনো কোনো কবিতাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে পড়া যায়, তবে এই অখণ্ড চেতনার আভাস পাওয়া যাবে। তবু অশ্রুকণা কাব্যে কবি সমগ্রভাবে কোনো জীবনদর্শনকে সচেতনভাবে লাভ করেছেন, এ কথা বলা যায় না। গিরীন্দ্রমোহিনীর এই কাব্যখানি তাঁকে সুপরিচিত করেছিল সত্য, তার কারণ এর নিবিড় ঘনিষ্ঠ আত্মভাষণ। কিন্তু অশ্রুকণায় কবির কবিমানসের সম্পূর্ণ পরিচয় ফুটে ওঠে নি। এর কাব্যরূপে যেমন শিল্পসৌষম্য সম্পূর্ণ হয়নি, এর ভাবনা যেমন বিচ্ছেদে বিমূঢ়, তেমনি তার থেকে কোনো গভীর জিজ্ঞাসা বা উপলব্ধির উদ্ভব হয় নি। বলা বাহুল্য, টেনিসনের ইন মেমোরিয়াম কাব্যে জগতের বিধান সম্পর্কে যে নৈতিক সান্ত্বনার বাণী আছে, শুধু সেদিক দিয়েই বলছি না, কীটসের উদ্দেশ্যে লেখা শেলির কবিতা কিংবা মিলটনের লিসিডাস কিংবা অনুরূপ কবিতায় একটা গভীর হৃদয়গত প্রত্যয়ের স্পর্শ আছে। এটাই কবির জীবনদর্শন এবং এরই মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত শোক হয় নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিটিকে বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতেই হয়। এই মুক্তি সকলের পক্ষে সাধ্য নয় আবার বাস্তববোধের কিঞ্চিৎ ম্লানতা ঘটে বলে সামাজিক মানুষ হিসাবে আমরা অনুযোগ করতেই পারি, যদিও সাহিত্যপাঠক হিসাবে আমরা শিল্পকে উপভোগই করি। বাস্তব-জীবন এবং শিল্পের এই দ্বন্দ্ব চিরকালের। অশ্রুকণার রসবিচার করতে গিয়ে এই প্রশ্ন আসবেই।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অশ্রুকণা অসার্থক রচনা। সব কাব্যই এই প্রশ্ন জাগাতে পারে না। গিরীন্দ্রমোহিনী যে জাগাতে পেরেছেন তাতেই এই কাব্যখানির মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সহিত্যের

শোককাব্যগুলির মধ্যে অশ্রুকণার স্থান থাকবেই। সঙ্গিহীন জীবনের জ্বালা কবিকে সব সময় স্বামীর স্মৃতিকে ভুলতে দেয়নি

ভাব—ভাব একবার
জীবনের পরপার!
যে চিরবিস্মৃতি চাও
সেথা যদি নাহি পাও?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয়!
কি করিবি—কি করিবি তখন হৃদয়? —মরীচিকা

কিন্তু নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতি কবিমানসের আর্টিস্টসুলভ আকর্ষণও এই কাব্যে আছে। অশ্রুকণার সর্বজনসম্মত বহুমান সত্ত্বেও গিরীন্দ্রমোহিনীর সমগ্র কবিজীবনকে অনুসরণ করলে দেখা যায় অশ্রুকণা কাব্য পরিণতির পথে একটা পর্যায় মাত্র, শেষ নয়। অশ্রুকণাতে কবিকে যেভাবে পাই পরে তার বিবর্তন হয়েছে। আভাষ, শিখা, অর্ঘ্য এবং সিন্ধুগাথা পড়লে বুঝতে পারা যায় কবি শেষ জীবনে একটি স্পষ্ট জীবনদর্শনে পৌছেছিলেন। মানব, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর প্রতি প্রেমের প্রগাঢ় বন্ধন একটি বৃহত্তর বিশ্বতোমুখী ভাবনার প্রতি তাঁকে বিশ্বাসী করে তুলেছিল। বস্তুলোক থেকে ভাবলোকের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তাঁর কল্পনাকে করেছিল রোমান্টিক, আবার সেই সঙ্গে একটি মুক্ত ইহচেতনা তাঁর কাব্যকে বলিষ্ঠ রমণীয় করেছে। শোকজাল থেকে বেরিয়ে এসে উদার বিশ্বপ্রাঙ্গণের মানবসংসারের মাঝখানে এসে তিনি দাঁড়ালেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিমানসের এই বিবর্তন যেমন সুন্দর, তেমনি অসাধারণ। সেই সঙ্গে এসেছিল প্রকাশভাষার যথাযোগ্য পরিণতি।

আভাষ কাব্যখানিকে এই পরিণতির পথের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। বিরহের সুর এই কাব্যেও আছে কিন্তু তার সঙ্গে আর নূতন কতকগুলি ভাবসূত্র পাচ্ছি। বৈধব্যের পর গিরীন্দ্রমোহিনী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হন নি, মানুষকে জীবনকে বা ভাগ্যকে তিনি অবিশ্বাস করেন নি; পেয়ে হারানোর এটাই পরম লাভ। কবি টেনিসন বলেছেন It is better to have loved and lost than never to have loved at all. অশ্রুকণাতে এই আস্তিক্যবুদ্ধির আভাস আছে যদিও সেটা তখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি। আভাষের একটি কবিতায় কবি বলেছেন

বৈরাগ্যের নামে কভু নির্মমতা এসো না নিকটে মোর
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব মমতাডোর? —নির্মমতা

সংসার ও জীবনের প্রতি অনুরাগ কোনো তত্ত্ব বা নীতির অবলম্বন হিসাবে আসে নি— সহজ প্রীতির অভিজ্ঞতায় তার বিকাশ। অশ্রুকণাতে কবি জীবন ও মরণের মধ্যে অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত বলে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিরহ যদি তাঁর মধ্যে ঔদাসীন্য এনে থাকে সম্পূর্ণ মৃত্যুকামী তাঁকে কখনই করে নি। আভাষে একটি সুন্দর কবিতা আছে— কবিতাটির নাম মরণ—

মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়নলোর।··

নিত্য তার বাঁশী শুনি
গৃহে হই উদাসিনী
আকুল দিবস গণি সদা তার কথা কই
তার মত ভাল মোরে তোরা কে বাসিস সই ?

ভানুসিংহের পদাবলীতে মৃত্যুর যে রূপক আছে, এখানেও তারই মতো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই রীতি বিলাতী কাব্য থেকে প্রাপ্ত। কীটসের কবিতায় মৃত্যুকামনা তো চিরন্তন জীবন-লাভের বিকল্প ব্যবস্থা। ভানুসিংহের পদাবলী রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বদৃষ্টি আসে নি, পরে এসেছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতাতে মৃত্যুপ্রেম স্পষ্ট কোনো মহৎ উপলব্ধি নিয়ে আসে নি। কিন্তু মৃত্যুর এই রমণীয় রূপকল্পনা 'মরবিড' নয়, রোমান্টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতায় মাধুর্যময়। সুতরাং এও জীবনপ্রীতিরই নামান্তর। রোমান্টিসিজমের একটা লক্ষণ ছিল মৃত্যু-কল্পনা। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই মৃত্যুকল্পনা পাই— কোনোখানেই আসলে জীবনবিমুখতা প্রকাশ পায় নি। অর্ঘ্য কাব্যেও মৃত্যুর কবিতা আছে—

তোমারে ভাবিবে কেবা পর
প্রবাসী প্রিয়ার মত
পথ চেয়ে অবিরত
নিত্য রাখ সাজায়ে বাসর !
তোমারে ভাবিবে কেবা পর। —মরণের প্রতি

এরই সঙ্গে আছে প্রকৃতি ও সংসার সম্বন্ধীয় নানা কবিতা। গ্রাম্য কুটির, নাতিনাতনীর সংসারের নানা ছবি কবি এঁকেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী রং আর তুলি নিয়ে ছবিও আঁকতেন। তাঁর কোনো কোনো ছবি প্রদর্শনীতে সমাদৃত হয়েছে। শেষের দিকের কাব্যের চিত্রধর্মিতাও লক্ষণীয়।

এদিকে বাংলা কাব্যে যুগান্তর এসে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে নূতন ধরণের কল্পনা এবং প্রকাশ-রীতির প্রবর্তন করলেন। রবীন্দ্র-পূর্ব কবিদের পরিমিত অর্থবোধক কল্পনার স্থলে ব্যঞ্জনাধর্মী ভাবময় কল্পনা এল। গত শতাব্দীর শেষ দশকেই বিশেষ করে এই রীতি-পরিবর্তন ঘটে। গিরীন্দ্রমোহিনী এক সময়ে হেমচন্দ্রের বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন[২] অশ্রুকণার যুগে হেমচন্দ্রের বিষয়ানুসরণ ত্যাগ করে আপন অন্তরের প্রয়োজনে বিষয়ান্তরে গেলেন। এটা কবির কাব্যসাধনার দ্বিতীয় যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর নৈতিক চেতনা, সংসার-চিত্র এবং অর্থবদ্ধ কাব্যসৃষ্টির ঐতিহ্য থেকে গিরীন্দ্রমোহিনী ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে কল্পনাধর্মী ব্যঞ্জনাময় কাব্যরচনার দিকে অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব! ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে গভীর সখ্যও স্মরণীয়। শিখাতে 'সোনার তরীর কোন কবিতা পাঠে' নামে একটি কবিতা আছে, এই প্রসঙ্গে সেটি উল্লেখযোগ্য। শিখাতেই ছবি নামে একটি কবিতা আছে—

তরুছায়া আঁকা বাঁকা
আঁকিলাম মসীমাখা
দূর দিগন্তরেখা তরু তমসে !

২ কবি হেমচন্দ্রের প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল— যুগান্তরেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা 'হেমচন্দ্র অস্তাচলে' ১৩৩১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মানসী ও মর্মবাণীতে প্রকাশিত হয়েছে।—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা

নদীবুকে নুয়ে শাখা
নেহারে মূরতি বাঁকা
উড়ে পড়ে মাছরাঙ্গা আহার আশে।

এর কোনো কোনো শব্দই যে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়িয়ে দেয়, তা নয়, এর চিত্রগুণ ও কল্পনারীতিও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ। এ রকমের দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁকে সহায়তা করলেও অশ্রুকণার কবির কাছে এটা নিছক অনুকরণ ছিল না; কারণ আপন অন্তরের দিকেই কবি ফিরে তাকিয়েছিলেন এবং সেখানে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ রকম চমৎকার অলংকৃত শ্রী তাঁর ভাষায় এসেছিল—

ওই বাতায়নে পশি'
এই কৃষ্ণ কেশরাশি
খুলি তরঙ্গিয়া দিব তিমির নির্ঝর। —কবির প্রতি কবিপ্রিয়া

কিংবা—

গাহিতে প্রেমের গান
আর ত চাহেনা প্রাণ
হের ম্লান আলোকের ভাতি।
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা
ক্ষীণ বাসনার রেখা
নিশি শেষে নিভ নিভ বাতি। —জীবনসন্ধ্যায়

নিম্নোদ্ধৃত পংক্তির পূর্বাপরতা কোথায় তাও কৌতূহলী পাঠক বুঝতে পারবেন

গণিছে কুসুম ধরি বিরহের দিন;
প্রভাতের শশিলেখা যেমন মলিন। —আষাঢ়ে

মেঘদূতের 'প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ' এর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের 'শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণশশিরেখা পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়'—এই রকম ভাবমূলক চিত্রই ছিল বলে মনে হয়।

আভাষে অশ্রুকণার অনুক্রমণ থাকলেও তৃতীয় বা পরিণত যুগের ভাববীজ অনেকই এখানে পাওয়া যায়। অশ্রুকণা-আভাষের যুগে কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে আত্মগত চিন্তা এবং নিরবয়ব কল্পনা এসে গিয়েছে। কিন্তু উপরে ভাষার নবীন রীতির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সে-সব প্রধানত পরিণত যুগের কাব্য অর্ঘ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। শিখা এবং অর্ঘ্যের যুগকে সেইজন্য কবিমানসের তৃতীয় যুগ বলা যায়। কিন্তু এই ভাষাশক্তি তো ভাবেরই রূপ। অর্ঘ্যে কবিমানস এক আশ্চর্য রূপান্তর লাভ করেছে। অশ্রুকণায় স্বামিবিচ্ছেদের তীব্রতা আত্মগত চিন্তা নিয়ে এসেছিল, পরবর্তী কাব্যরচনাকালে সেই তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল; তার পরিবর্তে আসে প্রকৃতিপ্রেম এবং নির্বিশেষ সৌন্দর্য-চেতনা নিরবয়ব অস্ফুট ভাবালু স্পর্শকাতরতা (sensuous-ness), যেমন—

মনে হয় কে যেন আমায় ভালবাসে
তাহার বাসনাখানি মোর চারিপাশে। —পরশফাঁদ

এই 'সুখের মতো ব্যথা'র গান রবীন্দ্রনাথই প্রথম গেয়েছিলেন কড়ি ও কোমলে, সোনার তরীতে, মানসীতে।

সবশেষে শিখার একটি কবিতার উল্লেখ করব। এই কবিতা থেকে গিরীন্দ্রমোহিনীর কল্পনা কোন আত্মলীন ভাবনা-দিগন্তে গিয়ে পৌঁছেছিল বুঝতে পারা যাবে। কবির বৈরাগ্যবিমুখ ইহচেতনা আমাদের এই বহুপরিচিত পরিপার্শ্বে, জীর্ণ ধূলিকণার মধ্যে, ঋতুচক্রে, সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে জীবনের চরম ও পরমকে খুঁজে পেয়েছে। বস্তুকে এত সুন্দর করে দেখার শক্তি কোথায়, কবি তার কথা বলেছেন—

যে তোমারে স্বীয় হৃদে দেছে প্রিয় বাস।
তাহারে বাস না ভাল ? এ কি সত্য ভাষা ?
তবু পুরিল না প্রশ্ন ! কারে ভালবাসি ?
দেখিনু অতীত দূরে হাসে ম্লান হাসি।

তার পর

ধীরে ধীরে এল নীরে ভরে দুনয়ন—
চমকি আপনা পানে করি নিরীক্ষণ,
মায়াবদ্ধ কায়াবদ্ধ অনিন্দ্য সুন্দর,—
দীপাধারবর্তী যথা দীপ মনোহর !
সেই আমি আপনারে করি নিরীক্ষণ
—কহিনু বাসি না ভাল কাহারে এমন ! —কারে ভালোবাসি

শুধু কল্পনার মৌলিকতা নয়, এর দুঃসাহসিকতাও অসাধারণ। অশ্রুকণার যুগ থেকে অনেক দূরে কবি এসে গিয়েছেন : কালের দিক দিয়ে হয়তো খুব বেশি নয়। কিন্তু অশ্রুকণার স্বামিপ্রেমের সঙ্গে এই বিস্ময়কর আত্মপ্রেমের মিল নেই। এই রূপান্তরণের দিক্‌ দিয়ে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিমানসকে নূতন করে বিচার করে দেখা দরকার।

শ্রীভবতোষ দত্ত

বাংলা ব্যাকরণের খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাগানে কী আছে জানাতে চাও।

ছবি এঁকে জানাতে পারো ; নানারকম ইশারা করে জানাতে পারো ; আমার হাতে ধরে সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে জানাতে পারো।

কিন্তু যে জিনিষটির কথা জানাতে চাও ভাষায় তার একটি নাম আছে। সে নাম সকলেরই জানা। নামটি গাছ। এই নামটি যদি না থাকত, তবে গাছ নিয়ে পরস্পর কথাবার্তা চলত না। ভাষায় পদার্থের এই যে-সকল নাম আছে ব্যাকরণে তাদের সকলকেই বলে বিশেষ্য।

গাছ শব্দ ভাষায় না থাকলেও সেটাকে চোখে দেখিয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যাকে দেখানো যায় না। যেমন গুণ। বুদ্ধি একটা গুণ। তুমি জানাতে চাও মাধবের বিশেষ একটা গুণ আছে, যেমন বুদ্ধি কিম্বা সাহস কিম্বা দয়া। ভাষায় ঐ গুণগুলির নাম আছে, সেই নাম উল্লেখ করলে আর কোনো রকম সংকেত করতে হয় না। এই নামও বিশেষ্য। গুণবাচক বিশেষ্য।

যদি জানাতে চাও গাছ এই নামটা কোন্ প্রকারের বিশেষ্য তা হলে ভাবতে হবে গাছ বলতে কোন্ শ্রেণীর জিনিষ বোঝায়। সকলেই জানে গাছ উদ্ভিদ্ শ্রেণীর। তা হলে গাছ বলতে যত রকমের উদ্ভিদ্ আছে সবাইকে বোঝায়, কোনো একটিমাত্র পদার্থকে বোঝায় না। গাছ বলতে একটি বিশেষ-জাতীয় জিনিষকে বোঝায়। তাই ওকে বলা যেতে পারে জাতিবাচক বিশেষ্য। যদি বলি চাঁপাগাছ, সেও একটিমাত্র পদার্থ নয়। জগতে যত এই জাতের গাছ আছে বাংলা ভাষায় সবারই নাম চাঁপা। অতএব চাঁপাগাছ এই নামটিও জাতিবাচক বিশেষ্য।

তোমার ছোটো ভাইকে তুমি অঙ্ক শেখাচ্ছ। তার জানা চাই দুই আর দুইয়ে চার। প্রথমে দুটো কড়ির সঙ্গে আর দুটো কড়ি যোগ করে দেখালে চারটে কড়ি হল। দুটো পেন্সিলের সঙ্গে আর দুটো পেন্সিল মিলিয়ে দেখালে চারটে পেন্সিল হল। কিন্তু জগতের সব পদার্থ নিয়ে দৃষ্টান্ত দেখানো অসম্ভব। অথচ যেখানেই হোক, যখনই হোক, দুটো জিনিষের সঙ্গে আর দুটো জিনিষ মিললেই হবে চারটে জিনিষ। তা হলেই অঙ্ক শেখাতে হলে বারে বারে নতুন নতুন জিনিষের নাম না করে সংখ্যার নাম করলেই কাজ সহজ হয়। এ না হলে বারবার জিনিষ ঘাড়ে করে এনে অঙ্ক কষা অসম্ভব হত। ভাষায় এক দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যার নাম থাকাতে গণনা সহজ হয়েছে। এক দুই তিন এগুলি সংখ্যাবাচক বিশেষ্য।

তুমি খেলা করছ। যে ছেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে বলতে চাও দ্রুতবেগে চলতে হবে। এই দ্রুতবেগে চলার যদি কোনো নাম থাকে তা হলে কাজ সহজ হয়। আছে নাম। দ্রুতবেগে চলাকে বলে **দৌড়োনো**। তেমনি লাফ দেওয়াকে বলে **লাফানো**। সেও একটা নাম। যাদের সঙ্গে খেলছ, তুমি চাও তোমার কথা তারা কানে তোলে। এই কথা কানে তোলার নাম আছে— **শোনা**। ঐ নামটা ব্যবহার করে বলতে পারো, আমার কথা **শোনা** চাই। কোনো বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার নাম **দেখা**। এমনি যত রকম কাজ করা আছে ভাষায় তার নাম আছে, সেই নামগুলিকে বলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। উপরে যে

ক্রিয়াবাচক নামগুলি দেওয়া গেল সংস্কৃত ভাষায় তাদের বলে— ধাবন, লম্ফন, শ্রবণ, দর্শন। এই শব্দগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

মোটের উপর, যত নাম আছে সমস্তকে দুই ভাগ করা যায়। সাধারণ ও বিশেষ। জগতে হাজার হাজার পাহাড় আছে, সব পাহাড়কেই বলে পাহাড়। তাই বলি পাহাড় নামটা সাধারণ নাম। কিন্তু হিমালয় পাহাড় জগতে একটি মাত্র আছে। হিমালয় নামটি বিশেষ নাম। পৃথিবীতে দেশ অনেক আছে। তাই, দেশ সাধারণ নাম। কিন্তু ভারতবর্ষ-নামক দেশ একটি বই আর নেই। তাই ভারতবর্ষ নামটিকে বলব বিশেষ নাম। সাধারণ নাম জাতিবাচক বিশেষ্য, বিশেষ নাম ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য।

—

আমরা যে বিষয় জানি, যে ভাব অনুভব করি, যে কাজ করে থাকি, তার নামগুলিকে ব্যাকরণশাস্ত্রে বলে বিশেষ্য।

এই-সমস্ত বিষয়ের স্বভাব আছে, লক্ষণ আছে, যার দ্বারা এদের বিশেষ পরিচয় পাই।

মনে করো, বাঘ। বাঘের যে স্বভাব তা দেখে তাকে বলি হিংস্র, সে হিংসা করে। তার একটা লক্ষণ, তার আছে চার পা; তাই তাকে বলি চতুষ্পদ। তার লম্বা লেজ; তাই তাকে কেউ কেউ বলেছেন বৃহল্লাঙ্গুল। তার নখ খুব ধারালো; তাই তাকে বলা যেতে পারে তীক্ষ্ননখী।

বাঘ জন্তুটা কেমন সেই কথাটা স্পষ্ট করে জানাবার জন্য তার নামের সঙ্গে এমন-সব শব্দ জোড়া যেতে পারে যাতে করে তার স্বভাব ও তার লক্ষণ বুঝতে পারি। হিংস্র ব্যাঘ্র, বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্র বলি বাঘের পরিচয় দেবার জন্যে। যে-সকল শব্দে পরিচয় ঘটায় তারা নাম নয়, সুতরাং বিশেষ্য নয়, তাদের বলে বিশেষণ।

তোমার ক্লাসে যদু আছে। সে লম্বা, সে রোগা, সে চালাক। সংস্কৃত ভাষায় বলতে পারি— সে দীর্ঘ, সে কৃশ, সে চতুর। এই শব্দগুলো বিশেষণ। যদু যে কেমনতরো এই শব্দগুলিতে তাই প্রকাশ করা হয়।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, 'কে' অথবা 'কী' এই প্রশ্নের উত্তরে যে-কোনো নাম বলা যায় তারা বিশেষ্য। 'কেমন' এই প্রশ্নের উত্তরে যে-কোনো শব্দ বলা যায় তারা বিশেষণ।

—

আমি ইস্কুলে পড়ি, তুমি বাড়িতে পড়, তিনি বাড়িতে পড়েন।

যে মানুষ দূরে আছে সে প্রশ্ন করবে, আমিই বা কে, তুমিই বা কে, তিনিই বা কে। যতক্ষণ না জানব যে বলছে 'আমি' সে হরি, যাকে বলা হচ্ছে 'তুমি' সে যদু, যাকে বলা হল 'তিনি' সে মাধব, ততক্ষণ ঐ আমি তুমি তিনি শব্দে স্পষ্ট কিছুই বোঝা গেল না। নামটা বা মানুষটা জানা থাকলে তবেই ঐ আমি তুমি তিনি শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। 'দরজার কাছে এসেই সে চলে গেল' শুনলেই জিজ্ঞাসা করতে হবে, যে চলে গেল সে কে, তার নাম কী? দেখতে পাচ্ছি মানুষের নামের বদলে ঐ আমি তুমি তিনি শব্দগুলির ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, পূর্বে যে নাম জানা হয়েছে তারই অনুবর্তী হয়ে তাকেই নির্দেশ করে। এই শব্দগুলিকে বলে সর্বনাম।

যাদের নাম ও পরিচয় জানা নেই তাদের সম্বন্ধে ব্যবহার হয় এমন সর্বনামও আছে, যথা, কে। 'ঐ গাছতলায় কে বসে আছে?' কে যে জানা নেই। 'কী ওখানে পড়ে আছে?' এই জিনিষটাও অজ্ঞাত।

অজানা অজ্ঞাতনামার উদ্দেশে এই সব সর্বনাম। তথাপি কোনো না কোনো রূপে হয় তারা আমার দেখা নয় তাদের কথা আমার শোনা আছে। যখন বলি 'আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন ওঠে' তখন আমার কোনো বিশেষ একটা জানা বিষয় লক্ষ্য করে বলি নে। কিন্তু যখন বলি, **কে** বসে আছে, কিম্বা, ওখানে **কী** ঝক্‌ঝক্‌ করছে, তখন গোচর কোনো বিষয়েরই কথা বোঝায়। যখন বলা যায় 'যে বসে আছে সে হরিচরণ' কিম্বা 'যা ঝক্‌ঝক্‌ করছে তা হীরে', তখন এই যা ও তা সর্বনাম অজ্ঞাতকে নির্দেশ ক'রে জ্ঞাত করে দেয়। সর্বনাম নিজে নাম নয়, কিন্তু যে নাম জানা কিম্বা জানা নয় সর্বনাম শব্দ তাদের নির্দেশ করে। হরি যখন নিজেকে লক্ষে এনে যদুর সঙ্গে কথা কচ্ছে তখন আমি শব্দ নির্দেশ করছে হরিকে, তার কথা যে শুনছে সেই যদুকে নির্দেশ করছে— তুমি। দূরে থাকাতে যে শুনছে না সেই মাধবকে নির্দেশ করছে তিনি বা সে। যার নাম অজ্ঞাত তাকে নির্দেশ করে— কে বা কী। সর্বনাম বিষয়ের নাম নয়; বিষয়কে নির্দেশ করে।

কেবলমাত্র বিশেষ্য বিশেষণ বা সর্বনাম দিয়ে কোনো কথা সম্পূর্ণ করা যায় না। আমি তুমি তিনি, কাক বা কালো কাক, বাক্যের একটা টুকরো মাত্র। বিষয়গুলি কী হয় বা কী করে না বললে তাদের কোনো সংবাদ দেওয়াই হয় না। কেউ যখন বলে 'খোঁড়া মানুষটি' তখন অপেক্ষা করে থাকি খোঁড়া মানুষ কী হয় বা কী করে শোনবার জন্যে। তর্ক উঠতে পারে 'মানুষটি খোঁড়া' বললেও বিশেষ্য বিশেষণের বেশি বলা হয় না, অথচ একটা সংবাদ সম্পূর্ণ হয়। এই দুটো শব্দের সঙ্গে হওয়া বা করা যোগ করা নেই বটে, হওয়া তবু লুকিয়ে আছে। মানুষটি খোঁড়া, কেননা সে খোঁড়া হয়েছে। বাক্যটিকে পুরো করে বলতে গেলে বলা উচিত— মানুষটি হয় খোঁড়া। বাংলা ভাষায় এমন করে বলার রীতি নেই, কিন্তু ইংরেজিতে আছে। বাংলা ভাষায় বিশেষণ যখন বিশেষ্যের আগে বসে তখন বাক্যটা অসমাপ্ত থাকে; যেমন, কালো ঘোড়া। কিন্তু বিশেষ্য যখন বিশেষণের আগে বসে তখন উভয় শব্দের মাঝখানে 'হয়' শব্দটি লুকোনো থাকে। 'ঘোড়াটি কালো' বললে বোঝায়— ঘোড়াটি হয় কালো। এই হওয়া বা করা বোঝায় যে-সব শব্দের দ্বারা তাদের বলে ক্রিয়া।

—

কেবল বিশেষ্য ও ক্রিয়া দিয়েই বাক্য সম্পূর্ণ করা যায়। বিশেষণটাকে বিশেষ্যেরই অংশ বলা চলে। যখন লাল পদ্ম দেখছি তখন পদ্মের লাল রঙ ও পদ্ম এক হয়ে আছে দেখতে পাই। অতএব যখন বলি 'লাল পদ্ম ফুটেছে' তখন প্রধান কথাটা হচ্ছে পদ্ম ফুটেছে। এখানে পদ্ম বিশেষ্য, ফুটেছে ক্রিয়া। কিন্তু এই বাক্যে এই পদ্ম বিশেষ্যের একটি বিশেষ পরিচয় আছে। ফোটা বলে যে একটা কাজ, সেই কাজ করছে কে? না পদ্ম। সেইজন্যে বাক্যটিতে পদ্মকে বলব কর্তা, ও পদ্ম যে কাজকে ব্যক্ত করেছে, অর্থাৎ ফুটেছে, তাকে বলব কর্ম। পদ্ম লাল, এ বাক্যে 'হয়' ক্রিয়া লুকোনো আছে। কে হয় লাল? না পদ্ম হয় লাল। তা হলেই এ বাক্যে পদ্ম হল কর্তা। ব্যাকরণে কর্তার চিহ্নে বলে কর্তৃকারক। বাংলাভাষায় অনেক স্থলেই কর্তৃকারকের কোনো চিহ্ন নেই।

বিশেষ্য পদে যে-সব বিষয়কে বোঝায় তারা যে কেবলই করে বা হয় তা তো নয়। বাইরে থেকে

আর কিছু তাদের নিয়ে কাজ করতে পারে। যেমন বাতাস পদ্মকে দোলায়। এখানে পদ্ম কর্তা নয়, বাতাস কর্তা। পদ্মের উপর বাতাস কাজ করছে। সেই কথাটা বোঝাবার জন্যে পদ্ম শব্দের চেহারা বদলে গেল। হল— পদ্মকে। ব্যাকরণের ভাষায় এই চিহ্নটা হল কর্মকারকের চিহ্ন।

পদ্মের দ্বারা যখন কোনো কর্ম করানো হয় তখন পদ্ম শব্দে অন্য রকমের চিহ্ন দেওয়া দরকার। লাল পদ্ম দিয়ে ওষুধ তৈরি হয়। এখানে পদ্ম শব্দে কোনো বদল হল না, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল 'দিয়ে' শব্দ। সাধারণ প্রয়োগে 'দিয়ে' কথাটার যে মানে এখানে ঠিক সে মানে নয়। এখানে 'দিয়ে' শব্দকে একটা চিহ্ন বলে ধরা উচিত। কোনো বস্তুর দ্বারা যখন কিছু করা হয়েছে বোঝায় তখন সেই বস্তুর নামটাতে যে চিহ্ন দেওয়া যায় তাকে বলে করণকারকের চিহ্ন। 'পদ্ম দিয়ে আসন সাজানো হল' এখানে যদিও সাজানো কাজে পদ্মই প্রধান উপকরণ তবু ঐ শব্দটাকে কর্তৃকারক বলতে পারি নে; কেননা, সে নিজে আসন সাজায় নি, তাকে অন্য কেউ ব্যবহার করে সাজিয়েছে। এই জন্য 'পদ্ম দিয়ে' শব্দটা করণকারক।

'পদ্ম হতে কিম্বা পদ্ম থেকে মধু পাওয়া গেল।' যদি বলা যেত 'পদ্ম মধু দিল' তা হলে পদ্ম শব্দ হত কর্তৃকারক। কিন্তু 'মধু পদ্ম থেকে নেওয়া হল' এই বাক্যের ভাব অন্য রকম। এখানেও পদ্ম শব্দে কোনো বদল হয় নি, তাতে 'থেকে' বা 'হতে' শব্দ যোগ করা হয়েছে। 'থেকে' বা 'হতে' শব্দের সাধারণ যে মানে এখানে সে মানে নয়, অতএব এই শব্দগুলোকে চিহ্ন বলে ধরে নিতে হবে। এই 'হতে' বা 'থেকে' অপাদান কারকের চিহ্ন।[১]

এই রচনা ও পরবর্তী রচনা শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে

রূপকারু

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

ব্যাকরণের ভূমিকা ॥ অন্যান্য নির্দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত ব্যাকরণে এক-একটি শব্দের মূল অন্বেষণ করিয়া তাহার ধাতু নির্ণয় করা হইয়াছে। স্বর্ণ ধাতুটি যেমন নানা ছাঁচে ঢালাই হইয়া কোনোটা বা পানপাত্র কোনোটা বা থালা কোনোটা বা কঙ্কণ আকার ধারণ করে তেমনি শব্দধাতুরও নানা ছাঁচ আছে, সেই ছাঁচের দ্বারা নিয়মিত হইয়া তাহা নানা রূপ ও নানা অর্থ গ্রহণ করে। শব্দগত ধাতুর এই ধ্বনিগত ছাঁচকে বলে প্রত্যয়।

ক্রিয়া কর্ম কার্য কীর্তি কর্তা কারু কারক কৃত করণ করণীয় কর্তব্য প্রভৃতি শব্দগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় ইহাদের মূল ধাতু একই। সেই ধাতুকে বলা হইয়াছে কৃ। তেমনি ধারণ ধর্ম ধৈর্য ধৃতি প্রভৃতি শব্দের ধাতু ধৃ। বারণ আবরণ বর্ম বৃতি প্রভৃতি শব্দের ধাতু বৃ। ধাতুগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রত্যয় অর্থাৎ ছাঁচগুলি নির্দিষ্টসংখ্যক। সেই কয়েকটি ছাঁচে সমস্ত বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দ বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন-অনুসারে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ ধাতু বহুসংখ্যক, কিন্তু তাহাদের ভাষাগত প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজন-অনুসারে তাহাদের ধ্বনিগত বিকারের সংখ্যা অত্যধিক নহে।

সংস্কৃত শব্দের সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে গেলে এই প্রত্যয়গুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। যেহেতু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত, এইজন্য সংস্কৃতশব্দ-নির্মাণের উপাদান ও প্রণালী না জানিলে বাংলাভাষায় অধিকার অসম্পূর্ণ থাকিবে। বিশেষত আধুনিক কালে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন শব্দ-রচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় -যোগে এই-সকল শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব বাংলাভাষাকে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি প্রত্যয় সমাস প্রভৃতির নিয়ম বাংলা ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই গ্রন্থে সেই চেষ্টা করা হইয়াছে।

—

ধাতুকে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করিতে গেলে তাহার স্বরবর্ণের বিকার ঘটে, এই বিকারের বিশেষ নিয়ম আছে। এই বিকারের পারিভাষিক নাম গুণ ও বৃদ্ধি। ··

এইখানে বলা প্রয়োজন স্বরবিকারের কোন্‌ নিয়ম অনুসারে 'দৃশ্‌' দর্শ হইয়াছে। এমনি করিয়া অন্যান্য নিয়মগুলি দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া নির্দিষ্ট করা কর্তব্য। ব্যবহারের পূর্বেই এক সঙ্গে [? বহু বিধিনিষেধ ও ধাতু বা শব্দের রূপান্তর কণ্ঠস্থ করিয়া লাভ নাই]···

সংস্কৃত শব্দরচনার আর-একটি উপাদান আছে, তাহাকে বলে উপসর্গ। এগুলি শব্দের আরম্ভে বসে। যেমন প্রতিধ্বনি। এখানে 'ধ্বনি' শব্দের আরম্ভে 'প্রতি' উপসর্গ-যোগে বুঝাইতেছে, যে ধ্বনি ফিরিয়া আসে। এইরূপ— প্রতিবাদ, প্রতিঘাত। আর-একটি উপসর্গ আছে— পরি। 'স্ফুট' শব্দের অর্থ ফোটা, একটি ফুল সকল দিকে ফুটিয়া উঠিলে তাহাকে বলা যায়— পরিস্ফুট। 'বৃত' বিশেষণ শব্দে বুঝায় যাহাকে বেষ্টন করা হইয়াছে, পরিবৃত বলিলে বুঝিতে হইবে, যাহা চতুর্দিকে বেষ্টিত।

উপসর্গের ব্যাখ্যা শেষ হইলে, উপসর্গপূর্বক প্রত্যয়-যোগে উপান্ত্য স্বরের বৃদ্ধির নিয়ম বলিতে হইবে।

সর্বশেষ তিনটি রচনা বা রচনাংশ বিভিন্ন টুক্‌রা কাগজে পাওয়া যায়।

ভাষাশিক্ষা ও ব্যাকরণ

কানাই সামন্ত

ভারতের বহু সহস্র বৎসরের জ্ঞান বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষায়, সংস্কৃত সাহিত্যে নিবদ্ধ। সেই ভাষা-শিক্ষার দ্বারা সেই সাহিত্যে প্রবেশলাভ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। এজন্য নিজে তিনি একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন আর অন্যকেও রচনা করিতে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচিত 'সংস্কৃতশিক্ষা'র দ্বিতীয় ভাগ মাত্র পাওয়া গিয়াছে ও দ্বিতীয়খণ্ড 'অচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী' সংগ্রহে সংকলিত হইয়াছে। উহার প্রকাশকাল ১৮৯৬ খৃস্টাব্দ। ইহার বহু বৎসর পরে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনার প্রয়োজনে সংস্কৃতপ্রবেশ ও সংস্কৃতশিক্ষক শিরোনামে কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রচয়িতা আশ্রমের নবাগত অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; পণ্ডিত মহাশয়ের প্রেরণাদাতা ও পরামর্শদাতা স্বয়ং কবি। সংস্কৃতপ্রবেশ দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশকাল ১৯০৫ খৃস্টাব্দ বলিয়া জানা যায়; অন্যান্য ভাগের, তথা সংস্কৃতশিক্ষকের প্রকাশকাল ইহা হইতেই অনুমান করিয়া লইতে হয়। বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত 'ব্যাকরণের ভূমিকা' -শীর্ষক কবির যে মন্তব্য অপ্রকাশিত একটি পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার রচনা এবং রচনার উপলক্ষ আরও বহু বৎসর পরের ঘটনা। দেখা গেল, শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অনেকেই পাঠভবনের শিক্ষা-শেষে, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসিতেছে; কাজেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে গেলে পৃথগ্‌ভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজন রহিয়াছে।

তদুপযোগী নূতন গ্রন্থপ্রণয়নের ভার দেওয়া হইল শ্রদ্ধেয় শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে। একই কারণে, কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, বাংলা ব্যাকরণ -রচনারও প্রয়োজন হয়। গুরুদেবের প্রদর্শিত পথে গোঁসাইজি বাংলা ব্যাকরণ -রচনা সমাধা করিয়াছিলেন; ইতিপূর্বে 'বাংলা সাহিত্যের কথা' লিখিবার কালে রবীন্দ্রনাথ যেমন আদ্যন্ত গ্রন্থ দেখিয়া দেন ও প্রয়োজনমত সম্পাদনা করেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্র-সম্পাদিত ঐ বাংলা ব্যাকরণ পরহস্তগত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অবশ্য, লেখা হয় নাই। বলা উচিত, ব্যাকরণ পৃথগ্‌ভাবে শিখানোর যুক্তিযুক্ততা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন স্বীকার করেন নাই। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর 'ভবিষ্যতের' মুখ চাহিয়া, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সহিত আপোষ করিয়া, রবীন্দ্রনাথ এরূপ বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ -সংকলনের নির্দেশ দেন। বাংলা ও সংস্কৃত তিনি নিজে যেভাবে শিখিয়াছিলেন, স্ত্রীপুত্রকন্যাকে এবং নানা ছাত্রছাত্রীকে বার বার যেভাবে শিখাইয়াছিলেন, তাহাতে সাহিত্যের পঠন পাঠন মনন ও রসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষাশিক্ষা, ভাষার রীতপ্রকৃতি বিধিনিষেধের প্রয়োগসিদ্ধ জ্ঞানলাভ, অত্যন্ত সহজে ও সানন্দে সম্পন্ন হইত। শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী বলেন, এই পদ্ধতিতে শিখাইয়া তাঁহারাও সহজেই প্রচুর ফল পাইয়াছেন। প্রাণচঞ্চল বালক-বালিকাদের শুষ্কনিয়মের জ্ঞান দিয়া, ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রের ভিতর দিয়া, তেমন সুন্দর ও সম্পূর্ণ শিক্ষাদান কিছুতেই সম্ভব নয়।

বর্তমানে মুদ্রিত 'বাংলা ব্যাকরণের খসড়া' এবং 'ব্যাকরণের ভূমিকা' সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্যই পর্যাপ্ত বলা যাইতে পারে। অথচ, সংস্কৃতসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য অনুরাগ এবং ঐ অনুরাগ অন্যের ভিতরেও সঞ্চারিত করিবার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ, এজন্য সংস্কৃতভাষা-শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার দীর্ঘকালীন চিন্তা ও চেষ্টা— আরও কতকগুলি তথ্যসংকলনের দ্বারাই পরিস্ফুট হইতে পারে।

জীবনস্মৃতিতে জানিতে পারি—

…বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় [১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ?] তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতিপুরাতন ফোর্ট্ উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা ; ছন্দ-অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না… আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং' এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত— ছন্দের ঝংকারের মুখে নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। …জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত— সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং' এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম।… আরও একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ
যদ্‌বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল।[১]

আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরিয়সী, কথাটার গূঢ় তাৎপর্য হয়তো বুঝা যাইতেছে। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' অপূর্ব-আবিষ্কৃত ছন্দ এবং শব্দঝংকার। তাহারই আকর্ষণে ভাষাশিক্ষার অনিবার্য সূচনা হইল। প্রতিভাবান্ বালককে ধরিয়া বাঁধিয়া শেখানো অসম্ভব ছিল, জীবনস্মৃতির পাঠক সে কথা তো ভালো ভাবেই জানেন। ইস্কুলের কোনো পড়ায় কোনোমতেই যখন বাগ মানানো গেল না—

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন।… আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন।… রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত-অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন।[১]

ইহাতেই পণ্ডিত মহাশয় যে যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কালিদাসের কাব্যের প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য (রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত প্রসঙ্গে ১২৯৮ অগ্রহায়ণের সাহিত্য মাসিকপত্রে লিখিতেছেন)—

অনেক দিন হইল, বাল্যকালে গঙ্গার ধারের এক বাগানে বসিয়া দাদার [বড়দাদার] মুখে যখন

শুনিয়াছিলাম 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং' তখন বোধ হয় উপক্রমণিকা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি ; সংস্কৃত শব্দগুলি কানে কতকটা পরিচিত ঠেকে, মনে হয় যেন ভাবটা একটু একটু ধরিতে পারিতেছি, কিন্তু তবু কিছুই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। অর্থাৎ, যে দুটা-একটা শব্দ বুঝা যায়, তাহার সহিত সংস্কৃত ছন্দের ঝংকার মিশ্রিত হইয়া মনের মধ্যে কেবল একটা সংগীত উৎপন্ন করিত ; তাহাকে ভাষায় পরিণত করা দুরূহ। মেঘদূতের মেঘমন্দ্র ছন্দ এবং 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং' এই ছত্রটি শুনিয়া প্রাচীন কালের এক ঘনবর্ষার দিন আমার উপরে ঘনাইয়া আসিল।[২]

কবির সূক্ষ্মশ্রুতিগ্রাহী কর্ণে অথবা অন্তঃকর্ণে, সুকুমার সংবেদনশীল মনে, ছন্দোবদ্ধ শব্দের মন্ত্রবৎ আশ্চর্য ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে তাঁহার উপনয়ন-কালীন অভিজ্ঞতাও অবশ্যই সকলের মনে পড়িবে—

...অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারাম বাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন।... নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল।... মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্‌ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা— বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।

...মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার এক দিনের কথা মনে পড়ে— আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না।... অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।[১]

জীবনস্মৃতি হইতে এই-যে উদ্‌ধৃতি দেওয়া গেল, এই প্রসঙ্গেই 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে কবি আবার বলিয়াছেন—

...উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থ ভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ[৩] পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক।[৪]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালীন শিক্ষালাভের এই আংশিক রেখাচিত্রেও বুঝা যাইবে, স্বভাবতঃই অন্যকে শিখাইবার প্রণালী তাঁহার কেমন ছিল। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে তিনি এইভাবেই বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকার-অর্জনে উৎসাহ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন।[৫] নিজের পুত্রকন্যা বা ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়ে, ইহাদের শিক্ষাবিষয়েও যখনই পারিয়াছেন এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মূল মহাভারত পড়িয়া বাংলায় সার সংকলন করিতে উৎসাহ দেন। সে কাজ তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত

সমাধা করেন।[৬] মৃণালিনী দেবীর উপর ভার ছিল, ঐভাবে বাল্মীকি-রামায়ণের সারসংকলন করিতে হইবে। তিনি কাজ হয়তো শুরু করিয়াছিলেন, শেষ করিবার সুযোগ পান নাই। বান্ধবমণ্ডলীতেও তিনি এরূপ শিক্ষাদান ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী এবং সক্রিয় ছিলেন, তাহা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি হইতেই জানা যায়—

আপনার শ্যালকজায়া আর্যা[৭] সরলা,[৮] বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষাপ্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতিলাভ করছেন— পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুশিতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতিমতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তা হলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃতচর্চায় আমি ভারী আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের [ছেলেদেরও] অতিমাত্রায় ইংরেজি-চর্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।[৯]

উল্লিখিত শিক্ষাপ্রণালীর মূলতত্ত্ব এতক্ষণে আমরা অবশ্যই বুঝিয়াছি— পৃথগ্‌ভাবে ব্যাকরণ মুখস্থ করাইয়া ভাষা শেখানো নয়, সাহিত্যের সানন্দ পঠন-পাঠনের সাহায্যেই ভাষা শেখানো। বলা যাইতে পারে, যেটা উদ্দেশ্য সেইটাই উপায় বা পদে পদে উপায়ের উদ্ভাবক। প্রণালীর বাস্তব আকার প্রকার কথঞ্চিৎ বুঝিতে হইলে, যেমন 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত' সংস্কৃতশিক্ষার দ্বিতীয়ভাগ[১০] দেখা দরকার তেমনি 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত' এবং শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত সংস্কৃতপ্রবেশের প্রথম ভাগের প্রথমমুদ্রিত পাঠ দেখা বিশেষ প্রয়োজন। (সংস্কৃতশিক্ষা ও সংস্কৃতপ্রবেশের অন্তর্বর্তী কালে— ন্যূনাধিক দশ বৎসর— এ সম্পর্কে কবির কর্মকৌশল ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই।) কবির যে[১১] রচনার ভিত্তিতে (মৌখিক উপদেশাদিও পাইয়াছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে) শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় এই গ্রন্থ লেখেন তাহারও পরিচয় লওয়া সংগত। উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে প্রথম পাঠের কতক অংশ সংকলন করা হইল।—

প্রথম পাঠ

কাকঃ কৃষ্ণঃ	শ্যামা লতা	মধুরং ফলং
মুখরঃ শুকঃ	নদী প্রবলা	শীতলং জলং
খঞ্জঃ কাতরঃ	পূর্ণা গঙ্গা	পুষ্পং পাটলং
সর্পঃ ক্রুদ্ধঃ	তারকা ম্লানা	উজ্জ্বলং ভূষণং
উজ্জ্বলঃ পাবকঃ	জননী ধীরা	প্রচুরং ভোজনং
স্থূলঃ কায়ঃ	ছিন্না শাখা	বনং দুর্গমং
শশঃ ক্ষীণঃ	কন্যা মুখরা	হৃদয়ং সদয়ং
গভীরঃ সাগরঃ	দুর্ব্বলা নারী	কোমলং কমলং
চঞ্চলঃ কুরঙ্গঃ	উষা স্নিগ্ধা	তীক্ষ্ণং শস্ত্রং
বিশালঃ শালঃ	ভীষণা সিংহী	গাত্রং কঠিনং

১। উল্লিখিত পাঠে কোন্ শব্দগুলি বিশেষ্য ও কোন্‌গুলি বিশেষণ তাহা প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রদের নিকট হইতে বাহির করিতে হইবে।

২। কোন্ শব্দগুলি কোন্ লিঙ্গ তাহা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গ একই হইয়া থাকে তাহা শিক্ষকের ইঙ্গিত অনুসারে ছাত্রগণ বাহির করিবে।

পাঠচর্চ্চা

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংস্কৃতে কিরূপ আকার ধারণ করিবে লিখ—
মেঘ (পুং) চন্দ্র (পুং) চিত্ত (ক্লীং)

ইত্যাদি

২। সংস্কৃত কর—
কৃষ্ণ সর্প প্রচুর ফল ক্ষীণ কুরঙ্গ

ইত্যাদি

৩। নিম্নলিখিত শব্দ হইতে বিশেষ্য বিশেষণ নির্ব্বাচন কর, কোন্ শব্দগুলি কোন্ লিঙ্গ তাহা লিখ এবং বিশেষ্য শব্দগুলির সহিত উপযুক্ত বিশেষণ যোজনা কর—
কোকিলঃ বাপী প্রশস্ত কেশঃ ক্ষীণ স্বজনঃ শ্বেত সভয় রাজ্ঞী চঞ্চল সদয় বাণী মহী মধুর

ইত্যাদি

৪। নিম্নলিখিত বাক্যে যেগুলিতে ভুল আছে সংশোধন কর—
সভয়ং কুরঙ্গঃ। চঞ্চলঃ সিংহী। দুর্ব্বলা খঞ্জঃ

ইত্যাদি

প্রশ্নোত্তর

অপি কাকঃ শ্বেতঃ ? ন হি। কাকঃ কৃষ্ণঃ। ন তু শ্বেতঃ।
ননু মূকঃ শুকঃ ? ন হি। মুখরঃ শুকঃ। ন তু মূকঃ।

ইত্যাদি

সুতরাং দেখিতেছি, প্রথমে কতকগুলি পাঠ, পরে পাঠচর্চা, পরে ঐ পাঠ অবলম্বনে প্রচুর প্রশ্নোত্তর। প্রথম পাঠের প্রথম ছোটো ছোটো বাক্যেই ধরা পড়ে রচয়িতার কবিমন, জগৎ এবং জীবন যার কাছে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ -ময়। সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গুরুমহাশয়ের (যিনি রচয়িতা তিনিই যদি হন শিক্ষাদাতা) এখানে সমবয়স, সমান মতি-প্রকৃতি। (বাংলা সহজপাঠে সূচনার অ অক্ষর হইতে ঠিক অনুরূপ ব্যাপার দেখা যায়।) সূচিত পাঠের উপর পরবর্তী 'পাঠচর্চা' ও 'প্রশ্নোত্তর' দেখিয়া অবশ্যই মনে পড়িবে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ভাষা শিখাইবার প্রণালী। সম্ভবতঃ ইহাকেই direct methodও বলা হয়। প্রশ্নোত্তর দিবার সময় শিক্ষার্থী যে আড়ষ্ট নিশ্চল হইয়া থাকিবে, এমন কোনো কথা নাই। শিক্ষক শিক্ষার্থী দুই দিকেই প্রয়োজনানুরূপ ভাবব্যক্তিতে পাঠ ও পঠন সরস হইবে।

দ্বিতীয় পাঠের সূচনায় পাওয়া যায়—

নূতনো ঘটঃ বৃক্ষো ভগ্নঃ হিংস্রো নকুলঃ ইত্যাদি।

সুতরাং পাঠচর্চা-ব্যপদেশে বিসর্গসন্ধি বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। (প্রথমেই বিসর্গসন্ধি শেখানো রবীন্দ্রনাথের উপদিষ্ট ফলদায়ক বিশিষ্ট পদ্ধতি।) পাঠ, পাঠচর্চা, ভাষান্তর, প্রশ্নোত্তর, এ-সবের পরে মেঘ শব্দের শ্লোকনিবদ্ধ প্রতিশব্দাবলী মুখস্থ করিতে বলা হইয়াছে। এইরূপে ৯।১০টি (দশম পাঠ সম্পূর্ণ লেখা হয় নাই) পাঠের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাষা সাহিত্য ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই সহজে শিখাইবার যে প্রাথমিক কল্পনা ছকিয়া দেন তদনুযায়ী শ্রদ্ধেয় হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খসড়া প্রস্তুত করেন। বঙ্গদেশীয় টোলে বাক্যান্তে (দাঁড়ির আগে) 'ম্' স্থানে 'ং' এবং অন্তস্থ 'ব' স্থলে ইচ্ছাধীন বর্গীয় 'ব'এর ব্যবহার প্রভৃতি যে-সব রীতি এক কালে প্রচলিত থাকিলেও পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে, পণ্ডিত মহাশয়ও সে-সব ত্যাগ করেন।[১২] তাঁহার খসড়া দেখিয়া তাহার উপরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া দেন, 'এই সংশোধন দৃষ্টে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া একটা খাতায় কপি করিয়া লইবে— পাশে পুনঃসংশোধনের মার্জ্জিন রাখিয়ো —এবং ইহা অবলম্বন করিয়া ছেলেদের পড়া চালাইয়ো'। অর্থাৎ, গ্রন্থ যে অবিলম্বে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এমন নয়। 'রবীন্দ্রনাথের কথা' পুস্তকে পণ্ডিত মহাশয় বলেন, 'যখন এলাম, তখন আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা, বোধ হয়, চোদ্দ-পনর। সে সময়ে সংস্কৃতের পাঠ্য পুস্তক ছিল না, কয়েক পৃষ্ঠার সংস্কৃত-পাঠের পাণ্ডুলিপি গুরুদেব আমাকে দিয়ে ব'লেছিলেন, এইটা দেখে এখন পড়াও, আর এই পদ্ধতি-অনুসারে একটা সংস্কৃতপাঠ্য লিখতে আরম্ভ কর। সেই পাণ্ডুলিপির প্রণালী-অনুসারে আমি তিন খণ্ডে[১৩] সম্পূর্ণ [?] "সংস্কৃতপ্রবেশ" লিখেছিলাম।'

সংস্কৃতপ্রবেশ প্রথম ভাগের প্রথম প্রকাশ-কালে সম্পাদক-রূপে রবীন্দ্রনাথ যাহা নিবেদন করেন তাহার প্রধান অংশ এখানে সংকলন করা যাইতে পারে—

ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষাশিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার যে স্বল্পমাত্র অধিকার আছে, তাহাতে আমার দ্বারা কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই শোভা পায়— সঙ্কটের আশঙ্কা করিয়া তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃতশিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ সংস্কৃতপ্রবেশ প্রথম কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।

তিনি এই প্রণালী অনুসারে অধ্যয়ন করাইতে গিয়া, ইহার সফলতার প্রমাণ পাইয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থরচনা সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মে সংস্কৃত শিক্ষা হয়, তাহাতে এ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার দুরাশা রাখি না। কিন্তু বয়স্ক লোকের মধ্যে যাঁহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত

সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন,[১৪] এই গ্রন্থে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে আশা করিয়া, ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথমাংশে পাঠ্য অংশ এবং পাঠচর্চ্চা রহিয়াছে, ইহার শেষাংশে শিক্ষকভাগে[১৪] সমস্ত বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই অংশের সহিত মিলাইয়া প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করিয়া চর্চ্চা করিয়া গেলে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অল্প কালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন, এই আমাদের বিশ্বাস।

…উত্তর সংস্করণে যাহাতে এই গ্রন্থ বিশুদ্ধতর ও সম্পূর্ণতর হইয়া উঠে, পণ্ডিতমাত্রের নিকট আমরা সে সম্বন্ধে আনুকূল্যের ভিক্ষা নিবেদন করিয়া রাখিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশেষে আর একটি ক্ষুদ্র তথ্যের উল্লেখ করিতে চাই।—

রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা যে সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থের খসড়া রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত, তাহার মাঝে মাঝে নানা শব্দপর্যায়গ্রথিত শ্লোক দেওয়া আছে— ছাত্র-ছাত্রীরা কণ্ঠস্থ করিবে। শব্দ জানা হইবে, আর ছন্দোবোধও হইবে। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করিতে হইলে কবি তাহাতে অনুরূপ ভাবগর্ভ বা রসদ্যোতক শ্লোক দিতে ইচ্ছা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ অন্য পাঠ্যপুস্তক না লিখিলেও, রবীন্দ্রনাথ 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার' গ্রন্থে এরূপ প্রায় ২০০ শত শ্লোক নির্বাচন করেন ও শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট চিহ্নাঙ্কিত করিয়া দেন। শ্রাবণের যে সকালে আশ্রমের গুরুদেব চিরকালের জন্য আশ্রম ছাড়িয়া আসেন (সেদিন সে কথা কে ভাবিতে পারিত!) তাহার পূর্বসন্ধ্যায় গোঁসাইজি যখন দেখা করিতে যান ও প্রণাম করিয়া দাঁড়ান, সেদিনও ঐ শ্লোকগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া— মূল অন্বয় এবং প্রাঞ্জল ভাষান্তর যোজনা করিয়া— গ্রন্থাকারে ছাপাইবার কথা তুলিতে ভোলেন নাই।

ঐ শ্লোকসংগ্রহ শীঘ্রই বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।

১ জীবনস্মৃতি।

২ প্রাচীন সাহিত্য (১৯৫৭ বা '৫৮), গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত।

৩ অতএব, যে 'মানে বোঝাটা' 'মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়' সে যে একান্তই স্থূলার্থ, অভিধান-ব্যাকরণ-গত নির্জীব অর্থ, এ কথা না বলিলেও চলে।

৪ মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট।

৫ বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া কাকীমাকে বুঝাইয়া দিতেন। আচার্য হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মূল রামায়ণের গল্পাংশ পড়াইতেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহদানে ঐরূপ গল্পাংশ-সংকলিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ১৯১৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, সংকলনকর্তা শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

৬ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত 'মহাভারত' (১৩১৩) গ্রন্থের উৎসর্গপত্র: যাঁহার স্নেহে ইহা সম্ভব হইয়াছে, যাঁহার উপদেশে ইহা গঠিত হইয়াছে, যাঁহার সাহায্যে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহারই শ্রীচরণে… সমর্পিত হইল। এই গ্রন্থের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'কুরুপাণ্ডব' (১৩১৮) প্রকাশিত হয়। উহার সূচনায় বা 'বিজ্ঞাপনে' রবীন্দ্রনাথ বলেন: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে… এই কারণে যে বাংলা রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৭ 'সতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা।'

৮ 'শিবধন বিদ্যার্ণব। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সংস্কৃত-শিক্ষক, পরে শান্তিনিকেতনেও শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।'

৯ চিঠিপত্র। ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৫৭)

১০ দ্রষ্টব্য : অচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। সংস্কৃত-শিক্ষার প্রথম ভাগ পাওয়া যায় নাই।

১১ অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত। বর্তমানে এই পাণ্ডুলিপি হইতে যে-সকল উদ্‌ধৃতি দেওয়া গেল তাহার বানান আধুনিক-রীতি-সম্মত করা হয় নাই।

১২ প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের অন্য দুইটি শব্দপ্রয়োগের ন্যায্যতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে—

তার পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা (৯ ফাল্গুন ১৩০০)

মিলনমাঙ্গল্যহোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে (২৮ ফাল্গুন ১৩৩১)

যথাক্রমে চিত্রা ও বনবাণী কাব্যের এই দুইটি ছত্রে ('সন্ধ্যা' এবং 'বসন্ত' কবিতায়) তদ্ভব বা তৎসম শব্দ 'প্রজ্জ্বলন্ত' বা 'প্রজ্জ্বলিত' অশুদ্ধ প্রয়োগ মনে হইতে পারে। 'প্রজ্বলন্ত' বা 'প্রজ্বলিত' বানান প্রত্যাশিত। অথচ, বাঙালি-রসনার সচ্ছন্দ উচ্চারণরীতি এবং ছন্দোমাধুরী উভয়ের অনুরোধেই কবির নিজস্ব বর্ণযোজনা অধিকতর সংগত, বিশেষ বিবেচনায় সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। এই সমস্যাস্থলে শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় আমাদের সম্প্রতি জানাইয়াছেন— কবির উক্ত প্রয়োগ-দুটি পাণিনিসূত্র-যোগেও সমর্থনযোগ্য। অনচি চ (পাণিনি ৮-৪-৪৭) সূত্রের বার্তিকে বলা হইয়াছে 'যণো ময়ো দ্বে বাচ্যে'; তদনুযায়ী সুধী + উপাস্যঃ = সুধ্যুপাস্যঃ, সুধ্‌য্যুপাস্যঃ, সুদ্ধ্যুপাস্যঃ, সুদ্‌ধ্য্যুপাস্যঃ সকলই যেমন সিদ্ধ হয়, তেমনি প্রজ্‌বলিত শব্দ প্রজ্‌জ্‌বলিত হওয়ারও বাধা নাই। আর, প্রজ্জ্বলন্ত শব্দ তৎসম না হওয়ায়, সে ক্ষেত্রে পাণিনির বিধান না হইলেও তো চলে।

১৩ রচয়িতার বিজ্ঞাপনে (সংস্কৃতপ্রবেশ প্রথম ভাগের প্রথম মুদ্রণে) পরিকল্পিত চতুর্থ ভাগের কথাও আছে। হয়তো লেখা বা ছাপা হয় নাই। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে ইহার ষষ্ঠ সংস্করণেও বলা হয় : চতুর্থ ভাগ প্রণয়ন করিবার ইচ্ছা আছে।

১৪ রচয়িতার বিজ্ঞাপন : শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত যাঁহারা ঘরে বসিয়া "সংস্কৃত-প্রবেশ" পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পাঠ-সৌকর্যার্থে "শিক্ষক" নামে আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে, সংস্কৃতপ্রবেশ দ্বিতীয় ভাগে মলাটের বিজ্ঞাপন-অনুযায়ী, সংস্কৃতশিক্ষক প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ ছিল। এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমমুদ্রিত সংস্কৃতপ্রবেশ প্রথম ভাগ, সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির সহিত নানা ভাবেই মিলিয়া যায়। গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণসমূহে ক্রমিক পরিবর্তন হইতে থাকে (আমরা ষষ্ঠ সংস্করণের বই দেখিয়াছি)— তাহার কারণ পণ্ডিত মহাশয়ের নিজেরই বিচার-বিবেচনা হইতে পারে, আর শান্তিনিকেতনের বাহিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাধীন বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য হইতে পারিবে, তাহারই প্রয়োজন-বোধ হইতে হইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। ফলতঃ উক্ত ষষ্ঠ সংস্করণের পুস্তককে পৃথক্ পুস্তক বলিলেও হয়তো অত্যুক্তি হইবে না।

সার্ জন মার্শাল

সার্ জন মার্শালের মৃত্যুতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে একটি যুগের অবসান ঘটল। গত ১৮ আগস্ট ভারততত্ত্বজ্ঞ এই পণ্ডিত বিরাশি বছর বয়সে স্বীয় জন্মভূমিতেই পরলোকগমন করেছেন।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনের দুর্দিনে বড়লাট লর্ড কার্জনের সহায়তায় স্থায়ী ও উন্নত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানসম্মত সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতির সাহায্যে একদা-জরিষ্ণু প্রত্নতত্ত্ববিভাগকে সর্বজন-প্রশংসার্হ করে মার্শাল চিরস্মরণযোগ্য নাম হয়ে গেছেন। সংস্কৃতি-সচেতন ভারতবাসীর শ্রদ্ধা চিরদিনই তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ততায় অর্পিত হবে।

১৮৭৬ সালের ১৯ মার্চ জন হিউবার্ট মার্শাল চেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন। ডালউইচ এবং পরে কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি কিংস কলেজের অনারারি ফেলো মনোনীত হন। ছাত্রজীবনে তিনি গ্রীক ভাষায় ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করে প্রেণ্ডারগাস্ট স্টুডেন্টশিপ অর্জন করেন। অতঃপর প্রত্নতত্ত্বের জগতে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। গ্রীস, দক্ষিণ-তুরস্ক এবং ক্রীটে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইসব জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যে নিযুক্ত থাকার সময়েই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অনুমোদনক্রমে ভারত সরকার তাঁকে 'প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা'র (ডাইরেক্টর জেনারেল অব আর্কিয়োলজি) -পদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান।

এইখানে সংক্ষেপে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রাক্-মার্শাল যুগের কথা একটু বলা প্রয়োজন। উইলিয়ম জোন্স ও জেম্স প্রিন্সেপের গবেষণার ফল আলেকজাণ্ডার কানিংহামের সময়ে সুসম্বদ্ধ রূপ লাভ করে। লর্ড ক্যানিঙের আমলে কানিংহামের চেষ্টায় 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ' (আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে) প্রথম স্থাপিত হয় এবং কানিংহাম তার দায়িত্ব ও ভার প্রাপ্ত হন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে, এককথায় ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে, কানিংহামের অমেয় দান স্বতন্ত্র প্রবন্ধের উপজীব্য বলে এখানে সে সম্পর্কে কিছু বলা হল না। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কানিংহাম কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলে জেমস বার্জেস বিভাগীয় অধিকর্তা নিযুক্ত হন এবং তিন বছর কাজ করার পর ১৮৮৯ সালে তাঁর প্রত্নতত্ত্ববিভাগে কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে। বার্জেস চলে যাওয়ার পরই প্রত্নতত্ত্ববিভাগে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সাময়িকভাবে সমগ্র বিভাগ এক নৈরাশ্যজনক অন্ধকারের শূন্যতায় নিমগ্ন হয়। সরকারের অনুদার নীতির ফলে বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হল, অর্থকৃচ্ছ্রতার ফলে কাজকর্মও বহুলাংশে ব্যাহত হল। এককথায়, বিভাগের উঠে যাওয়ার মত অবস্থা হল।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের এ-হেন দুর্দিনে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। সাধারণ ভারতবাসী কার্জনকে যত বিরূপ চোখেই দেখুক-না কেন, সংস্কৃতি-সচেতন ভারতবাসীর কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র, কারণ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে তাঁর উদ্যম ও নিরলস চেষ্টা বিশেষ-ভাবে প্রশংসার্হ। ১৯০০ সালের ২০ ডিসেম্বর লণ্ডনে ভারতসচিবের নিকট কার্জন ভারতীয় প্রত্নবিদ্যা-অনুশীলনসংক্রান্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। কার্জনের লেখালেখির ফলে লণ্ডনের কর্তারা তাঁর

প্রস্তাবগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হলেন। ১৯০১ সালে ২৯ নভেম্বর ভারতসচিব তাঁর প্রস্তাবগুলি মেনে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বছরের জন্য প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পুনর্বিন্যাসে রাজি হলেন। এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অনুমোদনক্রমে জন হিউবার্ট মার্শালকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা (ডাইরেক্টার) নিযুক্ত করে পাঠালেন।

১৯০২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মার্শাল প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ভার গ্রহণ করলেন। বিভাগের সর্বত্রই তখন অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা ; লোকজন নেই, টাকাকড়ি নেই, সর্বোপরি নেই নির্দিষ্ট কোনো কর্মপন্থা। এ-অবস্থায় মার্শাল প্রথমে কর্মসূচীর খসড়া তৈরি করা অত্যাবশ্যক মনে করলেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ৩ এপ্রিল সরকারের নিকট তিনি খননকার্য, প্রাচীন স্তম্ভাদি সংরক্ষণ ও জাদুঘর-সংক্রান্ত তাঁর 'Note on the operations and future conduct of the Archaeological Survey' নামক কর্মসূচীর খসড়াটি পেশ করলেন। ৭ এপ্রিল সরকার তাঁর খসড়া অনুমোদন করলেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগে নবযুগের সূচনা হল। প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের কাজে ও নতুনভাবে বিস্তৃত খননকার্যে মার্শাল পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করলেন।

মার্শাল-নির্ধারিত কর্মপন্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন :

প্রথমত, পুরানো ঘরবাড়ি ও স্তম্ভাদির কোনোরকম আন্দাজী সংস্কারকার্য চলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্থায়িত্ব বিপন্ন না হচ্ছে ;

দ্বিতীয়ত, ভেঙে পড়ার অবস্থায় না আসা পর্যন্ত পুরানো ঘরবাড়ি ইত্যাদির প্রত্যেকটি অংশ যেমন আছে তেমনই থাকবে ;

তৃতীয়ত, খোদাই-করা পাথর বা কাঠের কাজের অতি-প্রয়োজনীয় সংস্কার এমন দক্ষ শিল্পীকে দিয়ে করাতে হবে, যিনি প্রাচীন কাজের চমৎকারিত্ব ও উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন ;

চতুর্থত, কোনোক্ষেত্রেই পুরানো চিত্র ইত্যাদি সংস্কৃত হবে না ,

পঞ্চমত, অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং সুশিক্ষিত খননবিদ্ প্রাচীন স্থান খনন করবেন এবং ধ্বংসোন্মুখ জায়গাগুলি প্রথমে সাধারণভাবে খনন করতে হবে ;

ষষ্ঠত, প্রধান প্রধান প্রাদেশিক জাদুঘরগুলিতে কিছুসংখ্যক সরকারি প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মচারী নিযুক্ত করতে হবে ;

সপ্তমত, অনুশাসন-পাঠোদ্ধারের কাজ স্বতন্ত্র ও বিশেষ একজন কর্মচারীর (এপিগ্রাফিস্ট) উপর ন্যস্ত হবে, অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারীর উপর ন্যস্ত হতে পারবে না।

মার্শাল এই কর্মসূচীতে আরেকটি যে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন তা হল বিভাগীয় গ্রন্থাগার। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুষ্ঠু কাজকর্মের জন্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। ১৯০৩-০৪ সালেই তিনি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের জন্য ৪,০০০ টাকা বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। তাঁর উৎসাহে ও চেষ্টায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ গড়ে তুলেছে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থসম্ভার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভারবতর্ষ ও বিশ্বের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রায় চল্লিশ হাজার বই এবং অগণ্য পত্রপত্রিকায় সমৃদ্ধ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের গ্রন্থাগার বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যতম বিশিষ্ট ও মূল্যবান গ্রন্থাগার রূপে বিশেষজ্ঞদের নিকট সমাদৃত।

মার্শাল-নির্ধারিত কর্মসূচীর প্রধান সুর অনুসন্ধান ও খননসংক্রান্ত, এবং বলা বাহুল্য, সকল সময়েই খননপদ্ধতির যথাযথ্যের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর আগে প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ অনভিজ্ঞ কর্মচারীদের উপর পুরাকীর্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল। মার্শাল সে দায়িত্বভার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধানে আনলেন। বিজ্ঞানসম্মত যথাযথ খননকার্য যে অনেকখানি— অনেকখানি শুধু নয়, বরং বলা যায় প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিভূমি— সে সম্পর্কে মার্শাল সর্বদা সচেতন ছিলেন। সে সম্পর্কে তাঁর প্রণিধানযোগ্য উক্তি হল: '. .it is infinitely better to leave antiquities underground till such (experienced) supervision is available than to destroy in digging them out half the evidence which they might afford.'

মার্শালের কার্যভার গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে তাঁর পুরাকীর্তি সংরক্ষণনীতির ভিত্তিতে লর্ড কার্জনের চেষ্টায় ১৯০৪ সালে Ancient Monuments Preservation Act পাস হল। মার্শাল-প্রবর্তিত সংরক্ষণনীতি আজ আরও ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

মার্শালের অধীনে বিভাগের সন্তোষজনক কাজকর্মে ও প্রগতিতে আশান্বিত ও প্রীত হয়ে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ২৮ এপ্রিল ভারত সরকার লণ্ডনস্থ ভারতসচিবের অনুমোদনক্রমে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগকে স্থায়ী বিভাগে পরিণত করলেন। অতঃপর তিনি স্থায়ী অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন; তাঁর সঙ্গে একজন স্থায়ী অনুশাসন-পাঠোদ্ধারক ও (এপিগ্রাফিস্ট) নিযুক্ত হলেন। বিভাগীয় অধিকর্তা এবং এই অনুশাসন-পাঠোদ্ধারক সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ব ও অনুশাসন-সংক্রান্ত কাজকর্মের ভার পেলেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি অঞ্চলের শাসনভার এক-একজন অধ্যক্ষ বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর অর্পিত হল।

মার্শালের অন্যতম কাজ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফল এবং বিবিধ কর্মকৃতির সংগ্রন্থনা। এই সংগ্রন্থনাকার্যে তিনি যে কী আশ্চর্য সুশৃঙ্খল মনোভাবাপন্ন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর আমলের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে, আর ১৯১৫ সালে ২২শে অক্টোবর প্রকাশিত তাঁর 'নোট' থেকে।

মার্শালের প্রধান কৃতিত্ব খননবিদ্‌ হিসাবে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগে তাঁর মত অভিজ্ঞ ও নিপুণ খননবিদ্যা-বিশারদ খুব কমই এসেছেন। তাঁর আমলে পাটলিপুত্র, বৈশালী, শ্রাবস্তী, সারনাথ, নালন্দা, তক্ষশীলা, সাঁচী প্রভৃতি একাধিক প্রাচীন স্থানে খননকার্য চালানোর ফলে তাদের বিস্মৃতির আবরণ ঘুচে যায়। সাঁচীতে তাঁর খননকার্য সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি সাঁচী শুধু পুনঃখননই করেন নি, পরন্তু তার কীর্তিগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তক্ষশীলা খনন করে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সুপ্রচুর উপাদান উদ্ধার ও সংগ্রহ করেন; এইসকল উপাদানের আলোকে উত্তরপশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্তানে খ্রীস্টজন্মের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে বিদেশীদের শাসন-সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু যে-কারণে মার্শাল আমাদের নিকট অম্লান যশোগরিমায় ভাস্বর তা হল প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার। সিন্ধু-সভ্যতার দুই যমজ কেন্দ্র মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা। হরপ্পায় সুপ্রাচীন সভ্যতার কিছু নিদর্শন ইতিপূর্বেই কানিংহাম আবিষ্কার করেছিলেন এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়োতেও

অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে মার্শালের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি নিদর্শনগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ঐ দুইস্থানে ব্যাপক ভাবে খননকার্য চালিয়েছিলেন। তাঁর সেই খননকার্যের ফল আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই খননকার্যের ও সিন্ধু অববাহিকায় অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দিগন্তসীমা বহুদূরপ্রসারী হল ; আর্যরা আসার বহু আগেই ভারতবর্ষে যে উন্নত ধরনের নাগর-সভ্যতা বর্তমান ছিল, এ রূঢ় তথ্যের আবিষ্কার অতঃপর আত্মপ্রসাদপরায়ণ কতিপয় ইংরেজ ঐতিহাসিকের খেদ ও ক্ষোভের কারণ হল। বলা বাহুল্য, মার্শালের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পরে ভাটস, ম্যাকে, ননীগোপাল মজুমদার প্রমুখ তাঁর সমসাময়িক সহযোগী এবং তৎপরবর্তী ও সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হল, ভারতবর্ষের উত্তর উত্তরপশ্চিম পশ্চিম এবং দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের এক বিরাট অংশ এই সুপ্রাচীন-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের বছর পাঁচেক পরে, ১৯২৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, মার্শাল বিভাগীয় অধিকর্তার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তখন তাঁকে তাঁর আমলে খনিত স্থানগুলি সম্পর্কে পুস্তিকা লেখার ভার দেন। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, তক্ষশীলা, সাঁচী, মাণ্ডু, দিল্লী, আগ্রা এবং মুলতান প্রভৃতি স্থানগুলি সম্পর্কে তাঁকে পুস্তিকা লিখতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে ১৯ মার্চ কিছুদিনের জন্য বিশেষ কাজে তিনি পুনর্বার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে ১৫ মার্চ তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে যান।

শুধুমাত্র খননবিদ্ বা প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে দেখলে সার্ জন মার্শালকে ছোট করে দেখা হয়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা আর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। ভারতীয় চারুকলা ও স্থাপত্যের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মতামত বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভারতের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর লিখিত অধ্যায়টি তাঁর অনুশীলনী আর বিশ্লেষণী শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্বের অনুশীলনেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তথ্যাদির যথাযথ সমাবেশে আর তার সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণে তিনি আপন পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থে। অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গির উজ্জ্বলতায় তাঁর গ্রন্থগুলি সারস্বতজনের মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর নিজের ও সহকর্মীদের রচনার সমাবেশে সম্পাদিত তিনটি স্মরণযোগ্য সুবৃহৎ গ্রন্থ হল : *Mohenjo-daro and the Indus Civilisation* (তিন খণ্ডে সমাপ্ত), *Taxila* (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) এবং *Monuments of Sanchi* (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)। তাঁর নিজের রচিত বই হল : *Guide to Taxila* এবং *Guide to Sanchi*। সংগ্রহ-গ্রন্থত্রয়ে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলীতে তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম, আলোচিত স্থানগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক জ্ঞান, সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় তো রয়েছেই, পরন্তু অবাক হতে হয় যখন দেখি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সন্ধিৎসু সাধারণ লোকের জন্য লেখা 'পরিচায়িকা' (গাইড) পর্যায়ের বই দুটিও তাঁর সেই গভীর পাণ্ডিত্যের প্রভায় কী আশ্চর্য প্রোজ্জ্বল। এবং আরও অবাক হতে হয় যখন দেখি পাণ্ডিত্য উক্ত বই দুখানিকে কোথাও দুর্ভার বা ক্লেশপাঠ্য করে নি। বস্তুত, বই দুখানি একাধারে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের এবং ইতিহাসানুরাগী সাধারণের জন্য লেখা ; এবং উভয় শ্রেণীরই অবশ্যপাঠ্যের তালিকাভুক্ত। বলা বাহুল্য, মার্শালের ঐ 'পরিচায়িকা'-গ্রন্থ দুটি আজও অজেয় অপ্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরবে বিরাজমান। প্রত্নতত্ত্ব-

বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'পরিচায়িকা'-গ্রন্থগুলিতে উপরিউক্ত ধারা অনুসৃত হলে দেশের সকল জনেই উপকৃত হতেন। রূঢ় হলেও বলা প্রয়োজন, আজকালের পরিচায়িকা গ্রন্থে সে ধারা বা রীতির সন্ধান মেলে না।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগে বা পুরাতত্ত্ববিদ্যা-অনুশীলনে সার্ জন মার্শালের দানের পরিমাণ অল্প কথায় বলা অসম্ভব। অল্প কথাতেই বা কেন, সে দানের পরিমাপ করা দুরূহ। তাঁর খননপদ্ধতি-প্রাসঙ্গিক নিয়ম-নীতি নিয়ে আজকাল বিরূপ সমালোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর এই সমালোচকদেরও বিরূপ সমালোচক আছে। মার্শালের খননপদ্ধতি প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন: এক, খননপদ্ধতি সংক্রান্ত চূড়ান্ত কোনো নিয়ম-নীতি এখনও নির্ধারিত হয় নি; দুই, সে সময় পশ্চিম-এশিয়ায় যে ধরণের খননপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছিল মার্শাল সেই পদ্ধতিই ভারতবর্ষে প্রয়োগ করেছিলেন এবং যথাযথ্যের দিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত পদ্ধতি পশ্চিম-এশিয়ায় তখনকার কালে প্রযুক্ত পদ্ধতির চেয়ে কোনো অংশে পশ্চাদ্বর্তী ছিল না। তা ছাড়া সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, মার্শালের সময় খননপদ্ধতি বা তৎসংক্রান্ত উপকরণাদি আজকের মত অত উন্নত ছিল না; অনেক বাধা-বিঘ্ন অভাব-অসুবিধার মধ্যে মার্শালকে খননকার্য চালাতে হয়েছিল। এইসব কথা মনে রাখলে মার্শালের প্রতি যথার্থ বিচার করা হবে, খননবিদ্ হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের সার্থক পরিমাপ সম্ভব হবে।

সংক্ষেপে, সার্ জন মার্শাল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগকে অক্ষম ও জরিষ্ণু অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার করে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোজনা করে গেছেন; একাধিক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান খনন করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করেছেন; আর উত্তরকালের জন্য মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে তাঁর পাণ্ডিত্য আর অসীম শ্রমলব্ধ ফলের সার্থক ব্যবহার করে গেছেন। এককথায়, কানিংহামের পরে সার্ জন মার্শালই প্রাচীন ভারতের ঋদ্ধিবান গৌরবময় স্মৃতির উত্তরাধিকার সব চেয়ে অন্তরঙ্গভাবে ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

সমাজ ও গোষ্ঠী

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

আমার এক তরুণ বন্ধু আমার কাছে প্রশ্ন তুলেছেন: ভারতবর্ষে অবস্থা-বদলের জন্য আমরা কেবল রাজনীতির উপর নির্ভর করছি কেন। আমরা এখন আমাদের সমাজ বদলাতে চাচ্ছি—আমরা চাচ্ছি মানুষের মত বাঁচবার অধিকার সকলেরই থাকবে এমন সমাজ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে হয়তো সকলেই একমত, কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতৈক্য হলেও উপায় সম্বন্ধে মত-পার্থক্যের অন্ত নেই। কাজের বেলায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমের যে ঢেউ ভারতবর্ষকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমরা সেই ঢেউতেই ভেসে চলেছি। অর্থাৎ এই সমাজ-বদলের প্রধানতম অস্ত্র হিসেবে পলিটিক্সেরই শরণাপন্ন হয়েছি—যেমন পশ্চিমী দেশগুলিতে হয়ে থাকে। এ কথা অবশ্য সত্য যে বহু দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার ফলে রাজনৈতিক দলগুলি সমাজে বিপুল পরিবর্তন আনতে পেরেছেন। কিন্তু, তাঁর প্রশ্ন হল, উৎপাদনের ব্যবস্থার পরিবর্তন এইরকম ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা সাধনে সক্ষম হলেও আরও যেসব নানা শক্তি সমাজে কাজ করছে সেগুলির দিক পরিবর্তনের জন্যও কি পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নেই? বিশেষতঃ, আরও একটা কথা অন্ততঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বীকার না করে উপায় নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গণসংযোগ করে প্রধানতঃ নির্বাচনের সময়, কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভই তাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সেই কথাটা আরও একটু বিশ্লেষণ করলে এ কথাও হয়তো স্বীকার করতে হবে যে ঐ কথাটার পিছনে অস্পষ্টভাবে আরও একটা কথা লুকিয়ে আছে এবং সে কথাটা হল এই যে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজ-বদল হতে পারে, অন্য কোনো যন্ত্রে তা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হত তা হলে দেখা যেত, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই দুটি কার্যক্রম থাকত—একটি রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ অর্থাৎ নির্বাচনে জয়লাভ—আর অপরটি হচ্ছে নির্বাচন-অতিরিক্ত একটি সামাজিক কার্যক্রম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমরা যেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মেনে নিয়েছি নির্বাচন-অতিরিক্ত সামাজিক কার্যক্রমের কোনোই বিশেষ মূল্য নেই। রাষ্ট্রযন্ত্রই সবচেয়ে বড় যন্ত্র এবং যা-কিছু করতে হবে তা রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমেই করতে হবে। অতএব নির্বাচনে জয়লাভ ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু করণীয় নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় তাতে কি পুরোপুরি ফল পাওয়া যাবে?

প্রশ্নটি গভীর এবং এর ভালো করে বিচারের প্রয়োজন আছে। সমাজের বদল হয় কি করে এ নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের তর্কের অবধি নেই। টয়েনবী একমত দিয়েছেন, সোরোকিনের নিজস্ব মত আছে। কিন্তু আজকের দিনে প্রায় সকলেরই মন যে তত্ত্ব আচ্ছন্ন করে আছে সে তত্ত্ব হল মার্ক্সীয় তত্ত্ব। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। ইতিহাস চলে অন্য কিছুর তাগিদে নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই তাগিদে। উৎপাদন-ব্যবস্থার চেহারা-বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও চেহারা-বদল হয়। এবিষয়ে জগতে শতাব্দীকাল ধরে এত আলোচনা হয়েছে যে এর কোনো বিস্তৃত বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। হেগেলীয় মতবাদকে অস্বীকার

করে মার্ক্স দেখিয়েছেন যে দ্বন্দ্ববাদের ফলেই সমাজ এগিয়ে চলে সত্য, কিন্তু সে দ্বন্দ্ববাদ হল বস্তুর (materialistic), সে দ্বন্দ্ব হল অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, অন্য কিছুর নয়। এই গোড়ার কথা হতে অগ্রসর হয়ে মার্ক্স তাঁর বহু রচনার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন। সাম্যবাদীর ইস্তাহারে মার্ক্স দেখিয়েছিলেন, যে সময় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক দাবিই মেটানো সম্ভব হল না সেই সময় সেই কাঠামো ভেঙে তারই ধ্বংসস্তূপ হতে জন্মাল বুর্জোয়া সমাজ। এই বুর্জোয়া সমাজ নিষ্ঠুর নির্মমতার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস ঘটিয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে দেখা যায়, কালক্রমে ছোট ব্যবসায়ীরা মধ্যবিত্তেরা এবং শ্রমিকেরা ক্রমবর্ধমান দুর্দশার সম্মুখীন হয়— তখনই নতুন সমাজের বীজ জন্মাতে থাকে, সেই বীজ হতেই ক্রমে বিপ্লব দেখা দেয়।

মার্ক্সের এই তত্ত্বকে পরে লেনিন বহু বিস্তৃত করেছিলেন। বিশেষতঃ যে সমাজের কথা চিন্তা করে মার্ক্স তাঁর তত্ত্ব রচনা করেছিলেন সে সমাজ ছিল প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক সমাজ। যে দেশ যথেষ্ট শিল্পপ্রধান নয়, যেখানে শ্রমিকদল যথেষ্ট গড়ে ওঠে নি, যেখানে এখনও কৃষিই প্রধান উপজীবিকা, সেসব দেশে এই তত্ত্ব কিভাবে প্রযুক্ত হবে, সেসব ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় তত্ত্ব কিভাবে বিস্তৃত করতে হবে সে সম্বন্ধে লেনিন যথেষ্ট লিখে গিয়েছেন। তার পুনরাবৃত্তিরও কোনো প্রয়োজন দেখি না। যাঁরা মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করেছেন তাঁরা এইসব কথা সমস্তই জানেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষে আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করব।

৩

কিন্তু ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করবার আগে আরও দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

ফ্রান্স এককালে বিপ্লবের ভূমি ছিল, সেকালের বিপ্লবের সূচনা ফরাসি দেশেই। ফরাসি দেশ ধনতান্ত্রিক সভ্যতাতেও অগ্রসর। কাজেই মার্ক্সীয় রীতি অনুসারে সেখানে সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সর্বপ্রধান অস্ত্র হয়ে উঠবে এ কথা আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ফরাসি দেশে ধর্মের প্রভাব জনচিত্তকে এখনও যথেষ্ট আচ্ছন্ন করে আছে— ক্যাথলিক এবং অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের নির্বাচনের ব্যাপারেও অনেকখানি প্রভাব পড়ে। ইতালীতে তো এসব প্রভাব সুস্পষ্ট। এমন-কি জার্মানির মত অগ্রসর দেশেও যে এসব প্রভাব নেই তা বলা যায় না। তার উপর জার্মানিতে হিটলার-রাজত্বের সময় দেখা গিয়েছিল অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কথা ভুলে গিয়ে গোটা জাত আর্যরক্তের উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য বলা যেতে পারে প্রতিবিপ্লব মধ্যে মধ্যে আসবেই এবং এইরকম প্রতিবিপ্লবের সময় সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এ কথা সকলেই জানেন সমাজের অগ্রগতি সমরেখায় হয় না, মধ্যে মধ্যে তার উলটো গতি দেখা দেবেই। সেইজন্যই আজ এ কথা প্রায় সকল সমাজতাত্ত্বিকই স্বীকার করেন যে সমাজের অগ্রগতি সমান সরলরেখায় নয়, চংক্রমণগতিতে। সমাজ যখন মোটের উপর অগ্রসরও হয় তখনও মধ্যে মধ্যে যে বিপরীত গতি আসবে না তা নয়।

৪

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ

নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত— দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?" তাঁর বক্তব্য ছিল:

"ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। সেইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর— আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।…বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে— ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ একটা খুব বড় কথা বলেছেন। ইংলণ্ড বহু বছর ধরে রাষ্ট্রের সাধনা করেছে, ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণের দায়িত্ব সে রাষ্ট্রের হাতেই তুলে দিয়েছে। তেমন দেশেও দেখা যায় ধর্মের উপদলীয় প্রভাব ও কলহ জনচিত্তে মোহ বিস্তার করে। আর আমাদের দেশে সেই সাধনা সদ্য আরম্ভ হচ্ছে মাত্র। বস্তুতঃ তা-ও পুরোপুরি হয় নি। এ কথা মানতেই হবে, অন্নবস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে আমরা ক্রমশঃই বেশি পরিমাণে তুলে দিচ্ছি। এবং তা যতই বেশি পরিমাণে যাবে আমরা ততই রাষ্ট্রনির্ভর হয়ে পড়ব এবং রাষ্ট্রের গঠনই আমাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমরা অন্য বিষয়ের সাধনা ছেড়ে দিয়ে সবচেয়ে বেশি সাধনা করব পলিটিক্সেরই, কারণ পলিটিক্সই তখন হবে আমাদের কর্মস্থান।

আজকের ভারতবর্ষের অবস্থা লক্ষ্য করলে কিন্তু একটা অদ্ভুত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের বাংলায় সবচেয়ে বড় আলোড়ন জাগিয়েছিল সমাজসংস্কার-আন্দোলন—পলিটিক্স নয়। সতীদাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহের প্রচলন, বহুবিবাহ বন্ধ করা ইত্যাদি নানা সামাজিক আন্দোলন। তার তুলনায় আজ পলিটিক্স আমাদের জীবনে যথেষ্ট বেশি স্থান অধিকার করেছে। এতরকম ভোট, এত নির্বাচন—এ তো তার স্বাভাবিক ফল। কথায় বার্তায় আন্দোলনে আলোড়নে সব জায়গাতেই দেখা যায়, পলিটিক্সই সবচেয়ে বড় স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এই চিন্তা যে এখনও আমাদের মনে সত্যকারের দানা বাঁধেনি তার প্রমাণ আমরা অহরহ পাচ্ছি। নির্বাচনে জাতের দোহাই ধর্মের দোহাই—এসব লক্ষণ তো খুব গভীরে প্রবিষ্ট। তার চেয়েও একটা খুব বড় জিনিস দেখা গিয়েছিল ভাষা-আন্দোলনে। মাতৃভাষার উপর যখন আঘাত পড়েছে বা ভাষাতাত্ত্বিক রাজ্যপুনর্গঠন যেখানে হয় নি তখনই যে তীব্র আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে দেখা গিয়েছিল তা হতেই বোঝা গিয়েছিল এইসবের আকর্ষণ এখনও কত গভীর। বস্তুতঃ ভাষার আকর্ষণ কখনোই যায় না, যাওয়া উচিতও নয়। সেইজন্য সকল দেশের পলিটিক্সেই ভাষার সম্মান স্বীকৃত। সেখানে আঘাত পড়লে দলমত নির্বিশেষে মানুষ বিচলিত হয়ে উঠবে এ কথা স্বাভাবিক। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সময় সেইজন্য মনে রাখতে হবে আমরা যতই পলিটিক্সের সাধনা করিনা কেন, এইসব প্রভাব সমাজে যে গোষ্ঠী রচনা করেছে তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়।

৫

ভারতবর্ষে যে এই অবস্থা হবে তা মোটেই বিস্ময়ের কথা নয়। তার প্রথম কারণ, রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, আমাদের মর্মস্থল এতদিন সমাজ ছিল, রাষ্ট্র নয়। সমাজ আমাদের ধারণ ও পালন করেছে, রাষ্ট্র নয়। কাজেই রাজা যেই হোক-না কেন তাতে ততবেশি কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কিন্তু সমাজদেহে আঘাত পড়লে এই কারণেই এত বেশি চঞ্চলতা দেখা দিত। আজ সেই ধারা সবে বদলাতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বদলাতে বহু দেরি। এই ভাঙাচোরা অবস্থায় আমরা স্পষ্ট দিক্‌নির্দেশ অনেক সময় করতে পারছি না। একই সঙ্গে আইন করেও জমিদারী উচ্ছেদ করছি আবার ভূদান-আন্দোলন মারফত সমাজেরও দ্বারস্থ হচ্ছি। রাষ্ট্রও চলছে সমাজও চলছে— অথচ অনেক সময়ই তা এক উদ্দেশ্যে চলছে না, পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যও বহু সময় চলছে।

এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল, এই পরিবর্তনের কালে আমাদের সমাজে আধুনিক এবং অনাধুনিক অনেকরকম শক্তি সমানভাবেই চলছে। একদিকে এরোপ্লেন, অন্যদিকে গরুর গাড়ী। একদিকে চলছে অত্যাধুনিক অর্থনীতিমূলক গণতন্ত্রের মহড়া, অন্যদিকে নানারকম অশিক্ষা অবুদ্ধি ও সংস্কারের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাদুর্ভাব আমরা চাই আর নাই চাই সে আলাদা কথা, কিন্তু সমাজের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে এগুলিকে অস্বীকার করতে পারি নে। এগুলি সামাজিক সত্য। এমন-কি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্রেও এগুলি সময় সময় সম্মান ও প্রশ্রয় পায় না, তা নয়। তা না হলে কি করে ভারতবর্ষের দু-একটি রাজ্যে সরকার ভূগর্ভস্থ জল খুঁজে বার করবার জন্য বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত না করে জ্যোতিষী নিযুক্ত করেন? জনৈক রাষ্ট্রপ্রধান কাশীতে একশত ব্রাহ্মণকে অর্চনা করে পাদোদক গ্রহণ করেছিলেন এমন সংবাদও প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে।

বস্তুতঃ এই সংকট ইদানীং বাড়বার সম্ভাবনা ঘটেছে তার কারণ আছে। ইংরেজের আমলে দেশের জনসাধারণ কখনও নাড়া খায়নি, 'জনসাধারণ' বলতে বড়জোর উচ্চশিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তই বোঝাত। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী অনেককাল আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তায় মহড়া দিয়ে এসেছে, এদের চিন্তা অনেকখানি আধুনিক হয়ে এসেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর গণভোট ইত্যাদি কারণে তলার দিকের লোক নাড়া খেতে শুরু করেছে, তারা দেশের খুব বড় ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠেছে, অথচ তাদের মন আধুনিক রাষ্ট্রসম্মত চিন্তার খাতে অনেকখানিই প্রবাহিত হচ্ছে না। কাজেই তাদের চিন্তাভাবনা মধ্যবিত্তপ্রধান রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে যদি প্রতিফলিত না হত, যদি তাদের সেই চিন্তা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকত, আজ অবস্থার ফেরে সেই চিন্তা সমাজে দৃঢ়মূল তো আছেই, উপরন্তু রাষ্ট্রকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

১৮৯০ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর একটি জার্মান সংস্করণ হয়েছিল। তার ভূমিকায় এঙ্গেলস একটি কথা লিখেছিলেন। সে কথাটি হল এই: for the ultimate triumph of ideas set forth in the *Manifesto* Marx relied solely upon the intellectual development of the working class. এর মধ্যে solely কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই নেই। অর্থাৎ যে সময় শ্রমিকশ্রেণী আছে কিন্তু সমাজের শ্রেণীচেহারা এবং ইতিহাসের বিবর্তন সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়, তাদের চিন্তা নানা মোহময় সংস্কারে জড় এবং পঙ্গু, সেই অসংবদ্ধ জনসংখ্যা নিয়ে বিপ্লব হয় না, সামাজিক পরিবর্তনও ঘটানো যায় না।

সুতরাং সেই পরিবর্তন ঘটাবে কে? এ কথা সর্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত যে চিন্তার পরিবর্তন আসে মধ্যবিত্ত সমাজ হতেই। জর্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যানহাইম তাঁর *Man and Society* গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন সবচেয়ে দরিদ্রশ্রেণীই যে একাজের উপযুক্ত তা নয়। বস্তুতঃ আজ ভারতবর্ষেও যেসকল বুদ্ধিজীবী (যে-কোনো পার্টিরই) ভারতবর্ষের পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করছেন তাঁদের অধিকাংশই একেবারে নিঃস্ব মজুর শ্রেণীর ন'ন। স্বয়ং মার্ক্স'ও এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বলেছিলেন উপরতলা থেকে যেসব মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী খসে খসে পড়ে তারাই নীচের তলার লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

অথচ, ভারতবর্ষের মুশকিল হচ্ছে এই যে, এ দেশে সেই অর্থে মধ্যবিত্ত খুব কম। সুস্পষ্ট এবং সুগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজ, বলতে গেলে, বাংলা ছাড়া আর অন্য কোথায়ও তেমন নেই। যা আছে, তাদের এখনও প্রসারের যুগ, তারা বাংলার মধ্যবিত্তের মত খসে খসে পড়ছে না, সুতরাং তারা এখন নেতৃত্ব গ্রহণে আসবে না। দ্বিতীয়তঃ, শহুরে মধ্যবিত্তেরাই চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান। ভারতবর্ষ যদি শহরপ্রধান দেশ হত তা হলে হয়তো এই স্বল্প সংখ্যাই চিন্তার বিপ্লব ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হত। কিন্তু গ্রামই ভারতবর্ষের বৃহত্তম অংশ, গ্রামের মধ্যবিত্তের চেহারা অন্যরকম, তাদের চিন্তাধারা সবসময় ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত নয়, প্রাচীনকাল তাদের জীবনে এখনও সজীব সত্য—কাজেই তাদের চেহারা-বদল সময়সাপেক্ষ।

শেষ অস্ত্র ছিল রাষ্ট্র। যদি রাষ্ট্র আমাদের জীবনে সর্বগ্রাসী হত তা হলে আমরা অন্য চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একাগ্রমনে রাষ্ট্রের সাধনা করে রাষ্ট্রের মারফতই এইসব পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু রাষ্ট্র এ দেশে সর্বগ্রাসী নয়, সুতরাং সে পরিবর্তনও রাষ্ট্র মারফত রাতারাতি আসবে এ আশা ভুল।

সুতরাং আমাদের অগ্রগতি অনেক জটিল উপাদানের উপর নির্ভর করছে। একই সঙ্গে সব দিকে চেষ্টা না চালালে দ্রুতগতিতে আমাদের পরিবর্তন হবে না। সমাজের বদলের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর চেহারা-বদল অবশ্যপ্রয়োজন হয়ে উঠেছে, যেমন প্রয়োজন সমাজে নতুন চেহারার আধুনিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করার। আর যেসব রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী এবং একশ্রেণীমূলক নয় সেখানেও জনসাধারণের ইচ্ছার (Public will) উপকরণ হিসেবে গোষ্ঠীর ইচ্ছার (Group will) গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনেতিহাস যাঁরা অনুশীলন করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, ইউরোপ-প্রবাসকালে পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। রামমোহনের ইংরেজী জীবনচরিতগুলির মধ্যে বিশেষ করে শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কলেট-রচিত *Life and Letters of Raja Rammohun Roy* এবং শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার-কৃত *The Last Days in England of Raja Rammohun Roy* গ্রন্থ দুখানিতে ইংলণ্ডে তিনি যে সমাদর পেয়েছিলেন তার বিস্তারিত ও সশ্রদ্ধ আলোচনা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উক্ত ইংরাজ-লেখিকাদ্বয় রামমোহনের ফ্রান্স গমনের কথাও উল্লেখ করেছেন, যদিও সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তাঁরা দেন নি, সম্ভবতঃ তাঁদের তা জানাও ছিল না।[১] ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত রামমোহন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাদাম মোরঁ্যা নাম্নী জনৈকা বিদুষী ফরাসী মহিলা ফ্রান্সের সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক বিষয়ে দুটি প্রবন্ধে নূতন আলোক-পাত করেন।[২] সেই সময়ে শোনা গিয়েছিল উক্ত মহিলা ফরাসী ভাষায় রামমোহনের একটি জীবনচরিত রচনার জন্য উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, রামমোহন ফ্রান্সে গমন করবার কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতীয় দর্শনে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরূপে তাঁর সুনাম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুলাই ফ্রান্সের সোসিয়েতে আসিয়াতিক (প্রাচ্য বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ সারস্বত সভা) নামক প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বিদেশী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেরী কার্পেণ্টারের পূর্বোক্ত পুস্তকের পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত একখানি পত্রেও অবশ্য পরোক্ষভাবে আমরা এই তথ্য জানতে পারি, যদিও উল্লিখিত ঘটনার সন তারিখ সেখানে দেওয়া নেই।[৩]

কিন্তু রামমোহনকে সোসিয়েতে আসিয়াতিক সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য মনোনীত করবার পূর্বেই ফরাসীদেশের প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত সমাজ তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। বেদান্তদর্শনের সুপণ্ডিত ব্যাখ্যাতা ও সমাজসংস্কারকরূপে তাঁর পরিচয় ক্রমশঃ ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও ছড়িয়ে পড়ছিল। এই পরিচয়ের প্রধান মাধ্যম ছিল রামমোহনের গ্রন্থাবলী। মাদাম মোরঁ্যার পরে যত্নপূর্বক এই বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন জনৈকা আমেরিকান মহিলা শ্রীমতী আড্রিয়েন মুর। তাঁর বহু পরিশ্রমের ফলে রচিত *Rammohun Roy and America* নামক গ্রন্থে তিনি রামমোহন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রচনাবলীর যে তালিকা দিয়েছেন তার থেকে দেখা যায়, ফ্রান্সে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আরম্ভেই রামমোহনের রচনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান ও আলোচনা কিছু কিছু আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। "রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক" (Revue Encylopedique) পত্রিকায়, যতদূর জানা যায় সর্বপ্রথম, রামমোহন রায়ের আটখানি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।[৪] শ্রীমতী মুর এই বিশেষ সংখ্যাটির সন-তারিখ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু সোসিয়েতে আসিয়াতিকের মুখপত্র জুর্নাল আসিয়াতিকের ১৮২৩ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত রামমোহনের অপর এক গ্রন্থতালিকায় প্রসঙ্গতঃ "রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিকে"র ঐ সংখ্যাটির

খণ্ডের ও প্রকাশকালের উল্লেখ আছে, তা হল সপ্তম খণ্ড ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ।[৫] এই গ্রন্থগুলির নাম ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হলেও শ্রীমতী মূর অনুমান করেছেন যে এগুলি রামমোহনের গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ নয়, ইংরেজী অনুবাদগুলির নামই (সম্ভবতঃ ফরাসী পাঠকগণের বোঝবার সুবিধার জন্য) ফরাসীতে অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর অনুমান যে সত্য তার অন্য প্রমাণ আছে, পরে সে আলোচনা করব। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এই (বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী নামগুলিও দেওয়া হল):

(১) *"Traduction du Kena Oupanishada un des chapitres du Sama Veda, suivant la glasse du célèbre Chankara Tcharya constantant l'unité et la tout-puissance de l'être Supreme, seul objet digne d'adoration"* par le brahmen Rammahen Rai, Calcutta, Philip Pereira, Hindoostanee Press, 1816 (*Translation of the Cena Upanishad one of the chapters of the Sama Veda according to the gloss of the celebrated Shancaracharya : Establishing the unity and the Sole Omnipotence of the Supreme Being and that He Alone is the object of worship,* Calcutta 1816) ;

(২) *"Traduction d'un abrégé du Vedanta ou solution de tous les Vedas . . ."*, Calcutta 1817. 17 pp. (*Translation of an abridgement of the Vedanta or The Resolution of all the Vedas,* Calcutta 1816) ;[৬]

(৩) *"Traduction de l'ichopanishada un des chapitres de l'yadjoua (?) Veda . . ."*, Calcutta, Philip Pereira, Hindoostanee Press, 1816. (*Translation of the Ishopanishad one of the chapters of the Yajur Ved,* Calcutta 1816) ;

(৪) *"Defense du theisme en reponse a l'attaque d'un defenseur l'idolatrie hindoue, a Madras"*, Calcutta 1817. 52 pp. (*A Defence of Hindu Theism in reply to the attack of an advocate for idolatry at Madras,* Calcutta 1817) ;

(৫) *"Seconde defense du systeme monotheiste des Vedas en reponse a une apodogie de l'etat present de culte hindoue . . ."*, Calcutta 1817. 58 pp. (*A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas in reply to an apology for the present State of Hindoo Worship,* Calcutta 1817) ;

(৬) *"Traduction d'un abrégé de Vedanta ou solution du tous les Vedas avec un traduction du Kena Oupanichada un des chapitres du Sama Veda"* Londres T. et. J. Hooitt, 1817 ;[৭]

(৭) *"Traduction du moundek-oupanichada de L'Ateharva Veda . . ."*, Calcutta, D. Lankheet, Times Press 1819, 25 pp. (*Translation of the Moonduk Opunishud of the Uthurvu-Ved,* Calcutta 1819) ; এবং

(৮) *"Traduction du Keth-Oupanichada de L'Yadjour Veda . . ."*, Calcutta 1819, 40 pp. (*Translation of the Kuth-Opunishud of the Ujoor-Ved . . .,* Calcutta 1819).

এ ছাড়া রামমোহনের কতকগুলি গ্রন্থের অন্য একটি তালিকা সম্প্রতি আমি ফরাসী সোসিয়েতে আসিয়াতিকের মুখপত্র জুর্নাল আসিয়াতিকের ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট সংখ্যায় দেখতে পেয়েছি।[৮] শ্রীমতী মূর তাঁর সংগৃহীত রচনাপঞ্জীতে উক্ত জুর্নাল আসিয়াতিকে প্রকাশিত ম লাঁজুয়ঁানে লিখিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছিলেন।[৯] দুটি কারণে আমার মনে হয়েছে প্রবন্ধটির নাম ও প্রকাশের স্থানকাল তিনি সংগ্রহ করতে পারলেও, সেটি নিজে পড়বার সুযোগ তাঁর হয় নি। কেননা অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত লাঁজুয়ঁানের প্রবন্ধে স্পষ্ট আগস্ট সংখ্যায় প্রদত্ত রামমোহন-গ্রন্থতালিকার উল্লেখ আছে। শ্রীমতী মূরের এই তালিকার কথা জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত গ্রন্থতালিকা এবং লাঁজুয়ঁানের প্রবন্ধ পড়ে দেখলে তিনি সুনিশ্চিতরূপেই এ কথা জানতে পারতেন যে ফরাসীদেশে রামমোহনের পুস্তকাদির ইংরেজী অনুবাদই প্রচলিত ছিল, ফরাসী ভাষায় রামমোহন গ্রন্থাবলীর অনুবাদ সম্ভবতঃ প্রচারিত হয়নি। "রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিকে" প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে তিনি যে অনুমান করেছিলেন, তার সমর্থক প্রমাণ জুর্নাল আসিয়াতিকে প্রদত্ত গ্রন্থতালিকা এবং লাঁজুয়ঁানের প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। শেষোক্ত গ্রন্থতালিকার মধ্যে মূর উল্লিখিত "রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিকে"র বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশ-বৎসর যে পাওয়া যায় সে কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমতী মূরের পরিশ্রমের মূল্য বা গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। বিশেষতঃ লাঁজুয়ঁানের প্রবন্ধটির উল্লেখ করে তিনি রামমোহন-সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানি-গণকে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত রচনাটির উল্লেখ মাদাম মোর‍্যাঁও করেন নি।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, জুর্নাল আসিয়াতিকে মুদ্রিত গ্রন্থতালিকা বা ম. লাঁজুয়ঁানে লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে "সোসিয়েতে আসিয়াতিক" রামমোহনকে সম্মানিত সদস্য মনোনীত করবার পূর্বে। মাদাম মোর‍্যাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে উক্ত বৎসরের ৭ই জুন তারিখের অধিবেশনে ঐ প্রতিষ্ঠান রামমোহনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা আছে কি না সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি বিচারক-সমিতি নিযুক্ত করেন। ম. লাঁজুয়ঁানে, ম. বার্নুফ এবং ম. ক্লাপরথ, এই তিনজন ঐ সমিতির সদস্য ছিলেন। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ম. লাঁজুয়ঁানে রামমোহন-গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ব্যক্তিগত-ভাবে, বিচারক-সমিতির সদস্য হিসাবে নয়। কথাটি উল্লেখযোগ্য, কেননা কারও কারও এইরকম ধারণা হয়তো আছে যে লাঁজুয়ঁানের ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের প্রবন্ধ অনুসন্ধান-সমিতির সদস্য হিসাবে তাঁর সংগৃহীত বিবরণ।[১০] বরং বলা যেতে পারে ফ্রান্সে রামমোহনের গ্রন্থাদির প্রচার, লাঁজুয়ঁানের প্রবন্ধে প্রদত্ত সশ্রদ্ধ রামমোহন-পরিচিতি প্রভৃতি ক্রমশঃ সোসিয়েতে আসিয়াতিকের সঙ্গে যুক্ত ফরাসী প্রাচ্যবিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলীকে রামমোহন সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান করে তুলেছিল, এবং সেই জন্যই তাঁরা রামমোহনকে বৈদেশিক সদস্য মনোনীত করতে ইচ্ছুক হয়ে উল্লিখিত কমিশন বা বিচারকমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। রামমোহনের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে তাঁর মতামতের সঙ্গে পূর্ব হতে পরিচিত ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ ম. লাঁজুয়ঁানে অনুসন্ধান-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হন। সম্প্রতি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে জুর্নাল আসিয়াতিকের পুরাতন ফাইলে শ্রীমতী মূর নির্দিষ্ট ম. লাঁজুয়ঁানের প্রবন্ধটি খুঁজে পেয়েছি। সেই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থতালিকাটিও দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। নানাদিক থেকে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং রামমোহন-প্রসঙ্গে এগুলির কোনো আলোচনাই আজ পর্যন্ত হয়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

জুর্নাল আসিয়াতিকের ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় মুদ্রিত সংবাদে দেখা যায় ম. দুবোয়া দ্য ব্যোসেন

সোসিয়েতে আসিয়াতিকের ১৮২৩ সালের ৭ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কতগুলি গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন।[১১] তার মধ্যে ফার্‌সী ভাষায় দুখানি হস্তলিখিত পুঁথি এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজী, ওলন্দাজ ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা কয়েকখানি পুস্তক ছিল। এগুলির মধ্যে রামমোহনরচিত আটখানি পুস্তক ছিল, এ কথা জানতে পারা যায় পরবর্তী আগস্ট সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত রামমোহনের গ্রন্থ-তালিকা থেকে। সেখানে ৭ই জুলাইর সভা ও ম. দুবোয়া কর্তৃক পুস্তক উপহারের উল্লেখ আছে (Parmis les ouvrages offerts a la Société Asiatique dans la Séance du 7 juillet 1823 par M. Dubois de Beauchêne on remarque huit brochures brochures in-8° contenant huit ouvrages publiés à Calcutta de 1816 à 1821 et tous par le feu brahmane nommé en Sanscrit Ramayana Radja et en bengali Rammohun Roy)। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই গ্রন্থতালিকা প্রকাশকালে রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ফরাসী পণ্ডিত মহলের ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট ছিল। কেননা এই প্রসঙ্গে তাঁকে le feu brahmane বা 'পরলোকগত ব্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খানিক পরে আরো বিশদভাবে বলা হয়েছে ১৮২১ বা ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে (Le même brahmane qui est mort en 1821 ou 1822···)। তাঁদের এও ধারণা ছিল রামমোহনের সংস্কৃত নাম "রামায়ণ রাজ"। দুবোয়া উপহৃত গ্রন্থগুলির দ্বারা রামমোহন সম্পর্কে ফরাসী সুধীসমাজে ধীরে ধীরে যে সশ্রদ্ধ কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় তার ফলেই পরে এই সব ভ্রান্ত আজগুবি ধারণার নিরসন হয়েছিল একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

উক্ত গ্রন্থতালিকার প্রথমে দুবোয়া-প্রদত্ত রামমোহনের আটখানি গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম চারখানি যথাক্রমে কেন (কলিকাতা ১৮১৬) ঈশ (কলিকাতা ১৮১৬), মুণ্ডক (কলিকাতা ১৮১৯) এবং কঠ (কলিকাতা ১৮১৯), এই উপনিষদগুলির ইংরাজী অনুবাদ। লক্ষ্য করবার বিষয়, সব কটি নামই ইংরাজী, ফরাসী ভাষায় অনূদিত নয়। তালিকার পরবর্তী চারখানি গ্রন্থ যথাক্রমে: (৫) *An Apology for the Pursuit of Final Beatitude Independently of Brahmanical Observances* (Calcutta 18_0); (৬) *The precepts of Jesus* (Calcutta 1820); (৭) *An Appeal to the Christian Public* (Calcutta 1820); এবং (৮) *Second Appeal to the Christian Public* (Calcutta 1821)। দুবোয়ার নিকট হতে প্রাপ্ত উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কয়েকখানি পুস্তকের নাম এই তালিকাভুক্ত হয়েছে, দেখা যায়, যথা: (৯) *Un petit Traité contre l' idolatrie des Indoues en langue arabe, le même ouvrage en langue persane* (হিন্দুগণের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আরবী ভাষায় রচিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা; ফার্‌সী ভাষায় ঐ একই গ্রন্থ); (গ্রন্থ প্রকাশের স্থান কাল দেওয়া নেই); এই বইখানি রামমোহন-রচিত সুবিখ্যাত "তুহ্‌ফাৎ-উল মুওহিদীন" বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু "তুহ্‌ফাৎ"এ সাধারণভাবে সব ধর্মের ত্রুটির কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয় নি। পণ্ডিতেরা মনে করেন আরবী ভূমিকা যুক্ত ফার্‌সী পুস্তিকা "তুহ্‌ফাৎ" রামমোহনের পরিণত বয়সের রচনা। রামমোহনের *An Appeal to the Christian Public* নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তিনি অল্প বয়সে প্রচলিত হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আরবী ও ফার্‌সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা রচনা করেন।[১২] সম্ভবতঃ এখানে,

সেই গ্রন্থটির কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশের স্থান ও কালের উল্লেখ না থাকাতে মনে হয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলক এ গ্রন্থ দেখেন নি। সম্ভবতঃ *An Appeal to the Christian Public* এর ভূমিকা থেকে এর নামটি সংগৃহীত হয়েছিল। নামটি ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হবার কারণ বোধ হয় এই যে মূল গ্রন্থ ইংরাজীতে রচিত নয়; (১০) *A Defence of Hindu Theism* (Calcutta 1817); (১১) *A Second Defence of the Monotheistic System of the Veds* (Calcutta 1817); (১২) *Un Oupanishada du Sāma Veda en sancrit et en bengali et un Oupanishada de l' Yadjour-Veda aussi dans ces deux langues* (Calcutta 1818) (সংস্কৃত ও বাঙলা-ভাষায় সামবেদের অন্তর্ভুক্ত একখানি উপনিষদ এবং ঐ দুই ভাষায় যজুর্বেদের অন্তর্গত একখানি উপনিষদ)[১৩]; (১৩) *Translation of an Abridgment of the Vedant* (Calcutta 1818); [১৪] এবং (১৪) *Translation of a conference between an advocate and an opponent of the practice af burning widows alive from the original bungla* (*bengali*) (Calcutta 1818)।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে দুখানির নাম ফরাসী ভাষায় উল্লিখিত হলেও সেগুলি রামমোহনের মূল বা ইংরেজী গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ যে নয় তা অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দুবোয়া যে গ্রন্থগুলি সোসিয়েতে আসিয়াতিক প্রতিষ্ঠানকে উপহার দেন সেগুলি যে ইংরেজী ওলন্দাজ এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা, জুর্নাল আসিয়াতিকের ১৮২৩ সালের জুলাই সংখ্যায় তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রামমোহন-লিখিত পুস্তকগুলি সেই গ্রন্থরাজিরই অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত গ্রন্থতালিকাতেও দেখা যায় দুবোয়া-উপহৃত গ্রন্থগুলির পরিচয় ইংরেজী নামেই দেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত বইগুলির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে প্রকাশিত ইংরেজী, বাঙলা সংস্কৃত আরবী-ফারসী সংস্করণ গুলিরই উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র আরবী-ফারসী পুস্তিকা এবং সংস্কৃত-বাঙলায় মুদ্রিত উপনিষদ্ দুইখানির বেলায় পুস্তকের নাম ইংরেজীর পরিবর্তে ফরাসীতে লেখবার কারণ বোধ হয় এই যে ঐ গ্রন্থগুলি ইংরেজীতে লেখা নয়। রামমোহনের কোনো গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। তদানীন্তন ফরাসী পণ্ডিতসমাজ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই তাঁর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও মতামতের চর্চা করেছিলেন। এর থেকে অনুমান করা অসংগত নয় যে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিকে' প্রকাশিত রামমোহনের গ্রন্থতালিকা সম্পর্কে শ্রীমতী আড্রিয়েন মুর যে আন্দাজ করেছিলেন তা যথার্থ, অর্থাৎ ফরাসীতে মুদ্রিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের ইংরেজী পুস্তকেরই তালিকা। জুর্নাল আসিয়াতিকে প্রকাশিত গ্রন্থতালিকাটির সঙ্গেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে পত্রিকার পরবর্তী কোনো সংখ্যায় ম. লাঁজুয়ঁানে রামমোহন-গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন (On trouvera dans un prochain Numéro des observations de M. Lanjuinais sur les ouvrages de Rammohun Roy)।

জুর্নাল আসিয়াতিকের ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় ম. লাঁজুয়ঁানে লিখিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নানা দিক থেকে প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। যে সময়ে এটি রচিত হয় তখন পাশ্চাত্যের জগতে চিন্তাশীল মনীষীরা সবে মাত্র ভারতীয় দর্শন বিশেষতঃ বেদ-বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত বেদ উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্রের কোনো প্রামাণিক সংস্করণ বা অনুবাদ

পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয় নি। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট সাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকোহ্ কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের সাহায্যে "সির্‌র-ই-আকবর" বা "সির্‌র-উল-অস্রার" নামে বাহান্নখানি উপনিষদের ফার্‌সী ভাষায় একটি গদ্যানুবাদ সংকলন করেন।[১৫] উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ফরাসী পণ্ডিত ও সাধক আঁক্যতিল দ্যু পেরোঁ "ঔপনেক্‌হৎ" (Oupnek' hat) শীর্ষক এই ফার্‌সী সংস্করণের একটি লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় কর্তৃক উপনিষদের সংস্করণ এবং ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ভুল ত্রুটি পূর্ণ এই লাটিন সংস্করণটিই ভারত-জিজ্ঞাসু পাশ্চাত্য সুধীসমাজের প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'প্রায়' বলছি এইজন্য যে ইংরেজী ভাষায় উইলিয়ম জোন্স ও জার্মানে অথমার ফ্রাঙ্কের উপনিষদ আলোচনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যদিও সে সবের মূল্য অকিঞ্চিৎকর এবং ফ্রাঙ্কের প্রচেষ্টা রামমোহনের পরবর্তী। রামমোহনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপনিষদ ও বেদান্ত আলোচনা ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার শাস্ত্রসম্মত যথার্থ পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তদানীন্তন ইউরোপীয় সারস্বত সমাজের সশ্রদ্ধ কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। জার্মান পণ্ডিত ভিন্‌তারনিত্‌স্ যদিও ফ্রান্স বা ইউরোপখণ্ডের অন্যত্র রামমোহনের গ্রন্থাবলী কতদূর প্রচারিত হয়েছিল তা জানতেন না, তথাপি তিনি নির্ভুল অনুমানের সাহায্যে তাঁর সুবিখ্যাত "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে" রামমোহনের এই প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।[১৬] ম. লাঁজুয়াঁনের প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় প্রধানতঃ উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাতা রূপেই রামমোহন ফরাসী পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ; সমাজ সংস্কারক বা খ্রীস্টীয় নৈতিক আদর্শের সমর্থক রূপে তাঁর পরিচয় যেন সেখানে উপেক্ষিত না হলেও গৌণ। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ম লাঁজুয়াঁনের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তৎকালীন ফরাসী পণ্ডিত মহলের প্রাথমিক ধারণার মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় শাস্ত্রচর্চা সম্ভবতঃ বহুলাংশে এর জন্য দায়ী। রামমোহন কর্তৃক শাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যা এই সকল ভ্রান্তি অপনোদনে সহায়ক হয়েছিল, সন্দেহ নেই। প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল ফরাসী থেকে তার সম্পূর্ণ বাঙলা অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানে স্থানে লেখকের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য যে দু একটি অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছে, সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে রাখা হল। মূল প্রবন্ধের অনুচ্ছেদগুলিকে পরিবর্তন করা হয় নি। পাদটীকাগুলি অনুবাদক-কর্তৃক সংযোজিত। প্রবন্ধে "ল্য ক্রনিক্ রেলিজিউজ্" নামক সম্ভবতঃ একটি ফরাসী সাময়িক পত্রের উল্লেখ দেখা যায়। এতে রামমোহন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন। তিনি উক্ত আলোচনা থেকে রামমোহন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় এই সাময়িক পত্র (?) বা সেখানে প্রকাশিত রামমোহন-সংক্রান্ত আলোচনা কোথাও খুঁজে পাই নি।[১৭]

"রামমোহন রায়ের কতগুলি গ্রন্থসম্পর্কে মন্তব্য

'ল্য ক্রনিক্ রেলিজিউজ্' (পৃ ৩৮৮-৪০৩)-এ রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁর মতামত, জীবন এবং প্রধান গ্রন্থগুলি সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তার উপর নির্ভর করা চলে।

জুর্ণাল আসিয়াতিকের তৃতীয় খণ্ডে ১১৭-১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত ব্রাহ্মণ-কর্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীর একটি

সাধারণ তালিকা দেওয়া হয়েছে। তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস করতেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

এখানে তাঁর প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা যাচ্ছে। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, তাঁর চারখানি উপনিষদের অনুবাদ এবং বেদান্তসার (ইংরেজী অনুবাদ) দিয়ে আরম্ভ করছি।

এই চারখানি উপনিষদ হল, যজুর্বেদের অংশ বিশেষরূপে উল্লিখিত "ঈশ" এবং "কঠ", সামবেদের সঙ্গে যুক্ত 'কেন' এবং অথর্ববেদীয় 'মুণ্ডক' , অথর্ববেদ বেদসমূহের মধ্যে চতুর্থ।

উপনিষদগুলির মধ্যে ঈশের স্থান পঞ্চম। পারসীক সংস্করণে এর নাম দেওয়া হয়েছে "Eischa Vasieh" (ঈশাবাস্য) ; সংস্কৃত ভাষায় কথাটি হল "Irza" অথবা "Iza" (ঈশ) কিংবা Ischavasyam (ঈশাবাস্যম্) ; ফরাসী ভাষায় এর অর্থ হবে 'প্রভু' 'পরমেশ্বর' 'অদ্বিতীয়' 'প্রচ্ছন্ন' 'আচ্ছাদিত' বা "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত সত্তা", সৃষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচর হন ; তিনি ভিন্ন সৃষ্টির কোনো নিজস্ব সত্তা নেই।[১৮] ঔপনেক্‌হৎ[১৯]গুলি বিশ্লেষণ করে আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি এই হল উক্ত উপনিষদখানির মর্মকথা।

রামমোহন রায়ের পক্ষে এই গ্রন্থখানি ইংরেজীতে অনুবাদ না করলেও চলত, কেননা উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থাবলীর মধ্যে (ষষ্ঠ খণ্ড পৃ ৪৩৩) এর একটি ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান আছে।[২০] উইলিয়ম জোন্স এবং রামমোহন রায়ের উক্ত দুইখানি ইংরেজী সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, যদিও শেষোক্ত গ্রন্থখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।[২১] যদি আঁক্যতিল দ্যু পেরোঁর লাটিন অনুবাদের মাধ্যমে এই গ্রন্থগুলিকে পারসীক অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে পারসীক অনুবাদের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ করবার আছে : প্রথমতঃ (ভাষান্তরে) বিষয়বস্তুর অনাবশ্যক এবং দীর্ঘ অর্থব্যাখ্যা ; দ্বিতীয়তঃ (গ্রন্থমধ্যে) মুসলমানী শব্দ ও তত্ত্বের সমাবেশ, যথা "তন্‌জি" এবং "তস্‌বি"।[২২] আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন নেই যে এই সকল শব্দ এবং সেগুলির অর্থ বৈদিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্য ঐ কারণেই হয়তো পারসীক সংস্করণের মুসলমান গ্রন্থকারগণ যে সব অমার্জনীয় সংযোজন করেছেন, সেগুলি আশঙ্কানুরূপ বিপজ্জনক হয় নি।[২৩]

এবারে রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৯ সালের কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত কঠোপনিষদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। গ্রন্থে যথাযথ প্রকাশকাল বা প্রকাশস্থানের উল্লেখ নেই।[২৪] সহজেই বোঝা যায় আঁক্যতিল-প্রকাশিত 'ঔপনেক্‌হৎ' দ্বিতীয় খণ্ড ২৯৯-৩২৭ পৃষ্ঠার 'কিউনি' উপনিষদ (Oupnek'hat Kiouni)[২৫] শীর্ষক সপ্তত্রিংশত্তম গ্রন্থ এবং 'কঠোপনিষদ' অভিন্ন। কিন্তু 'কঠ' বা 'কিউনি' এই দুটি কথার কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাই না।[২৬] রায় (রামমোহন রায়) বলেন এই উপনিষদখানি যজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত। পারসীক ভাষার অনুবাদকগণ এবং তাঁদের মতে সায় দিয়ে আঁক্যতিল বলেছেন, এটি অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত। বলতে পারি না কার মত যুক্তিযুক্ত।[২৭] তত্ত্ব এবং বর্ণনা, উভয় দিক থেকেই লাটিন এবং ইংরেজী সংস্করণের তাৎপর্য এক। কিন্তু আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি, পারসীক সংস্করণটি মূলগ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ অর্থবিবৃতি মাত্র। একথাও মনে হয় ব্রাহ্মণ রায়ের (রামমোহন রায়ের) সংস্করণে গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। 'কেনোপনিষদ' সম্পর্কে বক্তব্য এই যে আঁক্যতিলের ষষ্ঠত্রিংশত্তম 'ঔপনেক্‌হৎ' (উপনিষদ) 'কিন'এর সঙ্গে

আমি এ'টিকে অভিন্ন বলে বুঝতে পেরেছি। পারসীক এবং লাটিন সংস্করণ অনুসারে "কেন" অথবা "কিন", (অর্থাৎ "ভাস্বর" বা "প্রকাশমান" সত্তা)[২৮], অথর্ববেদের এক অংশ, (সংস্কৃত ভাষায়) 'শাখ,' অথবা 'কাণ্ড'। অপর পক্ষে রামমোহন রায়ের মতানুসারে এটি সামবেদের শাখা।[২৯] (গ্রন্থকারগণের) উক্তি সমূহের মধ্যে গরমিলের এই হল দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় গ্রন্থাদির নামের ক্ষেত্রেও কতখানি শৈথিল্য বর্তমান।

কিন্তু চতুর্থ বা মুণ্ডক উপনিষদখানি বেদের কোনো গ্রন্থ থেকে নির্গত এ সম্পর্কে সব কটি সংস্করণই একমত। পারসীক ও লাটিন সংস্করণ অনুসারে নামটি 'মুণ্ডেক' (Mundek), রামমোহন রায়-প্রদত্ত বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী 'মুণ্ডাক' (Moonduck)[৩০] ; সংস্কৃতে নামটি 'মুণ্ডক' অর্থাৎ যা বেদের সার-স্বরূপ বা অলংকার-স্বরূপ।[৩১] এই অংশটি অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত।

রামমোহন রায়ের উক্ত চারখানি উপনিষদের সারানুবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা এবং বেদবিহিত হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ;[৩২] (তাঁর উদ্দেশ্য) ঐ বেদেরই সাহায্যে একথা প্রমাণ করা যে ভগবানের সঙ্গে ঐক্যানুভূতির দ্বারা যে মুক্তি লাভ করা যায় সে মুক্তি পৌত্তলিকতা মানুষকে কখনোই দিতে পারে না ; (এই ঐক্যবোধের প্রত্যয়ের মধ্যে) সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা, সর্বাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবদমন, ধ্যান, নিরাসক্তি নৈষ্কর্ম্য এবং সর্বশেষে (ব্রহ্মোপলব্ধি-জনিত) জ্যোতিরুদ্ভাস প্রভৃতি ঔপনেক্হতের (উপনিষদের) বিশ্লেষণে আমরা যা যা ব্যাখ্যা করেছি, সব কিছুই মিশে রয়েছে। তিনি এর দুর্বল দিকগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরেন নি।

একই সর্বাত্মবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এই পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে ১১৮-১৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত গ্রন্থসকল প্রকাশ করেছেন ; তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বেদান্তের একটি অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ; বেদান্ত শব্দের অর্থ হল বেদের শেষ ভাগ বা সারবস্তু ; ভারতে সনাতন আস্তিক ছয়টি দর্শনের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম ; দর্শন বলতে বোঝায় যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বচিন্তার একটি 'প্রতিচ্ছবি' বা 'দর্পণ'।[৩৩]

উক্ত প্রস্থানগুলি সংখ্যায় মূলতঃ তিনটি। এর প্রত্যেকটি দুটি তত্ত্বের বা দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সমষ্টি। এই তিনটি মূল প্রস্থান সাংখ্য ন্যায় এবং মীমাংসা নামে পরিচিত।[৩৪] বেদান্তদর্শন মীমাংসার অন্তর্ভুক্ত। আক্ষরিক অর্থে বিবেচনা করলে মীমাংসার অর্থ হল (প্রামাণিক বিজ্ঞানের) গবেষণা।[৩৫] ঐ নামে প্রাচীনতম গ্রন্থ তার প্রাচীনত্বের জন্য পূর্বমীমাংসা নামে অভিহিত হয়। অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রাচীন গ্রন্থখানির নাম উত্তরমীমাংসা বা শ্রেষ্ঠ গবেষণা।[৩৬] শেষোক্ত গ্রন্থে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের পন্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ পতঞ্জলি-মুনি-কৃত।[৩৭] ব্যাসকৃত পূর্বমীমাংসাতে ঔপনিষদ মতানুযায়ী সেই ব্রহ্মসংযোগের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় এবং বেদান্ত, এই সহজ নামেই তা সমধিক পরিচিত।[৩৮]

কয়েক বৎসর হল কলিকাতায় উক্ত গ্রন্থের বাংলা অক্ষরে একটি সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৩৯] তাতে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। রামমোহন রায় তাঁর (বর্তমান) ছাব্বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী রচনায় বেদান্ত-দর্শনের কতগুলি অতি সরল অংশ মাত্র বিবৃত করতে পেরেছেন।

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, আগম, আখ্যায়িকা, ক্রিয়াকর্ম এক কথায় সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র জ্ঞানী, লয়বাদী, পবিত্রাত্মা এবং যোগিগণই মুক্তিলাভের যোগ্য। কিন্তু মূর্তিপূজক সম্প্রদায়গুলির জন্য উক্ত শাস্ত্রের বিধান, (দেহান্তে) ঊর্ধ্বাকাশে চন্দ্রলোক তারকালোক প্রভৃতিতে অবস্থিত

আজগুবি অশ্লীল এবং নৈতিক আদর্শবিহীন নানাপ্রকার স্বর্গে লক্ষ লক্ষ বৎসর বাস এবং পরিণামে এই পৃথিবীতে নবজন্ম ও একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ; আর সর্বশেষে (প্রলয়কালে) যখন ব্রহ্ম সমগ্র সৃষ্টিকে নিজমধ্যে সংহরণ করবেন তখন তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। সুতরাং বুঝতে পারা যায় রামমোহন রায়ের রচনাবলী কখনোই কাউকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়নি।[৪০]

একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক রচনা প্রকাশ এবং প্রচারকার্যেও তিনি যথেষ্ট আনন্দবোধ করেছেন ; এবং ধর্মীয় উপাখ্যান, ভবিষ্যদ্বাণী, অলৌকিক কাহিনী রহস্যবাদ প্রভৃতি খ্রীস্টীয় মণ্ডলীসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অসার প্রতিপন্ন করবার কাজেও তাঁর উৎসাহ দেখা গিয়েছে। এই প্রচেষ্টাই তিনি করেছেন তাঁর সুপরিচিত 'খ্রীষ্টের উপদেশাবলী' এবং 'খ্রীষ্টীয় জনসাধারণের প্রতি' প্রথম ও দ্বিতীয় "আবেদন" শীর্ষক গ্রন্থগুলিতে। ইউরোপের সুপরিচিত এবং বহুল আলোচিত বিতর্কের বিষয়গুলির উপর তা মোটেই আলোক-পাত করে না।[৪১]

হিন্দু বিধবাগণকে তাদের স্বামীর চিতায় দাহপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিত তাঁর "কথোপকথন"[৪২] সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলবার বেশী কিছু নেই। প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রাদি যথেষ্ট সূক্ষ্মতার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সেখানে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে উক্ত নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, পরন্তু ঐ বিষয়ে যে শাস্ত্রোক্তি সংগৃহীত হ'য়েছে তার দ্বারা বিপরীত মতই প্রমাণিত হয়।

কোলব্রুকের একটি আলোচনায় (চতুর্থ খণ্ড পৃ ২০৪, ২১৫)[৪৩] বলা হ'য়েছে যে শাস্ত্রে (হিন্দু) বিধবাগণকে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের সে কাজে বাধ্য করাবার কথা বলা হয় নি। আমাদের গ্রন্থকার (রামমোহন রায়) বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের যষ্টির সাহায্যে বিধবাগণকে চিতায় নিক্ষেপ করবার এবং সেখানে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখবার জন্য তিরস্কার করেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বরোচিত আজগুবী শাস্ত্রীয় প্ররোচনার সঙ্গে যুক্ত এই বলপ্রয়োগ অমার্জনীয় ; এর ফল বার বার ভারতের বহুজনকে ভোগ করতে হয়েছে। যদি সিসিলিবাসী দিওদোরস বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থে উল্লিখিত এবং পরে কালগর্ভে লুপ্ত এই প্রথার উৎপত্তি ও প্রাচীনত্বের কথা জানতেন তিনি যদি খবর রাখতেন যে তাঁর রচনাকালের দুহাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে বিবাহের যে বিধিসকল সুনির্দিষ্ট হয়েছিল, সেগুলির সম্ভবতঃ কোনোও পরিবর্তন হয়নি ; এবং সকল শাস্ত্রই হিন্দু বিধবাকে স্বামীর মৃত্যুর পরে নির্জনে কৃচ্ছ্রসাধনপূর্বক জীবনধারণ করবার অনুমতি দিয়েছে, তাহলে তিনি তাঁর ইতিহাসে (৫০. ১৯. ৩৩.) নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসের সহিত তিনি যে কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন, তা নিশ্চয় বাতিল করে দিতেন। উক্ত কাহিনীপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ব্যাভিচার নিরকরণার্থে (ভারতবর্ষে) একটি আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইনে বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে বাধ্য করা হত।[৪৪]

হিন্দু সমাজে কখনই নূতন আইন প্রণয়ন করা হয় নি ; সুপ্রাচীন ও তথাকথিত আপ্তবিধান এবং লোকাচারের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা হয়েছে। কথিত আছে প্রাচীনরা ঐগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে টীকা টিপ্পনীর দ্বারা সেগুলির অর্থ ক্ষেত্র বিশেষে স্পষ্ট ও ক্ষেত্রান্তরে অস্পষ্ট হয়েছে ; কেননা উক্ত টীকাসমূহ সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে মেলে না।"

সোসিয়েতে আসিয়াতিকের মুখপত্রে প্রকাশিত রামমোহন এবং তাঁর গ্রন্থাবলী ও আদর্শ সম্পর্কে এই সুদীর্ঘ আলোচনা ফরাসী প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত সমাজকে রামমোহন সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল।

অনুমান করা যেতে পারে তাঁর সম্পর্কে এবারে ফরাসী সুধীসমাজ রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা (যথা, রামমোহন জীবিত নেই)ও তার ফলে দূর হয়। সোসিয়েতে আসিয়াতিকের ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন তারিখের অধিবেশনে রামমোহনকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক সদস্য (Associé Correspondent) মনোনীত করবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ব্যারন দ্য সাসি ও লা কোঁৎ দওত্যরিভ এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। ঐ সভাতেই লাঁজুয়ঁানে, বারনুফ এবং ক্লাপরথ কর্তৃক গঠিত একটি বিচারক মণ্ডলীর উপর রামোহনের সদস্য পদ-লাভের যোগ্যতাবিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী ৫ই জুলাই তারিখে সভার অধিবেশনে এই বিচারক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে ক্লাপরথ তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। জুর্নাল আসিয়াতিকের ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় সে বিষয়ে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল: "বৈদেশিক সদস্যরূপে প্রস্তাবিত পণ্ডিত রামমোহন রায়ের বিদ্যাবত্তাবিষয়ক যোগ্যতা সম্পর্কে ম. ক্লাপরথ বিচারক মণ্ডলীর পক্ষ হতে একটি বিবরণী পেশ করেন। এই বিবরণীতে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল সেগুলি কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করা হয় এবং রামমোহন রায়কে বৈদেশিক সদস্য উপাধিতে ভূষিত করা হয়। (M. Klaproth au nom d' une commission, fait un rapport sur les titres litteraires du Pandit Rammohan Roy, présenté pour être associé correspondant. Les conclusions de ce rapport sont soumises à la délibération du conseil, et le titre d'associé correspondant est décerné à Rammohan Roy)।[৪৫] ইংরেজ সামরিক বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্নেল লাচ্-লানের উপর সোসিয়েতে আসিয়াতিক রামমোহনের হাতে তাঁর সদস্যপদে মনোনয়ন পত্রখানি পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছিলেন বলে উক্ত কর্মচারীর একখানি পত্রে জানতে পারা যায়।[৪৬] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সুবিখ্যাত মনীষী সিসমঁদি ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যার 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক' পত্রিকায় '*Recherches sur la system colonial pour le gouvernment de l' Inde*' নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ রামমোহনের পরিচয় দিয়ে ধর্মনেতা ও সমাজসংস্কারকরূপে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।[৪৭] দেখা যাচ্ছে রামমোহন ফ্রান্সে যাবার কিছুদিন পূর্বেই সেখানকার পণ্ডিতসমাজ তাঁর রচনাবলী ও চিন্তাধারার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। সুতরাং ফ্রান্সে অল্পকাল অবস্থানের মধ্যেই যে তিনি ফরাসী-রাজ-কর্তৃক সমাদৃত হবেন সে আর আশ্চর্য কি? সম্রাট লুই ফিলিপ ছিলেন সোসিয়েতে আসিয়াতিকের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষক (Protecteur)।[৪৮] সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য রামমোহনের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিষয় পূর্ব হতেই সম্ভবতঃ তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল।

ভারতের বাইরে রামমোহনের খ্যাতির বিষয় আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃ ইংলণ্ডের কথাই আমাদের বেশি করে মনে পড়ে। সেখানে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেননা তাঁর প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ইংরাজের অনেক বেশী পরিমাণে ছিল। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং সম্ভবতঃ আমেরিকাতেও তাঁর খ্যাতি যে বহুবিস্তীর্ণ ছিল, সে খবর আমাদের কমই জানা আছে। ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁকে সম্মান দিয়েছিলেন প্রধানতঃ "পণ্ডিত" ও বেদান্তব্যাখ্যাতা হিসাবে, লাঁজুয়ঁানের প্রবন্ধ থেকেই তা জানা যায়। বেদান্ত বিষয়ক তাঁর গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে জেনা

থেকে এবং ডাচ্ বা ওলন্দাজ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে কাম্পেন থেকে। এই সব দেশের সমসাময়িক কাগজপত্রে তাঁর সম্পর্কে হয়তো আরও আলোচনাদি থাকতে পারে। আমেরিকার ক্ষেত্রে আড্রিয়ান মূরের পরিশ্রমের ফলে ঐ জাতীয় বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ভারতীয় বেদান্তদর্শন ও জীবনচর্যার প্রতি ইউরোপের সুধীসমাজে যে একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল সেই ভারত-জিজ্ঞাসার ইতিহাসে রামমোহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে আছে, উপরের আলোচনায় তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামমোহনের ভবিষ্যৎ জীবনীকারকে এবং ভারতীয় নবজাগৃতির ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণকে এবিষয়ে সচেতন হতে হবে।

---

১ S. D. collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (ed. by H. C. Sarkar), pp. 210-11; Mary Carpenter, *Last Days in England of Raja Rammohun Roy* (Calcutta 1915), pp. 125-26.

২ *India and the World*, December 1933, pp. 328-29; *The Father of Modern India* (Rammohun Centenary Commemoration Volume), Part II, pp. 363-71; প্রথম প্রবন্ধটিও দ্বিতীয় গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

৩ Mary Carpenter, *Last Days in England of Raja Rammohun Roy*, p. 224.

৪ Adrienne Moore, *Rammohun Roy and America* (Calcutta 1942), pp. 121-22.

৫ *Journal Asiatique* I Ser. Tome III (Paris 1823) pp. 117-19.

৬ ফরাসী বিজ্ঞাপনে প্রকাশের বৎসর দেওয়া আছে ১৮১৭; কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশের স্থান এবং কাল 'কলিকাতা' এবং ১৮১৬। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থখানি ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল।

৭ "*Translation of the Abridgement of the Vedant*" গ্রন্থখানি ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের কেনোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ সহ একত্র লণ্ডন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

৮ *Journal Asiatique*, I Ser. Tome III (Paris 1823), pp. 117-19.

৯ *Rammohun Roy and America* (Calcutta 1942), p. 180; *Journ. As.* I Ser. Tome III, pp. 243-49.

১০ দ্রষ্টব্য তত্ত্বকৌমুদী ৭৭ ভাগ ৯ম সংখ্যা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় রামমোহনের প্রভাব" শীর্ষক সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পৃ ৭০-৭৩

১১ *Journal Asiatique* I Ser. Tome III (Paris 1823), p. 58

১২ কাজী আবদুল ওদুদ, 'তুহ্ফাতুল মুওহিদীন', তত্ত্বকৌমুদী, ৭৭ ভাগ, ৯ম সংখ্যা পৃঃ ৬৭-৭০

১৩ রামমোহন রায় কর্তৃক বাঙলা ভাষায় ব্যাখ্যা সমেত যে পাঁচখানি উপনিষদের সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে কেনোপনিষদ সামবেদীয়, এবং ঈশোপনিষদ ও কঠোপনিষদ যজুর্বেদীয়। সুতরাং সম্ভবতঃ এখানে কেনোপনিষদ এবং পরবর্তী দুইখানি যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদের মধ্যে একখানির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশের যে তারিখ দেওয়া হয়েছে তা উক্ত গ্রন্থগুলির প্রকাশকালের সঙ্গে মেলে না। বঙ্গভাষায় কেনোপনিষদ ১৮১৬, ঈশোপনিষদ ১৮১৬ এবং কঠোপনিষদ ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থ ইংরাজীতে না হওয়ায় নাম ফরাসী ভাষায় দেওয়া হয়েছে।

১৪ *Translation of the Abridgment of the Vedant* শীর্ষক গ্রন্থটির কলিকাতা সংস্করণের প্রকাশবৎসর ১৮১৬; এবং লণ্ডন সংস্করণের প্রকাশ বৎসর ১৮১৭; গ্রন্থতালিকায় প্রদত্ত বৎসরটি ঠিক নয়।

১৫ Kalika Ranjan Quanungo, *Dara Shukoh* Vol. I (Second Ed. Calcutta 1952), pp. 108-12.

১৬ Winternitz— *A History of Indian Literature;* Eng. Trans. Vol. I, pp. 19-20.

১৭ ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে কিংবা তার পূর্বে রামমোহন সম্পর্কে এক ফরাসী পুস্তিকা ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল। ১৮২০ সালে ইংলণ্ডের Monthly Repository পত্রিকার পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশিত তার ইংরেজি অনুবাদের কতকাংশ মেরী কার্পেণ্টার উদ্ধৃত করেছেন।

মূল পুস্তিকাগুলি পরে ক্রমিক রেলজিউনে যুক্ত হয়েছিল বলে প্রকাশ, সম্ভবতঃ এখানে সেই অংশেরই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য Mary Carpenter, *The Last Days*, pp. 48-54.

১৮ 'প্রচ্ছন্ন' বা 'আচ্ছাদিত' 'ঈশ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়।

১৯ দ্যু পেরোঁ-কৃত লাটিন অনুবাদের নাম॥

২০ *The Works of Sir William Jones* Vol. VI (London 1799) : "Isávásyam or An Upanishad from the Yajur Veda", pp. 423-25; মূল প্রবন্ধে পত্রাঙ্কটি ছাপার ভুলে '৪৩৩' হয়েছে।

২১ দুটি অনুবাদের দৈর্ঘ্য সমান। 'ঈশোপনিষদ' গ্রন্থখানিই ক্ষুদ্র, মাত্র আঠারোটি শ্লোকের সমষ্টি; প্রবন্ধকার সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থ দেখেন নি।

২২ দারা শুকোহ্ প্রধানতঃ মুসলমান পাঠকদের জন্যই তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাই হিন্দু চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়হীন মুসলমানগণের সুবিধার জন্য মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের সুপরিচিত পরিভাষা তাঁকে কিছু কিছু ব্যবহার করতে হ'য়েছিল। দ্রষ্টব্য Quanungo *Dara Shukoh* Vol. I, p. 111.

২৩ কেননা সেগুলি যে মূল গ্রন্থের অংশ নয় তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

২৪ এই উক্তির মর্ম বুঝতে পারা কঠিন। কেননা জুর্নাল আসিয়াতিকে প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত কঠোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশের স্থান এবং কালের (Calcutta 1819) উল্লেখ করা আছে।

২৫ ফারসী অনুবাদে হয়তো বা লিপিকর-প্রমাদ হেতু "কঠ" শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে' দাঁড়িয়েছে "কিউনি"! ফারসী লিপির অনুলিখনে এই জাতীয় প্রমাদ নূতন বা বিচিত্র নয়।

২৬ কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি শাখার নাম 'কঠ'। উপনিষদখানি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধলেখক সম্ভবতঃ এ'কথা জানতেন না।

২৭ রামমোহন রায়ের উক্তিই ঠিক। কঠোপনিষদ যজুর্বেদীয় (দ্রষ্টব্য উপনিষদ-গ্রন্থাবলী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত পৃ ॥৵০)।

২৮ 'কেন' শব্দের ব্যাখ্যায় লেখক ভুল করেছেন। কেনোপনিষদের প্রথম শ্লোকের আরম্ভ এইরূপ: "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ"। এখানে 'কেন' শব্দের অর্থ "কাহাঁর দ্বারা"। প্রথম শ্লোকের প্রথম তিনটি চরণ ঐ একই সর্বনাম দ্বারা আরম্ভ হয়েছে বলেই উপনিষদটির নাম 'কেনোপনিষদ'। এর অপর নাম 'তলবকারোপনিষদ'।

২৯ রামমোহন রায়ের মতই ঠিক; দ্রষ্টব্য সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত উপনিষদ-গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড পৃ ৯।

৩০ বইটির নামে রামমোহন যে বানান ব্যবহার করেছেন, তা 'Moonduk'; গ্রন্থমধ্যে অবলম্বিত বানান "Mundaka".

৩১ 'মুণ্ডক' শব্দের এই অর্থ ঠিক নয়। এর অর্থ যে বা যা মুণ্ডন করে। "যেমন ক্ষুর নিঃশেষরূপে কেশ ছেদন করে, তেমনি এই উপনিষদ নিঃশেষরূপে অবিদ্যা দূর করে, এই অর্থে ইহার নাম মুণ্ডক।" (তত্ত্বভূষণ, উপনিষদ-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ ৮৵০)

৩২ মূল বেদে পৌত্তলিকতার উপদেশ নেই। লেখক সম্ভবতঃ তা জানতেন না।

৩৩ ফরাসী Vue বা miroir সংস্কৃত 'দর্শন' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে সন্তোষজনক নয়।

৩৪ প্রবন্ধকার ছয়টি দর্শনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন: (ক) সাংখ্য-যোগ; (খ) ন্যায়-বৈশেষিক; (গ) মীমাংসা-বেদান্ত।

৩৫ 'মীমাংসা' শব্দের এই অর্থ ঠিক নয়; এর প্রকৃত অর্থ 'যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত'। দ্রষ্টব্য S. N. Dasgupta, *History of Indian Philosophy,* Vol. I, p. 68।

৩৬ বর্তমান কালের কোনো কোনো পণ্ডিত পূর্বমীমাংসাকে উত্তরমীমাংসার পূর্ববর্তী মনে করেন বটে, কিন্তু প্রবন্ধকারের যুক্তি স্বীকার করেন না; দ্রষ্টব্য Keith, *The Karma Mimaṁsā*, p. 6.

৩৭ এই উক্তিতে ভুল আছে। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের লেখক পতঞ্জলি নন; বাদরায়ণ অথবা ব্যাস।

৩৮ এই উক্তিতে ভুল আছে। পূর্বমীমাংসা বা কর্মমীমাংসার সঙ্গে বেদান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। উত্তরমীমাংসার অপর নাম বেদান্ত। পূর্বমীমাংসা সূত্রের লেখক ব্যাস নন জৈমিনি। পূর্বমীমাংসাতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আছে, এ কথাও সত্য নয়।

৩৯ সম্ভবতঃ প্রবন্ধকার রামমোহন রায়ের "বেদান্তগ্রন্থ" (প্রকাশিত কলিকাতা, ১৮১৫ কিংবা ১৮১৬) এর উল্লেখ করেছেন।

৪০ রামমোহনের যে নিজস্ব একটি মণ্ডলী ছিল একথা প্রবন্ধকার জানতেন না।

৪১ রামমোহন-কৃত খ্রীস্টধর্মের যুক্তিবাদী সমালোচনা রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর নিকট উপাদেয় লাগবার কথা নয়।

৪২ *A Conference between an Advocate and an Opponent of the Practice of Burning Widows Alive* (Calcutta 1818).

৪৩ উল্লেখটি স্পষ্ট নয়। দ্রষ্টব্য Colebrooke—"On the Duties of a Faithful Hindu Widow" *Asiatic Researches* Vol. IV (Calcutta 1795), pp. 209-19; প্রবন্ধে প্রদত্ত পত্রাঙ্ক ২০৪ সম্ভব মুদ্রাকর-প্রমাদ; সেখানে '২১৪' হবে। রচনাটি কোলব্রুকের প্রবন্ধ সংগ্রহেও পরে মুদ্রিত হয়েছিল, দ্রষ্টব্য Colebrooke '*Miscellaneous Essays* Vol. I (London 1837), pp. 114-22.

৪৪ সিসিলি দ্বীপের গ্রীক অধিবাসী দিওদোরস খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে আদিম কাল থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত তদানীন্তন মনুষ্যজাতির একটি ইতিহাস লেখেন। সে গ্রন্থের নাম *Historical Library*। এই গ্রন্থে তিনি একটি ভারতীয় সতীদাহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কাহিনীটি তিনি সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস বা অন্য কোনো পূর্ববর্তী লেখকের রচনা থেকে সংগ্রহ করে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, ভারতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল এই কারণে যে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীরা প্রায়ই ব্যাভিচারিণী হ'ত এবং অনেক সময়ে এই উদ্দেশ্যে তারা বিষপ্রয়োগে পতিহত্যা করত। বলা বাহুল্য এই মতের কোনো ভিত্তি নেই; দ্রষ্টব্য *The Historical Library of Diodorus the Sicilian* (English Translation by Booth, London, 1841) Vol. II pp. 345-47.

৪৫ *Journal Asiatique* I Ser. Tome 5 (Paris 1824), p. 62; মাদাম মোরাঁর প্রবন্ধ *The Father of Modern India* (*Rammohun Centenary Commemoration Volume*) Part II, p. 370.

৪৬ Madame Morin, *Ibid.* Mary Carpenter, *Last Days in England of Rajah Rammohun Roy* (Calcutta 1915), pp. 223-25.

৪৭ Adrienne Moore, *Rammohun Roy and America*, p. 122, প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন; মেরী কার্পেন্টার তাঁর *Last Days* শীর্ষক গ্রন্থে (pp. 20-21) সিসমঁদির রামমোহন-সম্পর্কিত মন্তব্যের একটি ইংরেজি চুম্বক দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় মূল ফরাসী প্রবন্ধটি আমি সংগ্রহ করতে পারি নি।

৪৮ *Journal Asiatique*, 2nd Ser. Tome XI, p. 484.

স্বীকৃতি

শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের অঙ্কিত চারখানি ছবি বর্তমান সংখ্যায় ছাপা হইল। তন্মধ্যে 'রূপকারু' প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩৬ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত; ব্লক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। 'স্বর্ণকার-পরিবার' কার্ডস্কেচটি অবলম্বনে ১৩৪৪ শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন ('রায়বাহাদুর কিষনলালের স্যাকরা জগন্নাথ' ইত্যাদি), তাহা 'ছড়ার ছবি' কাব্যে গ্রথিত আছে। 'স্যাকরা' চিত্র উপলক্ষে কবি ঐ নামেই ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠে যে কবিতা লেখেন ('কার লাগি এই গয়না গড়াও' ইত্যাদি) তাহা বিচিত্রিতা কাব্যে অথবা রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে পাওয়া যাইবে। 'পসারিনী' চিত্রটি লইয়া ঐ শিরোনামেই রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮ মাঘে যে কবিতা লেখেন তাহাও বিচিত্রিতা কাব্যের অঙ্গীভূত আছে।

রামমোহনের রায়ের ও বিদ্যাসাগরের চিত্রের ব্লক বেঙ্গল পাবলিশার্সের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রামমোহন রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। বিনয় ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। মূল্য যথাক্রমে তিন টাকা ও সাত টাকা।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। "সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এই জন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।"

উনিশ শতকের বাংলার প্রতি এই কথা খুব বেশি প্রযোজ্য। উনিশ শতকের— বিশেষতঃ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের— বাংলার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের অন্যত্র যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন কিছু কিছু ছিল তার সঙ্গে বাঙালীর যোগ ছিল না বললেই চলে। ঐ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রিক আন্দোলন সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালীর মন বিশেষ সাড়া দেয় নি। সেকালকার ইতিহাসে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে মোটামুটি যা দেখা যায় তা হতে বরং বলা চলে সেকালের নবজাগ্রত বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ইংরেজের আওতায় গড়ে উঠছিল সেই ইংরেজকেই আশ্রয় করে ছিল, অপর পক্ষে বিশেষ যোগ দেয় নি। কমিসারিয়েট ও ফৌজীদল অথবা এমনি সরকার কেরানি ও কর্মচারী হিসেবে বাঙালী সারা উত্তরভারতে ছড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু তারা ইংরেজকেই মোটামুটি আঁকড়ে ধরে ছিল। আর খাস বাংলায় বাঙালী জমিদার প্রভৃতিরা কি করেছিলেন তার কিছু কিছু নকশা হুতোম প্যাঁচার রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। বাঙালীর রাষ্ট্রিক আন্দোলন বস্তুত আরম্ভ হয়েছে তার পরে, এবং আধুনিক মন নিয়ে। সে আন্দোলন নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, প্রজা-সাধারণের বিদ্রোহে। কিন্তু সে কথা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে, সে সময়, রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, আমরা রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নি, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করেছি।

এক হিসেবে বলা চলে যে বাঙালীর মন এই যে সামাজিক আন্দোলনের দিকে এত ঝোঁক দিয়েছিল এও বাঙালী মনীষার তীক্ষ্ণ উদাহরণ। এ কথা বলার অন্তত দুটি খুব বড় কারণ আছে। প্রথম কারণ, রবীন্দ্রনাথেরই কথায়, আমাদের দেশের কল্যাণভার সমাজেই পুঞ্জিত ছিল, কাজেই সমাজই ছিল আমাদের মর্মস্থান। আজও যে সে অবস্থা ঘুচেছে তা নয়। আরও বহুকাল রাষ্ট্রের সাধনা না করলে এবং জনসাধারণের কল্যাণভার রাষ্ট্রের হাতে সম্পূর্ণ পুঞ্জিত না হলে সে অবস্থা ঘুচবেও না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, সমাজ তৈরি হবার আগে যদি রাষ্ট্র মারফত কোনো সর্বগ্রাসী এবং সর্বব্যাপী পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হয় তা হলে সেই চেষ্টায় অনেক দুঃখ এবং অনেক বলপ্রয়োগ

অবশ্যম্ভাবী। জগতের কিছু দেশ তাড়াতাড়ি পথ চলার তাগিদে সেই দুঃখের পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে, এ কথা সত্য। কিন্তু সকল দেশই যে সে কথা মেনে নেবে এমন কথা বলা যায় না। অন্তত সেইসব দেশে সামাজের প্রস্তুতি রাষ্ট্রের প্রস্তুতির পূর্বগামী হবার প্রয়োজন আছে।

সচেতনভাবে হোক আর নাই হোক, উনিশ শতকের বাঙালী সেই জন্য সমাজসংস্কারের আন্দোলনের দিকে খুব জোর দিয়েছিল। বস্তুত প্রায় গোটা উনিশ শতকই এই ধরণের আন্দোলনে পরিব্যাপ্ত। শুধু সমাজসংস্কার বললে বোধ হয় এর মর্যাদার লাঘব করা হয়। এ আন্দোলন ছিল চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের সাধনা। মনের সর্বতোমুখী উদ্বোধন— বুদ্ধির যুগের যুক্তির যুগের, এক কথায় আধুনিক যুগের সূচনা। সেই জন্য রামমোহন এক দিকে সতীদাহ-নিবারণের আন্দোলন করেছেন, অন্য দিকে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন— সেইসঙ্গে আবার নতুন শিল্পবাণিজ্যের দিকেও মন দিয়েছেন। এক কথায়, সর্বাঙ্গীণ আধুনিকতা। আরও পরের যুগে সাহিত্যের মধ্যেও এই ধারা দেখতে পাই। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যই সৃষ্টি করে যান নি। তিনি যে পরিমাণ সমাজ-সমালোচনা তাঁর প্রবন্ধে ও ব্যঙ্গরচনায় করেছেন তা তাঁর 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যসৃষ্টির চেয়ে কিছু কম নয়। তাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আজও যায় নি।

বাঙালীর এই মানসপরিমণ্ডলের সবচেয়ে দ্যুতিময় গ্রহ বিদ্যাসাগর। এই মহাপুরুষের জীবনকথা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায় ততই বিস্মিত হতে হয়। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে হেমচন্দ্র বলেছিলেন—

ইংরেজীর ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃতের ডিশ্।
টোল-স্কুলী অধ্যাপক, দুয়েরই ফিনিস্॥

কথাটা পরিহাসচ্ছলে বলা হলেও এর মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের গভীর বর্ণনা আছে। আমাদের প্রাচীন ধারা যে আবর্জনাজালে লুপ্ত হতে বসেছিল, আর সাগরপার হতে যে ধারা আমাদের হৃদয়ের তটভূমিতে আছড়ে পড়ছিল তারই সংগমস্থলে দাঁড়িয়ে এই অকুতোভয় মহাবীর্যবান্ পুরুষটি সবলে প্রাচীন ধারাকে আবর্জনামুক্ত করেছেন, অন্য দিকে চিত্তের উদার স্বারাজ্যের মধ্যে নবীন ধারাকে গ্রহণ করেছেন। বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ, পাশ্চাত্য ধরণের প্রথম বেসরকারি কলেজ স্থাপন ইত্যাদি তাঁর বহুমুখী যুদ্ধোদ্যমের কথা কোন্ শিক্ষিত বাঙালীর অজানা আছে? কিন্তু শুধু কর্মের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও এই মহাপুরুষের অদম্য তেজের কথাই বা কে না জানেন? বস্তুত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মেও তিনি এক হিসেবে সাহেব ছিলেন, বাঙালীর চরিত্রের আনুষঙ্গিক দুর্বলতার লেশমাত্রও তাঁর ছিল না। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁকে পদে পদে আজীবন দারুণ সংগ্রাম করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর উদ্ধত মস্তক কখনও নোয়ান নি, তাঁর ঋজু মেরুদণ্ড কখনও বাঁকে নি। এই পলিমাটির বেতসবৃত্তির দেশে তিনি হিমালয়োচিত দার্ঢ্যের সঙ্গে হিমালয়ের মতই দুরধিগম্য তেজে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অথচ সেই হিমালয় হতে অজস্র প্রস্রবণ করুণার ধারায় বাংলাকে শীতল ও সঞ্জীবিত করেছে। এ ছাড়া তাঁর অদ্ভুত সাহিত্যকীর্তির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

বিশেষ সুখের বিষয়, এ হেন একটি আশ্চর্য উজ্জ্বল চরিত্র নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য জীবনীকারদের মত তিনি বিদ্যাসাগর-জীবনের কতক-গুলি ঘটনার বিবরণ বা সত্যাসত্য নির্ণয় করে সন্তুষ্ট থাকেন নি। তাঁর বিচারের মূল লক্ষ্য হল বিদ্যাসাগর

ও বাঙালী সমাজ। তৎকালীন বাঙালী সমাজের পটভূমিকাতেই তিনি বিদ্যাসাগরের জীবন বিচার করেছেন। তাঁর গ্রন্থের আপাতত দুই খণ্ড প্রকাশ হয়েছে, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডে তিনি কতকগুলি বড় সামাজিক প্রশ্নের পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরকে বিচার করেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, বিদ্যাসাগরের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা হল তাঁর মানবমুখিতা এবং মানবময়তা। "নবযুগের শক্তিমান মানুষের মতন তাঁর চিন্তাধারা ছিল ইহজগৎকেন্দ্রিক ও মানবকেন্দ্রিক। বালকদের বোধশক্তির বিকাশের জন্য যখন তিনি 'বোধোদয়' লিখেছিলেন, তখন প্রথম কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'।· · কিন্তু· · তখনো দেখা গেল, বোধোদয়ের প্রথমে 'পদার্থ' বা matter, তার পরে 'ঈশ্বর'। এই ইহজাগতিক মনোভাবের দিক থেকেও বিদ্যাসাগরকে রেনেসাঁস-যুগের অদ্বিতীয় মানুষ বলা যায়।" বস্তুত এই মূল কথাটি বুঝলেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের অনেক দিক বোঝা যায়। যেমন তাঁর শিক্ষাদর্শন। বিনয়বাবু দেখিয়েছেন সেখানেও তাঁর আদর্শের ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজম্। "সেই জন্যই দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও, নবযুগের হিউম্যানিস্ট আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষানীতির প্রতি অন্ধ অনুরাগী করে তোলে নি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনঃ-চর্চার আবশ্যকতা তিনি অস্বীকার করেন নি কখনো, কিন্তু চর্চার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং নিজে তা পরিবর্তন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক এবং সেখানে অতীতের সঙ্গে কোনো আপস-রফা তিনি করেন নি। এই কারণেই তিনি মনুসংহিতা পড়বার পরামর্শ দিয়েছিলেন, রঘুনন্দন নয়। এই কারণেই তিনি বার্কলে পড়বার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। এমন-কি বেদান্ত পড়বার দিকেও তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না। সমাজসংস্কারের ব্যাপারেও তাই। চেতনার মধ্যে যেসব নানা পূর্বসংস্কার জট পাকিয়ে থাকে সেই জট ছাড়ানো দুঃসাধ্য— কাজেই সমাজসংস্কার বড় দুরূহ ব্যাপার। বিদ্যাসাগর অকুতোভয়ে এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। বিনয়বাবু দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগর এইসব কাজ শুধু করুণার বশবর্তী হয়ে করেন নি। রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" বিনয়বাবু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন "উনিশ শতকে, সেকালের বাঙালী সমাজের সংকট ও অবনতির এই চিত্র মনে রাখলে, সমাজ-সংস্কারের ঐতিহাসিক আবশ্যকতা বোঝা সহজ হয়। বিদ্যাসাগর এই ঐতিহাসিক আবশ্যকতাবোধ থেকেই সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।" বস্তুত তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিনয়বাবু সে যুগের সমাজ ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় বিদ্যাসাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করে এই কথাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন "বিদ্যাসাগরের জীবনের 'হিউম্যানিস্ট' বা মানবমুখীন আদর্শ যেমন তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে তেমনি তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষাসংস্কারে এবং সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র সমান-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি। সেইখানেই তার আসল ঐতিহাসিক সার্থকতা।"

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক বিদ্যাসাগরের জীবনীর বিশেষ বিশ্লেষণ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা, জন্ম ও বাল্যকাল, বাল্যকালের সমাজ, কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র, তাঁর অধ্যাপকদের সঙ্গে

সম্পর্ক, কর্মজীবনের সূচনা, সমাজজীবনের খরস্রোত, নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার, নবজাগরণ— এই কটি বিষয় নিয়ে আলোচনা এই খণ্ডে রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সম্ভবত পরের জীবনের কথা থাকবে।

বিদ্যাসাগরের অনেকগুলি চরিতকথা আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি ছেড়ে দিলে, বিদ্যাসাগরের আসল চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলে এমন চরিতকথা খুবই কম। তার উপর, সেকালের সমাজের আসল চেহারাটি নিরূপণ করে তার ঘাতপ্রতিঘাতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব কিভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং কিভাবে তা সমাজের মোড় ফিরিয়েছিল এ আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নি বললেই চলে। এই অভাব শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ কুশলতার সঙ্গে দূর করেছেন। তাঁর প্রখর সমাজবোধ, গভীর বিশ্লেষণ, উৎকৃষ্ট রচনাগুণ এবং বহু তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা— এগুলির সমন্বয়ে বইটি বিদ্বজ্জনের অপরিহার্য বলে মনে করি।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

কাব্য-সঞ্চয়। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ; অভিজিৎ প্রকাশনী, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

তখন স্কুলে পড়ি ; শারদীয়া পূজা সমাগতা। কিন্তু সে বৎসর বাংলার বড় দুর্দিন ; অসময়ে অতিবৃষ্টি ও পরে অনাবৃষ্টিতে সেবারে বাংলার শরৎশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; ফলে দিকে দিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ; ঘরে ঘরে ক্ষুধিত ও রুগ্নের আর্তধ্বনি। তাহার মধ্যেই অবশ্য টিম্ টিম্ করিয়া বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মনে আছে, হঠাৎ একটা পত্রিকা খুলিয়া একটা দীর্ঘ কবিতা চোখে পড়িল, তাহার প্রথম পদটি—

> বোধনে তোমার রোদনের রোল ওঠে বাংলার বক্ষ চিরে'
> এর মাঝে মাগো, তোমার সাধনা ? হবে না হবে না, যাও মা ফিরে।

পদটি পড়িয়া সচকিত হইয়াছিলাম। সমগ্র কবিতাটির মধ্যেই পদটি ধ্রুবপদের মত বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দীর্ঘ কবিতাটি বার বার উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিয়াছিলাম, আমার কিশোরচিত্তে কবিতাটি যথার্থ একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। সমস্ত বাংলা দেশের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া লইয়া বাংলা দেশের দারিদ্র্য ক্ষুধা ব্যাধি-বেদনা হতাশার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিবার প্রবৃত্তি আনিয়া দিয়াছিল। আজ কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কাব্য-সঞ্চয়ে'র কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে 'ব্যর্থ বোধন' কবিতাটিতে চোখ পড়িতেই সেই পূর্বস্মৃতি মনে আসিল। এই কবিতাটিতে শুধু বাংলার দুর্দশা ও হাহাকারের বর্ণনাই পাই নাই, পাইয়াছিলাম গভীরপ্রেরণাদায়ক একটি দৃঢ় সংকল্প—

> মানুষ বলিতে যার কিছু নাই, হীন পশুসম যাতনা সহে,
> জগৎজননী তব আরাধনা তার কাছে সে কি মিথ্যা নহে ?
> যদি কোনও দিন ওগো মা আমার, এই বিদীর্ণ বক্ষপুটে
> সদ্য-ক্ষতের শোণিতবিন্দু রক্তকমলে ফুটিয়া ওঠে,—
> সেই হবে তব পূজার অর্ঘ্য, চন্দন হবে অশ্রুজল,
> তব আগমনী সেদিনে জাগাবে বাংলার বুকে লুপ্ত বল !

সাবিত্রীপ্রসন্ন বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের সৌরমণ্ডলের কবি। শুধু তিনি নন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস রায় প্রভৃতি এই সৌরমণ্ডলের কবি বলিয়াই সুপরিচিত।

এই পরিচয়ে এই কবিগোষ্ঠী কখনও কুণ্ঠিত নন, বরং গর্বিত। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হইয়া একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে ও ভঙ্গিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিব, এই অভিলাষ ইঁহাদের কাহারও মধ্যে অত্যন্তভাবে প্রকট হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু এই সৌরমণ্ডলের কবি বলিয়া এই কবিগোষ্ঠীর প্রতি আধুনিককালের পাঠক-সমাজের একটা স্পষ্ট অবজ্ঞা না হোক, একটা ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়াছি। আমার মনে হয়, এক সৌর-মণ্ডলের কবি— এই সাধারণ পরিচয়ে পরিচিত করিয়া আমরা অনেক সময়েই কবিগোষ্ঠীর প্রতি একটা অবিচার করি। ইঁহারা 'রবি' না হইয়া আপেক্ষিক অল্পভাসের গ্রহনক্ষত্র হইতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটা সাধারণ প্রভাব সত্ত্বেও ইঁহাদের কবিতায় কিছু কিছু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় আছে।

এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো কবিই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় জীবনের প্রথমাবধি একটি গভীর অধ্যাত্মবোধ লইয়া ক্রমপরিণতি লাভ করেন নাই। ইঁহাদের কাঁহারও কাঁহারও মধ্যে অধ্যাত্মবোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ধর্মবিশ্বাস রূপে, কোথাও অধ্যাত্মবোধ দেখা দিয়াছে একটা প্রেরণাদায়ক ঐতিহ্য রূপে। সুতরাং এদিক হইতে ইঁহাদের উপরে রবীন্দ্র-প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে লক্ষণীয় নয়। প্রভাব দেখা দিয়াছে মুখ্যতঃ প্রেম-বর্ণনায় এবং প্রকৃতি-বর্ণনায়। কিন্তু প্রকৃতি-বর্ণনার ক্ষেত্রে এই কবিগণের একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে প্রকৃতি তাহার যেন একখানি সমগ্র রূপ; তাহাকে আর পল্লী-প্রকৃতি বলিয়া বিশেষিত বা ভাগ করিয়া দেখিবার অবকাশ কম। কিন্তু এই কবিগণের মধ্যে পল্লী-প্রকৃতি বলিয়া প্রকৃতির একটি বিশেষ রূপ ফুটিয়াছে। পল্লী-প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য কি?

প্রকৃতির রূপদান করি অনেক সময়েই আমরা মানুষের জীবনের সঙ্গে, তাহার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করিয়া। বাংলার পল্লীর প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও বাংলার কিষাণ মজুরের। এই নিম্নমধ্যবিত্ত ও কিষাণ-মজুরের দৈনন্দিন ছোট-খাট সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা গায়ে মাখিয়া প্রকৃতি এই কবিগোষ্ঠীর কবিতায় একটা গভীর মমতাময়ী রূপ ধারণ করিয়াছে। সাবিত্রীপ্রসন্নের পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনায় স্থানে স্থানে এই মমতা স্পর্শযোগ্য।

শুধু পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনাতেই কবির পল্লী-প্রীতি ব্যঞ্জিত হয় নাই; বাংলার পল্লী-জীবনের সহিতই করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় প্রভৃতির ন্যায় সাবিত্রীপ্রসন্নেরও একটা ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষিত হয়। এ যোগ বুদ্ধির যোগ বা কল্পনার যোগ নয়, এ যোগ অন্তরের যোগ। তাই পল্লীকে লইয়া সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় কোনো সস্তাদরের রোম্যান্টিকতা নাই; পল্লীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ পল্লীর রূঢ় বাস্তব জীবন সম্বন্ধে তাঁহাকে সর্বদাই সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শত দারিদ্র্য শত লাঞ্ছনা বঞ্চনা সত্ত্বেও 'নিলামের ডাকে'র দিনে সর্বস্বান্ত চাষীর মৃতপত্নীর 'খাড়ু'জোড়া রাখিয়া দিবার জন্য মহাজনের নিকটে যে করুণ আর্তি তাহার মধ্যে কোনও বেদনার বিলাস নাই, সহানুভূতির সততা তাহাকে সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

সাবিত্রীপ্রসন্নের কবি-চেতনা গ্রামকেন্দ্রিক; জাতির যে সম্ভূতি-সম্পন্না স্মৃতি তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছে তাহাও গ্রামকেন্দ্রিক, যে সর্বোদয়যুক্ত জাগরণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহাও গ্রামকেন্দ্রিক। এই গ্রামকেন্দ্রিক কবি-মানসে শহরবিমুখিতা দেখা দিয়াছে অতি স্বাভাবিক ভাবেই। সেইজন্যই দেখি—

চলেছি পল্লীর পথে— জনশূন্য একান্ত নির্জন,
নগর হইতে কানে বিঁধে আসি প্রমত্ত গর্জন।

সেবার স্পর্ধিত গর্বে কর্মের অসীম ব্যর্থতায়
অন্তর কাঁদিয়া ওঠে গভীর ব্যথিত মমতায়
স্বদেশের অন্তরলক্ষ্মীর ; —মৃত্যু-উৎসব

প্রেমের ক্ষেত্রে খানিকটা রোম্যান্টিক-প্রবণতা লক্ষিত হইলেও সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতাগুলি সমগ্রভাবে বিচার করিলে তাঁহার সমাজচেতনা সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই সমাজচেতনা স্থানে স্থানে রাজনৈতিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সেই রাজনৈতিক বোধে শুধু বিরোধী বিদেশী শক্তির প্রতি বিদ্বেষবর্ষণই বড় হইয়া ওঠে নাই— মানবজাগৃতির কল্যাণময় বোধকেই জাগ্রত করিয়াছে। এই মানবতাবোধ স্বাভাবিকভাবেই বহুস্থানে দৈববিরোধী মনোভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে এ যুগের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির সহিত সাবিত্রীপ্রসন্নের সগোত্রীয়তা। সাবিত্রীপ্রসন্নকেও দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে দেখি—

মানুষ ও দেবতায় তাই চাহি ভীষণ সংগ্রাম,
মানুষ অমর নহে, আরো ভালো বিধি তার বাম।
প্রদীপ্ত পৌরুষে নর জিনি লবে স্বর্গের আসন,
সন্ধিসর্তে স্বর্গদূত ধরাতলে আনিবে ভাষণ।
অগ্নিময়ী বাণীর ঝঙ্কারে
মানুষ সেদিন দিবে সমুচিত উত্তর তাহারে—
"ভুবনবিজয়ী নর, নাহি ডরে দৈব কোপানল
গৌরব-তিলক তার সমুন্নত ললাটে উজ্জল।" — নর-দেবতায়

অথবা—

তাই মোর এ বৈরসাধন।
ভক্তি নহে— অবহেলা দূরত্বের কাটিবে বাঁধন
মানব ও দেবতার।
স্বর্গে মর্তে জয় হোক উপেক্ষিত মানব-আত্মার! — বৈর-সাধন

বিষয়বস্তুই কবিতার একমাত্র বা মুখ্য বস্তু নয় ; আস্বাদনের ক্ষেত্রে রূপায়নের প্রশ্ন অবশ্য বিচার্য। সেদিক হইতে সাবিত্রীপ্রসন্নের কতগুলি কবিতায় একটি জিনিস পরিপূর্ণ আস্বাদনের অন্তরায় রূপে দেখা দিয়াছে। তাহা হইল অনাবশ্যক শব্দায়মান দীর্ঘায়ন। আরও ঘনপিনদ্ধ সংহতির মধ্যে যে জিনিস নিটোল হইয়া উঠিতে পারিত অতিভাষণ ও দীর্ঘায়ণের ভিতর দিয়া তাহা কোথাও তরলায়িত— কোথাও কিঞ্চিৎ শ্রান্তিকর। ভাব-'সম্বেগ ও উচ্ছ্বাসপ্রাবল্যের মধ্যে পরিমাণ ও প্রকারগত পার্থক্য হয়তো দুর্লক্ষ্য ; কিন্তু সার্থকশিল্পীর ক্ষেত্রে সেই পরিমিতি-বোধ অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত। এই পরিমিতি-বোধ সম্বন্ধে অতি-সচেতনতা বহুস্থলে কৃত্রিমতার কারণ হয়, দুর্বোধ্যতারও কারণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লভ নয়। কিন্তু অন্তেস্থিত উভয়কোটিকে পরিত্যাগ করিয়া মাধ্যমিক হইয়া উঠিবার সহজপন্থা কি তাহা কোনও সমালোচকের নির্দেশের অপেক্ষা করে না— সে শিল্পচাতুর্য প্রতিভার উপাদান-ভূত সত্য।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, কলিকাতা ৯। আট টাকা।

ঝাঁসীর রাণী। শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১। পাঁচ টাকা।

বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবন-চরিত। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত নূতন সংস্করণ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা ৭। মূল্য পাঁচ টাকা বারো আনা।

সিপাহী থেকে সুবাদার। সুবাদার সীতারাম। ইংরেজি থেকে অনুবাদক শ্রীশোভন বসু। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২। তিন টাকা।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের শতবার্ষিক উপলক্ষে এই বিষয় সম্পর্কে ভারতে যত বই লেখা হয়েছে তার অধিকাংশ বাঙালীর রচিত, বাঙলায় অথবা ইংরেজিতে। লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক এবং সকলে সমগ্র বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেন নি। তথাপি এই ব্যাপারে বাঙালীর গভীর আগ্রহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আগ্রহ নিশ্চয়ই লেখকদের মধ্যে নিবদ্ধ নেই। জনসাধারণের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেই প্রকাশকরা এতগুলি বই প্রকাশ করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন।

বাঙলা বইগুলির মধ্যে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের ভা র তী য় ম হা বি দ্রো হ একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। উল্লেখযোগ্য বিশেষ করে লেখকের দৃষ্টিকোণের জন্য। তিনি জোরালো ভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে সাতান্ন সালের বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়। শুধু 'সিপাহীদের বিদ্রোহ' বলে তাকে চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে। সাতান্ন সালের বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের ফল নয়; অথবা অসন্তুষ্ট সিপাহীদের দাবি আদায়ের কৌশল বলেও একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক সাতান্ন বিদ্রোহের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা তথ্যসমৃদ্ধ এবং সাবলীল। অনেক পরিশ্রম করে তিনি প্রচুর সংকলন করেছেন। কিন্তু তার ফলে ভাষার গতি ভারাক্রান্ত হয় নি।

সাতান্ন বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে প্রতিপন্ন করবার সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, বিদ্রোহীদের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। এমন পুথিপত্র নেই যা থেকে অবিসংবাদীরূপে প্রমাণ করা যেতে পারে তাদের আদর্শ কি ছিল এবং এই আদর্শ সফল করবার জন্য কোন্ পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেছিল। বিদ্রোহে যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দেয় নি, কিন্তু সহানুভূতি ছিল, তারাও রাজরোষের শঙ্কায় সমসাময়িক বিবরণ রেখে যায় নি। সুতরাং বিদ্রোহকে যাঁরা 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' বলে মনে করেন এবং যাঁরা একে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে দেখেন—এই উভয় পক্ষকেই নির্ভর করতে হয় ইংরেজ লেখকদের বইয়ের উপরে। বলা বাহুল্য, এসব বই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। যাঁরা বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে প্রমাণ করতে চান তাঁদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য দলিলপত্রের নজির উপস্থিত করা কঠিন। ইংরেজ লেখকদের পরিবেশিত তথ্যকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য কোনো কোনো বিদেশী

লেখকের রচনায় কিছু কিছু সহানুভূতিপূর্ণ সত্যভাষণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দু-একজন ভারতীয় লেখকও বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিসূচক দু-একটি উক্তি করেছেন। প্রমোদবাবু সাতান্ন বিদ্রোহের সুপ্রচলিত তথ্যসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার মধ্যে প্রত্যয়শীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। সাতান্ন বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে প্রমাণ করবার জন্য এরূপ বিস্তৃত বিশ্লেষণ বাঙলা ভাষায় পূর্বে বোধ হয় আর হয় নি। প্রমোদবাবুর বইয়ের বিশেষ মূল্য এর উপরেই নির্ভর করছে।

সাতান্ন বিদ্রোহ স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল কিনা, এই প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের মনে আর-একটি প্রশ্ন জাগে। তা এই যে, বাঙালীর বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি ছিল কতটুকু। বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাঙালীর মনে সহানুভূতি ছিল না— অধিকাংশ লেখকই এই মত পোষণ করেন। বাঙালী কেন বিদ্রোহে যোগদান করে নি প্রমোদবাবু তার কয়েকটি কারণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এতদিন বাঙালী পুঁথিগত রাজনীতির চর্চা করেছে; অকস্মাৎ বিদ্রোহের সামনে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী যুবক চাকরি পেয়ে সন্তুষ্ট; সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ফলে বাঙলায় যে প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণী গড়ে উঠেছিল সেই শ্রেণী ছিল ইংরেজের সমর্থক। তা ছাড়া ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায় করে যেসব বাঙালী বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল তারাও স্বভাবতই বিদ্রোহ চায় নি।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়া আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। বিদ্রোহের প্রকৃতি পরে যা-ই দাঁড়াক-না কেন, প্রথমে যে এটা সিপাহীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল সে বিষয়ে ভুল নেই। আজকের মত সেদিনও বাঙালী সিপাহীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। বাঙালী সিপাহীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়লে আমাদের সমাজে তার প্রভাব পড়ত। বিদ্রোহ আরো কিছুকাল চললে বাঙালীর মন যে তাতে গভীর ভাবে সাড়া দিত এমন আশা করা যায়।

বাঙলা দেশে ব্রিটিশ শাসনের সুদৃঢ় পত্তন হয়েছে অন্য সকল অঞ্চলের পূর্বে। ১৮৫৭ সালের মধ্যেই সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্রিটিশের প্রশাসনযন্ত্র প্রসারিত হয়েছে। উত্তরভারতের অন্যত্র তখনও কার্যত গ্রামাঞ্চলের শাসনভার ছিল রাজা-জমিদারদের উপরে। তাই সেসব অঞ্চলে বিদ্রোহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা যে বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র নির্ভীক সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেনের ইংরেজবিরোধী মনোভাবের জন্য শঙ্কিত হয়ে প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করা হয়। অথচ বিদ্রোহের কোনো ইতিহাসকারই শ্যামসুন্দর সেন ও তাঁর 'সমাচার সুধাবর্ষণ'কে উপযুক্ত মর্যাদা দেন নি।

ইংরেজ শাসকরা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের আনুগত্য সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করতেন। তাই ১৮৫৭ সালের প্রকাশিত বইপত্র পরীক্ষা করে সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিলের ভার দেওয়া হয়েছিল লঙ্ সাহেবের উপরে। দিল্লী মীরাট প্রভৃতি অঞ্চলের বই সম্বন্ধে এরূপ রিপোর্টের ব্যবস্থা হয় নি। লঙ্ সাহেব তাঁর রিপোর্টে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' 'দূরবীণ' প্রভৃতি দণ্ডপ্রাপ্ত কাগজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকায় সন্দেহ হয় যে বিদ্রোহের সহানুভূতিসূচক সকল নজির গোপন করাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। সুতরাং বিদ্রোহ সমর্থন

করে অন্য কোনো পুথিপত্র যে লেখা হয় নি এমন কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। হয়তো সরকারের রোষে পড়ে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিস্তারিত যুক্তিতর্কের অবতারণার সুযোগ এখানে নেই। বিদ্রোহে বাঙালীর ভূমিকা সম্বন্ধে প্রমোদবাবুর দ্বিধাগ্রস্ত আলোচনা পড়ে মনে হল বাঙালীর সপক্ষে এটি আরো জোরালো করা যেত।

প্রমোদবাবু বইয়ের প্রথম অধ্যায় "মহাবিদ্রোহের পটভূমি"তে বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। এর পর বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। "ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ" অধ্যায়টি আর-একটু বিস্তৃত হলে রাণীর প্রতি সুবিচার করা হত। প্রমোদবাবু লিখেছেন, "তার পর সিপাহীরা রানীর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে দিল্লী চ'লে গেল (পৃ ৩২২)।" রানীর কাছ থেকে **জোর করে** টাকা নিয়ে গেল বললে বিবরণ যথার্থ হত। ৩২৭ পৃষ্ঠায় প্রমোদবাবু লিখেছেন, "২৩শে মার্চ কল্পির কিছু দূরে কুঞ্চে আবার যুদ্ধ হল। সেখানে হেরে যাবার পর বিদ্রোহী নেতারা **হঠাৎ** গোয়ালিয়রে উপস্থিত হলেন এবং ১লা জুন বিনা যুদ্ধে ঐ শহর দখল করলেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা পালিয়ে গিয়ে আগ্রায় ইংরেজের আশ্রয় নিলেন। ১৭ই জুন ১৮৫৮ সালে ইংরেজ বাহিনী যখন বিদ্রোহীদের আবার গোয়ালিয়রে আক্রমণ করল, তখন রানী লক্ষ্মীবাঈ কোট-কী-সরাই-এর যুদ্ধে নিহত হলেন।" নেতারা "হঠাৎ" গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন নি। রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের পরিকল্পনা অনুসারেই গোয়ালিয়র অধিকার করা হয়েছিল। রণকৌশলের দিক থেকে তাঁর পরিকল্পনা এরূপ মারাত্মক হয়েছিল যে লর্ড ক্যানিংও বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। নির্বিবাদে গোয়ালিয়র অধিকার করেও কেন যুদ্ধে হার হল তার কারণ বিশ্লেষণ করলে বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত। লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা এত সংক্ষেপে বলবার ফলে পাঠকের ঔৎসুক্য অতৃপ্ত থেকে যাবে।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে মতামত উদ্ধৃত করে তা খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন প্রমোদবাবু। পুস্তকের বহু স্থানে এরূপ বাদপ্রতিবাদ আছে। প্রমোদবাবুর প্রতিবাদের সুর কোথাও কোথাও ব্যঙ্গাত্মক হয়েছে। এটা না থাকলে সুখী হতাম। এ ধরণের বইয়ে এরূপ প্রতিবাদ শোভা পায় না। যদিও ব্যক্তিগতভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমি প্রমোদবাবুর মতের সমর্থক।

প্রমোদবাবু বহু তথ্য সংকলন করে সুন্দর ভাবে বিন্যাস করেছেন। তাঁর বক্তব্যের পশ্চাতে প্রত্যয় ও আবেগ আছে। সুতরাং পাঠকের মন এ বইয়ের আবেদনে সাড়া দেবে। যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক তাঁরাও এ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

প্রকাশক বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। অনেকগুলি ছবি ও মানচিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় বইটির মূল্য বেড়েছে।

সাতান্ন বিদ্রোহের পর থেকে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বীর্যবতী রমণীর প্রতীক তিনি। বিদ্রোহের আর কোনো নায়ক-নায়িকা তাঁর মত জনচিত্ত অধিকার করতে পারেন নি। বিদ্রোহের সাময়িক প্রয়োজনের অনেক ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্য; তাই এখনো তিনি আমাদের শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের এই শ্রদ্ধা যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জনশ্রুতি ও অস্পষ্ট ধারণাই আমাদের অবলম্বন। শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ঝাঁসীর রানীর একটি তথ্যনির্ভর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

লক্ষ্মীবাঈয়ের বিঠুরে জন্মের পর থেকে তাঁর বধূজীবন, দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ, রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা এবং বিদ্রোহে যোগদান ও মৃত্যুবরণ প্রভৃতি ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে লেখিকা একটি শক্তিশালিনী মাধুর্যমণ্ডিত নারীচরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। লেখিকা রানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন; তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দগতি এবং কাব্যগুণসম্পন্ন। সুতরাং একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মত তিনশতাধিক পৃষ্ঠার জীবনীটি সানন্দে পড়া যায়। ইতিহাসের সন-তারিখ জীবনকাহিনীর অনায়াস গতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

লেখিকা লক্ষ্মীবাঈএর শৌর্য ও সাহসের উপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে তাঁকে যে শুধু বীরাঙ্গনায় পরিণত করেন নি এটা আমাদের ভালো লেগেছে। রানীর চরিত্রের মানবতার দিকটা বেশ উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। প্রজাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ ছিল বলেই বিপদের দিনে তারা অস্ত্র হাতে করে রানীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। "মেরী ঝাঁসী দুংগী নহীঁ" বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করবার পরও বিনা বিদ্রোহে অধিকারচ্যুতি যে মেনে নিয়েছিলেন তার মধ্যেও রানীর সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসকরা তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে তিনি তাদের ক্ষতি করতে চান নি, বরং রক্ষা করবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ঘটনার আবর্তে পড়ে যখন বিদ্রোহ করতে হল তখন সাহস সংগঠনশক্তি ও রণকৌশলের যে পরিচয় দিয়েছেন তা প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত উপরে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে রানী প্রথমে বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যে চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা শত্রুর চোখে ধূলা দেবার জন্য; প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে তিনি "শঠতাপূর্ণ চিঠিগুলি" লিখেছিলেন। রানীর কার্যকলাপে শঠতা আরোপ না করে তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করলেও তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।

যাঁর জীবনী লেখা হয় তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ যদি সঠিকরূপে জানা না থাকে তা হলে চরিতকারকে সেই তারিখ নির্ধারণে বিশেষ সতর্ক হতে হয়। শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য পৃ. ২৮এ লিখছেন যে ১৮৩৫ সালের ২১শে নভেম্বর লক্ষ্মীবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। ২৯৯ পৃষ্ঠায় লেখিকা গোয়ালিয়রে রানীর সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে দেখা যায় রানীর জন্ম হয়েছিল ১৯শে নভেম্বর। দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস তাঁর "ঝাঁসী সংস্থানচ্যা মহারানী লক্ষ্মীবাঈ সাহেব হ্যাচে" নামক মারাঠী গ্রন্থেও জন্ম-তারিখ ১৯শে নভেম্বর বলেছেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন পারসনীসের তারিখ মেনে নিতে পারেন নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "We do not know even the date of her birth." (*Eighteen Fifty-Seven*, p. 269)। শ্রীমতী ভট্টাচার্য একই বইয়ে দুটি তারিখ ব্যবহার করেও তাঁর মনে কোনো সংশয় জাগে নি। একটি সম্পূর্ণ নতুন তারিখ—২১শে নভেম্বর—তিনি যে কোথায় পেলেন সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দেন নি। রানীর মৃত্যু হয়েছে ১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন; এই তারিখটি সুপ্রচলিত। কিন্তু সমাধি-ফলকের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় ১৮ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এই ব্যতিক্রম সম্বন্ধেও লেখিকা কিছু বলেন নি।

পুস্তকের শেষভাগে লেখিকা রানীর দত্তকপুত্র দামোদর রাও-এর কথা এবং রানীর প্রচলিত ছবির ইতিহাস দিয়েছেন। আলোচ্য জীবনীতে আমরা প্রচলিত বিবরণ থেকে কিছু পার্থক্য দেখেছি এবং কোথাও কোথাও নতুন বিবরণও পাওয়া গিয়েছে। পুস্তকের শেষভাগে জানা গেল লেখিকা গোবিন্দরাম তাম্বের সহায়তায়

কিছু কিছু অপ্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করেছেন। এই তথ্যগুলি চিহ্নিত করে দিলে ভালো হত। একমাত্র লেখিকা ছাড়া কারো জানবার উপায় নেই তিনি তাম্বে মহাশয়ের কাছ থেকে কি কি পেয়েছেন। এইসব অংশ নিয়ে পাঠকের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জীতে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ঝাঁসীর রাজকুমার'-এর উল্লেখ দেখলাম না। দামোদর রাও-এর আত্মকথার বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীচরণ মিত্রের 'ঝাঁসীর রাণীর' উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থপঞ্জীতে। চণ্ডীচরণ সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথাই কি বলতে চেয়েছেন লেখিকা? মিত্র পদবীধারী চণ্ডীচরণের কোনো বইয়ের সন্ধান আমরা পাই নি।

পুস্তকের অধ্যায়সূচী ও চিত্রসূচী না থাকায় পাঠকদের অসুবিধা হয়। মানচিত্রটি শেষ পৃষ্ঠার নীচে এমনভাবে চাপা পড়ে আছে যে এর অস্তিত্বের আভাস পাওয়া কঠিন।

শ্রীমতী ভট্টাচার্যের 'ঝাঁসীর রানী' বাঙলা জীবনীসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে।

আমরা পূর্বেই বলেছি সাতান্ন বিদ্রোহে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের কথা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইংরেজ পক্ষের দুই সৈনিকের আত্মচরিত পড়বার সুযোগ সম্প্রতি পাওয়া গেল। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবনচরিত' পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ। একটি দুষ্প্রাপ্য ভালো বাঙলা বই নবরূপে প্রকাশ করে প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। দুর্গাদাসের জন্ম হয় কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী কর্নাল নামক স্থানে। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ও দুর্গাদাস একই বছরে একই মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তার পর তিনি নিজের চেষ্টায় সেনাবাহিনীর চাকরি সংগ্রহ করেন। ১৮৫৩ সালে চাকরি উপলক্ষে ব্রহ্মদেশ যাত্রা থেকে শুরু করে আটান্ন সালে বিদ্রোহ সমাপ্তি পর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলী দুর্গাদাস তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

লেখক বিদ্রোহের সময় বেরিলিতে ছিলেন। এখানকার ঘটনাবলী ও সমাজচিত্র তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ব্রহ্মদেশের লোকদের আচার-ব্যবহারের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণও তিনি দিয়েছেন। সে সময় জিনিসপত্রের দাম কেমন ছিল, সিপাহী ও অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মীরা কত বেতন পেত, সেনাবিভাগে জীবনযাত্রা কেমন ছিল ইত্যাদি সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। সরকারের অনুগত কর্মচারী ছিলেন দুর্গাদাস। বিদ্রোহের প্রতি তাঁর যে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না সে কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহ দমন করবার জন্য যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, এবং যার বিবরণ অনেক ইংরেজ লেখকের বই থেকে জানা যায়, দুর্গাদাস সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে সেসব অত্যাচার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি।

দুর্গাদাস সাতান্ন বিদ্রোহের উপর কোনো নতুন আলোকপাত করেন নি। তিনি বিদ্রোহের পটভূমিকায় নিজের জীবনের কথা বলেছেন। তাঁর রচনাশৈলী চিত্তাকর্ষক। বেরিলিতে তাঁর বাড়িতে স্থানীয় লোকদের আড্ডা বসত। দুর্গাদাস তাঁর আত্মচরিত তেমনি বৈঠকী মেজাজে বলেছেন। মনে হয় বই পড়ছি না, কোনো নিপুণ কথকের মুখ থেকে গল্প শুনছি। অনেক টুকরো টুকরো রসসমৃদ্ধ কাহিনী একটি মালার

মত এই পুস্তকে গ্রথিত করা হয়েছে। দুর্গাদাসের 'আত্মচরিত' সাহিত্যমূল্যের জন্য চিরদিন সমাদর লাভ করবে। সাতান্ন বিদ্রোহের দলিল হিসাবে বিচার করলে এর মূল্য বেশি নয়।

একটি পুরনো বই নূতন করে জনপ্রিয়তা লাভ করবে কি না তা অনেকটা নির্ভর করে সম্পাদকের উপর। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। সামান্য যত্ন নিলে যেসব তথ্য নির্ভুলরূপে পরিবেশন করা যেত সেসব সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দেওয়া হয়েছে। ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদক বলেছেন, 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রে ১৩০৩ সাল পর্যন্ত 'আমার জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী'র প্রথম বঙ্গবাসী সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতে এই সম্পর্কে যে ভুল সংবাদ দেওয়া হয়েছিল সম্পাদক নির্বিচারে তার উপর নির্ভর করে ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ১৩০১ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'জন্মভূমি'র ৩২০ পৃষ্ঠায় দুর্গাদাসের জীবনচরিত সমাপ্ত হয়। ভূমিকার নবম পৃষ্ঠায় সম্পাদক বলেছেন বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কথা ঠিক নয়। বাঙলা ১৩৩১ এবং ইংরেজী ১৯২৪ সালে প্রথম সংস্করণ (বা বঙ্গবাসী-সংস্করণ) বেরিয়েছিল। দুর্গাদাসের মৃত্যুর তারিখ সম্পাদক বলেছেন, "১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন বা ১৩২১ সালের ১২ই শ্রাবণ…।" ৮ই জুন না হয়ে হবে ২৮শে জুন। বাঙলা মাসের ১২ তারিখ ইংরেজি মাসের ৮ই হতে পারে না।

সম্পাদক ভূমিকার দশম পৃষ্ঠায় বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানির ভাষাবিচার করিলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অপরাপর রচনাবলীর সহিত একটি সহজ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং আমার বিশ্বাস যে ইহা যোগেন্দ্রচন্দ্রেরই রচনা, বক্তা— দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।" একজনের নামে প্রচলিত বই অন্যের রচিত বলে ঘোষণা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সম্পাদকের প্রধান নজির বঙ্গবাসী-সংস্করণের প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি। সেখানে বলা হয়েছে যে, দুর্গাদাস তাঁর কাহিনী বলে যেতেন এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র তা লিখে নিতেন। সুতরাং এ বই যোগেন্দ্রচন্দ্রেরই রচনা। এই বিজ্ঞপ্তি যখন প্রকাশিত হয় তখন যোগেন্দ্রচন্দ্র ও দুর্গাদাস উভয়েই পরলোকগত। আর বঙ্গবাসী-সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিকারের যে তথ্যনিষ্ঠা ছিল না তা পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি। যোগেন্দ্রচন্দ্রের জীবনীকার ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুবলচন্দ্র মিত্র বা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি। 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' যেরূপ খ্যাতি অর্জন করেছিল তাতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই গ্রন্থ রচনায় কোনো হাত থাকলে অবশ্যই তা চরিতকাররা উল্লেখ করতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র কোথাও কোথাও হয়তো ভাষা সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও কর্মব্যস্ত সম্পাদকের পক্ষে এত বড় একটি বই লিখে অন্যের নামে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দুর্গাদাস নিজেই লিখেছেন, "তাঁহার (যোগেন্দ্রচন্দ্রের) কথায়, তাঁহার উপদেশে, তাঁহার আগ্রহে উৎসাহিত হইয়া, আমি অগত্যা আমার জীবনচরিত **লিখিতে বসিলাম** (পৃ ২)"। লেখা যোগেন্দ্রচন্দ্রের হলে তাঁর জীবিতকালে দুর্গাদাস এরূপ সুস্পষ্ট উক্তি কখনোই করতে পারতেন না।

সম্পাদক বলেছেন, আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের ভাষার সাদৃশ্য আছে। অভিজ্ঞ পাঠকের নিকট কিন্তু পার্থক্যটাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। দুর্গাদাসের ভাষা বৈঠকী মেজাজের ও লঘু চালের ; যোগেন্দ্রচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল এবং অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতির। স্থানাভাবের জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না।

দুর্গাদাসের জীবনচরিত একালের বাঙালী পাঠক-পাঠিকারও মনোরঞ্জন করতে যে সমর্থ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুবাদার সীতারামের আত্মচরিত 'সিপাহী থেকে সুবাদার' একটি ভিন্নশ্রেণীর জীবনীগ্রন্থ। দুর্গাদাসের রচনায় যে সাহিত্যরসের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে তা অনুপস্থিত। এক সরল জীবন-অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনাড়ম্বর স্বীকারোক্তিও যে কিরূপ চিত্তাকর্ষক হতে পারে আলোচ্য বইটি তা প্রমাণ করবে। ১৭৯৭ সালে অযোধ্যার তিলুই গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। কিছু লেখাপড়া শেখার পর মামার উৎসাহে তিনি সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন অল্পবয়সেই। গ্রাম থেকে শহরে আসবার পথে ঠগীর আক্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তখন সাহেবদের সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত ছিল। তাই প্রথম খুব সন্ত্রস্ত হয়েই চাকরির জন্য সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। ডাক্তার সাহেবের আদেশ পালনে সামান্য বিলম্ব হওয়ায় সাহেবের ছোট দুই ছেলে সীতারামকে "গাধা, শূয়োর" বলে গালি দিল। কর্মজীবনের প্রথমেই এই বিরূপ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সীতারামের প্রভুভক্তি আজীবন অটুট ছিল। প্রাণ বিপন্ন করে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ইংরেজের সেবা করবার পরও সীতারাম সাহেবদের মুখ থেকে "কালা শূয়োর" সম্বোধন শুনেছেন। সীতারাম সে জন্য ক্রুদ্ধ হন নি। আশ্চর্য নির্লিপ্ততার সঙ্গে নিরুত্তাপ ভাষায় সীতারাম এইসব অপমানের কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। যাঁর নিমক খাই, তাঁর গুণ গাই— সরলপ্রাণ সীতারামের এই ছিল অন্ধবিশ্বাস।

সীতারামের আত্মচরিতের শেষাংশে সাতান্ন বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। এর পূর্বে তিনি সেনাবাহিনীতে সিপাহীদের অবস্থা, ইংরেজ অফিসারদের ব্যবহার, নেপাল যুদ্ধ, পিণ্ডারী যুদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম আফগান যুদ্ধে তিনি বন্দী হয়েছিলেন। অনেকবার যুদ্ধে তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছে ; সেসব বর্ণনায় অ্যাডভেঞ্চারের রঙ পাওয়া যায়।

বিদ্রোহের সময় সীতারাম ছুটি নিয়ে বাড়ি ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজের অনুগত বলে তাঁকে বন্দী করেছিল। দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পান। ছুটির পরে যখন তিনি কাজে যোগদান করেন তখন তাঁর উপর ভার পড়ে বন্দী বিদ্রোহী সিপাহীদের গুলি করে হত্যা করবার। একবার বিদ্রোহী সিপাহীদের দলে ধরে আনা হল তাঁর বড়ছেলেকে। ছেলেকে গুলি করে হত্যা করবার নির্মম কর্তব্য থেকে তিনি মুক্তি পেলেন অনেক কেঁদে-কেটে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা তিনি করেন নি কিংবা পুত্রশোক তাঁকে ইংরেজ কর্তাদের উপর বীতশ্রদ্ধ করতে পারে নি। বিদ্রোহীর এরূপ শাস্তি হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা! নিয়মভঙ্গকারী পুত্র হলেও তিনি বিধান লঙ্ঘন করতে চাইবেন না।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সীতারাম ইংরেজ অফিসারদের ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। এই ব্যবহারের জন্যই সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এ কথাও বলেছেন। এই কারণে টাইমস্ পত্রিকা এ বইটিকে ভারতীয় বাহিনীর ইংরেজ অফিসারদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য বলে মন্তব্য করেছিলেন। শতাধিক বৎসর পূর্বেও যে সরকারী দপ্তরে ঘুষ ছাড়া কাজ হত না তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশীয় অফিসাররা সকলেই ঘুষ নিয়ে থাকে ; এর বড় কারণ অফিসারদের মাইনে বড় কম। বিদ্রোহের পরে ইংরেজ যে অত্যাচার করেছে সে সম্বন্ধে সীতারাম কিছুই বলেন নি। বরং অভিযোগ করেছেন যে, ইংরেজদের শাস্তি খুব লঘু বলেই দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করা যায় না।

সীতারামের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে কর্নেল নরগেট ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে বইটির তিন-চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকেই সীতারামের কাহিনীর জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। শ্রীশোভন বসু নরগেটের ইংরেজি থেকে বাঙলা অনুবাদ করেছেন। কিন্তু ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ

সেনের ভূমিকায় একবার মাত্র উল্লেখ ছাড়া ইংরেজি সংস্করণের উল্লেখ কোথাও নেই। নামপত্রে ইংরেজি সংস্করণের পূর্ণবিবরণ থাকলে ভালো হত।

শ্রীশোভন বসুর অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিষয়ানুগ। ইংরেজি সংস্করণ যথাযথরূপে অনুসরণ করেও যে রচনা আড়ষ্ট হয় নি এটা শোভন বাবুর কৃতিত্বের পরিচায়ক। সীতারামের আত্মচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এমন একটি বই এতদিন পরে অনূদিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখার সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করল।

পরিশেষে বাঙলা বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। ভবিষ্যতে বাঙলা বইয়ের উপর আমাদের আরো বেশি করে নির্ভর করতে হবে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙলা বই রেফারেন্সের উপযোগী করে তোলা উচিত। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য যে গ্রন্থপঞ্জী দিয়েছেন তা বর্ণানুক্রমিকতা অথবা বিষয়ানুক্রমিতা অনুসারে সাজানো হয় নি। বইয়ের নামগুলি যেমন মনে এসেছে লিখে গেছেন। শুধু লেখক ও বইয়ের নাম দিলেই বই চিহ্নিত করা সবসময় সহজ হয় না। প্রকাশের স্থান ও তারিখটা দিলে এদিক থেকে সুবিধা হবে। নির্ঘণ্ট না থাকলে প্রয়োজনের সময় কোনো প্রসঙ্গ খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে পড়ে। পুস্তকের শেষে একটি নির্ঘণ্ট থাকলে বইয়ের ব্যাবহারিক মূল্য অনেক বেড়ে যায়। উপরোক্ত বইগুলির একটিতেও নির্ঘণ্ট নেই।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চাপাটি ও পদ্ম। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। ডি এম লাইব্রেরি, কলিকাতা ৬। দাম তিন টাকা।

নটী। শ্রীমতীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৯। দাম সাড়ে তিন টাকা।

যা দেখেছি যা শুনেছি। শশিশেখর বসু। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

গত বছর সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন এ হল প্রকৃত বিপ্লব, যাতে জনচিত্ত উন্মথিত হয়ে যায়, দেশময় অভ্যুত্থান ঘটে; আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ওর মধ্যে বিপ্লবের চেহারা নেই, ওটা হল একটা বিদ্রোহ মাত্র, তার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো ছিল না, অতীতেই নিবদ্ধ ছিল। এক হিসেবে হয়তো শেষের কথাটাই সত্য। কেননা এ পর্যন্ত যেসব তথ্যপ্রমাণাদি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে মনে হয় সারা দেশের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় নি। বিশেষতঃ বাঙালীসমাজ তখন ইংরেজের সঙ্গে গ্রথিত, তারা বিদ্রোহকে ভালো চোখে অনেক সময়ই দেখে নি। সে হিসেবে কেউ কেউ যা বলেছেন মনে হয় সেই কথাই সত্য— এটা হল ক্ষয়গ্রস্ত মোগল আমলের শেষ রাষ্ট্রিক চিত্তবিকার। অবশ্য তাতে এর মহিমা খর্ব হয় না, কেননা কোনো বিদ্রোহও, আমার মতে, তাৎপর্যহীন ও নিষ্ফল হয় না। ইতিহাস এগিয়ে চলার পথে এগুলি এক-একটি স্তম্ভ — এগুলি না হলে হয়তো ভবিষ্যতের পথ রচনাই হত না।

কিন্তু ইতিহাসের এ কথা থাক্। সে তর্ক যাই হোক এ কথা মেনে নিতেই হবে সিপাহীবিদ্রোহ ভারতবর্ষকে খুব জোর একটা নাড়া দিয়েছিল। তার ফলে রাষ্ট্রিক অদলবদল যা-ই হোক-না কেন ওর

আঘাত নানা শহর নানা গ্রাম এবং নানা মানুষের জীবনে তরঙ্গ তুলেছিল বই-কি। তার দলিল ইতিহাস খুঁজলে হয়তো বেশি মিলবে না, কিছুটা স্মৃতিকথায় কিছুটা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় কিছুটা লোকমুখে ছড়িয়ে আছে। সেগুলি সাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ। সেই উপকরণ অবলম্বন করে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় তারই প্রমাণ হল আলোচ্য গ্রন্থগুলি।

শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর 'চাপাটি ও পদ্ম' বারোটি গল্পের সমষ্টি। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে কিছু সমসাময়িক গ্রন্থ আছে তার মধ্যে ছোট ছোট নানা ঘটনার উল্লেখ আছে। সেই গল্পের মানবিক উপকরণ ও সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট, সুদক্ষ শিল্পীর হাতে সেই গল্পগুলি সার্থক সাহিত্যরূপ ধারণ করেছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই গল্পগুলির পটভূমিকা সিপাহীবিদ্রোহ হলেও এগুলির মধ্যে গল্পের সুর অক্ষুণ্ণ রয়েছে— ইতিহাস সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে নি। যেমন "নানাসাহেব" গল্পটি। নানাকে ধরবার জন্য ইংরেজ ব্যগ্র; দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সকলেই নানা বলে ধরা দিতে চায় জেলখানায় বিনাব্যয়ে আহার-বাসস্থান সংগ্রহ করবার জন্য। নানাধরনের লোক আসছে— সন্ন্যাসী, কৃষক, সাধারণ লোক। কিন্তু গোয়েন্দা, ইংরেজের বিশ্বস্ত গোয়েন্দা ইসাক, কাউকেও সনাক্ত করছে না, কাজেই তারা ছাড়া পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। বিচিত্র লোক এই ইসাক। সে হল মামুদের হোস্টেলের হেড-ওয়েটার, নানাকে সে দেখেছে, কাজেই সে-ই গোয়েন্দার কাজ করছে। এইভাবে চলতে চলতে একদিন তার হোটেলে এলেন আজিমুল্লা খাঁ, নানার সহকর্মী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জুবেদি, যিনি কানপুরের বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের আসল কর্ত্রী। ইসাক তাঁদের ছদ্মবেশ ভেদ করে নাম ধরে কুর্নিশ করলে। "পুরুষ ও রমণী যুগপৎ শুধাইল, কিন্তু তুমি কে? এবার ইসাক তাহাদের কাছে আসিয়া, কণ্ঠের স্বর অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া··মৃদুস্বরে বলিল— আমিই নানাসাহেব।" নাটকীয়তায়, ঘটনার সংঘাতে এই গল্পটি ঝক্‌মক্ করছে, ঐতিহাসিক পটভূমিকা এর সঙ্গে অত্যন্ত উপযুক্ত ভাবে মিশে গিয়েছে। এই বইএর প্রত্যেকটি গল্পেরই এই গুণ। প্রসঙ্গতঃ দুই-এক জায়গায় প্রমথবাবু ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে সেকালের বাঙালীর রাজভক্তি ও ভীরুতার উপর কটাক্ষ করেছেন, সে কটাক্ষ আমাদের পাওনা। এই ধরণের ইতিহাসাশ্রিত রচনায় প্রমথবাবু সিদ্ধহস্ত— তাঁর সেই পাকা হাতের ছাপ এই বইখানির ছত্রে ছত্রে।

শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য বেশি বই লেখেন নি, সেইজন্যই তাঁর 'নটী' বইখানি পড়ে একাধারে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে হয়। এই বইটি গল্পসমষ্টি নয়, উপন্যাস। এবং সত্যকারের উপন্যাস— কেবল বড় গল্প নয়। একটি ক্ষীণ ঘটনাকে অবলম্বন করে অনেক পাতা লেখা যেতে পারে বটে, কিন্তু তাতে বড় জোর বড় গল্প হতে পারে, উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের প্রাণবস্তু হল ঘনজমাট বুনোনি, ঘটনার সংঘাত। তার উপর ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লিখতে গেলে ইতিহাসকে যথোচিত পরিমাণে আনতে অবশ্যই হবে, কিন্তু মানবকাহিনী ইতিহাসে চাপা পড়লে চলবে না। 'নটী' বইটিতে এই সব-ক'টি গুণ প্রভূত পরিমাণেই আছে। লেখিকা কোনো রাজারাজড়ার কাহিনী লেখেন নি। মোগল যুগ তখন দ্রুত ক্ষীয়মাণ, ছোট ছোট রাজারা ডাকাতের দল পোষে, ঠগী লুঠেরার উৎপাতে দেশ ভরতি, অন্য দিকে ইংরেজ কোম্পানির রাজত্ব ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাদের ঘাঁটি পড়ছে দেশের সর্বত্র, রেসিডেন্টের

ভয়ে রাজারা কম্পমান, তাদের রিসালা মার্চ করে চলে বাদশাহী সড়ক ধরে দেশের সর্বত্র। ওদিকে রাজোয়াড়ায় বিক্রম নেই তবু বিলাস আছে, মুজরো বসে, শিশমহলে নাচ হয়। এমনি এক নর্তকী মোতি। তার মা বহুবল্লভাদের নিয়ম ভেঙে একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, হতাশায় জীবনক্ষয় করে তানসেনের মক্‌বরায় জীবন ত্যাগ করল শেষে। তারই মেয়ে মোতি। বাঁধনে পড়া তার কুলধর্ম নয়। তবু সে বাঁধনে পড়ল একদিন। তরুণ অশ্বারোহী খুদাবক্সের বাঁধনে পড়ল সে। খুদাবক্সের জীবনকাহিনী বিচিত্র। তার বাপদাদারা লড়ে এসেছে, গ্রামে হিন্দু মুসলমান ঝগড়া করেছে রক্তের উন্মাদনায়, প্রাণও হারিয়েছে সেইভাবে। সেই বংশের ছেলে খুদাবক্স। কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত পালাতে হল। একবার এ আশ্রয়, একবার অন্য আশ্রয় করতে করতে শেষকালে তাদের চরম মিলন হল মৃত্যুর কিনারায়। সিপাহী-বিদ্রোহে কোম্পানির সৈন্যের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে। এই উদ্দাম বাঁধন-ছেঁড়া দুই তরণী সেই বিদ্রোহ-আবর্তিত তরঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে— এই বইটি সেই কাহিনীর অপূর্ব শিল্পরূপ।

শ্রীযুত শশিশেখর বসুর 'যা দেখেছি যা শুনেছি' অন্য ধরণের বই। হালকা মজলিশজমানো গল্প, কিন্তু একেবারে মর্মভেদী। মধ্যে মধ্যে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত আছে, হাসির অনবদ্য উপকরণ আছে। এর মধ্যে কয়েকটি গল্প আছে মিউটিনি প্রসঙ্গে। লেখক বৃদ্ধদের কাছে যেসব কাহিনী শুনেছিলেন সেইসব গল্প। প্রত্যেকটিই সার্থক।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

আলোচনা

ব'কারের আকার-প্রকার

বিশ্বভারতী পত্রিকার গত বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীঅমলেন্দু সেন 'সংসদ্ বাঙলা অভিধান' নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা একই কালে শিক্ষাপ্রদ আর মনোজ্ঞ। এই আলোচনায় আর-একটি প্রসঙ্গ যোগ ক'রে আমরা বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজ ও উক্ত অভিধানের প্রণেতা-প্রকাশক উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এই ক্ষুদ্রায়তন অভিধানে সংকলন ও প্রকাশ -পারিপাট্যে 'প্রায় চল্লিশ হাজার শব্দের পদ, অর্থ, প্রয়োগের উদাহরণ' শুধু নয়, মোটামুটি ব্যুৎপত্তি পর্যন্ত দেখিয়ে, বিশেষ সদ্‌বিবেচনা ও কুশলতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আগামী সংস্করণে আর-একটি কাজ করলে, বাংলাভাষা-শিক্ষার্থীদের আরও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা হবে। বাংলায় অন্তস্থ ও বর্গীয় দুরকম ব'এর উচ্চারণ নেই— সুতরাং অভিধানে দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায় না থাকাই সংগত, অথচ শব্দের অর্থ শুধু নয়, সর্বদাই শব্দের ব্যুৎপত্তিটিও না জানা গেলে শব্দব্যবহার সুসাধ্য হয় না; বিশেষতঃ তৎসম শব্দে 'ব' নিয়ে অসুবিধা ভোগ করেন অপণ্ডিত অধিকাংশ বাঙালি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিত ব্যক্তি। শব্দের প্রাথমিক 'ব' চেনবার সম্পর্কে অধ্যায়ের সূচনায় (পৃ ৫২৯) প্রয়োজনীয় মন্তব্য অবশ্যই আছে— কিন্তু সে মন্তব্য সর্বদা মনে রেখে সকলে যে ব-সূচিত যে-কোনো শব্দ দেখবেন এটা আশা করা যায় না। তা ছাড়া শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত সকলেরই পক্ষে এক নজরেই যাতে

শব্দব্যুৎপত্তি লাভ হয়, সদাশয় অভিধানকারের এই চেষ্টা থাকাই সংগত। তা হলে ব-অধ্যায়ের শব্দগুলির ব, * ব, ৺ ব, এরূপ বিচিত্র চেহারায় সূচনা না হয়ে, অভিধানের বর্তমান শব্দবিন্যাসপরম্পরা একেবারে অক্ষুণ্ণ রেখেও (অবশ্য, নূতন শব্দ-আহরণ বা পুরাতন-বর্জন ভিন্ন কথা) ব এবং ৱ এরূপ দুটি অক্ষর ব্যবহার করাই সব চেয়ে সুবিধাজনক। এই উপলক্ষে আরও কিছু করা যায় এবং করা উচিত যা অভিধানকার বা প্রকাশকের পরিশ্রম বাড়ালেও (উদ্যমে এবং অধ্যবসায়ে তাঁদের কৃপণতা আছে বা থাকবে এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই)— ভাষা-শিক্ষার পক্ষে আরও প্রচুর পরিমাণেই অনুকূল হবে। সমুদয় অভিধানে যে-কোনো শব্দের আদ্যন্তে যেখানে যে ব বা ৱ আছে সেগুলিকে যথাবিধি ব এবং ৱ -ভেদে নির্দিষ্ট করে দেওয়াই প্রশস্ত। বাঙালির উচ্চারণে কোনো ভেদ না থাকলেও, য এবং জ চেনবার অসুবিধা নেই আকারের ভেদ-বশতঃ। (একমাত্র য বা জ অক্ষর থাকলেও বলবার কিছু ছিল কি ?) এতে ক'রেই য বা জ -বিশিষ্ট তৎসম শব্দের অন্তত ব্যুৎপত্তি জানবার কোথাও কোনো অসুবিধা হয় না। অন্তস্থ এবং বর্গীয় ব সম্পর্কেও অনুরূপ সুবিধা বা সেই সুবিধালাভের অনুকূল ঈষৎ একটু ইশারা অবশ্যই দাবি করা চলে— প্রচলিত শব্দবিন্যাসে কিছুমাত্র ওলট-পালট না ঘটিয়ে। শিক্ষার্থীর পক্ষে এক নজরেই জানা প্রয়োজন— স্বয়ম্বর, কিম্বা, বারম্বার প্রভৃতি বাংলাসাহিত্যের অতিপ্রচলিত প্রয়োগসমূহে পণ্ডিতমশায় কেনই বা বিরূপ। প্রবীণ বকিল, ভাবুক বার্ড্স্বার্থ, বরেণ্য বুড্‌বরুন্‌ (সাহিত্যে এরূপ বানান মাঝে মাঝে চোখে পড়ে) এঁরাই বা কোথাকার কোন্ জন! ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে, কেবল তৎসম শব্দ নয়, হিন্দি উর্দু বিদেশীয় নানা শব্দের নানা 'ব' নিয়ে বাঙালি বক্তা শ্রোতা ও পাঠকের সমস্যার শেষ নেই— বাংলা অভিধান সেই সমস্যার কতকটা সমাধান সহজেই নয়নগোচর ও জ্ঞানগোচর ক'রে দিতে পারেন।

ৱ অক্ষরটি সম্ভবতঃ বাংলা লাইনো বর্ণযোজন-যন্ত্রেও বর্তমান। কারণ, অসমীয়া সাহিত্যও আশা করি ঐ যন্ত্র-সাহায্যেই সাকার হয়ে থাকে। অসমীয়া ভাষায় 'ৱ' যে অক্ষর হিসাবেই গণ্য হোক, বাংলায় ঐ ৱ অভীষ্ট বর্গীয় অক্ষররূপে গ্রহণ করলে হিন্দি বা সংস্কৃত ব্যবহারবিধির সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। (শিক্ষার সম্পূর্ণতা-অভিলাষে সংস্কৃত এবং হিন্দি অনেককেই শিখতে হবে, তার আর সন্দেহ কী।) ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার জন্য বিশেষ-বাঞ্ছনীয় এক-লিপি-গ্রহণ যতদিন না হচ্ছে, (বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থের কথা আপাতত থাক্) বাংলা অভিধানে এই অধিকন্তু ব্যবস্থা বা ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ থাকলে, বাংলা-শিক্ষার্থী-মাত্রেই বিশেষ উপকৃত হবেন মনে হয়।

কানাই সামন্ত

স্বরলিপি

শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি,
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি ॥
কত দুঃখে কত দূরে দূরে   আঁধারসাগর ঘুরে ঘুরে
সোনার তরী তীরে এল ভাসি।
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি ॥
ওগো পুরবালা,
আনো সাজিয়ে বরণডালা।
যুগলমিলনমহোৎসবে   শুভ শঙ্খরবে
বসন্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি।
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[ধা -া]
II সা -ধা ধা । -ণা ধা -া I ধা -া ধা । -ণা ধা -পা I
শু ০ ভ ০ মি ০ ল ০ ন ০ ল ০

I পা -া -মা । পা -া -া I মপা -মা পা । -া পা -মা I
গ ০ ০ নে ০ ০ বা ০ ০ জু ক্ বাঁ ০

I পা -র্সা -া । -ণা -া -া I ধা -া ধা । -ণা ধা -া I
শি ০ ০ ০ ০ ০ মে ০ ঘ ০ মু ক্

I পা -া পধা । -া মা -া I পা -া -া । -া -া -া I
ত ০ গ ০ গ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া পা । -া পমা -মপমা I মা -জ্ঞা -া । -া -া -া I [ ] I
জা ০ গু ক্ হা ০ ০ সি ০ ০ ০ ০ ০

II মা -া পা । -া ণপা -া I না -া না । -া না -া I
ক ০ ত ০ দুঃ ০ ক্ খে ০ ক ০ ত ০

I না -া র্সা । -র্রা না -া I র্সা -া -া । -া -া -া I
দূ ॰ রে ॰ দূ ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পর্সা -া র্সা । -া র্সা -া I পর্সা -া র্সা । -া র্সা -র্রা I
আঁ॰ ॰ ধা ॰ র ॰ সা ॰ গ ॰ র ॰

I না -া র্সা । -র্রা র্সা -র্রা I র্সা -া -ণা । -া -া -া I
ঘু ॰ রে ॰ ঘু ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I ধা -া ধা । -ণা ধা -া I ণা -া ধা । -া পা -ধা I
সো ॰ না র্ ত ॰ রী ॰ তী ॰ রে ॰

I মা -া পা । -ধা পমা -ধপমা I মা -জ্ঞা -া । -া -া -া I
এ ॰ ল ॰ ভা ॰॰ সি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I জ্ঞা -া জ্ঞা । -মা মা -া I পমা -া রা । -া সা -া I
পূ র্ ণি ॰ মা ॰ আ ॰ কা ॰ শে ॰

I রা -া সা । -া ন্‌া -া I সা -া -া । মা মা -া I
জা ॰ গু কৃ হা ॰ সি ॰ ॰ ও গো ॰

I মা -া পা । -ধা মা -া I পা -া -া । রা রা -মা I
পূ ॰ র ॰ বা ॰ লা ॰ ॰ ও গো ॰

I মা -া পা । -ধা মা -া I পা -া -া । পা পা -ধা I
পূ ॰ র ॰ বা ॰ লা ॰ ॰ আ নো ॰

I মা -ণা ণা । -া ণা -া I ণধা -া ধা । -পা পা -া I
সা ॰ জি ॰ য়ে ॰ ব ॰ র ॰ ণ ॰

I মা -া -ধপা । মা -জ্ঞা -া I -া -া -া । রা সা -া I
ডা ॰ ॰ লা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ও গো ॰

I রা -া রা । -মজ্ঞা রা -া I সা -া -া । -া -া -া I
পু ০ র ০ বা ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া পা । -া পা -া I ণা -পা না । -া না -া I
যু ০ গ ০ ল ০ মি ০ ল ০ ন ০

I না -া র্সা । -া না -া I র্সা -া -া । র্সা র্সা -া I
ম ০ হো ৎ স ০ বে ০ ০ শু ভ ০

I র্সা -না র্সা । -না র্সা -না I র্সা -র্রা -া । -না -া -া I
শ ঙ্ খ ০ র ০ বে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা । -না র্সা -া I না -া র্সা । -র্রা র্রা -া I
ব ০ স ন্ তে র্ আ ০ ন ন্ দ ০

I র্সা -া র্সা । -ণা ণা -ধা I ধা -ণা -া । -পা -া -া I
দা ও উ চ্ ছ্বা ০ ০ ০ সি ০ ০ ০

I মা -া পা । -ণা ণা -া I পধা -া ধা । -পা পা -া I
পূ র্ ণি ০ মা ০ আ ০ কা ০ শে ০

I মা -া পা । -ধা পমা -ধপমা I মা -জ্ঞা -া । -া -া -া II [ ] II
জা ০ গু ক্ হা ০০ সি ০ ০ ০ ০ ০

এই গানটি ২।৪ ছন্দেও গাওয়া চলে

১৭ নভেম্বর ১৯২৫ অঙ্কিত চিত্র
চিত্রাধিকারী বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

"অরূপরশ্মির অন্বেষণে"
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৮৮০ শক

জয়যাত্রা ১৮৯৬

অবলা বসু

ছেলেবেলা হইতেই ইচ্ছা ছিল, আমার এই সামান্য জীবন যেন দেশসেবায় নিয়োগ করিতে পারি। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার কোনো গুণই আমার ছিল না, কিন্তু দেবতার আশীর্বাদে আমার কল্পনার অতীত সার্থকতা জীবনে লাভ করিয়াছি। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশসেবার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে কথা বলিতে গেলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই বৎসরে আচার্য বসু মহাশয় অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিকসমাজে প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে আহূত হন। তাঁহার সহিত আমিও যাই ; এই আমার প্রথম ইয়োরোপ-যাত্রা। ইহার পর পাঁচ-ছয়বার তাঁহার সহিত পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। আমার ভ্রমণকালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নানাভাবে ভাঙ্গিয়াছে ও গড়িয়াছে, এক আমার বয়সেই ইয়োরোপে কত পরিবর্তন দেখিলাম। এ দেশে একটি মানুষের জীবনে এমন বিপুল পরিবর্তন কখনও দেখা যায় না।

বিলাতে পৌছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম। তাহার মধ্যে সার্ জে. জে. টমসন, অলিভার লজ ও লর্ড কেল্‌ভিন ছিলেন। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে সভয়ে উপরের গ্যালারিতে অন্যান্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসিলাম। এতকাল তো ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহুকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে, আজ বাঙ্গালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তার পর যে কি হইল সে-সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্যের আবিষ্ক্রিয়া-সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম ইনিই অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন। ইনি অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার গ্লাসগোর ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারূপে আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন। তাঁহারা দুজনেই আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাঁহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।

ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নানাস্থানে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলাম। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডাক্তার গ্ল্যাডস্টোনের বাড়িতে এইরূপ নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া ভোজনসভাতে বসিয়া শুনিলাম, একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক— যাঁহাকে ভারতসচিব বিশেষজ্ঞ-স্বরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন— পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিতেছেন, "এই 'চন্দ্র বসু' লোকটি যাহার কথা আজকাল লোকে এত বলিতেছে সে কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! তাহাদিগকে ছোটো টেস্ট টিউব দিয়া পরীক্ষা করাইয়া তাহার স্থানে বড় টেস্ট টিউব দিলে আর তাহারা সেই পরীক্ষা

করিতে পারে না— ভারতবাসী নকলে মজবুত, কিন্তু বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া হাতে-কলমে ব্যবহার তো কখনো করিতে পারে না!" পাশের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র‍্যাম্‌সে। তিনি বলিলেন— "চুপ করো— তুমি কিছুই জান না— ভারতবাসী বহু শতাব্দীর সাধনাতে তাহাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করিয়াছে যে চিন্তাশীলতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহুদিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগ্য যে ইহারা এ পর্যন্ত নিজের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে নাই। যখন শিখিবে তখন ব্রিটনের আধিপত্য চলিয়া যাইবে। তবে এই 'চন্দ্র বসু' দৈবক্রমে এইরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই।"· ·

ইহার পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্য আচার্য নিমন্ত্রিত হন। এইস্থানে বক্তৃতা দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন। তরল গ্যাসের (liquid gas) আবিষ্কর্তা প্রসিদ্ধ Sir James Dewar তখন ইহার কর্তা ছিলেন। তিনি রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনেরই উপরের তলাতে বাস করিতেন। সেদিন আমাদের সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বহু সম্মানিত লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই প্রথম আমার বৈজ্ঞানিক সামাজিক সম্মিলনে নিমন্ত্রণ, তাহার ফলে অনেকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। বঙ্গনারীর এই প্রথম বৈজ্ঞানিক জগতে প্রবেশ। সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরাও সকলেই বুঝি খুব বিদুষী। এইসব নিমন্ত্রণে গিয়া সে ধারণা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল— তবে বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরা যে খুবই পতিপ্রাণা ও পতির সেবাতে নিযুক্তা ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি। লর্ড কেল্‌ভিন নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধান ছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সর্বদাই তাঁহার সেবা করিতেন।

রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের প্রবর্তক আদিগুরু ডেভি ও ফ্যারাডের যন্ত্রপাতি সেখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। শুক্রবার দিন তাহার প্রদর্শনী হয় এবং যদি সেখানে কেহ কোনো নূতন কিছু দেখাইতে চান তাহাও শুক্রবার দিন দেখানো হয়। আমরা আহারান্তে এইসব দেখিয়া বক্তৃতা-গৃহে গেলাম। সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয়পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই, কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে ৯টা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা-অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। লর্ড র‍্যালে বলিলেন যে এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনো হয় নাই— দু-একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিসটা বাস্তব; এ যেন মায়াজাল। আমি যখন আচার্যের সহিত ইংলণ্ডে যাই তখন জড়পিণ্ডবৎ ছিলাম, আজকালকার মেয়েদের মতন চালাক-চতুর ছিলাম না, একটি কথাও বলিতে পারিতাম না, কিন্তু এইসব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোনো স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল।

১৩৩২ বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবীভ্রমণ প্রবন্ধ হইতে সংকলিত

17 th May '91 [1901]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি নানাজনের কাছ থেকে নানারকম খবর পাইয়া থাকিবেন, আমারও সামান্য কিছু বক্তব্য আছে— তাহা ভাল করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার শক্তি যদিও আমার নাই তথাপি আমার সামান্য বক্তব্য সামান্য ভাষাতে আপনার নিকট উপস্থিত করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে না। শুক্রবার দিন যদি বক্তৃতাতে আপনি উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া কেন আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। সেদিন আমার মনে হইল আমি স্ত্রীজাতির মধ্যে এমন কি পুণ্য করিয়াছিলাম! দীনা ভারতী বিজয়মাল্যে যে পুরুষরত্নকে শোভিত করিয়াছেন কি পুণ্যবলে আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী হইলাম!

আমার কেবল তাহাই মনে হইতেছিল। নিজের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আহ্লাদ ও বিস্ময় যুগপৎ উদয় হইতেছিল। আপনিও যদি সেই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে এই ক্ষুদ্র ভারতবর্ষীয়ের নির্ভীক সত্য প্রচার দেখিতেন তাহা হইলে স্তম্ভিত হইতেন। সেদিন আর লোকে কি বলিবে সে ভয় ছিল না, "আমি সত্য লইয়া আসিয়াছি তোমরা শ্রবণ কর" এই ভাবই প্রকাশ হইতেছিল।

এই আমার বক্তব্য—

প্রণতা
শ্রীঅবলা বসু

ওঁ

কলিকাতা
৪ জুন ১৯০১

মাননীয়াসু

আপনি ধন্য। আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য হইয়াছি। আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছি না— আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি।

বন্ধুকে তাঁহার কর্ম্মসমাধার পূর্ব্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাঁহার জীবন নিরর্থক হইবে। আমরা তাঁহাকে য়ুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব— তিনি যেন তাঁহার এই সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন।

আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিয়াছেন— সেইখানে, স্বদেশের হৃদয়মণ্ডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক্ !

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লণ্ডন ১৭ই মে ১৯০১

বন্ধু

তুমি আমার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত আছ। বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্য্যস্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics, এবং Chemistryর দুরূহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব। আর experiment-গুলিও অতি কঠিন, কতকগুলি কল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল। তার পর একটি ঘটনা হইল সে কথা স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন দু প্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়া ছিলাম, আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল, তোমাদের এতদিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নির্ম্মূল হইবে এ কথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য্য unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ এক ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল 'বরণ করিতে আসিয়াছি' তার পর মুহূর্ত্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

জানি না কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পরদিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তার পর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না; যাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্ত্তে পরিস্ফুট হইল।· ·

তোমার
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

ওঁ

৪ জুন [১৯০১]

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অন্য

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জন-কোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্র মাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্য চন্দ্র পুষ্প পত্র পশু পক্ষী ধূলায় প্রস্তরে,—
একটি জাগ্রত প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপ রশ্মির অন্বেষণে
লোক লোকান্তের অন্তরালে,— যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে!

হে তপস্বি, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদ-গর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায় শ্রদ্ধায় ধ্যানে,— বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে— বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক্! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।· ·

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৮৯৬-৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার বিলাতে প্রচার করেন, অবলা বসু মহোদয়ার প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

১৯০১ সালে ১০ মে তারিখে রয়াল ইনস্টিটিউশনে শুক্রবাসরীয় আলোচনাসভায় জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবে সাড়া সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করেন; বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট উহা বিশেষ সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করে। ঐ সভার পর অবলা বসু মহোদয়া ও জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরসহ সেগুলি প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথের ‘চিঠিপত্র’ ষষ্ঠ খণ্ড হইতে সংকলিত হইল।

জগদীশচন্দ্র বসু

১

১৯এ নবেম্বর ১৯১৩

বন্ধু

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম্ম তোমার চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

২

দার্জ্জিলিং
২।৬।১৯১৯

বন্ধু তুমি ধন্য।

তোমার
জগদীশ

৩

কলিকাতা
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

বন্ধু

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার
জগদীশ

৪

২১ এপ্রিল ১৯২৬
Artillery Mansions Hotel
Westminster

বন্ধু

Nervous Mechanism in Plants তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম। এই সপ্তাহেই তোমার নিকট পুস্তক যাইবে।

কেমন আছ জানাইও।

তোমার
জগদীশ

৫

Bose Institute
93, Upper Circular Road
Calcutta, the 22d Oct., 1928

বন্ধু

কয়দিন হইল কলিকাতা আসিয়াছি। সতীশ দাস মৃত্যুমুখে, আর দু চারদিন। তোমার বধূ [ঠাকুরাণী] এবং আমি যে কিরূপ দুশ্চিন্তায় আছি তাহা বুঝিতে পারিবে। আমাদের যে দু চারিদিন বাকী আছে তাহারই প্রকৃত পন্থা বাহির করিতে হইবে।

তুমি যে মনের কষ্টে আছ তাহাতে আমি তোমার বিষয় সর্ব্বদা ভাবিতেছি। ত্রিশ বৎসর হইতে আমরা সহযোগী এবং সহকর্ম্মী। তোমার কষ্ট আমাকে আঘাত করে। যদি কোন রকমে তোমার অভীষ্ট সাধনে সহায় হইতে পারি, তাহা হইলে আমি সফলকাম হইব।

তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বর রহিবে। আর যে বেশী তোমার দান তাহা অযাচিত। সে কার্য্যে আমি তোমার চিরসহায় মনে করিও।

আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মধ্যেও বড় কাজ হইয়াছে এবং হইবে। এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।

১লা ডিসেম্বরে আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব, সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে।

শেষ দিন পর্য্যন্তও যে সাধনা আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতেই জীবন অবসান করিব। ম্রিয়মাণ হইব না। অন্ততঃ আমরা দুজন একে অন্যের ভার বহন করিব। এর চেয়ে আর বেশী কি হইতে পারে।

তোমার
জগদীশ

আমার লেখা ও বানান বুঝিতে পার কিনা এ আশঙ্কায় সর্ব্বদা লিখিতে পারি না

৬

দার্জ্জিলিং ১০ই অক্ট ১৯৩১

বন্ধু

তোমার বনবাণী পাইয়া সুখী হইলাম। বইখানি সুন্দর হইয়াছে। তোমার বাণী যেন বহুদিন বহু লোকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় ইহাই আকাঙ্ক্ষা করি।

আমি নানা কারণে ম্রিয়মাণ আছি। সরকার হইতে খবর আসিয়াছে যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা কাটা যাইবে।— কারণ তাহা সখের ব্যাপার মাত্র। আমার অনেক করিবার ছিল তাহা এখন অসম্ভবপ্রায় হইল।

তোমার

জগদীশ

৭

দার্জ্জিলিং

১১ জুলাই ১৯৩২

বন্ধু

তোমার পারস্যবিজয় কাহিনী আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। দেখা হইলে সব কথা শুনিব। এই দুর্দ্দিনে আমরা সর্ব্বপ্রকারেই পরাহত হইতেছি, এর মধ্যে এই জ্যোতিরেখা অন্ধকারে আলো।

তুমি এখন বহুরূপে আহত হইতেছ, মনে করিও আমি তোমার দুঃখে দুঃখী। আমিও সম্প্রতি ভগিনীস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। মীরার আকস্মিক দুঃখে একান্ত পীড়িত হইলাম।

তোমার

জগদীশ

৮

কলিকাতা

২২এ সেপ্টে ১৯৩৩

বন্ধু

তোমার জন্য কিরূপ চিন্তিত আছি তাহা জানাইতে পারিতেছি না। এখন অনেক বিষয় হইতে ছুটী নিতে হইবে। তোমার স্বাস্থ্য এখন চিন্তার কারণ হইয়াছে। সাবধানে থাকিলে এখনও অনেকদিন চলিবে, নতুবা কোন দিন কি হয় এই শঙ্কা। দার্জ্জিলিং আসিও, আমরা আজই সেখানে যাইতেছি।

তোমার

জগদীশ

১৯ই নভেম্বর ১৯১৩

বন্ধু

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যে ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। এতকাল পরে ইচ্ছা পূর্ণ হইল। দেবতা এই বরমাল্য আজ কি করিয়া তোমার উত্তমাঙ্গে পরাইল? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম্ম তোমার চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি-উপলক্ষে

৯

২৫এ বৈশাখ ১৩৩৩

বন্ধু

জগতের কল্যাণ জন্য তোমার অবিশ্রান্ত চেষ্টা বহু বৎসর ধরিয়া যেন ফলবতী হয় আজ এই প্রার্থনা করিতেছি।

তোমার বিশ্বভারতীর কোন অনুষ্ঠানের সাহায্যার্থে ৫০০৲ টাকা পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবে।

তোমার
জগদীশ

পত্রপরিচয়

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর অধিকাংশ ১৩৩৩ সালে প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ) প্রকাশিত হইয়াছিল। যে-সকল পত্র প্রবাসীতে অপ্রকাশিত ছিল, বর্তমান সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হইল। কয়েকখানি চিঠি ইতিপূর্বে প্রকাশিত।

পত্র ১ রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে লিখিত। সংবাদ পাইয়া জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহাও নিম্নে মুদ্রিত হইল—

Recd. at—16H. 50 M
Calcutta S Date 15 [Novembe

To

Rabindranath Tagore
Bolpur E. I
I am rejoicing dear friend
Jaggdish
[15th November 1913]

পত্র ২ রবীন্দ্রনাথের নাইট পদবীত্যাগ উপলক্ষে লিখিত।

পত্র ৩ জগদীশচন্দ্র-রচিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ উপলক্ষে লিখিত।

পত্র ৪ জগদীশচন্দ্র-লিখিত এই পুস্তকের উৎসর্গপত্র—

To | My Life-Long Friend | Rabindra Nath Tagore

পত্র ৫ সতীশ দাস—সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবী সতীশরঞ্জন দাস, অবলা বসুর ভ্রাতা।

৫ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিপূর্তির উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা এই সংখ্যার অন্যত্র পুনর্মুদ্রিত হইল। ৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত বনবাণী গ্রন্থে কবিতাটি মুদ্রিত আছে।

পত্র ৭ পারস্যবিজয় কাহিনী—১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের পারস্যভ্রমণকথা।

৩ সংখ্যক পত্র ব্যতীত অন্যান্য চিঠি, ও টেলিগ্রামটি, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

জড়জগৎ উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণীজগৎ

জগদীশচন্দ্র বসু

সকলেই মনে করেন যে, জড় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর বর্তমান। তবে দৃষ্ট-জগত কি কেনো নিয়মে আবদ্ধ নহে? এরূপও হইতে পারে যে, আপাততঃ বৈষম্যের মধ্যে কোনো মূলগত একত্বের বন্ধন আছে।

আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই সমস্যা আমার মন অধিকার করিয়াছিল। আমি তখন আকাশের বিদ্যুৎতরঙ্গ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এবং দূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক নূতন কল আবিষ্কার ও নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম, ধাতুনির্মিত কলের লিপি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, যেন কলটি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। লিপির ধরণ আমাদের ক্লান্তি-লিপিরই অনুরূপ। মানুষের যেমন বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হয়, কলটিরও সেইরূপ বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইল। আবার কতকগুলি ঔষধে যেমন আমাদিগকে উত্তেজিত করে, জড়নির্মিত কলেও তাহার অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। উহার ফলে বহুদূর হইতে প্রেরিত অতি ক্ষীণ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অপিচ কতকগুলি দ্রব্য কলের উপর বিষবৎ কার্য করিয়াছিল, যাহার জন্য কলের সাড়া দিবার শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, অনেক সময় যেমন অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিলে জীবদেহে উত্তেজকের ক্রিয়া করে, ধাতুনির্মিত যন্ত্রেও সেইরূপ ফল দৃষ্ট হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার আভাস দেখিতে পাইলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, জড় ও জীব জগৎ একই নিয়মে পরিচালিত এবং উহারা একই সূত্রে গ্রথিত।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রক্রিয়া

উদ্ভিদ, জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বলিয়া উহার মধ্যে প্রাণীর ন্যায় ক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম।

কিন্তু এইরূপ বিবেচনা প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। প্রচলিত মতবাদীগণ মনে করেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বাহিরের আঘাতে জীবপেশী যেরূপ সংকুচিত হয়, উদ্ভিদে সেরূপ হয় না। প্রাণীকে এক স্থলে আঘাত করিলে স্নায়ু দ্বারা উত্তেজনা দূরে প্রেরিত হয় এবং তথায় সংকুচনশীল পেশীকে চালিত করে। উদ্ভিদে উত্তেজনাবাহক এরূপ কোনো পথ নাই। প্রাণীগণ বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে যেরূপ উত্তেজিত কিংবা অবসন্ন হয়, উদ্ভিদে সেরূপ কিছু হয় না। প্রাণী-জগতে স্পন্দনশীল পেশী দেখা যায়, যাহা পুনঃ পুনঃ সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, তাহা উদ্ভিদে দৃষ্ট হয় না। স্বতঃস্পন্দনশীল পেশী বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে উত্তেজিত প্রশমিত অথবা আড়ষ্ট হয়। উদ্ভিদে তদনুরূপ প্রক্রিয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না ; ইহা এবং অন্যান্য কল্পিত কারণে বিরুদ্ধবাদীগণ মনে করিতেন যে, বৃক্ষজীবন ও প্রাণীজীবন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্র বসু

এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রকৃত কারণ এই যে, এতদিন বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত ছিল। যদি কোনো অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। তবে কি করিয়া যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহা জ্ঞানগোচর করা যাইতে পারে? ইহার জন্য জীবন্ত ভাবের একটি মাপকাঠি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

মাপকাঠি

প্রাণী যখন কোনো বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন নানা রূপে সাড়া দিয়া থাকে। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়া'র উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়াতে প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া, আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব প্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার একমাত্র উপায় এই, সে যেন তাহার ইতিহাস স্বয়ং লিখিতে সমর্থ হয়। বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা দ্বারা সহজেই তাহার ভিতরকার প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু আমার উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র দ্বারা যে বৃদ্ধি অদৃশ্য ছিল তাহা কোটিগুণ বাড়াইয়া সহজ দৃষ্টিভূত করা হইয়াছে। এই যন্ত্র দ্বারা বৃক্ষের বিভিন্ন আহারের ও ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধি-মাত্রার যাহা পরিবর্তন হয় তাহা মুহূর্তকালে জানা যাইতে পারে। পরীক্ষার ফলে ইচ্ছানুসারে গাছের বৃদ্ধি বহুগুণ বাড়াইবার, হ্রাস করিবার এবং স্থগিত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের স্পর্শেও যে বৃক্ষ সংকুচিত হয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহার একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মৃত্যুরেখা

উদ্ভিদের জীবনে এমন সময় আসে যখন কোনো এক প্রকাণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। মৃত্যুর রুদ্র আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই— অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষপাত্রে তীব্র বেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্তিত হয়। ঊর্ধ্বরেখা নিম্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

বৃক্ষের অন্যান্য বিবিধ সাড়া বিশেষ বিশেষ কলের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃক্ষের উত্তেজনা-প্রবাহ

বৃক্ষে যে একস্থানে আঘাতজনিত উত্তেজনার আবেগ দূরে প্রেরিত হয় তাহা সমতাল-যন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কলের আশ্চর্য ক্ষমতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা

এত সূক্ষ্ম হইয়াছে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইয়াছে। ইহার কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, এবং ইহা দ্বারা বৃক্ষের কোনো স্থানের আঘাত-সংবাদ দূরে পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহা যন্ত্রকর্তৃক লিখিত হয়। প্রাণীর স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। সমতাল-যন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যেসব কারণে প্রাণীর উত্তেজনা-প্রবাহের বেগ বর্ধিত কিংবা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদের উত্তেজনা-প্রবাহের বেগ বর্ধিত অথবা প্রশমিত হয়। এ সম্বন্ধে প্রাণীর এবং উদ্ভিদের প্রক্রিয়া মূলতঃ একই রূপ।

স্বতঃস্পন্দন

প্রাণীগণের এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা-আপনি স্পন্দিত হয়। ইহা হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীতে বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের স্বাভাবিক তাল বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়। ইহার প্রয়োগে ক্ষণকালের জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। বিবিধ বিষ প্রয়োগে হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়, কোনো বিষ প্রয়োগে হৃদয়-স্পন্দন সংকুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে প্রসারিত অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। এইরূপ পরস্পরবিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে। উদ্ভিদেও যে স্পন্দনশীলতা আছে তাহা বনচাঁড়ালের ক্ষুদ্র পাতা দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছে। বনচাঁড়ালের স্পন্দনের বিশেষত্ব একেবারে অজ্ঞাত ছিল, কারণ উহার স্পন্দনরেখা লিপিবদ্ধ করিবার কোনো উপায়ই ছিল না। বিশেষ কল নির্মাণদ্বারা এই বাধা দূরীকৃত হইয়াছে। অতি আশ্চর্য এই যে, উদ্ভিদের স্পন্দনরেখা প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনরেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। 'আভ্যন্তরিক' রক্তের চাপ অধিক হ্রাস করিলে যেরূপ হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয় এবং রক্তের চাপ বাড়াইলে স্পন্দন পুনরায় আরম্ভ হয়, উদ্ভিদেও আভ্যন্তরিক রসের চাপ কমাইলে স্বতঃস্পন্দন বন্ধ এবং চাপ বাড়াইলে পুনরায় আরম্ভ হয়। ইহার প্রয়োগে উদ্ভিদস্পন্দন সাময়িক আড়ষ্ট হয়, বাতাস করিলেই অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফর্ম অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলে স্পন্দন একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, যে-বিষ দ্বারা যেভাবে স্পন্দনশীল হৃদ্‌পিণ্ড নিস্পন্দিত হয় সেই বিষে সেইভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে পারিয়াছি। স্বতঃস্পন্দনের প্রকৃত রহস্য কি তাহা উদ্ভিদের উপর পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এইরূপে নিরন্তর স্পন্দন করিবার জন্য বাহিরের শক্তিসঞ্চয় আবশ্যক। সেই শক্তি সংগ্রহের জন্য আলোর সাহায্যে উদ্ভিদ বায়ু অথবা জল হইতে অঙ্গারাম্ল বিশ্লেষণ করিয়া স্বীয় শরীর গঠন করে। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রক্রিয়ায় ভেদাভেদ লিপিবদ্ধ হয়। কখনও উদ্ভিদ এই যন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহার আহারের তৎপরতা বাহিরে প্রকাশ করে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, এইসব কলের কার্যকারিতা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই জন্য আমার বিরুদ্ধবাদীরা রয়াল সোসাইটিতে এইসব কল লইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, এইসব কল এবং নূতন প্রণালী দ্বারা জীবজগতের অনেক দুরূহ সমস্যার উত্তর পাওয়া যাইবে। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাঁহারাই তখন আমাকে রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে নিয়োজিত করিলেন। ভারত যে বিজ্ঞান-পরীক্ষার দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিবে এই প্রথম তাহা স্বীকৃত

হইল। যেসব পরীক্ষার অল্পবিস্তর আভাস দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্বীকৃত হইবে যে প্রাণীর ও উদ্ভিদের মূলগত প্রক্রিয়া একইরূপে সাধিত হয়। এই প্রমাণের বিশেষ ফল এই যে, উদ্ভিদের অপেক্ষাকৃত সরল জীবন হইতে অধিকতর জটিল প্রাণীজগতের রহস্যোদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হইবে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে, যেমন, জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা।

বৃক্ষের জীবনসংগ্রাম

বহুবিধ দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও বৃক্ষ তাহার জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে কোন্ শক্তিবলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুঝিতে পারিয়াছে? তাহার একটি কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটি নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে-স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক। বৃক্ষের ভিতর আরও একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরের কত পরিবর্তন ঘটিতেছে কিন্তু অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পুনর্জীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা অনাবশ্যক জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে আরও একটি শক্তি তাহার সম্বল। সে যদি বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তবে সেই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে ধারণ করিয়াছে। এই জন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তাহার শির ঊর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখাপ্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তিবলে সে বাহিরের আঘাত পাইয়াও বাঁচিয়া থাকে? তাহা এই: যে ধৈর্যে যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থানে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, এবং যে স্মৃতিতে বহুজীবনের শক্তি নিজস্ব করিয়া রাখে। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে জীবনসংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া পরমুখাপেক্ষী ও পর-অন্নে প্রতিপালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

অনন্তের পথযাত্রী

অদৃশ্য আলোকের পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, অসংখ্যবিধ জ্যোতির মধ্যে এক ক্ষুদ্র গণ্ডিটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমাদের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ এবং এই অপূর্ণতার জন্য অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন নিরাশ হয় নাই। বরং অদম্য উৎসাহে সে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন রাজ্যের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

অনন্তের পথযাত্রী, কি সম্বল তোমার? সম্বল কিছুই নাই, কেবল আছে অন্ধবিশ্বাস, যে বিশ্বাসবলে প্রবাল দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্যেও সাধকদিগের অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়াই আরম্ভ এবং আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই-একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়ফলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইলে বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইবে।

জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' গ্রন্থ হইতে এই সংকলন
রজত-জয়ন্তী (১৯৩৫) হইতে গৃহীত

আচার্য জগদীশচন্দ্র

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পিতার যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন আমি নিতান্ত শিশু। পরিচয় ক্রমশ যখন বন্ধুত্বে পরিণত হল তখনও আমি বালক। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে আমার স্মৃতি তাই বাল্যস্মৃতির সঙ্গেই বেশি জড়িত।

জগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালে লণ্ডন-প্রবাসকালে আমার পিতাকে লিখেছিলেন, 'তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম··'

জগদীশচন্দ্র ইউরোপে-ভ্রমণের পর কলকাতায় ফিরে আসেন ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস্ তাঁর বইয়ে লিখেছেন, পৌঁছ-সংবাদ পেয়ে আমার পিতা তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন তিনি বাড়িতে নেই। তখন তাঁর টেবিলে একটি ম্যাগনোলিয়া ফুল রেখে আসেন। দ্বিতীয় বার যখন দেখা করতে যান দুই বন্ধুর কিরকম মিলন ঘটেছিল তার বর্ণনা গেডিসের লেখায় পাওয়া যায় না, আমার স্মৃতিপটে তার আবছায়া ছবি এখনও জেগে আছে। বিলাত থেকে ফিরে কিছুদিনের জন্যে ধর্মতলার এক বাড়িতে জগদীশচন্দ্র ছিলেন। সে বাড়ি সম্ভবত আনন্দমোহন বসুর ছিল। আমি তখন ন-বছরের শিশু, তবু, কেন জানি না, পিতা আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুই বন্ধুতে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা বুঝতে পারা বা মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি, এইটুকুই কেবল মনে পড়ে। জগদীশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত ভাবে ইউরোপ-ভ্রমণের কাহিনী অনর্গল বলে যাচ্ছেন আর আমার পিতা সাগ্রহে তা শুনছেন এবং মাঝে মাঝে দু জনে মিলে খুব হেসে উঠছেন। গল্প বোধ হয় আরও অনেকক্ষণ চলত, আমার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়াতে আমার পরিশ্রান্ত মুখের ভাব দেখেই হয়তো পিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধুর কাছ থেকে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

এই সময়ে পিতার উপর জমিদারি দেখার ভার ছিল। তাঁকে প্রায়ই শিলাইদহে যেতে হত। শীতের সময় তিনি পদ্মানদীর বালির চরের ধারে বোট বেঁধে বাস করতেন। তখন তিনি প্রথমে সাধনার পরে ভারতীর সম্পাদনা করছেন। প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছে। পদ্মার দিগন্তব্যাপী বালির চরে খুব নিভৃত কোনো স্থানে বোট বাঁধা থাকত। লোকজন সেখানে যেতে পারত না। গল্পের পর গল্প লিখে গেছেন এই পরিবেশে। ছোটোগল্প লেখাতে উৎসাহ দিতেন জগদীশচন্দ্র। প্রতি সপ্তাহের শেষ শনিবারে তিনি আসতেন। তাঁর জন্য আর-একটা বজরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। দু রাত শিলাইদহে কাটিয়ে সোমবার কলেজের কাজে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। আমার পিতার কাছে পৌঁছে প্রথমেই তাঁর দাবি জানাতেন— গল্প চাই। প্রতি সপ্তাহেই একটি করে নতুন গল্প তাঁকে পড়ে শোনানো যেন বাঁধাদস্তুর হয়ে গিয়েছিল। লেখা শেষ হলেই প্রথমে পড়ে শোনাতে হবে জগদীশচন্দ্রকে, তারপর ছাপতে যাবে। বন্ধুত্বের এই দাবি বন্ধুর পক্ষে অগ্রাহ্য করবার উপায় ছিল না।

আমার পিতা যখন শিলাইদহে বোটে থাকতে যেতেন আমাকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমার পিতা যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে জগদীশচন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করতেন, আমারও তেমনি ঔৎসুক্য

বিলাতে জগদীশচন্দ্র । ১৯০১

অবলা বসু
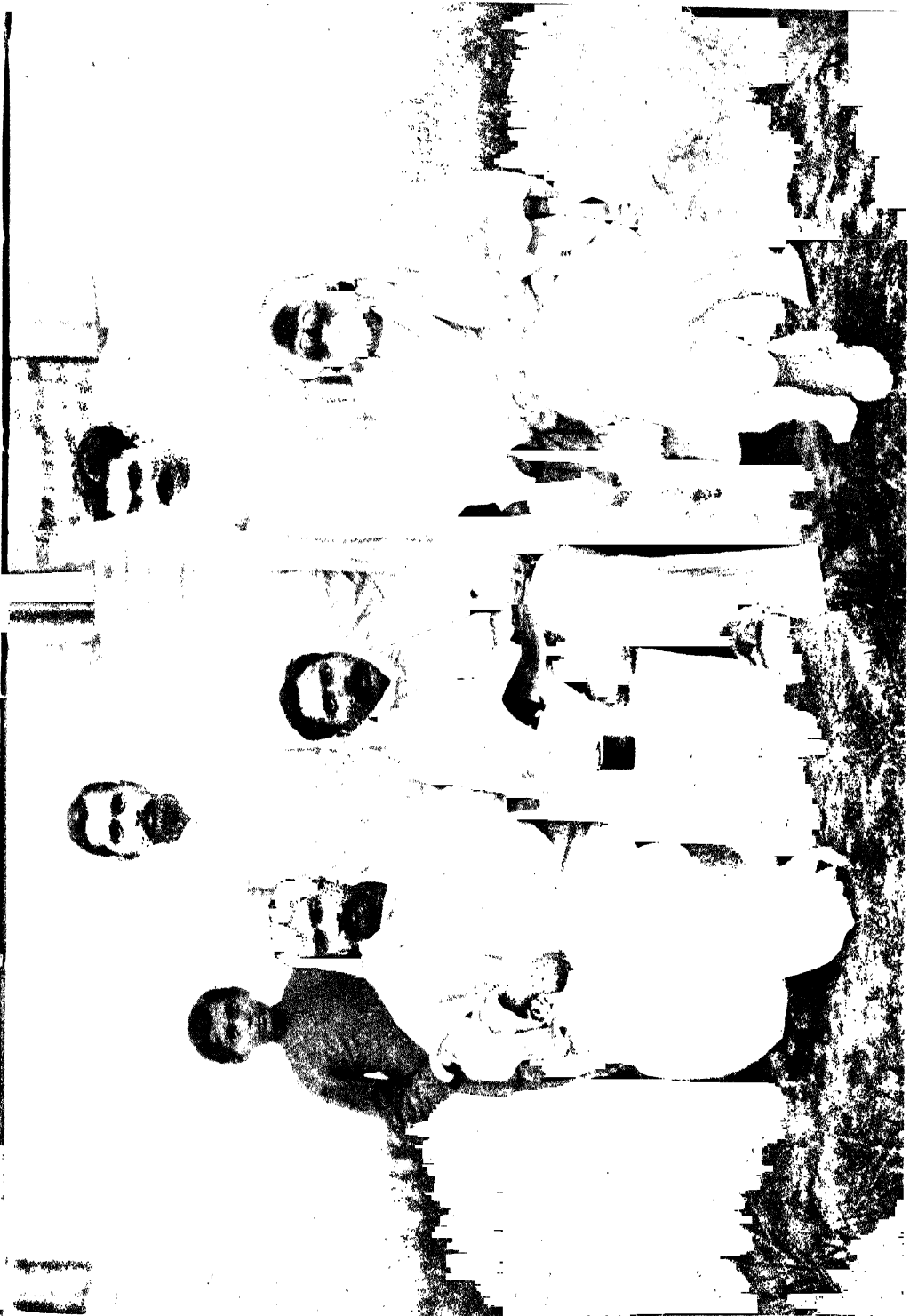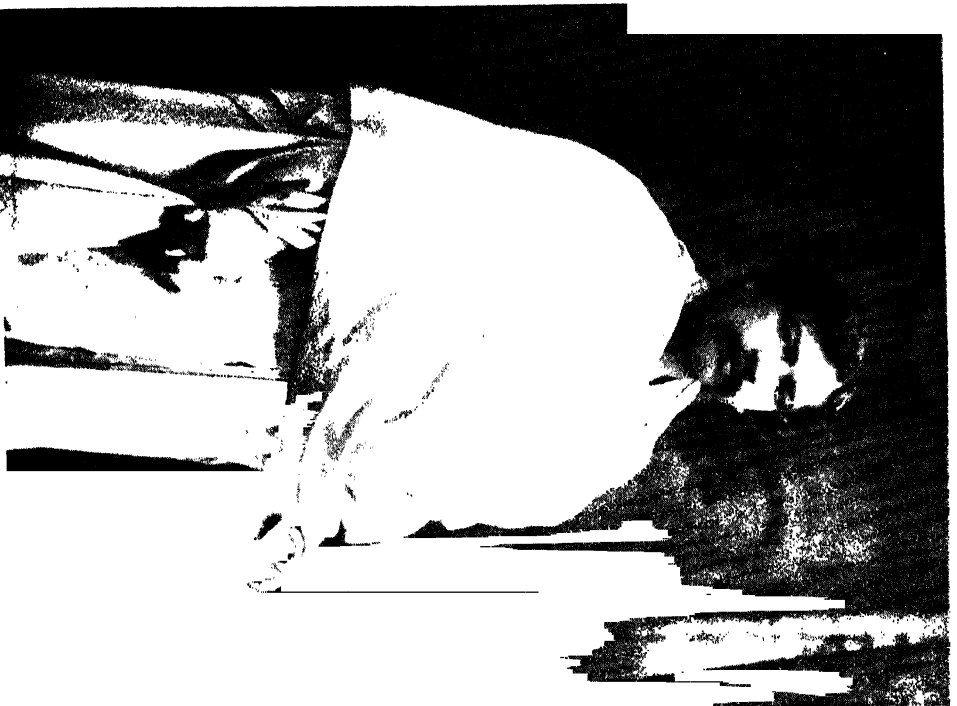
কম ছিল না। আমার সঙ্গে তিনি গল্প করতেন, নানারকম খেলা শেখাতেন, ছোট বলে আমাকে উপেক্ষা করতেন না। আমি তাঁর স্নেহপাত্র হতে পেরেছি তাতে আমার খুব অহংকার বোধ হত। আমি মনে মনে কল্পনা করতুম বড় হলে জগদীশচন্দ্রের মত বিজ্ঞানী হব।

বর্ষার পর নদীর জল নেমে গেলে বালির চরের উপর কচ্ছপ ওঠে ডিম পাড়তে। জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে ভালোবাসতেন। আমাকে শিখিয়ে দিলেন কী করে ডিম খুঁজে বের করা যায়। শুকনো বালির উপর কচ্ছপের পায়ের দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, সেই সারবাঁধা পদচিহ্ন এঁকেবেঁকে বহুদূর পর্যন্ত চলে। গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপ না পেলে ডিম ফোটে না ; তাই কচ্ছপ নদী ছাড়িয়ে যতটা সম্ভব উঁচু ডাঙায় গিয়ে ডিম পেড়ে আসে। বালি সরিয়ে গর্তের মধ্যে ডিম পেড়ে আবার বালিগুলি সমান করে চাপা দিয়ে যায় যাতে শেয়ালে সন্ধান না পায়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও ধূর্ত শেয়ালকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিতে পারে না। আমাকে জগদীশচন্দ্র শিখিয়ে দিলেন কী করে পায়ের দাগ ধরে ধরে ডিমের গর্ত আবিষ্কার করতে হয়। শেয়ালের সঙ্গে আমার রেষারেষি চলতে থাকত। ডিমের খোঁজ করতে গিয়ে অনেক সময় কচ্ছপমাতারও সাক্ষাৎ মিলত। ডাঙার উপর তার পালানোর উপায় নেই, উল্‌টে দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া সহজ। কচ্ছপের মাংস খেতে জগদীশচন্দ্র খুব পছন্দ করতেন।

পদ্মাচরে বসবাস জগদীশচন্দ্রেরও বড়ো ভালো লাগত। দেশে বিদেশে কত সুন্দর জায়গা তিনি দেখে এসেছেন। তবু আমাদের বলতেন, পদ্মাচরের মতো এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীতে কোথাও নেই। স্নানের পূর্বে তিনি আমাকে দিয়ে বালির মধ্যে কয়েকটি গর্ত করিয়ে রাখতেন। সকলকে এক-একটি গর্তের মধ্যে আকণ্ঠ বালি চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে হত। যখন সমস্ত শরীর গরম হয়ে প্রায় আধসিদ্ধ হয়ে উঠত তখন পদ্মার ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যেত। তিনি বলতেন, এতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

জগদীশচন্দ্রের গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত ; তাঁর প্রকাশভঙ্গিও ছিল ভারি সুন্দর, সরস। গল্প বলার মধ্যে যথেষ্ট হাস্যরস থাকত বলে তাঁর গল্প শুনতে বড়ো ভালো লাগত— কৌতূহল জেগে উঠত, ক্লান্তিকর মনে হত না। জগদীশচন্দ্র গল্প বলে বা তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা করে আমার পিতার আনন্দবর্ধন করতেন। দিনের বেলাটা এইরকম গল্পগুজবে আলোচনায় কেটে যেত। সন্ধ্যা হলেই উনি কবিকে ধরতেন, লেখা পড়ে শোনাতে হবে। কবিতা প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেবার উপায় ছিল না, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সব থেকে বেশি আগ্রহ ছিল ছোটোগল্পে। আহারাদির পর শুরু হত গান। গান গাওয়া কখন শেষ হত আমি জানি না ; তার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়তুম। কয়েকটি গান জগদীশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল। একটি পিতৃদেবকে বার বার গাইতে বলতেন, সেটা হচ্ছে—

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে, ফিরে এসো।

এই রকম বিমল আনন্দে কেটে যেত প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবি বার। কলকাতায় ফেরবার মুখে জগদীশচন্দ্র বন্ধুকে নোটিস দিয়ে রাখতেন, আসছে সপ্তাহে আর-একটা নতুন গল্প চাই।

আমার ছেলেবেলাকার শিলাইদহের স্মৃতির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মধুর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

তার পর মনে পড়ে বুদ্ধগয়ার কথা। ১৯০৪ সাল হবে। জগদীশচন্দ্র, শ্রীমতী অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতা সহ বুদ্ধগয়া যাবেন স্থির করেন, পিতৃদেবকে অনুরোধ করলেন সঙ্গী হতে। ক্রমশ দলটি বেশ

বড়ো হয়ে গেল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর ও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালুকর্তা), আমি ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কেউ বাদ পড়লুম না। আমরা বুদ্ধগয়ার মোহন্তের অতিথি হব ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেষ প্রয়োজন হয় নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল তাতেই আমরা সুখে সচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম। আতিথ্যের অভাব হয় নি, উত্তম দুধ ঘি ফলমূল বহুবিধ খাদ্য সব সময়েই প্রস্তুত। যখনই ফাঁক পেতুম, উঠোনে বৃহৎ ইঁদারা ছিল, তার ভিতরে নেমে গিয়ে বসে থাকতুম। এরকম ইঁদারা ইতিপূর্বে দেখি নি। ইঁদারার বাইরের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে সিঁড়ির মতো গ্যালারি নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে। তার মাঝে মাঝে জানলা আছে। গরমের দিনে সেখানে বসে বড়ো আরাম।

রোদ পড়ে গেলে সন্ধের দিকে সকলে মিলে মন্দির দেখতে যাই। ত্রিপুরার মহিম ঠাকুর ও লালুকর্তা দু জনেরই ফোটো তোলার শখ; তাঁদের সঙ্গে ছোটো বড়ো নানারকম ক্যামেরা ছিল; দিনের আলো থাকতে কোনো সময় গিয়ে তাঁরা বহু ফোটো তুলে রেখেছিলেন। (সে ফোটোগুলি আছে কি না জানি না)। মন্দির দেখা হলে আমরা মন্দিরের পিছন দিকে বোধিদ্রুমের নিকটে গিয়ে বসলুম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চার দিকে নিস্তব্ধ, তার মধ্যে কানে এল "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"— বৌদ্ধমন্ত্রের মৃদুগম্ভীর ধ্বনির আবর্তন। কয়েকটি জাপানী তীর্থযাত্রী এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দিরপ্রদক্ষিণ করছেন, আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ জ্বেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কী শান্ত তাঁদের মূর্তি। কী গভীর তাঁদের ভক্তি। ইষ্টপূজার কী অনাড়ম্বর প্রণালী। অনতিপূর্বে মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তির সামনে মোহন্তের পুরোহিতদের কর্কশ ঢাক ঢোল ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি দেখে এসেছিলুম। আমাদের মনে এই কথাটাই জাগল, ভগবান এঁদের মধ্যে কার পূজা খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন? মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারও আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্কবিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আমাকে তিনি ধম্মপদ আগাগোড়া মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। পালি পড়াও শুরু হল এবং পিতারই আদেশক্রমে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত-তর্জমার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হলুম।

বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু-তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল। বড়ো দুঃখ যে তার আজ কোনো অনুলিপি নেই। সেই অল্পবয়সে বুদ্ধগয়ার মাহাত্ম্য বা বয়স্কদের আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। না থাকলেও এই তীর্থস্থানে দুর্লভ সৎসঙ্গে ত্রিরাত্রিবাসের স্মৃতি আমার মানসপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

ফেরবার সময় সকলে মিলে গয়া স্টেশনে যাওয়া হল। সকলের গন্তব্যস্থল এক নয়, তাই বিভিন্ন ট্রেন ধরতে হবে। সপত্নীক জগদীশচন্দ্র বম্বে মেলে কলকাতায় যাবেন— সেই ট্রেনই প্রথম এল। দৌড়াদৌড়ি করে কোনো কামরাতেই জায়গা পেলেন না। প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় দেখা গেল

দুটি লোক, দু জনেই শ্বেতাঙ্গ। ভারতীয়কে তারা ঢুকতে দেবে না দেখে আমরা দু-এক জন স্টেশনমাস্টারের কাছে ছুটে গেলুম। ব্যাপার বুঝতে পেরে তিনি কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এলেন না। ফিরে এসে দেখি ভগিনী নিবেদিতা তাঁর স্বজাতি-দুটিকে বেশ তিক্তমধুর ধমক দিচ্ছেন। ধমক খেয়ে সাহেবেরা অবশেষে গাড়ির দরজা খুলে দিল। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী বসু শেষমুহূর্তে কোনোরকমে উঠে পড়লেন।

ট্রেন চলে গেলে দেখলুম নিবেদিতার প্রজ্বলিত মূর্তি। কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারছেন না ; সেই মুহূর্তেই ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে পারলে তবে যেন স্বস্তি পান। তাঁর সেই রাগ পড়তে না পড়তে আর-একটা ট্রেন এসে পড়ল। নিবেদিতাকে এই ট্রেনেই যেতে হবে পশ্চিমের দিকে। দুটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা— একটিতে একজন শ্বেতাঙ্গিনী, অন্যটিতে একটিমাত্র ভারতীয় পুরুষ। যে কামরায় ইংরেজ মহিলা ছিলেন, আমরা নিবেদিতার মালপত্র সেই কামরায় তুলে দিতে গেলে তিনি বললেন : I am not going in there। অগত্যা অন্য কামরায় নিয়ে গেলুম। আমরা দরজা খুলে ঢুকতেই ভদ্রলোকটি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গড়গড়া সরিয়ে নিয়ে নিবেদিতার জন্য তাঁর নিজের জায়গা ছেড়ে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময় নিবেদিতা আমাদের সকলকে ডেকে বললেন : Now, you see the difference between the barbarous Englishmen and the civilized Indians।

আমি যখন আমেরিকায় কলেজে পড়ছি, জানতে পারলুম জগদীশচন্দ্র আমেরিকা-পরিভ্রমণে আসছেন। কয়েকটি ইউনিভার্সিটি বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে। এই খবর পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। তখনই ছুটলুম আমার কলেজের ডীনের কাছে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে আনতেই হবে আমার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁকে জানালুম। ডীন ড্যাভেনপোর্ট পণ্ডিত মানুষ, বিজ্ঞানজগতের যথেষ্ট খবর রাখেন। আমি তাঁর ক্লাসে পড়ি, ছাত্র হিসাবে আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। সহাস্যে বললেন, তুমি যা চাও তাই হবে। সেই শুনে আমিও জগদীশচন্দ্রকে চিঠি লিখলুম যে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেলে তিনি যেন উপেক্ষা না করেন ; হার্ভার্ড্ ইয়েল প্রভৃতির মতো বিখ্যাত না হলেও তিনি এই অপেক্ষাকৃত ছোটো বিদ্যায়তনে সমজদার শ্রোতা হয়তো বেশি পাবেন। মোট কথা তাঁর আসা চাইই। জবাব পেলুম তিনি শীঘ্রই আসবেন। আমি তখন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান-মহলে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে মহা উৎসাহে প্রচার করতে লেগে গেলুম।[১] এত উৎসাহ, এত আনন্দ, এত আয়োজনের পর যখন আচার্যের আসবার সময় নিকটবর্তী হল, আমি পড়লুম অসুস্থ হয়ে। ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন একটা আরোগ্যভবনে পনেরো দিন ধরে তাদের ব্যবস্থাধীনে নিরাময় হবার জন্য। সাত দিন সেখানে থেকে আমি পালিয়ে এসে সটান হাজির হলুম স্টেশনে, জগদীশচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণীকে অভ্যর্থনা করে তাঁদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে যাবার জন্য। তার পর দিনই প্রথম বক্তৃতা। সকালবেলায় জগদীশচন্দ্র আমাকে বললেন : 'আমার বক্তৃতার সঙ্গে যে experimental demonstrations থাকবে তাতে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। চল, সায়ান্স লেকচার হলে যন্ত্রগুলি খাটিয়ে রাখি ও তোমাকে দেখিয়ে দিই কী করতে হবে।' আনন্দে অধীর হয়ে উঠলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল আমার সহপাঠীরা কী ঈর্ষার চোখেই না আমাকে এর পর দেখবে। নানারকম অত্যাচার উপদ্রবে গাছগাছড়া কিরকম সাড়া দেয় সে-সব

দেখাবার জন্য জগদীশচন্দ্র কয়েকটি অত্যাশ্চর্য যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন। লজ্জাবতীর পাতায় কোনোরকম আঘাত লাগলে তার পাতা গুটিয়ে যায়, তা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু যে-কোনো গাছেই আঘাত লাগলে তার আর্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া আছে, যদিও আমরা তা দেখতে পাই না। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে, গাছ কিসে কিরকম সাড়া দেয় কালো পর্দার উপর একবিন্দু আলোর কম্পন দেখে আমরা তা অনায়াসে বুঝতে পারি। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি যখন কোনো experiment দেখাবার জন্য থামতেন— আগ্রহের সঙ্গে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যে মুহূর্তে আলোর রেখা আশানুরূপ নেচে উঠত তিনি উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন: 'There, there, there!' আমিও তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতুম— ভুলচুক কিছু করি নি।

আমার আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর যখনই দেখা হত জগদীশচন্দ্র বলতেন, 'তুমি আমার ল্যাবরেটরিতে কবে যোগ দিতে আসছ?' শান্তিনিকেতনে তখন আমার ডাক পড়েছে, জগদীশচন্দ্রের অনুরোধ রাখতে পারি নি। সেজন্য তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থ কতকগুলি আমাকে দিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতন-গ্রন্থাগারে সেগুলি এখনও আছে।

গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙের 'মায়াপুরী'তে জগদীশচন্দ্র থাকতেন। তার কাছেই গ্লেন ইডেনে আমাদের বাসা। যে বছরের কথা বলছি তখন জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়। আমার পিতা ঘন ঘন তাঁর কাছে যেতেন। কাব্যালোচনা বিশেষ হত না। পিতৃদেবের কাছ থেকে তখন জগদীশচন্দ্র শুনতে চাইতেন দার্শনিক প্রসঙ্গ। বেশ বোঝা যেত তাঁর মনের মধ্যে জীবনমৃত্যুর রহস্য নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার তাঁকে যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারছে না। প্রচলিত ধর্মমতও পুরোপুরি গ্রহণ করতে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন সায় দিচ্ছে না। তাই ক্রমাগত কবিকে প্রশ্ন করতেন, তাঁর সাধনার ফলে তিনি কী উপলব্ধি করেছেন। বিজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী অনেক বিচার প্রমাণের জটিল রাস্তায় ঘুরে ফিরেও যে মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না— কবি বা সাধক হয়তো তাঁদের সহজ অন্তর্দৃষ্টির গুণে অনায়াসে তার সন্ধান পেয়েছেন, এই ধরণের একটি বিশ্বাস হয়তো তাঁর হয়েছিল এবং এই জন্যই আমার পিতাকে এ বিষয়ে তিনি ক্রমাগত প্রশ্ন করতেন।

দার্জিলিঙেই সেই শেষ দেখা। তাঁর মৃত্যুর সময় আমরা কলকাতায় ছিলুম না।

---

১ এই প্রসঙ্গে অবলা বসু মহোদয়া রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল। —সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

"রথী শরৎবাবুর কাছে অধ্যাপক মহাশয়ের বিষয় একটা চিঠি লিখিয়াছেন; তাহাতে জানা গেল যে Illinois হইতে ওঁকে Oct মাসে lecturer করিয়া নেবার খুব সম্ভাবনা আছে। হয়ত রথী আপনার কাছেও লিখিয়াছেন। এটা সুসংবাদ বটে।" ২০ মার্চ ১৯০৮

"রথী ওঁর lecture দেবা সম্বন্ধে খুব খাটিয়াছে, ফলে এত নিমন্ত্রণ আসিয়াছে যে উনি সব রাখিতে পারিলেন না, কেবল ৫।৬ টা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন।. ." ২০ নভেম্বর ১৯০৮

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

গণিতে উদাসীন সাহিত্যামোদী মধুসূদন একদিন ক্লাসে একটি দুরূহ অঙ্কের সমাধান করিয়া সহপাঠী ভূদেবকে বলিলেন, দেখো শেক্সপীয়র ইচ্ছা করলে নিউটন হতে পারে কিন্তু নিউটনের পক্ষে শেক্সপীয়র হওয়া অসম্ভব।

তার পরে বলিলেন, কিন্তু আমার অঙ্ক কষা এই পর্যন্তই— বলিয়া তিনি একখানি সাহিত্যের পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

এখন ছাত্রদের মধ্যে অনুপস্থিত নিউটনের পক্ষ গ্রহণ করিবার মতো দুঃসাহসী ব্যক্তি না থাকায় নিউটনের মামলা একতরফা ডিসমিস হইয়া গেল। কিন্তু মামলাটি সত্যই কি সংক্ষেপে ডিসমিস-যোগ্য! বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কি কবি হওয়া একেবারেই অসম্ভব? পৃথিবীর সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের ইতিহাস সন্ধান করিলে নিশ্চয় দেখা যাইবে যে, কবি ও বৈজ্ঞানিকে ব্যবধান দুস্তর নয়— অর্থাৎ প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রখ্যাত কবি হইয়া না উঠিলেও, কখনো কখনো বৈজ্ঞানিকের হাতে কবির কলম স্বচ্ছন্দে চলিয়াছে। তাহার বেশি আশা করা অন্যায় হইবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র কবি ও বিজ্ঞানীর ব্যবধান-দুস্তরতায় বিশ্বাসী নন। তাঁহার মতে কবি ও বিজ্ঞানীর লক্ষ্য এক— সত্যানুসন্ধান। তবে পথ স্বতন্ত্র বটে। বিজ্ঞানী প্রমাণ ও যুক্তির খুঁটি ধরিয়া ধরিয়া চলেন, কবি চলেন অনুভূতি ও অনুমানের ইঙ্গিতে। কল্পনা দুজনেরই প্রেরণাদাত্রী; এখানেই নিউটনে ও শেক্সপীয়রে ঐক্য।

তিনি স্পষ্টতঃ বলিতেছেন— "কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোকে যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলিয়াছেন— "সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব রসায়নতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।"

এই মন্তব্যটি কাহার কলমে লিখিত— কবির না বৈজ্ঞানিকের! রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে অনুরূপ বা সমান্তরাল মন্তব্য খুঁজিয়া বাহির করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই বলিয়াছিলাম কবির কলমে ও বিজ্ঞানীর কলমে আড়াআড়ি নাই, প্রচ্ছন্ন সহযোগিতাই আছে— তবে ক্ষেত্র ভিন্ন বলিয়া সেটা সব সময়ে ধরা পড়ে না।

জগদীশচন্দ্রের কলম কখনো কখনো কবির চালে, অনেক সময়েই সাহিত্যের চালে, চলিয়াছে। আবার তাঁহার হাতে বিজ্ঞানের যন্ত্রগুলি খুব সম্ভব অনেক সময়ে কবির চিহ্নিত পথে চলিয়া কবি ও বিজ্ঞানীর অচ্ছেদ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। তাঁহার মধ্যে একজন প্রচ্ছন্ন কবি না থাকিলে জড়বিজ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ জড় ও চৈতন্যের সুনির্দিষ্ট বেড়া ভাঙিয়া দিয়া, জড় ও চৈতন্য যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে সেই নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেন না। তাঁহার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন কবিই খুব সম্ভব আর-একটি প্রদীপ্ত কবিপ্রতিভাকে কাছে টানিয়া পরম বান্ধব করিয়া তুলিয়াছিল। তখন দেখা গেল যে, অন্তরের মতো বাহিরেও কবি ও বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য অতি ঘনিষ্ঠ, একের মন হইতে অপরের মনে এক ধাপের ব্যবধান। অন্তরে বাহিরে কবি ও বিজ্ঞানী প্রতিবেশী।

২

মাতৃভাষায় প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট বাংলা রচনা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। অব্যক্ত নামে প্রকাশিত প্রবন্ধসমষ্টিই তাঁহার লিখিত একমাত্র বাংলা গ্রন্থ। কুড়িটি প্রবন্ধের মধ্যে নিছক সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন রচনার সংখ্যা সামান্য কয়টি মাত্র। এখন, এই ক'টি অবলম্বনে আলোচনায় বিপদ আছে। প্রথমতঃ লেখকের প্রতি অবিচার হইতে পারে, বিশেষতঃ সমালোচক যেখানে নিশ্চিত যে রচনায় প্রকাশিত সাহিত্যগুণের চেয়ে লেখকের অন্তর্নিহিত সাহিত্যিক শক্তি অনেক বেশি। কিন্তু এই অদৃশ্য অনেক-বেশিটাকে তথ্যপ্রমাণাদিযোগে অপরের বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলা সব সময়ে বড় সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ এমন আলোচনা অনেক সময়েই সম্ভাবনার বিবরণ হইতে বাধ্য। যে-সব সাহিত্যিক গুণের সম্ভাবনা তাঁহার মধ্যে ছিল সুযোগের অভাবে বা অন্য কারণে তাহা প্রকট হইয়া ওঠে নাই, এক-আধটা সূক্ষ্ম নিরিখ মাত্র রাখিয়া গিয়াছে— সে নিরিখ সমালোচকের চোখেই সব সময়ে পড়িতে চায় না, পাঠকের চোখে তুলিয়া ধরা আরো কত কঠিন। এমন ক্ষেত্রে লেখকের জীবন ও অন্য কীর্তির সাক্ষীগুলাকে তলব করিতে হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাও সহজ নয়। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্তি বর্তমান সমালোচকের জ্ঞানের অনায়ত্ত। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার সাহিত্যকীর্তিকে উজ্জ্বলতর ও স্পষ্টতর করিয়া তোলা যাইত। বাকি থাকিল আচার্যের জীবনের, অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহ ও প্রভাবের, সাক্ষ্য। সেটাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিব।

৩

সে যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পরাধীনতার গ্লানি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। ইহা ছিল একটি সর্বভারতীয় অনুভূতি। উনিশ শতকের বিচিত্র কর্মোদ্যমের মূলপ্রেরণা ছিল এই অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রেরণায় তৎকালীন বাঙালী মনীষীগণ কর্মের ও জ্ঞানের বিচিত্র পথে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ইহা সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির

SHAME
SHAME
STRIKE

সকলেরই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এই প্রেরণা, পরাধীনতার গ্লানিই মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জাগাইয়াছিল এই মনীষীগণের মনে। পরাধীন জাতির হাতে চরিতার্থতা লাভের অন্য অস্ত্র ছিল না। ত্রিপুরারাজের শীলমোহরে বাংলাভাষা লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর সোৎসাহে বলিয়া উঠিয়াছিলেন— ওরে, আমার মাতৃভাষা রাজভাষা। ইহাই ছিল সকলের মনের অনুচ্চারিত ভাব। মাতৃভাষাকে হয়তো রাজভাষা করা যাইবে না— কিন্তু তাহাকে চিত্তরাজ্যে রাজরাজেশ্বরী করিয়া তুলিতে বাধা কী!

বলা বাহুল্য জগদীশচন্দ্রও এই গ্লানি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। এখন, এই ভাবের অনুষঙ্গরূপে তাঁহার মনে আসিয়াছে মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, দেশের অতীত ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ-সঞ্জাত কৌতূহল। তার পরে তাঁহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন কবিস্বভাব ছিল তাহা তাঁহাকে একপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদিতা দিয়াছিল। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে দেখিবার আগ্রহে ইহার পরিচয় পাই—পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে কবি ও বিজ্ঞানীর ঐক্য প্রদর্শন উপলক্ষে তিনি ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর সে যুগের একটি সাধারণ লক্ষণ ছিল আধ্যাত্মিক চেতনা। জগদীশচন্দ্রও ইহার অতীত ছিলেন না। সর্বশেষে উল্লেখ করিতে হয় তাঁহার সামাজিক মনের কৌতুকপরায়ণ হাস্যোজ্জ্বলতা।

এখন তাঁহার রচনার আলোচনায় নামিলে দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত কয়েকটি সূত্রই অল্পবিস্তর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাঁহার সাহিত্যে। সে-সব চিহ্ন অনেক স্থলেই ক্ষীণ, অনেক স্থলেই অনুমান করিয়া লইতে হয়— প্রায় সর্বত্রই সম্ভাবনার গুহা-নিহিত। সেইজন্য পূর্বাহ্নেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, তাঁহার রচনার ইতিহাস অনেক পরিমাণেই সম্ভাবনার বিবরণ— অর্থাৎ ইহা যতটা সাহিত্যের আলোচনা তার চেয়ে বেশি একটি সাহিত্যিক মনের আলোচনা।

৪

প্রথমে অগ্নিপরীক্ষা প্রবন্ধটি লওয়া যাক। মাতৃভূমি-উদ্ধারের উপায় যখন থাকে না তখন অপরকে মাতৃভূমি-রক্ষার্থ বীরের মতো প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে বীরের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। অগ্নিপরীক্ষা সেইরকম একটি উৎসাহবর্ধক কাহিনী। গোর্খা-সেনাপতি বলভদ্র সত্তর জন বীর সঙ্গী-সহকারে মাতৃভূমি-রক্ষার্থে অসি হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। "লেখক নেপালের সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ কালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করেন।"

যে পরাধীনতার গ্লানিময় অনুভূতির কথা পূর্বে বলিয়াছি এই কাহিনীটি রচনার মূলে তাহাই সক্রিয়। কিন্তু মনীষীর মন গ্লানিতেই মুহ্যমান হয় নাই— নূতন প্রেরণার বশে চালিত হইয়াছে।

মাতৃভাষায় লিখিতে হইবে— কিন্তু কেন কিরূপে? "এ সম্বন্ধে ২৭ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাঁহারই আজ্ঞায় 'আকাশস্পন্দন' ও 'অদৃশ্য আলোক' সম্বন্ধে লিখিলাম। পরে লিখাইল, 'উদ্ভিদজীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়ামাত্র'। জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানিতাম না। কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম?" আজ্ঞাদাত্রী কে? মাতৃভাষা, না মাতৃভূমি, না বিধাতা? সেকালের লোকের মনে তিনে মিলিয়া এক ছিল।

পরাধীনতার গ্লানিবোধে মানুষের মন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না— অতীতকালে যাত্রা করিয়া প্রাচীন

ঐতিহ্য হইতে গৌরব ও শিক্ষা আদায় করিয়া লয়, আবার ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিয়া প্রতিকারের উপায় সন্ধান করে। জগদীশচন্দ্রের রচনায় এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

অজন্তাগুহার চিত্রাবলী দর্শনে তিনি একাধারে শিক্ষা ও শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। "আর একখানি চিত্রে রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্যাধিজর্জ্জরিত, শোকার্ত্ত মানবের দুঃখ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে। কি করিয়া এই দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে, তিনি আজ রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইবেন। আজ মহাসংক্রমণের দিন। ··সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর জনমানবের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে অকাট্য ব্যবধান, পারাপারের কোন সেতু নাই। গুহার অন্ধকারে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের পুরী। অশান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।"

এখন, এই অশান্তি দূর হইল কিরূপে? তিনি বলিতেছেন যে, অন্যত্র বুদ্ধের আর দুইখানি চিত্র দেখিলেন। একখানিতে জননী পুত্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধের আশীর্বাদ যাক্ঞা করিতেছেন, অন্যখানিতে সুজাতা উপবাসক্লিষ্ট বুদ্ধকে পরমান্ন নিবেদন করিতেছেন। "দেখিতে দেখিতে অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝখানে মমতা ও স্নেহরচিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল।" সজীব মাতৃহৃদয় হইতেছে এই সেতু।

'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই অত্যাশ্চর্য রচনাটি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি পরম সম্পদ। কবিহৃদয়ের ইহা অনবদ্য সৃষ্টি। কলিকাতায় ভাগীরথীপ্রবাহ তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগাইয়াছে, নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? উৎসের সন্ধানে তিনি স্রোতের উজানে যাত্রা করিয়া গঙ্গোত্রীতে পৌছিয়াছেন, সেখানে অতীতকাল তুষারে সংহত। আবার সেই স্রোত অনুসরণ করিয়া গঙ্গাসাগরে পৌছিয়াছেন, সেখানে অনাগত ভবিষ্যৎ রহস্যে গম্ভীর। মাঝখানে বর্তমান কাল, কলিকাতা নিতান্ত প্রগল্‌ভ। এই ভাবে ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে তাঁহার ত্রিকালদর্শন ঘটিয়া পুণ্য প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই শ্রেণীর রচনা দেখিয়া দুঃখ হয় যে, কেন তাঁহার লেখনী আরো বহুবিধ সৃষ্টির সুযোগ পায় নাই। মনে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যের পথে চলিলে বাংলা সাহিত্যের একটি অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিত।

জগদীশচন্দ্রের কৌতুকপরায়ণ সামাজিক মনের উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত *On the Edges of Time* নামে পুস্তকে মজলিশী জগদীশচন্দ্রের একটি চিত্র পাওয়া যাইতেছে। রথীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন— Jagadish Chandra Bose had a wonderful fund of interesting stories, some very amusing, of the many lands he had visited and personalities he had met. He could go on telling them for hours and days together, yet one would never get tired of listening to him for he could always make the most trivial facts interesting, and his humour was so refreshing. He could also laugh, so few people can laugh well and at the proper time and place. I would greatly miss him when he went away ··

অব্যক্ত গ্রন্থের 'পলাতক তুফান' নামে রচনাটি একটি মজলিশী মনের সৃষ্টি। রচনাটিতে যে সার্থক

হাস্যরস আছে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে বিচিত্র ব্যাখ্যা আছে, সর্বোপরি যে সাহিত্যিক গুণ আছে তাহা যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের ঈর্ষার স্থল।

সর্বশেষে তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনার উল্লেখ করিতে হয়। যুক্তকর, ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে, নিবেদন, হাজির প্রভৃতি রচনা সেই অরূপ রশ্মিতে উজ্জ্বল।

"জীবনের যখন পূর্ণশক্তি তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি ; কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া সে তখন তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি, তবে বলিবার কি আছে? কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা দুর্মতি, এই ধান্ধাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সে কেবল বলিবে— আসামী হাজির।"

আসামী অনেক কাল হইল তাঁহার পদপ্রান্তে হাজির হইয়াছেন আর আমরা নিশ্চয় জানি তিনি যে কেবল বেকসুর খালাস পাইয়াছেন তাহা নয়, মহাবিচারকের পাদপীঠতলে উপবেশনের মহার্ঘ্য আসনটি লাভ করিয়াছেন। 'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা'— পার্থিব সকল অতৃপ্তির পরিণাম যে মহাতৃপ্তি তাহা লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জগদীশচন্দ্র মাতৃভাষার মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকগুলি সম্ভাবনার দীপ জ্বালিয়াছিলেন। বিধিনির্দিষ্ট প্রেরণা তাঁহাকে অন্যপথে চালিত না করিলে— এই সম্ভাবনার দীপগুলি উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল হইয়া বাংলা সাহিত্যাকাশে একটি অক্ষয় সপ্তর্ষিমণ্ডল রচনা করিতে পারিত— সেই শক্তি, সেই কবিমন, সেই সরস প্রসাদগুণ তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বসুবিজ্ঞানমন্দিরে অনুষ্ঠিত বিশেষ বক্তৃতামালার অন্যতম।

শিল্পরসিক জগদীশচন্দ্র

শ্রীনন্দলাল বসু

স্মৃতিলিখন : শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। গণেন মহারাজ নিয়ে গিয়ে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

আর্ট সম্পর্কে অনেক কথা বলতেন তিনি। বড়ো বড়ো সব আইডিয়া দিতেন আমাদের।

মহাভারতের দ্রোণ-চরিত্র ভালো লাগে নি তাঁর। 'ইন্‌সিন্‌সিয়ার লোক' বলেছিলেন তিনি সমালোচনা-প্রসঙ্গে। শিষ্যের আঙুল কেটে দিয়েছিলেন বলে তিনি পছন্দ করতেন না দ্রোণকে। সব চেয়ে পছন্দ ছিল তাঁর কর্ণকে— বীর কর্ণকে।

আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বরাবর। নিমন্ত্রণ করতেন বাড়িতে। খোঁজখবর করতেন প্রায়ই।

পরে, তাঁর সঙ্গে দেখা হয় যখন তিনি অজন্তা যান। মিসেস হেরিংহাম তখন অজন্তায়। তাঁকে কপিতে সাহায্য করবার জন্যে অজন্তা যাই আমি আর অসিত। সিস্টার নিবেদিতা গিয়ে অবনীবাবুকে বলে আমাদের পাঠালেন। ওখানে কাজ চলবার সময় বেঙ্কটাপ্পা আর সমরেন্দ্র গুপ্তকে আনিয়ে নিলেন হেরিংহাম।

অজন্তায় আমাদের কাজ চলছে। জগদীশবাবু, সিস্টার আর গণেন গুহায় গেলেন দেখতে। সঙ্গে ছিলেন লেডি বসুও।

অজন্তায় আমরা থাকতুম ফর্দাপুর ডাকবাংলোয়। টোঙ্গা থেকে ওঁরা নামলেন ওখানেই। সিস্টার নামলেন 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলতে বলতে ; গলায় তাঁর ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। জগদীশচন্দ্র আমাদের আস্তানা দেখে তার পর এলেন গুহায়, আমাদের কাজ দেখতে।

কাজ চালাচ্ছি আমরা তন্ময় হয়ে। বাইরের জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছিল। খাবার সময় বয়ে যেত। এই সব দেখে ওঁরা ভাবলেন, শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

জগদীশবাবুর সঙ্গে ছিল তাঁর মগ বাবুর্চি। সে লেগে গেল রান্না করতে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন জগদীশবাবু।

আমি তখন জাত মানতুম খুব। লেডি বসু ও সিস্টার নিবেদিতা অনুরোধ করলেন, সবাই একসঙ্গে খেতে। চেষ্টা করতুম, জল আর ভাত বাঁচিয়ে খাবার। ক্রমে সয়ে গেল সব।

অজন্তা থেকে ফিরে এসে, পরে 'বিচিত্রা'য় কাজ করি। 'বিচিত্রা'র শেষ পর্বে, আমি আর সুরেন কর রইলুম কলকাতাতেই। তখন প্রতিমা দেবীকে শেখাচ্ছি আমি। জগদীশবাবুর বৈঠকখানায় আর লেকচার-হলে ফ্রেস্কো করার কথা হল। কথা বললেন অবনীবাবু।

ফ্রেস্কোর জন্য আড়াই ফুট তিন ফুট চওড়া আর পাঁচ-ছ ফুট লম্বা সেগুন কাঠের তক্তা গণেন মহারাজ কিনে দিয়ে গেলেন আমাদের। কি কি ছবি করতে হবে সে কথা জানবার জন্যে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বললেন গণেন।

রণ-কল্পনা

উদয়সবিতা
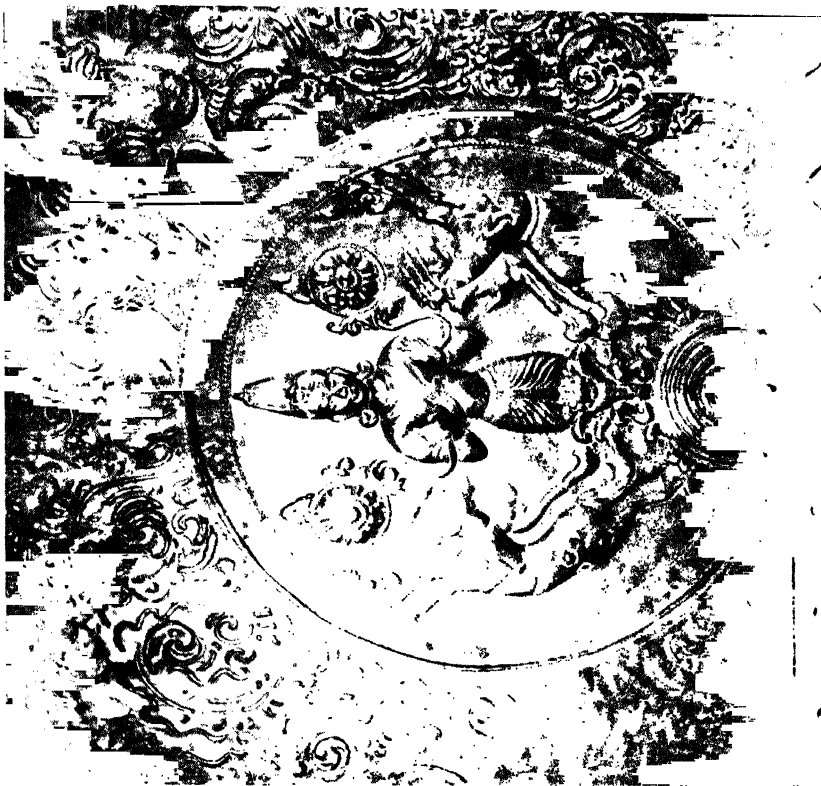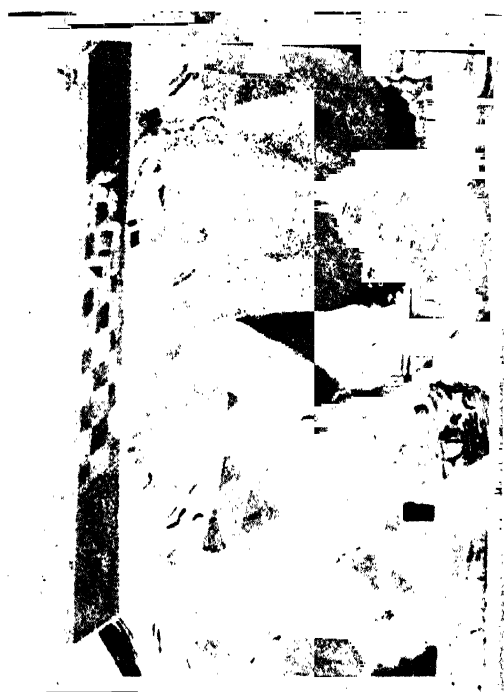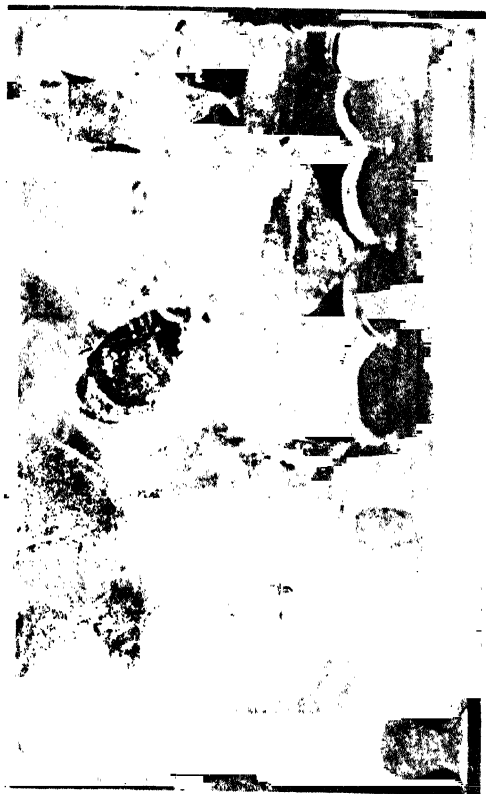
কথা হল, ছবি হবে মহাভারত থেকে আর অজন্তার কপি থেকে। মহাভারতের যে প্যানেল করলুম তার দেওয়ালের এক দিকে পার্থসারথি, মাঝখানে পাশাখেলা, আর-এক দিকে হাতির পিঠে চড়ে দুর্যোধন যুদ্ধ করছেন।

উল্টো দিকের দেওয়ালের, অর্থাৎ রাস্তার দিকের দেওয়ালের, মাঝখানে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ— একলা চলেছেন যুধিষ্ঠির, সঙ্গে ধর্মরূপী কুকুর।

আর দু পাশে দুটো প্যানেল। তাতে আছে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষপর্ব। জনশূন্য প্রকাণ্ড মাঠ। মাঝে মাঝে চিতা জ্বলছে। কৃপাচার্যেরা সবাই পালাচ্ছেন। মাঝে যুধিষ্ঠির।— এ সব করলুম আমি।

মাঝে মাঝে অজন্তার প্যানেল। দুটো পদ্ম— এই সব করলেন স্থরেন। স্থরেন অজন্তার প্যানেল মোট করলেন চারটে।

লেকচার-হলে তামার প্লেটে সৌরজগতের ডিজাইন করেছিলুম আমি, ঠোকাইয়ের কাজের জন্যে। চিৎপুর রোডের একজন কারিকর আমার সেই ডিজাইন থেকে করে দিলেন।

সরস্বতীর ডিজাইন করতে বলেছিলেন জগদীশবাবু। সে আর করা হয় নি।

সিস্টারের রিলিফের এক মূর্তি আছে বস্থবিজ্ঞানমন্দিরে। সে ডিজাইন আমার করা। বোম্বের কার্‌মাকার করেন ঐ রিলিফের কাজ আমার ডিজাইন থেকে।

ছ' মাসের বেশি লেগেছিল আমাদের, সব মিলিয়ে শেষ করতে। দিন-রাত কাজ করতুম আমরা।

বৈঠকখানার মাঝের প্যানেলটা করেছিলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ। অবনীবাবুর 'ভারতমাতা' ছবির লাইনে-করা ফ্রেস্কো।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় অবনীবাবু এঁকেছিলেন 'বঙ্গমাতা'র ছবি। তারই নাম হল পরে 'ভারতমাতা'। নাম দিলেন সিস্টার নিবেদিতা।

'ভারতমাতা' নাম দিয়ে সে ছবি তখন সিল্কের পতাকার উপর ক'রে, প্রোসেশন করা হত সেই স্বদেশী আমলে। সেই 'বঙ্গমাতা'রই রেখাচিত্র আর্ট স্কুলের ঈশ্বরীপ্রসাদ জগদীশবাবুর বৈঠকখানার মাঝের প্যানেলে এঁকে দিয়েছিলেন।— জগদীশবাবু ছিলেন খাঁটি স্বদেশী মানুষ।

প্যাট্রিক গেডিসের প্রসঙ্গে ওঁদের কথা মনে পড়ে। প্যাট্রিক গেডিস থাকতেন এসে জগদীশবাবুর ঘরে। লেডি বস্থ ওঁকে যত্ন করতেন মায়ের মতন। ওঁদের ওখানে আমি গিয়েছিলাম গেডিসকে দেখতে। সেই সঙ্গে কাজও ছিল ; ওঁদের জন্যে সিল্কের উপর যে ছবি করেছিলুম সেটা তখন ওঁদের লেকচার-হলে খাটিয়ে দেওয়া হবে।

এখনও লেকচার-হলের উপরে টাঙানো আছে সে ছবি— কল্পনা আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। একটি মেয়ে বাঁশি বাজিয়ে আগে আগে চলছে আর তার পিছনে পিছনে চলছে একজন পুরুষ— হাতে খাপখোলা তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করতে করতে।

ছবিখানি দেখে গেডিস বললেন, 'ভালো হয়েছে। তবে, আর-একটা জিনিস করো। যে লোকটা চলে যাচ্ছে, পিছন-পথে তার পায়ের চিহ্ন এঁকে দাও। অতীতের ট্র্যাডিশন ওটা।'

কি দিয়ে করব ; রঙ তো আনা হয় নি।

'খড়ি দিয়ে ক্যুর দেবে। তাতে কি। খড়ি অনেক দিন থাকবে।'

খড়ি দিয়েই আমি এঁকে দিলুম পদচিহ্ন।

কলকাতায় কিসের একটা মীটিং ছিল একদিন। গেডিস বেরচ্ছেন বক্তৃতা দিতে। অনেক দিন হয় মাথার চুল ছাঁটা হয় নি। আরসি দেখে, নিজের মাথার চুল নিজেই ছেঁটেছেন। এব্ড়োখেব্ড়ো হয়েছে মাথাময়। লেডী বসু আপত্তি করলেন। গেডিস্ বললেন, 'তা হোক্, ওতে কি হবে।' বসুজায়া সে কথা না মেনে, নিজেই কাঁচি দিয়ে চুল খানিক সোজা ক'রে দিলেন সাহেবের।

একবার ফাউন্টেন পেনের কালী বুক পকেটে লেগে গেছে। লেডী বসু আপত্তি করলেন সে জামায়। সাহেব বললেন, 'ও থাক্-না।' নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে। কাচবারও সময় নেই। তখন খড়ি নিয়ে নিজেই ঘষে দিলেন। কালীর দাগের উপর আরও খানিক সাদা পোঁচ পড়ল।

জগদীশবাবুর বাড়িতে গেডিসের কথা আরও আছে। দার্জিলিঙে নীলরতনবাবুর বাগানবাড়ি ছিল। গেডিস্ গিয়ে সেই বাড়িতে উঠেছিলেন। ডক্টর বোসও থাকতেন ওখানে গিয়ে। সে সব প্রসঙ্গ আজ থাক্।

তবে আজও জানতে ইচ্ছে করে, ছবির লোকটার সেই পিছনে-ফেলে-আসা পদচিহ্নের সাদা খড়ির দাগগুলো আছে কি না।

ভারতপথিক আচার্য জগদীশচন্দ্র

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সন্তদের বাণী দেখলে বুঝতে পারি যে সন্তদের ধর্মের উদারতা অতিশয় চমৎকার। সন্তদের বাণী নিয়েই আমি চিরদিন কাজ করেছি। তখন দেখতাম পণ্ডিতেরা এইসব সন্তমতকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। যদিও এখনো তাঁদের গ্রন্থ এবং লিখিত শাস্ত্রের প্রতি পণ্ডিতজনের যথেষ্ট শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে তবু এখন সন্তবাণী ভালো করে জানার প্রয়োজন অনেকে অনুভব করছেন।

কি সহজ মুক্ত ভাব! এক নিরক্ষর সন্তের ছোট্টো একটি বাণী বলি, তবেই আমার কথা বোঝা যাবে।

ঝড়ে নৌকা ডুবে গেছে। মানুষ ঝড়ের তাড়নায় ডুবে গিয়ে জলের নীচে হাত-পা ছুঁড়ছে। তখন মাছের দল তাঁকে জিজ্ঞেস করছে, কেন লাফালাফি করছ—

কোঁ্যা রে লড়না
কোঁ্যা রে মরণা
কোঁ্যা রে উপর জানা।

মানুষ যখন জলে ডুবছে তখন সে বলল আমার নৌকা যে-বাতাসে ডুবছে প্রতি নিঃশ্বাসেই যে সেই-বায়ুর পরশ চাই।—

জিস্‌মে মেরী নাও ডুবাঈ
হরদম উস্‌কো পানা।

অর্থাৎ যে হাওয়া আমার তরী ডুবিয়েছে, প্রত্যেক নিঃশ্বাসেই আমি যে তাকেই চাই।

এই কথাই কবীর আর-এক স্থানে বলেছেন— নগরে লাগল আগুন, সারা নগর পুড়ে শেষ হয়ে গেল, মনে হল এরা আর কখনো আগুনের ধার ধারবে না। প্রভাতকালে দেখি একটি মেয়ে হাতে খড়-কুটো নিয়ে কোথায় চলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, হে কন্যে, কোথায় চলেছ, কিসের খোঁজে? মেয়েটি বলল, আগুন চাই। আ রে, এ কি কথা। কাল সন্ধ্যায় যে আগুনে পুড়ে নগর ছাই হয়ে গেল, আজ প্রভাতে প্রথমেই দেখছি তুমি সেই আগুনের খোঁজেই বের হয়েছ।—

সারা পাটন্ জ্বলি খুয়া
তৌ ভী জোহৈ আগি।

শান্তিনিকেতনে যখন এলাম তখন দেখলাম যে, আমার জানাশোনা অনেক মহাপুরুষের কবির সঙ্গে গভীর যোগ আছে। আবার এমন মহাপুরুষকে এখানে এসে জানলাম যাঁদের বিষয়ে পূর্বে কখনো ভালো করে আমি কিছুই জানতাম না।

যে কাশীতে আমার বাল্যকাল কেটেছে সেখানেও এক দল এমন প্রাচীনপন্থী আছেন যাঁরা কখনো সন্তদের বাণী শ্রদ্ধা করে শুনবেন না। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, গুরুদেবের কী গভীর শ্রদ্ধা এইসমস্ত

বাণীর প্রতি। কয়েকজনকে এখানে পেলাম যাঁরা এই সন্তবাণীর মর্ম উদ্‌ঘাটনে অতিশয় চমৎকার কাজ করেছেন।

কবীরের এক বড়ো মঠ রয়েছে মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুর জেলায় কুদরমাল নামক স্থানে। কুদরমাল যেতে হলে দুইটি স্টেশনের সহায়তা পাওয়া যায়। স্টেশন দুইটির একটির নাম চাঁপা, আর-একটি বড়দুয়ার। কবীরের পরিচয়ও লোকদের মধ্যে খুব কম।

গুরুদেবের কাছে আছি। তাঁর বাণী শুনি। তার এক-একটি স্থানে এমন-সব বাণী গুরুদেবের কাছে শুনেছি যা একেবারে আমাদের বহু অন্ধকার অচিরে দূর করে দিত।

ক্রমশ এখানে সন্তমতের বড়ো সহায়ক দুই-এক জন গুরুদেবের বন্ধুজনের মধ্যে পাওয়া গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, ডাক্তার সিলভ্যান লেভী, ডাক্তার উইনটারনীজ প্রভৃতি। তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ হয়ে বহু বিষয়ের অন্ধকার কেটেছে।

কিন্তু সবচেয়ে আমার আশ্চর্য লেগেছিল, যখন পদার্থবিজ্ঞানের এক মস্ত পণ্ডিতের কাছে কতকটা সহায়তা পেলাম। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আমাদের পূর্ববঙ্গেরই মানুষ এবং একই বিক্রমপুরের বাসিন্দা আমরা। শুনেছি পূর্বে দেশে থাকতে তাঁদের সঙ্গে যাতায়াত ছিল আমাদের। আমার পিতৃদেবের মেডিকেল কলেজের সহাধ্যায়ী ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু আচার্য জগদীশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

জগদীশ বসু মহাশয় একদিন এমন-একটি কথা বললেন যা শুনে আমার অনেক দিনের একটা সংশয় দূরীভূত হল।

ভক্ত কবীরেরও মত— সকল সাধনাকে এবং সাধককে খুব উদারভাবে সমস্ত ধর্মের মর্মে প্রবেশ করতে হবে। কবীর বলেছেন, আমাদের দেশমাতার যে বিরাট বীণাযন্ত্রটি, তাতে বহু তন্ত্রী বিরাজমান। সেই বীণাযন্ত্রটি ছোটো বড়ো নানা তারে নানা সুরে বাঁধা। সবগুলো মিলে তাতে যে মহাতান ওঠে তাই হল ভারতের সাধকের কাম্য।

এই জন্যই ভারতের আত্মপরিচয় দিতে হলে সেই সমগ্রতা কোথাও যেন ক্ষুণ্ণ না হয় তাই দেখতে হবে। ভারতের যিনি ভারতী তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পাওয়া যাবে যে ভারতের সর্বস্বরসমন্বয়ই হল আমাদের দেশের মর্মগত পরিচয়।

তাই কবীর বলেছেন আমাদের দেশের যে এত মতামত এত ভিন্নতা তবু তার সবই বজায় রাখতে হবে। যে-কোনো একটি সুর বা তন্ত্রীকে উপেক্ষা করে অসম্মান যদি করি তবে সে আর আমাদের দেশের বিচিত্র বীণা রইল না।

তাই কবীর ভারতের ধর্মকে কোনো এক সম্প্রদায়-বিশেষের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। এই ভারতের সমস্ত মতের এই যে অপূর্ব একটি সমন্বয়, যাতে তার একটি তারকেও বাদ দেবার উপায় নেই। সর্বস্বর-সমন্বয়ের যে বীণা তাই হল ভারতের মরমের পরিচয়—

পঞ্চ বীণ শত ধুন উচারে
যো বেধত হিয় মঁঝারে হো।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের চিন্তাধারাও যে এইরূপ তা টের পেলাম তাঁর একদিনের কথাতে।

যদিও জগদীশচন্দ্র বয়সে রবীন্দ্রনাথের কিছু বড় ছিলেন, তবু তাঁর এত বড় বন্ধু আর বোধ হয়

কাকেও দেখি না। রবীন্দ্রনাথকে দেখা যেত ভুবন সরকারের লেনের মধ্য দিয়ে একটি সরু পথ দিয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ি যাচ্ছেন। একদিন জোড়াসাঁকোতে আমি আর শান্তিনিকেতনের সন্তোষচন্দ্র মজুমদার বসে আছি। গুরুদেব হঠাৎ আমাদের ডাক দিলেন— তাঁর সঙ্গে জগদীশবাবুর বাড়ি যেতে হবে। সেদিন, কেন জানি না, কোনো গাড়ি এল না। গুরুদেব আগে চলেছেন, আমরা চলেছি তাঁর পিছনে। যেতে যেতে হঠাৎ সেই গলিটার মধ্যে তিনি যে এমন করে ঢুকে যাবেন বুঝতেই পারি নি। সন্তোষ ও অজিত চক্রবর্তীর কাছে এই পথের কথা পূর্বে শুনেছিলাম। গলিটা তখনো দেখি নি।

সেদিন গুরুদেবের সঙ্গে কথা হচ্ছে আচার্য জগদীশের সঙ্গে, তার মধ্যে হঠাৎ কি যেন কোনো কারণে আমাকে বলতে হল একটি কথা। ভারতবর্ষে এই সর্ব-সত্য-স্বীকার-করা মতকে কবীর নিজে ভারত-পন্থ বলে গেছেন। আমার হাতে সেদিন ঠাণ্ডারাম মালগুজারের সহায়তায় মুদ্রিত একখানি বই ছিল কবীরপন্থী যুগলানন্দজীর লেখা। যাতে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন 'ভারতপথিক' বলে। আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতপথিক শব্দটি দেখে এত আনন্দিত হলেন যে তার তুলনা নেই।

আচার্য জগদীশ বললেন, এই শব্দটি তো অতি সুন্দর। এটিকে ব্যবহার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তা করে গেছেন। জগদীশচন্দ্র কোথাও বলেছেন কি না বলতে পারি না। তবে সেদিন হতে আচার্য বসুর বাড়িতে আমার যাতায়াতের পথ খুলে গেল।

আমার কর্মস্থল শান্তিনিকেতন। কলিকাতায় আমার যাতায়াত বিশেষ প্রয়োজন না হলে হত না। অনেক বৎসর ধরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন ৩০শে নভেম্বর যেতাম।

বসু-বিজ্ঞানমন্দির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানটি প্রাচীন ভারতীয় মতে হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে তাঁর প্রিয় বিজ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ -উৎসবের সমস্ত মন্ত্র আমাকে সংকলন করতে হয়। ঝাড়গ্রাম বাণীভবনে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানটি আমাকেই করতে হয়েছিল। এইসব কারণে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে আলাপের সুযোগ হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র বসু ও জড় এবং জীবের সাড়া

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু

বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম যে ভারতীয় বিজ্ঞানী তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন সেই জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিক ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮। ১৮৮৭ সালে জার্মানির বিজ্ঞানী হার্জ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে এক যুগান্তরকারী গবেষণা সম্পাদনা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসু, লজ, রিঘি, ফ্লেমিং, মার্কনি প্রভৃতি বিজ্ঞানী হার্জ-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে বহু পরীক্ষায় ব্যাপৃত রইলেন। বিনা তারে বার্তা প্রেরণ তাঁদের পরীক্ষায় সম্ভব হল। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এক সেন্টিমিটারের চেয়েও ছোটো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বৈদ্যুতিক ঊর্মি তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রতিপন্ন করলেন যে, আলোকের ধর্ম ও এই বিদ্যুৎতরঙ্গের ধর্ম হুবহু এক। যন্ত্রের যে অংশে এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরা পড়ে, জগদীশচন্দ্র সেই গ্রাহক-অংশের ধর্ম সম্বন্ধে বহু গবেষণা করলেন। তিনি দেখালেন যে, যন্ত্রকৃত আঘাত, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, আলোক প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের উত্তেজনায় গ্রাহক-অংশ একই ভাবে সাড়া দেয়। এইসব গবেষণা জড় ও জীবের সাড়া নামক পুস্তিকায় তিনি প্রকাশ করলেন। ধাতব পদার্থ ও জীব-পেশীর মধ্যে কতকগুলি সাড়ার সমতা লক্ষ্য করার পর তিনি উদ্ভিদের সাড়া সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন, কারণ উদ্ভিদ হল সরল জড় ও জটিল প্রাণীর মধ্যবর্তী। ১৯০২ সাল হতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে তিনি তাঁর অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন, আর ১৯১৭ সালে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেখানেই ওইসব গবেষণা চলতে থাকল।

জড় ও জীবের সাড়া এক প্রকারের— বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের এত বড়ো একটা উক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে অনুধাবন করতে হয়, জীবন বলতে আমরা কি বুঝি। এক কথায় এর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি সজীব পদার্থের এইসব বৈশিষ্ট্য থাকবে— আত্তীকরণ, প্রজনন, আঘাতে সাড়া দেবার শক্তি ও বাইরের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা।

জীবিত পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে সরল হল একটি কোষ দিয়ে গঠিত সবুজবর্ণের শেওলা। বদ্ধ জলাশয়ে এদের দেখা যায়, এরা সেখানে বেড়ে বেড়ে চলে। এরা হল জীব-অভিব্যক্তির সব নীচের ধাপে, আর সব উপরে রইল বহুকোষযুক্ত প্রাণী। প্রাণিদেহে কোষগুলি এক-একটি বিভাগে দলবদ্ধ হয়ে থাকে— কোথাও পেশীভাবে, কোথাও নার্ভের আকারে, কোথাও মস্তিষ্করূপে। ওই যে সবুজবর্ণের এককোষযুক্ত শেওলা, তার ওই কোষেতেই জীবনীক্রিয়ার সমস্ত-কিছু সংহত হয়ে আছে। এই জীব-কোষ বাইরে থেকে বিভিন্ন রকমের অজৈব মলিকিউল আত্মসাৎ ক'রে নিজ দেহ পুষ্ট করতে থাকল; জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন, ফসফরস, পটাশিয়ম প্রভৃতি দিয়ে গঠিত যৌগিক পদার্থ নিয়ে নিজেদের শ্বেতসার, চর্বি, প্রোটিন প্রভৃতি গঠন করল। এইভাবে জটিল কোষ গঠন করতে যে শক্তির প্রয়োজন তা সে পেল সূর্যালোক থেকে; সূর্যালোক শোষণ করল ওই কোষের ক্লোরোফিল মলিকিউলরা। সেলগুলি আয়তনে বাড়তে থাকল, শেষে তারা বিভক্ত হল, তাদের

লণ্ডন রয়াল ইন্সটিটিউটে বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে আবিষ্কার বিষয়ে বক্তৃতা রত জগদীশচন্দ্র। ১৮৯৭

ছাত্রবৃন্দসহ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

উপবিষ্ট। বাম দিক হইতে। মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশচন্দ্র, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

দণ্ডায়মান। বাম দিক হইতে। স্নেহময় দত্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

সন্তানসন্ততি দেখা দিল। একটি সরল জড় পদার্থ হতে কি ভাবে জীবের উৎপত্তি হয় এই হল তার একটি উদাহরণ।

বর্তমানকালে জীব-অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ স্বীকৃত হয়েছে যে, জড় হতেই জীবনের উদ্ভব। যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই অভিব্যক্তি চলেছে তাতে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও অন্য কয়েকটি সরল মৌলিক পদার্থ জটিল হতে জটিলতর মলিকিউলে পরিণত হচ্ছে। কল্পনা করা হয়, এইসব জটিল মলিকিউল ধীরে ধীরে জীবিতকোষের দুটি বৈশিষ্ট্য লাভ করছে; একটি হল চতুষ্পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত সরল মলিকিউলকে আত্মসাৎ করা, অপরটি ওইসব মলিকিউল গ্রহণ করে নিজদেহে অনুরূপ মলিকিউল সৃষ্টি করা। এই দুই প্রক্রিয়াকে বলা যায় পুষ্টি বৃদ্ধি ও প্রজনন। এইসব জটিল মলিকিউল গঠনে মধ্যবর্তী স্তরে কি কি প্রক্রিয়া চলেছে সে সম্বন্ধে বহু জল্পনাকল্পনা হচ্ছে। এইসব কল্পনার মধ্যে একটা মূল কথা রয়েছে এই, জীবনের ধর্ম জড়পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, অ্যাটমদের মধ্যে রাসায়নিক আসক্তির ফলে বিশেষ অবস্থায় তা পরিস্ফুট হচ্ছে, আর এইভাবে জড় হতে জীবের উৎপত্তি।

জীবনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা। যেসব উচ্চশ্রেণী প্রাণীর নার্ভ ও পেশী আছে তারা কিভাবে সাড়া দেয় আগে দেখা যাক। আঘাত দিলে, বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উত্তেজিত করলে, রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে— বাইরের সকল রকম উত্তেজনায় তারা নিজ দেহে তড়িৎ-স্রোতের সৃষ্টি করে; আর কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই কারণে ইংরেজ জীববিদ্যাবিশারদ ওআলার এই মত প্রকাশ করেন যে, বাইরের উত্তেজনায় বৈদ্যুতিক সাড়া দেওয়া হল জীবনের বৈশিষ্ট্য, আর এই বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে সূক্ষ্ম, সব চেয়ে ব্যাপক। জীবন সম্বন্ধে ওআলার-এর এই সংজ্ঞা জগদীশচন্দ্র গ্রহণ করলেন।

একই জাতীয় প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়ে গঠিত জীবনের প্রথম বিকাশ যে ছত্রক সেও উত্তেজনীয়, আর তার উত্তেজনা সে প্রকাশ করে সংকুচিত হয়ে, নিজদেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে। জীব-অভিব্যক্তির ঊর্ধ্বতম বিকাশ হল প্রাণী; প্রাণিদেহে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গড়ে উঠেছে— চোখ দিয়ে সে দেখছে, কান দিয়ে শুনছে, নাক দিয়ে শুঁকছে, জিব দিয়ে আস্বাদ নিচ্ছে, আর সর্বদেহ দিয়ে স্পর্শ অনুভব করছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়যন্ত্র থেকে নার্ভ চলে গিয়েছে, ; স্থানে স্থানে তারা মিলিত হচ্ছে, আবার সেখান থেকে বেরচ্ছে, শেষ অবধি মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে এসে পৌছচ্ছে। মস্তিষ্কে বাইরের পৃথিবীর যে ছাপ পড়ছে তা দেহমধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহে চালিত হচ্ছে। প্রাণিজগতে শীর্ষস্থানীয় হল মানব; মানবের মস্তিষ্কে যে উত্তেজনা পৌছচ্ছে তাতে তার চেতনাশক্তি জাগরূক হচ্ছে, আর বাক্যের সাহায্যে সে তার চিন্তাকে অপরের নিকট পৌছে দিচ্ছে। জীবাভিব্যক্তির দীর্ঘ প্রসারিত ধারার একদিকে রয়েছে প্রোটোপ্লাজ্‌ম, যে সাড়া দিচ্ছে সংকুচিত হয়ে, বৈদ্যুতিক প্রবাহ পাঠিয়ে, আর ওই ধারার অপর প্রান্ত এসে পৌছেছে মানবে, যে মানব চেতনা-শক্তির অধিকারী হয়ে তারই সাহায্য নিয়ে তার উদ্দীপনা প্রকাশ করছে।

জড় হতে জীবের উৎপত্তি কি রকমে ঘটছে— এর উত্তরে কল্পনা করা হয়েছে যে, জড়ের মধ্যে জীবন প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার রাসায়নিক আসক্তির মাধ্যমে ওই জীবনের প্রকাশ। সেই রকম ভেবে নেওয়া যেতে পারে যে, চেতনা জড়ের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এখন প্রশ্ন হবে, এই চেতনা কিভাবে নিজেকে প্রকাশিত করছে।

জগদীশচন্দ্র বল্‌লেন— জড়ের বৈদ্যুতিক সাড়া হল এই প্রকাশের দূত; আর তিনি বললেন, এই

কারণেই জড় ও জীবের মধ্যে আমরা সাড়ার সমতা লক্ষ্য করি। যেসকল অনুসন্ধানের ফলে জগদীশচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর এই মত ব্যক্ত ক'রে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিপ্লব আনলেন সেই অনুসন্ধানের মূলে ছিল তাঁর এই কয়টি পরীক্ষা।

বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার জন্য তিনি একটা নলে কিছুটা গুঁড়া ধাতব পদার্থ নিলেন। একটা ব্যাটারি হতে তড়িৎপ্রবাহ ওই ধাতুচূর্ণ ও একটি গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এখন, ওই গুঁড়ার উপর যেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পড়ল অমনি পূর্বপ্রবাহের উপর আর-একটি তড়িৎস্রোত অনুবিদ্ধ হল, গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়ে গেল। এই রকমের পরীক্ষা করতে: করতে জগদীশচন্দ্র লক্ষ্য করলেন অনুবিদ্ধ তড়িৎস্রোত ধীরে ধীরে কমে চলেছে, যেন বৈদ্যুতিক তরঙ্গে আহত ধাতুচূর্ণের একটা ক্লান্তি আসছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলেন, তড়িৎপ্রবাহ আগের মতো চলতে রইল, বিশ্রামে যেন ওই ধাতুচূর্ণের ক্লান্তি দূর হল। ধাতুচূর্ণের পরিবর্তে গ্যালেনা স্ফটিক ব্যবহার করে জগদীশচন্দ্র একই ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। এখন তিনি দুটা টিনের তার নিলেন, প্রতি তারের একটি করে প্রান্ত জলে ডোবানো রইল। তার দুটির অপর দুই প্রান্ত গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত। এখন একটি তারে মোচড় দিলেন; লক্ষ্য করলেন, গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে একটি তড়িৎস্রোত বয়ে গেল; তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা বেড়ে গেল যখন জলে একটুখানি উত্তেজক সোডিয়ম বাই-কার্বনেট দেওয়া হল; আবার তড়িৎপ্রবাহ কমতে কমতে এসে থেমে গেল যখন অক্সালিক অ্যাসিডের মতো অবসাদক জলে মিশিয়ে দেওয়া হল। উদ্ভিদে, প্রাণীর পেশীতে তো ওই একই রকমের ব্যাপার ঘটে থাকে— ক্লান্তি, উত্তেজনা, অবসাদ অনুরূপ অবস্থায় দেখা দেয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন— পাশাপাশি ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণিপেশীর উপর পরীক্ষা চলল; বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রে সাড়ালিপি গৃহীত হতে থাকল (চিত্র ৪)। দেখলেন, কি জড়ে, কি জীবে, ক্লান্তিতে একই রকমে সাড়ার পরিমাণ কমে, উত্তেজকে বাড়ে, বিষপ্রয়োগে এই সাড়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সাড়ালিপির এই সমতা লক্ষ্য করে তিনি বললেন— এখন কোথায় রেখা টেনে বলব, পদার্থবিদ্যার নিয়ম এখানে শেষ হল, আর শারীরবৃত্তের নিয়ম আরম্ভ হল; আদৌ এই রকমের ভেদরেখা টানা যায় না।

জগদীশচন্দ্র বললেন— এইসব সাড়ালিপি কি আমাদের জানাচ্ছে না যে, জড় ও জীবের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম আছে যা উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত। ওইসব সাড়ালিপি কি এই কথা বলছে না যে, জীব যে সাড়া দিচ্ছে জড়ে তা পূর্ব হতেই সূচিত হয়েছে। আমরা আজ জানলুম যে, শারীরবৃত্তের নিয়মসমূহ পদার্থবিদ্যা-রসায়নবিদ্যার নিয়ম হতে একেবারে বিযুক্ত নয়। জানলুম যে, বিজ্ঞান এক, আর তার নিয়মগুলি ধীরে ধীরে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। কোথাও কোনো ব্যবধান এসে দু দিককে পৃথক ক'রে ফেলছে না।

পৃথিবীর উপাদান জড়পদার্থ হতে প্রাণিজীবন ও তার চেতনার উৎপত্তি, এ কথা স্বীকৃত হয়েছে। তা হলে ধরে নিতে হবে, অচেতন জড় পদার্থের মধ্যে জীবন ও চেতনা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন জীবন ও চেতনা কিভাবে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে? জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, রাসায়নিক আসক্তির দ্বারা ব্যাপারটা ঘটছে; এই প্রক্রিয়ায় একটি সরল মলিকিউল বাইরের কয়েক রকমের অ্যাটম আত্মসাৎ ক'রে ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে, আর শেষ অবধি তা
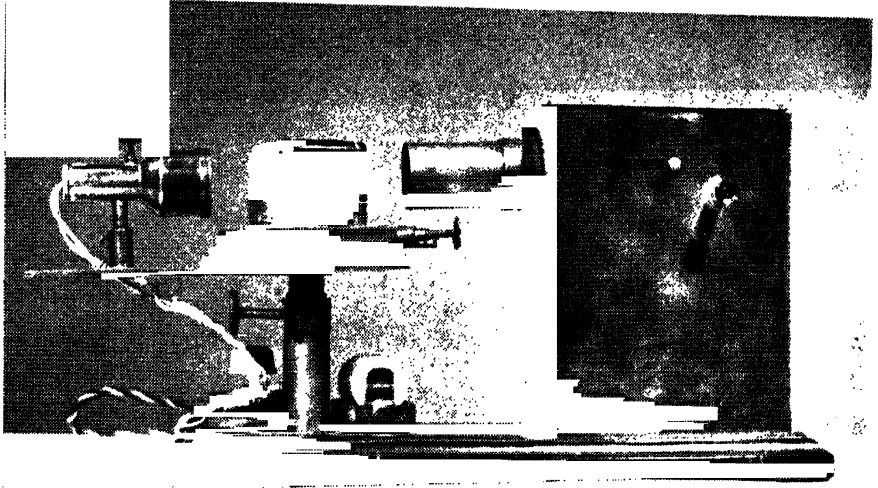
চিত্র ১। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত বিদ্যুৎতরঙ্গ উৎপাদক যন্ত্র
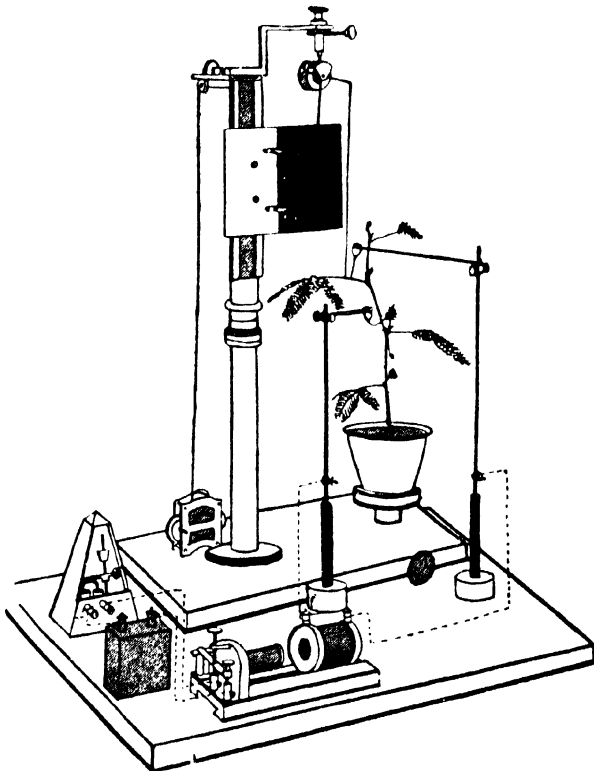
চিত্র ২। সমতাল-তরুলিপি যন্ত্র বা রেজোনান্ট রেকর্ডার
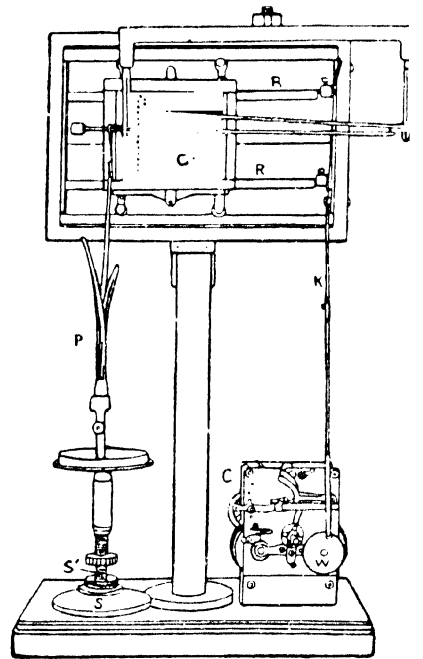
চিত্র ৩। বৃদ্ধিমান যন্ত্র বা হাই-ম্যাগ্নিফিকেশন (
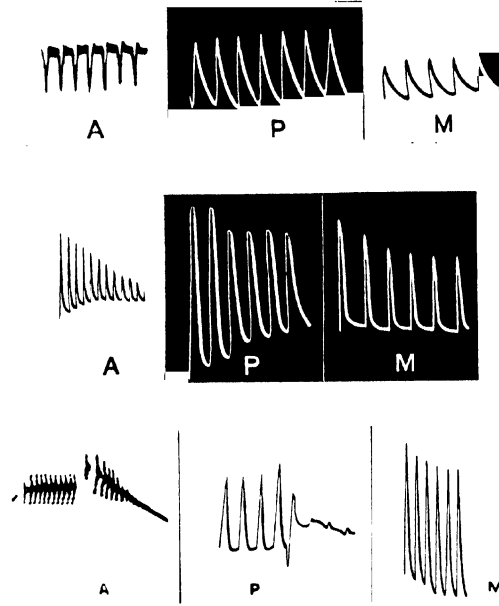
চিত্র ৪ । বামে : প্রাণীর সাড়া । মধ্যে : উদ্ভিদের সাড়া । দক্ষিণে : ধাতুর সাড়া
উপর হইতে নীচে : বিভিন্ন অবস্থায় উহাদের সাড়া

চিত্র ৫ । লজ্জাবতী লতা
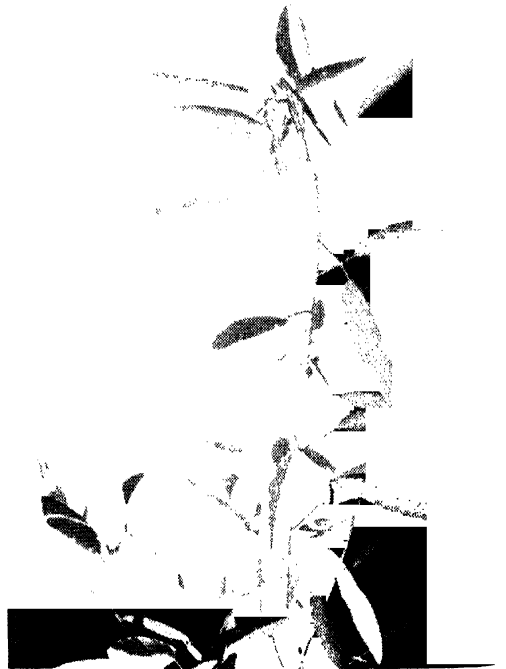
চিত্র ৬ । বনচাঁড়ালের গাছ

হতেই প্রাণের উৎপত্তি। সেই রকম জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষা হতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জীবের চেতনা উদ্ভূত হচ্ছে তা হল জড় ও জীব উভয়ের বৈদ্যুতিক সাড়া দেবার ক্ষমতা যা উভয়ের মধ্যে একই ভাবে কাজ ক'রে চলেছে। জড় ও জীবময় এই ব্রহ্মাণ্ডকে এক সূত্রে বেঁধে তার বিরাটত্বকে কল্পনার মধ্যে আনতে ভারতে প্রাচীন ঋষিরা বলেছিলেন— যঃ একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। বর্তমান যুগে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী পরীক্ষালব্ধ সত্য দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিভিন্ন দেশে ইতিহাসের বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানী এই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উদ্ভব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করে চলেছেন। তাঁদের সেইসব চিন্তাধারায় এই কয়টি বিশেষ স্তর দেখা যায়। প্রথম, জড়ের মধ্যে যেসব ব্যাপার ঘটছে তাকে গণিতের মানের মধ্যে নিয়ে আসা; দ্বিতীয়, জীবনকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নিয়মসমূহ দিয়ে ব্যক্ত ক'রে চলা; তৃতীয়, জড় হতে জীব কী ভাবে উদ্ভূত হল আর সেই জীবের মধ্যে চেতনা কি ভাবে দেখা দিল। পদার্থের মধ্যে জীবনের ও চেতনার বীজ প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে। রাসায়নিক আসক্তি ও উত্তেজনীয়তা, এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তারা পরিস্ফুট হচ্ছে।

জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে, বিশ্বে জড় ও জীব উভয়ের মধ্যে উত্তেজনীয়তা বর্তমান। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ হল জগদীশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় দান।

বীরনীতি

জগদীশচন্দ্র বসু

যদি বিজ্ঞান কিছু শিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহাই স্বরূপ নয়। সর্বদা ভুল দেখি, ভুল ভাবি ও ভুল শুনি। আমরা ক্ষুদ্র সৃষ্ট বস্তু হইয়াও যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্নেহমমতার চক্ষে দেখি তবে যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার মমতা আমাদের অপেক্ষা কত বেশি।

আমাদের বুদ্ধির অতীত বিষয়ে মন ক্লিষ্ট না করিয়া আমাদের করিবার অনেক আছে। হয়তো আমরাই সৃষ্টিকর্তার হস্ত। আমাদের হস্ত আড়ষ্ট হইলে সৃষ্টিকর্তার কার্য আড়ষ্ট হইবে।

যাহা অজ্ঞাত তাহাই বিভীষিকাময়, সেইজন্যই আমরা মরণকে মিথ্যারূপে দেখি। আমার নিকট তো সমস্ত জগৎই জীবন্ত।

আর-এক কথা— যাহা অনিবার্য তাহাকে বরণ করিতেই হইবে, পৌরুষ সহকারে অথবা ভীত চিত্তে।

যদি মাতৃপ্রেম বিধাতার প্রদত্ত হয়, তবে তাঁহার স্নেহ এবং করুণা মানুষের মমতা হইতে গভীরতর। শ্রান্ত শিশু যদি মাতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে ঘুমাইতে পারে, তাহা হইলে মরণনিদ্রাতে ভয় কি?

এই জীবন একটা মহাক্রীড়াস্বরূপ। আমরা কি একটা উপলক্ষ্য করিয়া ইহাকে পাশার ন্যায় নিক্ষেপ করিতে পারি না?— হয় জয় কিম্বা পরাজয়। আপনি জীবনকে আনন্দময় দেখিতে চান। কিন্তু ঝটিকা ও অগ্ন্যুৎপাতেও এক মহাসংগীত আছে।

আমরা এখানে শান্তির ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আছি, কিন্তু অদূরেই লক্ষ লক্ষ লোক নিজেকে যন্ত্রণাময় মরণে আহুতি দিতেছে। ইহাদের নিরানন্দে হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল হইবে।

আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ, সুখ কি দুঃখ, ইহাতে কি আসে যায়?

আসল কথা পূর্ণতা অথবা অপূর্ণতা লইয়া, ইহার মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণ করিব?

হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার? সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাসবলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে মাঝে দুই-একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়বলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।

সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্বলতা ঘটে।

যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাসনয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারংবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে।

অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিম্বা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস— কোন্‌টা অধিক বিস্ময়কর?

জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! এ কথা সর্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাগতি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। উর্ধ্বাভিমুখেই সৃষ্টির গতি; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।

ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়; প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতদিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।

বীরনীতি আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান। এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের।

বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য।

জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ-আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দান রূপে গৃহীত হয়।

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা।

মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস। দেখ, তাহারই বলে এই পুণ্য দেশ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা একই স্থানে উপনীত হই।

কি কি শক্তিবলে উদ্ভিদ আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে? যে ধৈর্য, যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে সে ভিতর ও বাহির সামঞ্জস্য করিয়া লয়, যে স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছা অনুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশদ্বার কখনও উদ্‌ঘাটিত কখনও

অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে।· · অন্তররাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ থাকিবে।

জন্মিবার সময় ক্ষুদ্র ও অসহায় হইয়া এই শক্তি-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার শরীর লালিত ও বর্ধিত করিয়াছে। মাতৃস্তন্যের সহিত স্নেহ মায়া মমতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধুজনের প্রেম দ্বারা জীবন উৎফুল্লিত হইয়াছে। দুর্দিনেও বাহিরের আঘাত-ফলে ভিতরের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুঝিতে সক্ষম হইয়াছি।

ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায়? এ সবার মূলে আমি না তুমি?

একের জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি অন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেকে তোমারই নির্দেশে জ্ঞান-সন্ধানার্থ জীবনপাত করিয়াছে, মানবের কল্যাণহেতু রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়া দুঃখদারিদ্র বরণ করিয়াছে, এবং দেশসেবায় অকাতরে বধ্য মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেইসব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন, জ্ঞান ও কর্মে, শৌর্যে ও বীর্যে পরিপূরিত করিয়াছে।

ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধ রূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে। উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি, যাহা দ্বারা অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি। সেই শক্তিতেই মানব মানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।

আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর্দৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়পদ্ম।

জগদীশচন্দ্রের পত্র ও প্রবন্ধাবলী হইতে শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। প্রথম দুইটি সংকলন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ১৯১৬ সালে লিখিত দুইখানি পত্রের অংশ।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয়করকমলে

বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারি ভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—

কাছে থেকে স্ফূর্তি নাই; — হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি'; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানব মর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়; —
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে। মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,

ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত প্রভু। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তব পাশে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব-উপলক্ষে

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সত্তর বৎসরের জন্মদিনের প্রাক্‌কালে 'ত্রিশ বৎসর হইতে সহযোগী এবং সহকর্মী' বন্ধুর শুভ ইচ্ছা কামনা ক'রে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

"আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।··শেষ দিন পর্যন্তও যে সাধনা আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতেই জীবন অবসান করিব। ম্রিয়মাণ হইব না। অন্ততঃ আমরা দুজনে একে অন্যের ভার বহন করিব।"

দেবতার দানের এই স্বীকৃতি, প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল ধরে লিখিত জগদীশচন্দ্রের বহু পত্রেই প্রকীর্ণ হয়ে আছে—

"তোমার সহিত শুভক্ষণে দেখা হইয়াছিল। কেবল তোমার সঙ্গেই মন খুলিয়া কথা বলিতে পারি। আর তোমার সঙ্গে কাজ করিয়াই সুখী।"

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ছোট বড় সব চিঠিতেই নানা ভাষায় এই কথাটিই ধ্বনিত—

"আমাদের বন্ধুতা দেবতার করুণা বলিয়া মনে করি।"

সপ্ততিতম জন্মদিনের এই চিঠির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—

"আমার অন্তরের কথা তুমি জানো— কিন্তু সকলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমার সৌভাগ্য, তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই গৌরবের কথাটিকে স্থায়ী রূপ দিয়ে আমার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছি— ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার আনন্দ।"

জগদীশচন্দ্র যে দেবতার করুণার কথা উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করেছেন, সে-করুণা সমগ্র দেশের 'পরে, সে-সৌভাগ্য এই ভারতবর্ষের; কারণ, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের এই সৌহার্দ্য তো কেবল তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে আনুকূল্য ও দানপ্রতিদানের বিষয় নয়; সেই ব্যক্তিগত সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে দেশকে তা স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধিমান করেছে। গভীর দেশপ্রাণতা কবি ও বিজ্ঞানীর এই একপ্রাণতার উৎস; উভয়েরই জীবন যখন অপেক্ষাকৃত সঙ্গবিরল, সর্বজনের স্বীকৃতি যখন সুদূরবর্তী, সেই কালে তাঁরা পরস্পরকে সখ্য দ্বারা যে মহৎ চিন্তায় ও দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন দেশের চিত্তক্ষেত্রকে তা চিরদিনের জন্য প্রাণবান্ ফলবান্ করেছে।— সেই কথা স্মরণ করবার জন্যই এই শতবার্ষিক উৎসবে আজকের দিনটি বিশেষভাবে চিহ্নিত।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সৌহৃদ্যের বিবরণ সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হতে পারে। বর্তমান সংকলন আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসবে বক্তৃতারূপে পরিকল্পিত (৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮। সভাপতি শ্রীঅমল হোম), সময়ের নির্দিষ্ট সীমা তাতে স্বীকার্য, তাতে প্রধান কয়েকটি বিষয়ই উল্লিখিত হতে পারে। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আর্যা অবলা বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় কবিতা ও প্রবন্ধ, ও আনুষঙ্গিক পত্রাদির সংগ্রহ 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রসঙ্গের অধিকাংশ উপকরণই নিবদ্ধ; রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের 'পত্রাবলী'ও জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে সংকলিত হয়েছে।— এই রচনায় ব্যবহৃত কোনো কোনো বিষয় বর্তমান সংকলয়িতা -কর্তৃক প্রসঙ্গান্তরেও ব্যবহৃত।

২

গত শতাব্দীর শেষভাগে, রবীন্দ্রনাথের প্রথমযৌবনে, স্বদেশচেতনা যখন দেশের মধ্যে ক্রমশ জাগরিত হয়ে উঠছে— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে যখন "বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে"— তখন রবীন্দ্রনাথের মনে, আরও কোনো কোনো মনীষীর মনে, রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করবার চেয়েও দেশাত্মবোধের যে-দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছিল তা হচ্ছে "বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের অমরবাণী উচ্চারণ" করবার কথা, পৃথিবীর কাছে "ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয়" দেবার আগ্রহ।

তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ একদা আক্ষেপের সূত্রে ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করেছিলেন—

"এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবজাতিকে কি আমাদের কিছুই সংবাদ দিবার নাই? দুই একখানি তরী শস্যপূর্ণ করিয়া আমরা কি ভবিষ্যতের রাজ্যে পাঠাইতে পারিব না? জগতের একতান সংগীতের মধ্যেই বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?

"দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের নিকট মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব? সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালীর নাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে?"

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন একসূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব, এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।"

"রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলণ্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গোরুর মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এসিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং তাঁহাদের দুগ্ধ জোগাইবার জন্য আছে, কিড্ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

"অদ্য আমাদের হীনতার অভাব নাই এ কথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া আসে নাই।..."

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুগভীর আশা রবীন্দ্রনাথ সেদিন মনে পোষণ করেছেন—

"বিপুল মানবশক্তি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে— এ আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে।"

"আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সব বড়লোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।"

প্রথমযৌবনের এই কল্পনাকে সাধনা দ্বারা নিজের জীবনে কবি যেমন সার্থক করে তুলেছিলেন— তরুণ বয়সে তিনি যে আশা প্রকাশ করেছিলেন—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—

জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি
গান গেয়ে কবি, জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি

সে-আশা ফলবতী হয়েছিল তাঁর জীবনে— তেমনি বন্ধুসমাজে যেখানেই প্রতিভার দীপ্তি লক্ষ্য করেছেন সকলকেই "পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতে" আহ্বান করেছেন, প্রবল উৎসাহে তাঁদের কর্মে প্রেরণা-সঞ্চারে উদ্‌যোগী হয়েছেন—

"স্বদেশের আহ্বান প্রত্যহই পরিস্ফুটতর ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে— আপনি যে এই আহ্বানের লক্ষ্য আছেন তাহা আমি কবির চক্ষে দেখিতেছি, এবং একদিন যে আপনি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশের ললাটে নূতন যশোমাল্য স্থাপন করিতেছেন তাহাও আমি দেখিতে পাইতেছি।"

৩

এই বন্ধুসমাজের পুরোভাগে সেদিন ছিলেন জগদীশচন্দ্র। বস্তুতঃ, "উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া আসে নাই" রবীন্দ্রনাথের এই সুদৃপ্ত উক্তি, ১৮৯৬-৯৭ সালে বিদেশে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের স্বীকৃতির পরবর্তী ; রবীন্দ্রনাথের ঐ আলোচনার অন্যতম প্রসঙ্গও স্বয়ং জগদীশচন্দ্র।

বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করে জগদীশচন্দ্র ১৮৯৭ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন— এই বৎসর থেকেই জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার সূচনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম।"

এই আলোককে প্রতিকূল বায়ু থেকে রক্ষা করবার ভার সমগ্র দেশের হয়ে সেদিন নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়কার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখছেন—

"এ পথে তাঁর সহযোগিতায় উপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না ; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক্, গম্যস্থানের উজানপথে এগিয়ে দেবার কিছু-না-কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপর তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির 'পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।"

স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, পাশ্চাত্য মহাদেশে বিজ্ঞানের 'দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ' করবেন— এই আগ্রহে দিবারাত্র রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ছিল উদ্বেল, এবং 'এই গৌরবের পথ সুগম করবার' জন্য তিনি কোনো বাধাকেই

স্বীকার করেন নি, নিজের স্বভাবের বাধাকেও না। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনে অন্য কোনো সুহৃদের প্রতিই তাঁর প্রীতি, সাহচর্য ও আনুকূল্য এমন প্রবলবেগে বর্ষিত হয় নি।

৪

জড় ও জীবের সাধর্ম্য সম্বন্ধে তাঁর নব আবিষ্কার পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করবার জন্য জগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালে আবার বিদেশযাত্রা করলেন, প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি বিদেশে যাপন করেছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে অবিরত পত্রবিনিময় চলেছিল ; রবীন্দ্রনাথের যে-অল্পকয়েকখানি চিঠি রক্ষিত হয়েছে তার থেকেও জানা যায় জগদীশচন্দ্রের সাধনা সম্বন্ধে কি বিপুল প্রত্যাশা তাঁর হৃদয়কে এই সময় আন্দোলিত করছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের আদর্শ-সাধনে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত, তারই একটি রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন জগদীশচন্দ্রে— প্রাচীন ভারতবর্ষের নিরাসক্ত তপস্বী গুরুর নবীন রূপ। তিনি নিজেও তখন শান্তিনিকেতনে গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করে তারই কাজে আত্মসমর্পণের সাধনায় ব্যগ্র ; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত" করবেন, জগদীশচন্দ্রের কাছে এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

১৯০২ সালে একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—

"নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য তোমাকে তোমার কর্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক্।·· ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি।·· যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ··তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে··। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই— আর-একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে।·· ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছায়ায় সেই বেদী-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে।"

১৯০২ সালেই অপর একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো— তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরেয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্রে হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে·· তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে ··। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আর কাহাকেও দেন নাই— তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে— সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে

আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।"

৫

সমপ্রাণ সমানধর্মার প্রতিই সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান। ভারততীর্থের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল্পনায় একই আবেগে সেদিন জগদীশচন্দ্রও অনুপ্রাণিত। বস্তুতঃ জগদীশচন্দ্র যে বিজ্ঞানসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা আপন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার কামনায় নয়, এমন-কি কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসার বশবর্তী হয়েও নয়— ভারতবর্ষের পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হয়ে আধুনিক কালে পুনর্জন্ম লাভ করবে, ভারতবর্ষ একদিন বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্র বলে পরিগণিত হবে এই কল্পনাই ছিল সেদিন তাঁর সাধনার প্রেরণা-মূলে। বিজ্ঞানসাধনা ও স্বদেশসাধনা একাত্ম হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন— ১৯০০ সালের কথা—

"জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইত।"

১৯০১ সালে একখানি চিঠিতে লিখছেন—

"কি অত্যাশ্চর্য নূতন জগৎ আমার সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়াছে বলিতে পারি না। কি অসীম নূতন সত্য সম্মুখে রহিয়াছে।"

"একদিন মনে করিয়াছিলাম যে এমন দিন কবে আসিবে যে দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞান-আহরণের জন্য ভারততীর্থে লোকসমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না।··কারণ আমাদের দেশবাসীরা কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ হইয়া আছেন।··

"বন্ধু তুমি এই বিশ্বাস চিরকাল প্রচার করিও। আমরা জানি না, আমরা কোন ফলের আশা করি না, তবু যেন আমাদের কার্য করিবার শক্তি নির্মূল না হয়। কোন দিনে কোন কালে আর কেহ দেখিবে। বিশ বৎসর পরে আমরা কেহ রহিব না, কিন্তু আমাদের আশার উচ্ছ্বাস যেন চিরজীবন্ত থাকে।"

তাঁর কোনো কোনো গবেষণাপত্র বিদেশে স্বীকৃত ও রয়াল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়েছে, এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে জগদীশচন্দ্র লিখছেন— "কিন্তু এই সম্পূর্ণ অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন বিষয়, যদি আমাদের দেশ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত তাহা হইলে আমি জীবন সার্থক মনে করিতাম।"

স্বদেশে তাঁর বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল ক্ষেত্র তখনও প্রস্তুত হয় নি, বিদেশে বিজ্ঞানীরা তাঁকে সম্মানের আসনে আহ্বান করছেন, তপস্যা শেষ হবার পূর্বে, য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা প্রোথিত না ক'রে অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরতে বারণ ক'রে মিনতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুরোধ করছেন— জগদীশচন্দ্র তার উত্তরে লিখছেন—

"আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই আমার জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে সব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহাও সহ্য করিব।"

যে ভারতমাতার চিত্র তাঁর গৃহকে অলংকৃত করেছিল, তাঁর পূজাবেদী স্থাপিত ছিল জগদীশচন্দ্রের হৃদয়ে। বন্ধুর কণ্ঠে উৎসাহধ্বনিতে 'ক্ষীণ মাতৃস্বর' শুনে তিনি বল লাভ করেন, বারবার এ কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। চিন্ময়ী মাতৃমূর্তি তাঁর কাছে যেন প্রত্যক্ষবৎ ছিলেন; ১৯০১ সালের মে মাসে রয়াল ইনস্টিটিউশনে শুক্রবাসরীয় বক্তৃতায় তাঁর আবিষ্কারের বিশেষ স্বীকৃতি হয়— সেই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

"বন্ধু

তুমি আমার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত আছ। বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই।· ·তার পর একটি ঘটনা হইল সে কথা স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন দু প্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়া ছিলাম। আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল, তোমাদের এতদিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্য নির্মূল হইবে এ কথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ এক ছায়াময়ী মূর্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল 'বরণ করিতে আসিয়াছি' তার পর মুহূর্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

"জানি না কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পরদিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তার পর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না; যাহা পূর্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্তে পরিস্ফুট হইল।"

১৯০১ সালের একখানি চিঠিতে মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা অবিস্মরণীয় বাণী-রূপ লাভ করেছে—

"বন্ধু,

গাছ মাটী হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল ?— কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই দুঃখসুখের অংশী একথা সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয় লাভ করিব।"

৬

জগদীশচন্দ্রের বিদেশপ্রবাসকালে কেবল উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখে দ্বিধা ও অবসাদ থেকে তাঁকে রক্ষা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। তাঁর যাত্রাপথ যাতে অনুকূল হয়, আর্থিক ও আনুষঙ্গিক বাধা যাতে

প্রবল হয়ে উঠে তাঁর সত্যপ্রতিষ্ঠার ব্রত অর্ধপথে অসমাপ্ত না থাকে, অসময়ে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে না হয়, এ জন্যও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে তিনি লিখলেন—

"তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।·· তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। যাহাতে কর্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি— আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো।·· তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু, এবং তাহার মূল্যই বা কি?"

জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসতে উৎসুক, এ কথা বুঝতে পেরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, জগদীশচন্দ্র স্বদেশে থেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করুন— "কাজ ক'রে তুমি যে সামান্য টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুষিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমাদের ধিক্।"

জগদীশচন্দ্রের কর্মের আর্থিক বাধামোচনে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য। রবীন্দ্রনাথের সূত্রেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ১৯০০ সালে বিদেশযাত্রার পূর্বে একবার জগদীশচন্দ্রের জন্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞানশালা স্থাপনের প্রস্তাব হয়, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে তার ব্যয়ভার বহন করতে ত্রিপুরা-মহারাজ সানন্দে সম্মত হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বিদেশপ্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথ অর্থসংগ্রহের জন্য ত্রিপুরায় যে-সকল চিঠিপত্র লেখেন, তার দুখানি উদ্‌ধৃত করলেই স্পষ্ট হবে যে, জগদীশচন্দ্রের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক সংকোচ ও অভিমানবোধ কিভাবে বিসর্জন দিয়েছিলেন— পরবর্তীকালে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রবল অর্থসংকটের দিনেও যা তিনি কখনোই সম্পূর্ণ পেরে ওঠেন নি। বস্তুতঃ, রাধাকিশোরের কাছে অর্থানুকূল্য-প্রার্থনার অব্যবহিত পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের মনে এ সম্বন্ধে সংকোচ সৃষ্টির বিশেষ কারণও ঘটেছিল। কিন্তু সেই দ্বিধা সবলে পরিত্যাগ করে তিনি ত্রিপুরার মহারাজের কাছে প্রার্থীরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাধাকিশোরের সহচর মহিমচন্দ্রকে ১৯০১ সালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে সেই কাহিনী বর্ণিত—

"সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে— আমি স্বার্থপর ভাবে ভিক্ষুভাবে মহারাজের দ্বারে গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করি। মহারাজ আমাকে মান্যবন্ধুভাবে দেখিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে নিজে স্বভাবতই ইচ্ছুক কিন্তু, শুনিতে পাই তোমরা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে সুদূরে রাখিতে চেষ্টা কর— সুতরাং মহারাজের সহিত আমার প্রিয়সম্বন্ধ লোকচক্ষে হীন করিয়া তুলিতেছে। সেই সকল কারণে মহারাজের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ দূরে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টায় ছিলাম। কেবল জগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না— লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব— ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসংকোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব। আমি ধনীর পুত্র, কিন্তু ধনী নহি— অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভসংকল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই— সুতরাং শুভকর্মের অন্তরায়স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়াই আমার কর্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব।"

ত্রিপুরার মহারাজকে রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই লিখছেন—

"জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সংকটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমার পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম, তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।· · মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সংকুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য করিব।"

এই চিঠি লিখবার দু মাস পর, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আগরতলায় ত্রিপুরা-মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হন। জগদীশচন্দ্র এর পর মহারাজের কাছে যে আনুকূল্য পেয়েছিলেন সে কথা মহারাজের মৃত্যুর পর জগদীশচন্দ্রই এক সভায় বিবৃত করে গিয়েছেন— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, "তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন।"

৭

জগদীশচন্দ্র যখন ইউরোপের 'রণক্ষেত্রে' 'ভারতবর্ষের জয়পতাকা' নিখাত করতে নিযুক্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতবর্ষের "নির্মল শুচি আদর্শে" মানুষ গড়ার সাধনায় নিমগ্ন। তারই ফলে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সূচনা। আত্মীয়বন্ধু-সমাজে সেদিন তাঁর সঙ্গী-সংখ্যা সামান্য, অনেকেই এই বিদ্যালয়কে কবিকল্পনা বলে পরিহাসবিদ্ধ করেছেন। এই সময় বিদেশ থেকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগতই যে-উৎসাহবাক্য প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই সেদিন তা গভীরভাবে তাঁর হৃদয়ে-মনে বলসঞ্চার করেছিল। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনেক ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত করেছেন, কাব্যচয়নিকা প্রকাশে উৎসাহিত করেছেন, নোবেল পুরস্কার লাভের বহু পূর্বেই বিদেশে রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ প্রচারে চেষ্টিত হয়েছেন; অনুমান করবার কারণ আছে যে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-রচনার মূলেও জগদীশচন্দ্রের প্রবল প্রেরণা বর্তমান ছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়-পরিচালনার নিঃসঙ্গতার দিনে জগদীশচন্দ্রের উৎসাহবাক্যে রবীন্দ্রনাথ মনের যে আনুকূল্য, যে সান্ত্বনা পেয়েছেন সেও অন্যত্র দুর্লভ ছিল। কয়েকটি পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করি—

"লণ্ডন ১৫ অক্টোবর ১৯০১

"আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রথম মিথ্যা-অভিমানী স্বজাতিবৎসল, আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী বিশ্বাসী ধৈর্যশীল স্বজাতিপ্রেমিকের সংখ্যা দিন

দিন বর্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও, এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২।৪টি যুবকও যদি এই ভাবে প্রণোদিত হয় তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।"

"London 12. 2. 1902

"বন্ধু, আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরি ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর চাপা দিলে, প্রস্তর চূর্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না।

"তুমি মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষ্য অঙ্কিত করিয়া দাও।"

"লণ্ডন ২৭ জুন ১৯০২

"তুমি যাহার সূত্রপাত করিতেছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়—অন্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। নিরাশার কথা শুনিয়া মন ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু তোমার নিকট উৎসাহের কথা শুনিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখদুঃখ আমরাই বহন করিব। মিথ্যা চাক্‌চিক্যে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই; যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে তাহার ভিতরে দেখিয়াছি। আমরা যেন কখনও মিথ্যা কথায় না ভুলি। পুণ্যই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্তরে কিম্বা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্টলাভ করিব না।"

১৯০৩ সালে কন্যার গুরুতর পীড়ায় রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন থেকে দূরে তার শুশ্রূষায় রত আছেন তখন তিনি জগদীশচন্দ্রকে অনুরোধ করছেন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করতে—একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই।··কি আর বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও—ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিয়ো।" জগদীশচন্দ্র সুপরামর্শ দ্বারা এই সময় শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের যথাসাধ্য আনুকূল্য করেছিলেন।

মানুষ গড়ার কাজই যে দেশের শ্রেষ্ঠ কাজ, রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগ যে কখনোই ব্যর্থ হবে না, বহু চিঠিতেই এই আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করে জগদীশচন্দ্র নানা দুর্যোগের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের মনকে সঞ্জীবিত রাখতে চেষ্টা করেছেন। ১৯০৭ সালে একখানি চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

"আমি দিন দিন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি যাহা সত্য, তাহাই অতি সহজ এবং সেই জন্যই লোকদৃষ্টির অগোচর। সমস্ত ভবিষ্যতের আশা, মনুষ্যগঠন দ্বারা। তাহার একমাত্র উপায় কোমল শিশুজীবনে দুএকটি মন্ত্র চিরমুদ্রিত করা। এজন্য তুমি যাহা করিতেছ তাহার সার্থকতা আমরাই দেখিয়া যাইতে পারিব।"

১৯০৭-৯ সালে সুদূর বিদেশে স্বীয় আবিষ্কার ও মতবাদের প্রতিষ্ঠায় জগদীশচন্দ্র নিযুক্ত, সে-সময়েও শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের কথা তিনি বিস্মৃত হন নি—

"তোমার বিদ্যালয়ের কথা যতই মনে করি, ততই মন উৎফুল্ল হয়। অন্ততঃ কয়েকটির জীবন যে তোমার শিক্ষায় অমর হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

"তোমার স্কুলের কথা সর্বদা ভাবি। এই তোমার প্রধান কার্য। এইরূপ মানুষ গড়ার চেয়ে কোন কাজ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।"

"তোমার স্কুলের কথা আমাকে সর্বদা বিস্তারিতরূপে লিখিও। মনে রাখিও তোমার প্রতি কার্যে আমার মন আকৃষ্ট। এই দুর্দিনে মনে কোনরূপ শান্তি পাইতেছি না, কেবল তোমার আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া মন স্থির করিতে চেষ্টা করি। আমাদের বন্ধুতা দেবতার করুণা বলিয়া মনে করি।"

"ঝড় ও দুর্ঘটনার মধ্যেও তোমার রোপিত বৃক্ষ যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।·· তোমার উপর —র প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া একান্ত সুখী হইলাম। তোমার অন্যান্য শিষ্য যদি তোমার উপদেশে এরূপ গঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমার কার্য যে বিশেষরূপে ফলবান হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

"তোমার বিদ্যালয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বিশেষ করিয়া লিখিও। ইহাকে বিবিধ দিকে পূর্ণ করিতে হইবে।"

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যাকুল ছিল। ১৯১৮ সালে সম্ভবতঃ বন্ধুর কাছে কোনো পত্রে তিনি সে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে থাকবেন। উত্তরে জগদীশচন্দ্র তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে লিখছেন—

"তোমার চিঠি পড়িয়া মনে হইল স্কুলের কথা মনে করিয়া চিন্তিত আছ। যতদিন কেহ সমস্ত ভার গ্রহণ করে, ততদিন অন্য কেহ সেই ভার লঘু করিবার চেষ্টা করে না। এটা হয়ত বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণতার চিহ্ন। কিন্তু তোমার স্কুল দেখিয়া অন্য দেশে স্কুল হইতেছে। তাহারা ভাবুক নয় কিন্তু কর্মী। সুতরাং তোমার চেষ্টা হয়ত অন্য দেশে অধিকরূপ পরিস্ফুট হইবে।

"আর তোমার স্কুলের ছেলেরা অন্ততঃ কয়েক বৎসর নির্ভয়ে বাড়িতে পারিয়াছে। আজকালকার দিনে এ কথাটা কম নয়। তাছাড়া এতগুলি ছেলের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শিক্ষার সার্থকতা করিবে। সে হয়ত আমরা দেখিয়া যাইতে পারিব না, কিন্তু তাহা হইবেই হইবে।"

৮

চীন-জাপানের সঙ্গে, 'বৃহত্তর' ভারতবর্ষের সঙ্গে সংস্কৃতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যোগ পুনঃস্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উদ্‌যোগের কথা সুবিদিত। আলোচ্য পর্বে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রায় পনেরো-কুড়ি বৎসর পূর্বেও, শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে-সকল কল্পনা চলছিল জগদীশচন্দ্রও তার অংশী ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি নানা প্রস্তাব করেছেন, ১৯০৩ সালে তাঁর একটি চিঠিতে তার নিদর্শন পাই—

"তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আসিলে হইবে।

"তবে একটা বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটি সহজসাধ্য— পরে বৃহৎ আকারে হইবে। কিন্তু বর্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

"যবদ্বীপে ত সতীশ যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুথির কপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

"একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করিতে এখনও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে, তাহার বলে কঠিনগুলি সহজ হইবে।

"আমার plan এই।

"এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরাজীবিদ্‌ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে Tibetএর mss ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তার পর তোমার Mr. Horyকে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী পুথির কপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্যে হোরীর সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীন দেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।"

বস্তুতঃ ভারত-পন্থায় উভয়ে ছিলেন সহযাত্রী। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানমন্দির ও কলকাতায় জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমন্দির দুয়েরই মূল ভিত্তি একই গভীরে।

বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা-ব্যাখ্যান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ভারতের যেখানে অভাব যেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই দৈন্যপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী। বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোক-সম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণ করবার ভার নিয়েছে।· ·

"যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ-না রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু স্বদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান।· ·বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণপ্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্‌'— আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।· ·পিতামহদের এই নিমন্ত্রণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব হয়ে থাকে তবে সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, কিছুতেই আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে, তবেই বিশ্বের প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি।"

বসুবিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্বে, জগদীশচন্দ্রের একটি অভিভাষণে এই একই সুর ধ্বনিত—

"যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে।

ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

"তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ, এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ? এই সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রই থাকিবে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারম্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

১৯১৬ সালে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে যে আশার প্রকাশ করেছিলেন তারই আবৃত্তি করে এই আলোচনা সমাপ্ত করি—

"আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে— কোণের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে না। ঐ দেখ-না, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোসকে কেউ ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মন্ত্র কুণো বিজ্ঞানের মন্ত্র নয়— তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের মহাসংকীর্তন পূর্ব পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেচেন। এই যে তিনি দ্বার খুলে বেরিয়েচেন— এ দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তাঁর দলের লোক আরো আসচে,— পথে আর জায়গা হবে না।"

মনীষী-মঙ্গল

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে প্রাপ্ত-পূজা বিজ্ঞানাচার্য বহুমানাস্পদ
ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্ধনা উপলক্ষে

জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে!
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার!
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো! তোমায় করি নমস্কার।

দাস্যকালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে,
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে;
গরুড় তুমি গগনারূঢ় বিনতানীড়সম্ভূত,
দেবতাসম ললাটে তব স্ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত!

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ;
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান।
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, এ কি গো তব ইন্দ্রজাল!
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বনচাঁড়াল!

মরমী তুমি চরম খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো,
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে এ কি হেম-কাঠি.

হিম যা ছিল তপ্ত হল মেলিল আঁখি মূর্ছিত—
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চিত!
বনের পরী তুলিল হাই, জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে!

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ,
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ!
ভুবন ভরি বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্তু জড়ে স্পন্দমান!

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্র করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী!
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে,
সত্য-মহা-সমুদ্রেতে সংগমেরি তীর্থ হে!

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রের কি শূদ্রের;
দ্বন্দ্বহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
বিশ্বজন-বন্দ্য তুমি তোমায় করি নমস্কার।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯১৫ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৯১৪-১৫ সালে ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানী-সমাজে তাঁহার আবিষ্কার বর্ণনা করিয়া ১৯১৫ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন— এই উপলক্ষে ১৯১৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি প্রীতিসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কবিতাটি এই অনুষ্ঠানে পঠিত হইয়াছিল। কবির প্রিয়সুহৃৎ সাহিত্য-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী কবিতাটি পাঠ করেন। 'জ্ঞানের মণিপ্রদীপ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কলেজের ছাত্রগণ এই উৎসবে আচার্যদেবকে একটি 'আরতি-প্রদীপ' উপহার দিয়াছিলেন— "which symbolises the light and knowledge in all directions"— এই প্রদীপ উপহারের প্রস্তাবের জন্য ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন; অবনীন্দ্রনাথ প্রদীপটি নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ এই উপলক্ষে অভ্যাগত বিদেশী সুধীবর্গের জন্য রবীন্দ্রনাথের "ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি" কবিতাটি অনুবাদ করিয়া দেন।— এ সকল তথ্যই প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ সংখ্যা হইতে গৃহীত।— সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

স্বরলিপি

মিশ্র খাম্বাজ। একতাল

বন্দি তোমায় ভারতজননি বিদ্যামুকুটধারিণি !
বরপুত্রের তপ-অর্জিত গৌরবমণিমালিনি !
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ হৃদি-আনন্দ-কারিণি !
মরি বিদ্যামুকুটধারিণি !
যুগযুগান্ত তিমির অন্তে হাস, মা, কমলবরণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নব জীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী,
হাস, মা, কমলবরণি !
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্যবীর্যশালিনি।
আবার তোমায় দেখিব, জননি, সুখে দশদিক্‌পালিনি ;
অপমানক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পরকরবালিনি !
অয়ি শৌর্যবীর্যশালিনি !

সরলা দেবী

II {পা -া পা । মপধা ধা -া । পধা ধ্ণর্সা ণা । ধা পা পা I
ব ন্ দি তো০০ মা য়্ ভা০ র০০ ত জ ন নি

I পা -া ধা । পধপা মগা মা । মগা -া মা । (পধ্ণর্সা -ণধা -পমা)} I পধা -ণর্সা -া I
বি দ্ দা মু০০ কু০ ট ধা ০ রি ণি০০০ ০০ ০০ ণি০ ০০ ০

I র্সা র্সা র্রর্গা । -র্মা র্গা র্রা । র্সা না র্সা । -না র্সা র্সা I
ব র পু০ ত ত্রে র ত প অ র্ জি ত

I র্সর্রা -র্সা ণা । ধা পা মা । মগা -া মা । পধ্ণর্সা -ণধা -পমা II
গো উ র ব ম ণি মা ০ লি নি০০০ ০০ ০০

II পা পা পা । -া ধর্সা র্সা । ণা ধা ধর্সা । -ণধা পা মা I
কো টি স ন্ তা০ ন আঁ খি ত০ ০র্ প ণ

I ধা পা পা । ধা -া পা । ধা পা ধণা । -ধপা -ধা -া I
হৃ দি আ ন ন্ দ কা রি ণি ০০ ০ ০

I -া -া -া । -া -া -া । -া -া -া । -া পা পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম রি

I র্সা -া র্সা । র্গা র্মপা র্মগা । র্রসনা -া র্সা । ণর্সা -র্রসা -ণধপমা II
বি দ্ দা মু০ কু০ ট০ ধা০০ ০ রি ণি০ ০০ ০০০০

II {পা পা পা । পা -া পা । ধা র্সা র্সা । র্রা -া র্রা I
যু গ যু গা ন্ ত তি মি র অ ন্ তে

I র্সা র্সা র্সা । র্রা র্রা র্গর্রা । র্সা র্রা র্সর্রসা । -া -া -া} I
হা স মা ক ম ল০ ব র ণি০০ ০ ০ ০

I পা না -া । না না না । র্সা -া না । র্সা র্সা র্সা I
আ শা র্ আ লো কে ফু ল্ ল হৃ দ য়ে

I পা র্সা না । র্সা র্সা নর্সর্রা । র্সা ণা ধা । -া -া -া I
আ বা র শো ভি ছে০০ ধ র ণী ০ ০ ০

I {ধা ধা ধা । ধা ধপা ধা । ণা র্সা ধর্সা । ণধা পা পা I
ন ব জী ব নে০ র প স রা০ ব০ হি য়া

I পা ধা পধপা । মা গা মা । মগা মা পধা । -ণর্সা -ণধা -পা} I
আ সি ছে০০ কা লে র ত০ র ণী০ ০০ ০০ ০

I র্সনা র্সা র্সা । র্রগা র্মপা র্মগা । রর্সনা র্সা ণর্সা । -র্রসা -ণধা -পমা II
হা০ স মা ক০ ম০ ল০ ব০০ র ণি০ ০০ ০০ ০০

II {পা পা পা । পা -া পা । ধা র্সা র্সা । র্রা -া র্রা I
এ সে ছে বি দ্ দা আ সি বে ঋ দ্ ধি

I র্সা -া -র্সা । র্রা -া র্গর্রা । র্সা -র্রা র্রা । র্সণা -ধপা -া} I
শৌ র্ য বী র্ য০ শা ০ লি নি০ ০০ ০

I পা না -া । না না -া । র্সা র্সা না । র্সা র্সা র্সা I
আ বা র্ তো মা য়্ দে খি ব জ ন নি

I পা র্সা না । র্সা র্সা -া । নর্সা -র্রা র্সা । ণা -ধা -া I
স্থ খে দ শ দি ক্ পা০ ০ লি নি ০ ০

I ধা ধা ধা । ধা ধপা ধা । ণা র্সা ধর্সা । ণধা পা পা I
অ প মা ন ক্ষ০ ত জু ড়া ই০ বি০ মা তঃ

I পা -া ধা । পধপা মগা মা । মগা মা পধা । -ণর্সা -ণধপা -া I
থ র্ প র০০ ক০ র বা লি নি০ ০০ ০০০ ০

I র্সনা -র্সা র্সা । র্রর্গা -র্মর্পা র্মর্গা । র্রর্সনা -র্সা র্সা । ণর্সা-র্রর্সা -ণধপমা II II
শৌ র্ য বী০ ০র্ য০ শা০০ ০ লি নি০ ০০ ০০০০

এই গানটি 'বন্দনা' নামে, ১৩০৯ ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী পত্রে নিম্নমুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ প্রকাশিত হয়—

'এই বৎসর [১৩০৯] সারস্বত-উৎসবকালে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতাস্থ বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় হইতে সম্মান ও অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়াছে। এই সঙ্গীতটি তদুপলক্ষ্যে বিরচিত।'

জগদীশচন্দ্র স্বীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিদেশের বিজ্ঞানী-সমাজে আলোচনা ও প্রচারপূর্বক ইহার কিছুকাল পূর্বে সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন— সেই উপলক্ষ্যে এই-সকল সংবর্ধনা।

জগদীশচন্দ্র বসু -প্রসঙ্গ

অরূপরশ্মির অন্বেষণে ॥

'ভারতের কোন্‌ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি' কবিতায় জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

· ·কী অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্কধূলিতলে।
· ·সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যায় অ রূ প র শ্মি র অ ন্বে ষ ণে
লোকলোকান্তের অন্তরালে— যেথা পূর্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন, স্তম্ভিত, বিস্মিত, জোড়হাতে।· ·

ছবিটি ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে, জগদীশচন্দ্রের জন্মবার্ষিকের (৩০ নভেম্বর) কয়েক দিন পূর্বে, অঙ্কিত ও জগদীশচন্দ্রকে উপহৃত।

অপূর্ব সাড়া ॥

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই চিত্রখানি অঙ্কিত। ১৩২৮ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসীতে এই ছবির প্রকাশকালে চিত্রপরিচয়ে লেখা হয়—

"আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় উদ্ভিদ চেতন সকল পদার্থকেই সাড়া দেওয়াইয়া ছাড়িয়াছেন। কিন্তু পদার্থ সাড়া দেয় আচার্যের সোনার কাঠির ছোঁওয়া পাইলেই— আপনা হইতেই নয়। শিল্পী কিন্তু কল্পনায় দেখিয়াছেন দেশে এমন সাড়া পড়িয়া গেছে যাতে আচার্যের আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই দেশের সকল বস্তুই সাড়া দিতে শুরু করিয়াছে। বাঁশগাছ হাঁকিতেছে— Strike, Strike ; লজ্জাবতী চেঁচাইতেছে— Shame, Shame ; বনচাঁড়াল বলিতেছে— Agitate, Agitate ; চাঁদ চেঁচাইতেছে— চাঁদা, চাঁদা ; এবং সরস্বতী-লক্ষ্মীর শূন্য আসন পদ্মবনে ব্যাং-সাহেব গলা ফুলাইয়া হাঁকিতেছে— বন্দে মাতরম্‌। (ইংরেজি শব্দগুলির মধ্যে দ্ব্যর্থ আছে— strike মানে আঘাত ও ধর্মঘট, বাঁশ strike বলাতে দুই অর্থই সুসংগত হইয়াছে ; লজ্জাবতী বলিতেছে লজ্জা লজ্জা ; বনচাঁড়াল-গাছের কাছে তুড়ি দিলে বনচাঁড়ালের পাতা আন্দোলিত হয়, agitate মানে আন্দোলন করা ; চাঁদ চেঁচাইতেছে চাঁদা চাঁদা বলিয়া।) ফরিদপুরের পূজারী খেজুরগাছ প্রণাম করিতে করিতেও চোখ মেলিয়া কাণ্ডখানা দেখিতেছে এবং হিমালয় বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ মেলিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। ওদিকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দেখিয়া আচার্য জগদীশের ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে। বজ্র আচার্য জগদীশের অবলম্বিত সাধনার প্রতীক।"

জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ· · ॥

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে তাঁহার জমিদারিতে থাকিতেন তখন সেখানে যে

বন্ধুসভা বসিত তাহারই চিত্র— শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা *On the Edges of Time* গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। শিলাইদহের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র উভয়কেই আবিষ্ট করিয়াছিল— রবীন্দ্রনাথের জীবনে শিলাইদহ যে স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠক অবগত আছেন ; রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের কোনো-কোনো চিঠি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"৩০ মে ১৯০২।· · আমার স্মৃতি শিলাইদহে আবদ্ধ। সেখানে কি ফিরিয়া যাইবে না ? অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার যাইবে। আর একবার একত্র তীর্থযাত্রা করিব।"

"২০ নবেম্বর ১৯০৮।· · দেশে ফিরিলে আমাকে ঘনঘন বোলপুরে ও শিলাইদহে দেখিতে পাইবে।· ·"

"৮ জানুয়ারি ১৯০৯।· · মনে করিও তোমার বোলপুর ও শিলাইদহের কথা সর্বদা স্মরণ করি। সেই প্রথমে যখন শিলাইদহে গিয়াছিলাম-– সে আজ কত বৎসরের কথা— আজও প্রত্যেক দৃশ্য মনে পড়িতেছে।"

বিলাতে জগদীশচন্দ্র, ১৯০১ ॥

এই ছবি পাইয়া রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লেখেন—

[অগস্ট ১৯০১] "তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে— এ ছবি আমার লেখার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছুদিন পূর্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গ্রুপ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না।· · তোমার এ ছবিখানি আমি চাহিলেও দিতাম না।"

পূর্ববর্ণিত শিলাইদহের গ্রুপ, ও এই ছবি, দুইখানিই সুরক্ষিত ছিল। এখন শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে আছে ; দুইখানিই বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

অবলা বসু ॥

স্বামীর প্রীতিভাজন সুহৃৎরূপে রবীন্দ্রনাথ আর্যা অবলা বসু মহোদয়ারও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন— স্বামীর সহিত তিনিও অনেক সময় শিলাইদহ যাত্রা করিয়াছেন। একবারের কথা স্মরণ করিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছেন (১৯০৮)— "সেবার বড়দিনের ছুটীর সময় অশান্তিপূর্ণ চঞ্চল হৃদয় লইয়া শিলাইদহে গিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দুটী কথা বলিয়াই নবজীবন লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম। সে কথা আমি কোনদিন ভুলিতে পারিব না।" রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অবলা বসু মহোদয়ার পত্রাবলী জগদীশচন্দ্র বসুর 'পত্রাবলী'র পরিশেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; অবলা বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত।

মহাভারত-চিত্রাবলী ॥

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত ও কল্পিত এবং বসুবিজ্ঞানমন্দিরে রক্ষিত চিত্রাদি এই সংখ্যায় যেগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহার প্রবন্ধে সেগুলি আলোচিত।

'আলোক ও আঁধারের দ্বন্দ্ব, রথে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে আঁধারের পরাজয়' যে ধাতুফলকে ("উদয়সবিতা" নামে বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত) বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের রচনাংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, "বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী" —তরুলতার আলোকমুখিতা এই প্রবন্ধে আলোচিত ; ধাতুফলকের প্রতিলিপিও এই প্রবন্ধে মুদ্রিত)—

"দুইটি দাঁড়ের দ্বারা তরণী কেবল নদীবক্ষের উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু সর্বদিগ্‌-বিহারী জীব কখনও দক্ষিণে কখনও বামে কখনও উর্ধ্বে কখনও বা অধোদিকে ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্বমুখী গতি নিরূপণ করিবার জন্য অন্ততঃ চারিটি রশ্মির আবশ্যক।

"লজ্জাবতীর পাতার প্রতি কোষই আলোক ধরিবার ফাঁদ। সেই আলোর উত্তেজনা এক-একটি স্নায়ুসূত্র ধরিয়া পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়। যতক্ষণ না চারিটি ডাঁটার পত্র-সমষ্টি সমানভাবে আলোকমুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বল্‌গার টানের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পত্ররথ তখন দক্ষিণে, কিম্বা বামে, উর্ধ্বে কিম্বা নিম্নে চালিত হয়।

"সবিতার রথ

"সারথি তবে কে? দিবাকর নিজেকে কোটি কোটি অংশে বিভক্ত করিয়া ধরা-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া সূর্যদেবের শত শত মূর্তি মেঝের উপর দেখিতে পাই।

"সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাঁহার রথরূপে গ্রহণ করেন। পত্রের চারিটি বল্‌গা তাঁহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ বাহিয়া সীমাহীন তাঁহার গতি। কিন্তু এই অসীম পথ প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ধূলিকণার ন্যায় এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র লতার অতি ক্ষুদ্র পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির দ্বারা প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র পাতাটির গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। জীবন এবং জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

"সর্ব্বভূতের চালক তুমি, তোমার তেজোরাশিকে কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন!"

বিপিনচন্দ্র পাল -প্রসঙ্গ

বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ · ॥

১৯০৭ সালে অগস্ট মাসে তৎকালীন সুবিখ্যাত সংবাদপত্র *Bande Mataram* -এর নামে রাজদ্রোহের মামলা হয়, প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। এই মামলায় অভিযোক্তা কর্তৃক সাক্ষ্য দিতে আহূত হইয়া বিপিনচন্দ্র "Conscientious Objection" জ্ঞাপন করিয়া সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হন, ফলে আদালতের অবমাননার অভিযোগে বিপিনচন্দ্রের ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। কিন্তু অরবিন্দ বন্দে মাতরম্‌ পত্রের সম্পাদক এ কথা আর প্রমাণ হয় না, তিনি অব্যাহতি লাভ করেন।

বিপিনচন্দ্রের কারাদণ্ডে অরবিন্দ বন্দে মাতরম্‌ পত্রে লেখেন—

The country will not suffer by the incarceration of this great orator and writer, this spokesman and prophet of Nationalism, nor will Bepin Chandra himself suffer by it. He has risen ten times as high as he was before in the estimation of his countrymen: if there are any among them who disliked or distrusted him, they have been silenced, for good we hope, by his manly, straightforward and conscientious stand for the right as he understood it. He will come out of prison with his power and influence doubled, and Nationalism has already become the stronger for his self-immolation.

বিপিনচন্দ্রকে কারাজীবন কাটাইতে হইয়াছিল প্রেসিডেন্সি ও বক্সার জেলে। এই সময় তিনি যে 'জীবনের হিসাব নিকাশ' করিয়াছিলেন সেই 'আত্মচিন্তা', "জেলের খাতা" নামক পুস্তকে গ্রথিত হয়— বর্তমান সংখ্যায় তাহার কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৯০৮ সালের মার্চ মাসে বিপিনচন্দ্রের কারামুক্তি উপলক্ষ্যে দেশের বহুস্থানে আনন্দ-উৎসব ও তাঁহার সংবর্ধনা হয়। উত্তরপাড়ায় এইরূপ একটি সভায় এই চিত্রটি গৃহীত— নেতৃত্ব করেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিছরিবাবু), চিত্রে তিনি মধ্যস্থানে উপবিষ্ট।

অরবিন্দও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন— উত্তরপাড়ায় সংবর্ধনা-সভায় বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা সম্বন্ধে তিনি বন্দে মাতরম্ পত্রে লেখেন—

India has in herself a faith of super-human virtue to accomplish miracles, to deliver out of irrefragable bondage, to bring God down upon earth. She has a secret of will power which no other nation possesses. All she needs to rouse in her that faith, that will, is an ideal which will induce her to make the effort. That ideal is now being preached by Bipinchandra Pal in every speech that he delivers, and never has it been delivered with such beauty of expression, such a passion of earnestness and pathos, such a sublimity of feeling as at Uttarpara. . . The ideal is that of humanity in God, of God in humanity. . . The people have not yet understood but the power to understand is in them, and if any voice can awake that power, it is Bipinchandra's.

অতঃপর ১৯০৮ সালের মে মাসে অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯০৯ সালে তাঁহার মুক্তির পর তিনিও উত্তরপাড়ায় সংবর্ধিত হন। প্রত্যুত্তরে অরবিন্দ যে বক্তৃতা করেন তাহা "Uttarpara Speech" নামে খ্যাত— এই বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে বলেন—

It was more than a year ago that I came here last. When I came I was not alone ; one of the mightiest prophets of Nationalism sat by my side. It was he who then came out of the seclusion to which God had sent him, so that in the silence of solitude of his cell he might hear the word that He had to say. It was he that you came in your hundreds to welcome. Now he is far away, separated from us by thousands of miles[১] . . .

When Bepin Chandra Pal came out of jail, he came with a message, and it was an inspired message. I remember the speech he made here. It was a speech not so much political or religious in its bearing and intention. He spoke of his realisation in jail, of God within us all,[২] of the Lord within the nation, and in his subsequent speeches also he spoke of a greater than ordinary force in the movement and a greater than ordinary purpose before it. Now I also meet you, and again it is you of Uttarpara who are the first to welcome me. . . That message which Bepin Chandra Pal received in Buxar jail, God gave to me in Alipore. . .

---

১ বিপিনচন্দ্র এই সময় বিলাতে একরূপ নির্বাসনে ছিলেন— ভারতবর্ষের মুক্তির কথা রচনার মধ্য দিয়া প্রচারে ব্যাপৃত।

২ 'জেলের খাতা' গ্রন্থে বিপিনচন্দ্রের এই সময়ের আত্মচিন্তার নিদর্শন আছে।

লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর টিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ॥

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে তিনজন পুরুষপ্রবরের নাম জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগামী দলের প্রধান নেতারূপে একসময় দেশের সর্বত্র বন্দিত ও একত্র উচ্চারিত হইত— 'লাল-বাল-পাল'— এই চিত্রে অন্যান্য প্রধান কয়েকজন দেশনেতার সহিত তাঁহাদের প্রতিমূর্তি একত্র বিধৃত। কলিকাতায় ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনকালে এই চিত্র গৃহীত— 'জাতীয় দল'এর সংকল্প এই অধিবেশনে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল— ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে আরব্ধ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের স্বীকৃতি ও সমর্থনসূচক প্রস্তাব গ্রহণে। এই অধিবেশনেই সভাপতি দাদাভাই নওরোজী 'স্বরাজ'এর কথা বলেন।

ইতিপূর্বেই স্বদেশী ও বয়কটের সমর্থনে ও ব্যাখ্যায় বিপিনচন্দ্রের রচনা ও বাগ্মিতার শক্তি দেশময় দীপ্তির সঞ্চার করিয়াছিল— কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র বয়কট প্রস্তাব সমর্থন করিয়া যে বক্তৃতা[৩] দিয়াছিলেন বয়ঃপ্রবীণ অনেকের স্মৃতিতে এখনও তাহা উজ্জ্বল আছে।

বন্দে মাতরম্ পত্র হইতে যে সকল প্রবন্ধাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার একটি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীশিশিরকুমার মিত্রের সৌজন্য প্রাপ্ত, অপরটি বিপিনচন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব সমিতি কর্তৃক প্রচারিত একটি পুস্তিকা হইতে গৃহীত। আলোচ্য পর্বের প্রসঙ্গে বহু তথ্য শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায় -প্রণীত *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বীকৃতি

প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অনুগ্রহপূর্বক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত চিত্র দুইখানির, এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের স্বাক্ষরিত প্রতিকৃতির, রয়াল ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্রের চিত্রের ও অবলা বসু মহোদয়ার চিত্রের ব্লক এবং জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির ব্লক, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিক সমিতির সৌজন্যে প্রাপ্ত; শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত ও পরিকল্পিত জ্ঞান ও কল্পনা এবং উদয়সবিতার ফোটোগ্রাফও সমিতি দিয়াছেন।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত মহাভারত-চিত্রাবলীর ফোটোগ্রাফ আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আচার্য কার্বের চিত্র শ্রীসলিল ঘোষ অনুগ্রহপূর্বক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

ইঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

সংশোধন। জগদীশচন্দ্রের চিত্র, ১৮৯৭। রয়াল ইনস্টিটিউট স্থলে রয়াল ইনস্টিটিউশন হইবে।

---

৩ দ্রষ্টব্য Bepinchandra Pal, *Swadeshi and Swaraj*, "Boycott of Association with Government" স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্রের অনেক রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত।

বিপিনচন্দ্র পাল
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত
রবীন্দ্রভারতী-সংগ্রহ

জীবনবাণী

বিপিনচন্দ্র পাল

এ-জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি, ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, সুখসমৃদ্ধিশালী অন্য কোনো দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্বোপরি, এই বাংলা দেশে এ যুগে জন্মিয়াছি, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়, এ যুগে, এই বাংলা দেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

২

মানুষ যত কেন ক্ষুদ্র হউক-না কখনই নিঃসঙ্গ হইয়া রহে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবন যে সমাজে জন্মিয়াছি সেই সমাজের জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে। মানুষ একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগ করে, ইহা শাস্ত্রবাক্য হইলেও সত্য নহে। মানুষ বিশাল বিশ্বের অনাদিকৃত কর্মবোঝা মাথায় লইয়া এ সংসারে জন্মে। নিজের কর্মের দ্বারা ইহজীবনে বিশ্বের এই কর্মবোঝাকে লাঘব বা গুরু করিয়া সংসার হইতে অপসৃত হয়। এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

৩

বিশ্বের মুক্তি ভিন্ন বিশিষ্টের মুক্তি নাই। ইহারই নাম কর্মফল। এই ভাবে যখন নিজের ক্ষুদ্র জীবনের দিকে তাকাই তখন এ জীবনকে কিছুতেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ভাবিতে সাহস হয় না। এই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। জড়বিজ্ঞান সেই লুপ্ত লিপিরই উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বের প্রত্যেক জীবকোষাণুর মধ্যে সৃষ্টির সমগ্র প্রাণীজগতের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। জীববিজ্ঞান তাহারই আলোচনা করিয়া জীবের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেইরূপ সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; মানুষ যত কেন ছোটো হউক-না তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের সঙ্গে তাহার সমসাময়িক সমাজজীবনের কথা ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া রহে। এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ভিতর দিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান ভাব ও কর্মচেষ্টা ফুটিয়া উঠে। টানা ও পোড়েন মিলিয়া যেমন কাপড় বুনে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও তাহার সমাজের জীবন উভয়ে মিলিয়া বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের তাঁতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালের ইতিহাস রচনা করে।

৪

এ জীবনের একটা শিক্ষা সকলের চাইতে বড়— সকল সময় মনে রাখিতে পারি বা না পারি, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে, এ জীবনের কর্তা আমি নিজে নহি। নিজে যাহা করিতে চাহিয়াছি তাহা

কতবার করিতে পারি নাই। যাহা করিতে চাই নাই বা করিব ভাবি নাই, বহুবার তাহাই করিয়াছি ও তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘজীবনের প্রায় শেষ সীমানায় আসিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া যখন দেখি তখন সত্যই বলিতে পারি :

'হরি হে, তুমি আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে,
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল কেবল আমার আমার বলে ॥'

'সত্তর বৎসর'। প্রবাসী মাঘ ১৩৩৩

৫

ভগবৎকৃপায়, এই সংসারে এই জন্মেই, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেল। এই অর্ধশত বৎসরের প্রতি যখন ফিরিয়া চাহি ভগবানের অত্যদ্ভুত লীলা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই। এ জীবনে সুখদুঃখ অনেক পাইয়াছি; কিন্তু এই জীবনব্যাপী চেষ্টার সফলতা-নিষ্ফলতার এক কণামাত্রও আজ পরিবর্তন করিতে সাধ হয় না। এ জন্মে অপরাধ অনেক করিয়াছি। লোকে যাহাকে পাপ বলে, তারও গণনা করা সম্ভবপর নহে। প্রতিদিনই শতবার আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। যাহা বলা উচিত ছিল না তাহা বলিয়াছি, যাহা করা উচিত ছিল না তাহা করিয়াছি; জীবনের বিবিধ সম্বন্ধের যথাকর্তব্য পদে পদে অবহেলা করিয়াছি। গুরুজনের প্রাপ্য গুরুজনকে দেই নাই। পিতার আদেশ অহংবশে শতবার অমান্য করিয়া তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ দিয়াছি। তাঁর সে অতুল স্নেহের মর্যাদা, তাঁহার জীবদ্দশায় দিনেকের তরেও বুঝি নাই, রাখি নাই। বন্ধুবান্ধবদিগের উপর সতত আবদার করিয়াছি, কত উপদ্রব করিয়াছি। কিন্তু কখনো প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রণয়ের মর্যাদা রাখি নাই, সর্বদা নিজের খেয়ালের বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া তাঁদের অনুরোধ উপরোধ সকলই পায়ে ঠেলিয়া চলিয়াছি। ইচ্ছা করিয়া যখন সংসার পাতিলাম, নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম, সতীর প্রেম, পুত্রকন্যার ভক্তি ও ভালোবাসা এ-সকলও যখন পাইলাম, তখনও আপনাকে ছাড়িয়া ইহাদের প্রতি যে কর্তব্য তাহাও ভালো করিয়া পালন করিতে পারি নাই। সংসারের কোনো কর্তব্যই পালন করা হয় নাই। অপরাধ লোকে যাকে বলে, আমার জীবনে তার গণনা হয় না, দোষ আমার অগণ্য। পাপ আমার অসংখ্য, কিন্তু এ-সকলের জন্য কখনো প্রাণে বিন্দু পরিমাণেও প্রকৃত অনুতাপের উদ্রেক হয় নাই। অনুশোচনা মাঝে মাঝে ভোগ করিয়াছি; ক্লেশ পাইয়া, অভাব দেখিয়া, নিরাশায় পড়িয়া, সুখ বা সম্মানের হানি আশঙ্কা করিয়া, সময়ে সময়ে গভীর অনুশোচনা হইয়াছে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও অনুতপ্ত হই নাই। আর আজ এই প্রায় অর্ধশতাব্দীর কর্মাকর্ম লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিয়া অকপটে এ কথা বলিতে পারি যে, এ জীবনের মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্মতম রেখাও পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হউক, ইহা কখনই ইচ্ছা করি না।

হে ভগবন্‌, সত্য সত্য আজ তোমাকে জীবনের যা অকর্ম করিয়াছি, আর যা সুকর্ম করিয়াছি, তৎসমুদায়ের জন্য ধন্যবাদ করি। যা সুখ পাইয়াছি আর যা দুঃখ ভুগিয়াছি তৎসমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। মিলনের আনন্দ যাহা দিয়াছ, বিচ্ছেদের দাহন যাহা দিয়াছ, তৎসমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। অনেক চাহিয়াছি তাহা দিয়াছ, আবার অনেক চাহিয়াছি তাহা দাও নাই, তৎসমুদায়ের

জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। অযাচিতভাবে যাহা মুখে তুলিয়া দিয়াছ, বুকে আনিয়া রাখিয়াছ, আর কাঁদিয়া-কাটিয়াও যাহা তোমার নিকট হইতে পাই নাই, লুব্ধ করিয়া যাহা প্রাণের দরজা হইতে ফিরাইয়া লইয়াছ, সে সমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। প্রভো! জীবনে ভুলভ্রান্তি অসংখ্য হইয়াছে, কত অসত্যকে সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, কত সত্যকে অসত্য বলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছি, তৎসমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমার অহংকার ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা, ভোগ ও বৈরাগ্য, অধর্ম ও ধর্ম, অকর্তব্য ও কর্তব্য, অজ্ঞান ও জ্ঞান, অভক্তি ও ভক্তি, আরম্ভ ও অনারম্ভ, বন্ধন ও মোক্ষ, মান ও অমানিতা, বিপদ ও সম্পদ, বিচ্ছেদ ও মিলন, নিরাশা ও আশা সকলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি।

৬

আমি কোনো গভীর চিন্তাই মনে মনে করিতে পারি না। প্রকাশের প্রয়াসেই আমার চিন্তা পরিস্ফুট হয়, অভিব্যক্তির চেষ্টাতেই আমার অন্তরের ভাব বিকশিত হইয়া উঠে। আপনার মনোভাবকে যখন আপনি দেখিতে চাই, তখনই তাহাকে ভাষায় প্রকাশিত করিতে হয়। এইজন্যই লেখা ও বলা আমার প্রকৃতিগত হইয়া আছে। এইজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি যখনই যাহা লিখিয়াছি, বা যখনই যাহা বলিয়াছি, তার প্রথম পাঠক ও প্রথম শ্রোতা তো আমি নিজেই হইয়াছি। আমি সততই নিজের জ্ঞানলাভের জন্য, নিজের উদ্দীপনার জন্য, নিজের শিক্ষার জন্য, নিজের উন্নতির ও নিজের তৃপ্তির জন্য, লিখিয়াছি ও বলিয়াছি। এই কারণে অনেক সময় আমার লেখা ও বলা অপরের নিকট দুর্বোধ্যও হইয়া গিয়াছে। আমি নিজের বোধগম্য হইবার জন্য যে ভাষা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাই সতত ব্যবহার করিয়াছি, নিজে যাহা-কিছু অধিগত করিয়াছি, তাহার বিবৃতি বা পুনরুক্তি করি নাই, প্রয়োজন হইলে, কেবল উল্লেখমাত্র করিয়াছি। এইজন্য যাঁহারা অন্য ভাবের ভাবুক যাঁরা অন্য ধাপের বা ধাতের লোক, তাঁদের বোধগম্য করিবার কোনো প্রয়াস কোনোদিন পাই নাই, এবং তাঁহাদের নিকট আমার কথা ও লেখা অনেক সময় জটিল ও অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

ফলতঃ আমার লেখাতে ও বলাতে সর্বদাই আমি নিজেকে শিষ্যরূপে দেখিয়াছি। গুরু যে কে, তাহা ভালো করিয়া ধরিতে পারি নাই। তবে ইহা অসংখ্য বার উপলব্ধি করিয়াছি যে, কে'যেন অন্তরাল হইতে আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অনেক অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দিতেছেন। এজন্য লোকে যাহাকে আমার রচনা বা আমার উক্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আমি নিজেই চমকিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি এবং নিজের লেখা পড়িতে পড়িতে নিজেই কত সময় বিস্ময়ে আনন্দে ভগবৎ-কৃপা ও ভগবৎ-প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জন করিয়াছি।

মনোমধ্যে মনোভাব স্বপ্নের মত, বায়ুর মত, আকাশে তাড়িত বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড সকলের মত অস্পষ্ট অস্পৃশ্য ও অগ্রাহ্য ও চঞ্চল হইয়া বিচরণ করে। এই মনোভাবকে যখন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি, তখন তাহা স্থির হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিতে থাকে। ভাষার আবরণে আবৃত হইতে যাইয়া যাহা অসম্বদ্ধ ছিল, তাহা সুসম্বদ্ধ ও ঘননিবিষ্ট হয়, যাহা একাকী ছিল, তাহা অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া,

আপনার যথাযথ ওজন বুঝিয়া সংযত হয়; যাহা অসত্য তাহা পরিহৃত, যাহা সত্য তাহা যুক্তিপ্রতিষ্ঠ, ও যাহা সত্যাভাস মাত্র ছিল, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

ভক্তিশাস্ত্রে ভগবৎ-স্মরণের উপদেশ আছে। এ স্মরণ কাহাকে বলে? স্মরণ বলিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা বোঝায়। যাঁহাকে পূর্বে দেখি নাই, তাঁহাকে স্মরণ করিব কেমন করিয়া? শ্রুত বিষয়ের স্মৃতি হয়। ভগবল্লীলা পুরাণ ইতিহাসে যাহা শোনা গিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তিকে লোকে সচরাচর স্মরণ বলিয়া মনে করে। ইহাও স্মরণ সত্য। কিন্তু আমার নিজ জীবনে যদি ভগবল্লীলা না দেখিলাম বা না বুঝিলাম, তবে এ স্মৃতিতে আমার লাভ কি? বন্ধ্যার পুত্রস্নেহের ন্যায় ইহা যে কেবল কল্পিত, কেবল শব্দমাত্রে প্রতিষ্ঠিত; সত্য বা বস্তুতন্ত্র নহে। রাম-বনবাসে জননী কৌশল্যার গভীর মর্মবেদনা বুঝেন কেবল পুত্রবতী রমণী, অপুত্রা যে সে ইহার কি জানে? পুরাণ-ইতিহাসের স্মৃতি যদি আমার আত্মস্মৃতিকে জাগাইয়া দেয়, তবেই কেবল তাহাদের সাহায্যে আমার ভগবৎ-স্মরণ সম্ভব হয়, অন্যথা নহে। পুরাণেতিহাসে ভগবল্লীলা-কাহিনী শ্রবণ করা গৌণ স্মরণ, মুখ্য স্মরণ নিজ জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীতে ভগবানের প্রেম ও প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা। আত্মজীবন-কাহিনী ভক্তিভরে অধ্যয়ন ধ্যান করাই প্রকৃত স্মরণ।

'জেলের খাতা'। ১৩১৬

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

বিপিনচন্দ্র পাল

ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্মসাধনে ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাকেই রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার সাধকেরা এই স্বদেশপ্রেমকে তাঁহাদের ধর্মজীবনের আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের এই স্বাধীনতার সাধকদিগের অগ্রণী হইয়া উঠেন।

এই সময়েই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক-জন মিলিয়া একটা ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম কথা ছিল— "স্বায়ত্তশাসনই (তখনও স্বরাজ-শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।" অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্তশাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্মতঃ তাহার কোনো অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। "তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্নমেণ্টের আইনকানুন মানিয়া চলিব— কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্নমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

এই প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল— "আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোলো বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।" তৃতীয় কথা ছিল— "লোকশিক্ষা-প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।" চতুর্থ কথা ছিল— "অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।" পঞ্চম কথা ছিল— "আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"

শাস্ত্রী মহাশয় তখনও হেয়ার স্কুলে পণ্ডিতী করেন। এইজন্য প্রথম দীক্ষার দিনে তিনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার ছয় মাস পরে সরকারের কর্মে ইস্তফা দিয়া তিনি নিয়মমত দীক্ষা লইয়া এই দলভুক্ত হয়েন। দলটা যে খুব বড় ছিল তাহা নহে। স্বর্গীয় কালীশংকর সুকুল, হেলেনা-কাব্য মিত্র-কাব্য ভারত-মঙ্গল প্রভৃতি রচয়িতা স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র, সেকালের ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী (ইনি পরে 'ব্রজবিদেহী সন্তদাস' নামে ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত), শ্রীযুক্ত ডা. সুন্দরী-মোহন দাস এবং আমি— আমরা এই ছয় জনই প্রথম দিন এই দীক্ষা গ্রহণ করি। ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় ইঁহারা এই দল ভুক্ত হয়েন। ইহা ১৮৭৬-৭৭ ইংরাজির কথা। আমরা এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলিই যে রক্ষা করিতে পারিয়াছি এ কথা বলিতে পারি না। যে কমিউনিজমের (communism) আদর্শে আমরা এই দলটা বাঁধিতে গিয়াছিলাম—

অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণ অর্থ-ভাণ্ডারে নিজ নিজ উপার্জিত অর্থ দান করিব, এবং সেই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনোপযোগী বৃত্তি লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব— এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। —বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩২৯

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর'এ এই সাধকগোষ্ঠী গঠনের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে এইসকল প্রতিজ্ঞার বিষয় বিস্তারিত উল্লিখিত আছে—

আমাদের চক্ষে, তখন শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সামাজিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, এ সকলের একটা সত্য ও সংগত সম্মিলন ও সমন্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল। এই পূর্ণতর স্বাধীনতার আকর্ষণেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

এই আদর্শের প্রেরণায়, ইহারই সাধন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় একটি সাধকদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ নব্য ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা আমাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি করিয়া ম্যাট্‌সিনি এবং ইয়ং ইতালী (Young Italy) সমাজের সভ্যেরা নিজেদের মাতৃভূমিকে অস্ট্রীয়ার শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সুরেন্দ্রনাথের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা আসে। ম্যাট্‌সিনি প্রথমে ইতালীর প্রাচীন বিপ্লববাদী কারবনারাইদিগের (Carbonari) সঙ্গে জুটিয়া পড়েন। কারবনারাই-দল দেশময় বহুসংখ্যক গুপ্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির গঠন করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি গুপ্তষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার দ্বারা দেশ উদ্ধার হইবে না, ইহা বুঝিয়া অল্পদিন মধ্যেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু কারবনারাইদিগের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মিলিয়া তাঁহারা কারবনারাইদিগের অনুকরণে নিজেদের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গুপ্ত-সমিতি (বা secret society) গড়িবার চেষ্টা করেন। এ সকলের পিছনে কোনো প্রবল বিপ্লববাদের প্রেরণা ছিল না।…

শাস্ত্রী মহাশয়ও এই সময়েই আমাদের কয়জনকে লইয়া একটা ছোট কর্মী বা সাধক-দল গড়িবার চেষ্টা করেন। তিনি আমাদিগের জন্য একখানা প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়া দেন। সে দলিলখানি বহুদিন হইল আমাদের ছাত্রাবাস হইতে কি করিয়া কোথায় যে উড়িয়া যায়, তাহার সন্ধান পাই নাই। তাহার মূল কথাগুলি এখনও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রতিজ্ঞার বিষয় ছিল :

১. আমরা প্রতিমাপূজা করিব না, এবং প্রচলিত প্রতিমাপূজার সঙ্গে কোনো প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিব না।

২. আমরা বাক্যে ও কার্যে জাতিভেদ মানিব না, এবং যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।

৩. আমরা পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব, এবং প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিব।

৪. আমরা নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না; এবং কোনো বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না, এবং যে বিবাহের পুরুষের বয়স একুশের এবং বালিকার বয়স ষোল বৎসরের কম, সেরূপ বিবাহে কোনো প্রকারে সাহায্য করিব না, ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিব না।

BHARATI

বিপিনচন্দ্র পাল | বিপিনচন্দ্র পালের কারামুক্তির পর উত্তরপাড়ায় সম্বর্ধনা-সভা । ১৯০৮ মার্চ | অরবিন্দ ঘোষ

চিত্র শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে

৫. আমরা যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব।

৬. আমরা নিজেদের এবং লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও শৌর্য -বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চার প্রচার করিব, এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুকচালনা অভ্যাস করিব, এবং দেশমধ্যে যাহাতে এসকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিব।

৭. আমরা একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসনকেই বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি, তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীয় রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন-কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্নমেণ্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলাম যে, আমাদের কাহারও কোনো স্বতন্ত্র তহবিল থাকিবে না। যে যাহা উপার্জন করিব, তাহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইবে ; এবং এই সাধারণ তহবিল হইতে আমাদের এবং আমাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা হইবে। এই প্রতিজ্ঞাটি কাজে কেহই রক্ষা করেন নাই। নানা দিকে সকলে কর্মোপলক্ষে ছড়াইয়া পড়াতে এ চেষ্টা করাও সম্ভব হয় নাই। নতুবা মোটের উপরে যাঁরা এই প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয়াছেন। —প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩

'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা' বিষয়ে গগনচন্দ্র হোম মহাশয় তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে (১৩৩৬) দীক্ষানুষ্ঠানের যে বিবরণ দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্‌ধৃত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার 'আত্মচরিতে' (১৯১৮) এ বিষয়ে লিখিয়াছেন।

সে এক অপূর্ব অনুষ্ঠান। আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশংকর সুকুল, শরচ্চন্দ্র রায়, তারাকিশোর চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার [শিবনাথ শাস্ত্রীর] নিকট পূর্বেই এই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমার দীক্ষার দিনে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে এক বাগানে গভীর রাত্রে তাঁহারা সকলে দীক্ষার্থী উমাপদ রায় ও আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন; সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল। আমরা বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া বটপত্রে লিখিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ হিংসা, ধর্মবিশ্বাসে প্রতিমাপূজা, সমাজে জাতিভেদ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরাধীনতা অগ্নিতে আহুতি দিলাম। তাহার পর বটপত্রগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম।

এই আত্মপ্রসাদ আছে— ভগবানের নাম লইয়া, ৪৫ বৎসর পূর্বে, যে ব্রত লইয়াছিলাম, যে-সমুদয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই, বিধাতার আশীর্বাদে, জীবনে পালন করিতে পারিয়াছি। আর, শুধু আমি নয় ; জীবিতদের মধ্যে বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র, সুন্দরীমোহন, উমাপদবাবু, এবং পরলোকগতদের মধ্যে 'দাদামহাশয়' শরচ্চন্দ্র রায়, কবি আনন্দচন্দ্র, কালীশংকর সুকুল— সকলেই মোটের উপরে প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয়াছেন।

পত্রাবলী কন্যা শ্রীমতী অমিয়া দেবকে লিখিত

বিপিনচন্দ্র পাল

140, Sinclair Rd. w
May 21st, London '09

১

মা· ·,

তোমাদের কারো কোনো চিঠি গতবারে না পাইয়া মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। এক লাইন খবর পেলেই সান্ত্বনা পাই— তাও তোমাদের সপ্তাহে লিখিবার সময় হয় না। যাহা হউক, ঈশ্বরকৃপায় তোমরা ভাল আছ, জানিলেই কৃতার্থ হব।

তোমার মাকে বলিও যে আমরা এখানে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছি, ইহা ভাবিয়া ধীর ও সন্তোষ হইয়া সব দিক চালাইতে। এক'শ টাকায় মাস চলা উচিত। যা হউক, একথা আমার লেখা বৃথা। সামনে থাকিলেও বা কিছু করিতে পারিতাম, এখানে পড়িয়া আছি, ভগবান তোমাদের যেভাবে চালাবেন তাই হবে। আমি আর কি করিব? তোমার ছোটদির সঙ্গে তোমার থাকা ভাল ছিল। দুজনারই ভাল হতো। এখনো সম্ভব হইলে তাই করিবে।

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। দয়াময় তোমাদের মঙ্গল করুন।

তোমার বাবা
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

The Swaraj Office
140 Sinclair Rd. West-Kensington
London W.
June 11. 1909.

২

মা,

তোমার চিঠি পাইয়াছি। গত দু' সপ্তাহই বড় গোলমালে ছিলাম, তাই চিঠি দিতে পারি নি। তোমরা প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিতে ভুলিও না। খোকা লিখেছে যে সে প্রতি সপ্তাহে আমাকে চিঠি দেয়। কৈ আমি তো বহুদিন তার চিঠি পাই নাই। তোমার মাকে বুঝিয়ে বলো যে আমার এখানকার দিন কি রূপে কাটে তা ভগবানই জানেন। যদি একটা আয়ের স্থিরতা থাক্‌তো তবে তাঁকে কিছু কিছু হাতখরচ পাঠাতাম, কিন্তু কোনই কিছু স্থিরতা নাই। 'স্বরাজ'[১] এখনো দাঁড়ায় নি, তার জন্য যে কি ভাবনা তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর তোমাদের তো এক'শ টাকা ঠিক আছে;—পেতে দেরি হয়, কিন্তু পাওয়া তো যায়ই। ঐ এক'শ টাকায় কুলান অসম্ভব নয়। তবে জমান সম্ভব নয়। আর ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করে ফল আছে কি? ভাবনার হাতে আমাকে যদি ছেড়ে দি, তবে এখানে দুদিনে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু ভাবনা তো তাঁর চরণে। তিনি অন্নদাতা; যদি দেন তবে খাব, যখন দেন, তখন খাই। এতকাল দিয়েছেন এতকাল তাই খেয়ে

১ বিপিনচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও লণ্ডনে প্রকাশিত ইংরেজি পাক্ষিক পত্র

আছি। আমার কি সাধ্য ছিল যে এখানে আসি, না আসলে বন্দী হতাম। তিনি এনেছেন, তাই আসিয়াছি। প্রতিদিন তিনি রাখ্‌ছেন তাই আছি। যদি অনাহার, অপমান প্রয়োজন হয়, তিনি তাও বিধান কর্ত্তে পারেন, তার প্রতিরোধ করে সাধ্য কার? তাঁর উপরে নির্ভর না করিয়া আর উপায় কি? নির্ভর করিতে পারিলে আরাম, না পারিলে ক্লেশ ও যন্ত্রণা, এই বেশ কম।

আজ ক'দিন কানু colic হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়মে হয়েছে, কষ্ট পাবে কিছু। কিন্তু ভগবৎকৃপায় ভয়ের কারণ আছে এমন মনে হয় না। ডাক্তার দেখ্‌ছেন। তবে এদেশের ডাক্তার আমাদের শরীরের কথা বোঝে কিনা সন্দেহ হয়। খাদ্যাখাদ্যের ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হচ্ছে। তোমরা ভেব'না। ঈশ্বরকৃপায় শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে। আমি একরূপ ভাল আছি।

তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ লইবে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

তোমার বাবা
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

নিভৃত আত্মচিন্তা 'জেলের খাতা'য় বিপিনচন্দ্র যে একান্ত ভগবৎ-নির্ভরের ব্যাকুল বাসনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ বহুদূর বিদেশ হইতে কন্যাকে লিখিত এই চিঠি দুখানিতেও। এই নির্ভরের ফলেই তিনি অর্থচিন্তা সম্বন্ধে অনেকাংশে উদাসীন হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রেও বিশেষ মতস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছেন।

"তিনি অন্নদাতা; যদি দেন তবে খাব, যখন দেন, তখন খাই" কন্যাকে তিনি যে এই প্রবোধবাক্য লিখিয়াছিলেন বাস্তবজীবনে তাহার একটি নিদর্শন নিজ অভিজ্ঞতা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—

"বিপিনচন্দ্র সে সময়ে নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় নিযুক্ত আছেন। পত্রিকাটি আর্থিক দিক দিয়ে সফলতা লাভ করতে পারে নি; সেইজন্য বিপিনচন্দ্রের বেশ অনটন চলছিল। এই সময়ে একদিন আমার মেজমামা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এসে আমাকে ডেকে পাঁচটি টাকা দিয়ে শীঘ্র গিয়ে বিপিনচন্দ্রের কন্যা শোভনার হাতে দিয়ে আসতে বললেন। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে, সেইদিন কিছুক্ষণ আগে মেজমামা চোরবাগানে সরকার বাই-লেনে বিপিনচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে শোভনাকে রান্নাঘরে শুকনো মুখে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, টাকা না থাকায় সেদিন তাদের উনুনে আগুন দেওয়া পর্যন্ত হয় নি। মেজমামার জিজ্ঞাসার জবাবে শোভনা বলেছে: 'ঘরে একটা পয়সাও নেই, বাবার তো এ সম্পর্কে কোনো উদ্‌বেগ নেই। তিনি কারও কাছে ধার চাইতেও নারাজ; তাই আজ আমাদের উপোস। আমাদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে; কিন্তু ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর কথা ভেবে আমি কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

"মেজমামা তখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে বঙ্গদর্শন কার্যালয়ে গিয়ে বিপিনচন্দ্রকে নিশ্চিন্তমনে কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখতে পেলেন। বিপিনচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীর খবর দিলে পরে তিনি বললেন: 'ভগবান ভাগ্যে যা লিখেছেন, তাই হবে। আমার ভাগ্যে যদি আজ টাকা জোটে তবেই আহারও জুটবে; আমি আর কি করতে পারি!'

"··অবশ্য সেই দিনই একজন পুস্তকপ্রকাশকের কাছ থেকে বিপিনচন্দ্র পঞ্চাশটি টাকা পান এবং সেই দিনই আমার মাতুলের পাঁচটি টাকা ফেরত পাঠান।··" —যুগান্তর, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

অর্থে যে বিপিনচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল না বা সে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তিনি উঠিয়াছিলেন এমন নহে; কিন্তু এক পক্ষে ভগবৎ-নির্ভর, অপর পক্ষে স্বমতে দৃঢ়তা, এই দুয়ের উপর ভর করিয়া তিনি সেই প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন, এবং বার বার তাঁহাকে সেই শক্তির পরীক্ষাও দিতে হইয়াছিল।

বস্তুতঃ অর্থসঞ্চয় বা ভবিষ্যৎ ভাবনা সম্পর্কে এই ঔদাস্যের ফলে, যৌবনে ধর্মমতের জন্য পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া জীবনের যে পথ তিনি বাছিয়া লন, সারা জীবন মতস্বাতন্ত্র্যের জন্য নানা নিশ্চিন্ত আশ্রয় বর্জন করিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হয় শেষবয়সের দারিদ্র্যে, তথা জনসাধারণের উপেক্ষা বা অবজ্ঞা -স্বীকারে।

বিপিনচন্দ্র পাল নবযুগের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব

শ্রীভবতোষ দত্ত

বিপিনচন্দ্র পালের চিন্তাপূর্ণ গদ্যরচনা যখন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তখন বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগ অতিক্রান্ত। বঙ্কিম-যুগ বলতে বাংলা সাহিত্যে যে যুগকে বোঝায় প্রবন্ধকাররূপে বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি তার পরে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগকে বলা যেতে পারে তাঁর গদ্যরচনায় শিক্ষানবিশির যুগ। বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির আদর্শ রচিত হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র সেই আদর্শেই নিজের গদ্যরূপকে মার্জিত করেছিলেন। তাঁর প্রধান রচনাগুলি সবই প্রায় বর্তমান শতাব্দীতেই প্রকাশিত হয়েছে। 'শোভনা' নামে একটি উপন্যাস, 'ভারতসীমান্তে রুষ' 'ভিক্টোরিয়া' এবং 'ভক্তিসাধন' প্রকাশিত হয়েছিল গত শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে। কিন্তু যে রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রকে বাংলার চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেগুলি সবই এই শতাব্দীর। 'জেলের খাতা' 'চরিতকথা' 'নবযুগের বাংলা' ছাড়াও 'সত্যমিথ্যা' নামে একটি ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রের চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করছে।

'স্বাতন্ত্র্য' কথাটা আপেক্ষিক। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধজাতীয় রচনার মধ্যে যে ধরনের চিন্তা মুখ্য হয়ে উঠেছে বিপিনচন্দ্র ঠিক তাকে অনুসরণ করেন নি। তিনি নিজে একটি চিন্তার ভিত্তি গড়ে নিয়েছিলেন এবং যতদূর মনে হয় বিপিনচন্দ্রের বিশ্লেষণ-শক্তির অসাধারণ মৌলিকতা সত্ত্বেও তাঁর মূল প্রেরণা ছিল বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজকল্যাণমূলক ভাবনারীতিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিমণ্ডলে তাঁর প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হত সন্দেহ নেই, তবু তার একটা সাধারণ উৎস নির্দেশ করা শক্ত হত না। কিন্তু এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজে এবং যুগচিন্তায় যে পরিবর্তনটি ধীরে ধীরে ঘটছিল বিপিনচন্দ্র তার সবটুকুই গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-আশ্রয়ী স্বাধীন বিচারণাতেই আধুনিক যুক্তিধর্মী রচনার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে ; ক্রমে ক্রমে তার প্রভাব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য সহায়তায়। আজ সেখানে বিপিনচন্দ্র পালের প্রভাব ততখানি জীবন্ত না হলেও আধুনিক বাংলার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর পথনির্দেশকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

বিপিনচন্দ্র বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসের যখন ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তাঁর সহযোগী আরও কেউ ছিলেন যাঁরা তাঁরই মত ঐতিহ্য এবং সংস্কারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যুক্তিমূলক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামও মনে পড়বে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের স্থান স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক এবং পৌরাণিক জ্ঞান এবং কর্ম -কাণ্ডে। পাঁচকড়ি বা বিপিনচন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দরের মত বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী ছিলেন না। আবেগ এবং অনুভূতি তাঁদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই আবেগের উৎস ছিল দেশ সমাজ এবং ধর্ম। বাংলা ও বাঙালীর বিশিষ্টতা ধর্মে সাহিত্যে জীবনাচরণের ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রতিফলিত বলে একটা দৃঢ় বিশ্বাস এঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এটা আকস্মিক ছিল না। দেশ-সত্তা এবং জাতি-সত্তা সম্পর্কে সচেতনতা আধুনিক মনেরই বিশিষ্টতা। মধ্যযুগীয় চিন্তায় এর

আভাস ছিল না। মধ্যযুগে ছিল ধর্ম আচার এবং সংকীর্ণ সংসারযাত্রার অন্ধ সংস্কার। আধুনিক ধর্ম-সাধনাতে যুক্তি এল, অন্ধ আচার সংশয়পূর্ণ হল আর সংকীর্ণ জীবন বৃহত্তর স্বার্থবোধে মুক্তিলাভ করল। জাতি বা সমাজকে ভালোবাসাও একটা সংস্কার। কিন্তু এই সংস্কারকে নূতন করে অর্জন করতে হয়েছে। এই জগৎ এবং মানবসমাজকে ভালোবাসার জন্য হৃদয়কে নূতন করে গড়ে নিতে হল। আমাদের সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিন্তাসূত্রে এই ইহমুখিনতাই ছিল একটি খুব বড় এবং মৌলিক গ্রন্থি। রামমোহনের আবির্ভাবে বাংলা দেশে যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে তাতে ভারতীয় বা বাঙালী জাতি বলে বিশিষ্ট গর্ববোধ দেখা না দিলেও স্বসমাজমুখী ইহকেন্দ্রিক চিন্তা যে দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যাকে রাজনৈতিক অর্থে জাতীয়তাবোধ বলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই বস্তুটি তেমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তা না হলেও নানাভাবেই তার ভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল। স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের উদ্ধার-সাধনে, নূতন সমাজ-গঠনের কল্পনায়, ধর্ম এবং সাহিত্যের নবীন রূপান্তরণে স্বভাবতই একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান চলেছিল। বিপিনচন্দ্রই বলেছেন, 'আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalismএর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।'[১] বিপিনচন্দ্রের এই উক্তি সত্য হলে আমাদের আধুনিক নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে জাতীয়তাবোধের ব্যাপ্ত হওয়ার কারণও ছিল না। কিন্তু স্বদেশাভিমান যে ধর্ম এবং সমাজের সংস্কার-প্রয়াস থেকেই জেগে উঠবে, সেটাও স্বাভাবিক।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় চেতনা এই ঐতিহাসিক কারণেই ব্যাপকতা অর্জন করল। এই পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিপিনচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা এবং প্রেরণা। ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবনচরিতে তিনি বলেছেন—

'আমার যৌবনকালে বাঙালী যুবসম্প্রদায় তত্ত্ববোধিনীগোষ্ঠীর চেয়ে বরং বঙ্গদর্শনগোষ্ঠীর সংস্পর্শেই বেশি এসেছিল। তত্ত্ববোধিনী আমাদের মত যুবকদের কাছে ছিল গুরুগম্ভীর। বঙ্গদর্শনের উপন্যাস, কবিতা, ব্যঙ্গরচনা, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক রচনা আমাদের হৃদয়কে অধিকতর উদ্দীপিত করত। দুর্গেশনন্দিনী আমাদের স্বদেশাভিমানকে জাগিয়ে দিল। আমাদের অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি আমরা উজাড় করে দিলাম বীরেন্দ্র সিংহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমাদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের মত আর কারও কাব্যই জাতীয়তাবোধকে এমন করে জাগাতে পারে নি।'

বাংলার জাগরণের এই দিকটা এবার স্বাভাবিক পরিণতি পেল। স্বদেশপ্রেম দেখা দিল পরিপূর্ণ ইহচেতনার ফল হিসাবেই। কিন্তু এই স্বদেশপ্রেমে বিশেষত্ব ছিল। এতে তখনও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রকৃতি আসে নি। বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশপ্রেমের বাণী দিয়েছিলেন, তাতে জাতি হিসাবে সর্বাঙ্গীণ জাগরণকেই কাম্য বলে কল্পনা করেছিলেন। এই জাতীয়তাবোধে জাতিবৈরিতাও ছিল না। পরবর্তীকালে জাতীয়তা কেবল রাষ্ট্রশাসনের অধিকারবোধে পর্যবসিত হয়ে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক রূপ লাভ করল। কিন্তু এই নবজাগ্রত জাতীয়চেতনা ধর্ম সমাজ সাহিত্য নীতি শিক্ষা— সব কিছুকেই অবলম্বন করল। আমাদের প্রথম জাগরণের ধারাবাহিকতাই এতে অব্যাহত ছিল। প্রথম যুগে সমাজ ধর্ম এবং শিক্ষা-সংস্কারের যে মানবিক

---

১ "সুরেন্দ্রনাথ", চরিতকথা

বোধের উদ্বোধন তার লক্ষ্য ক্রমশ নিবদ্ধ হল জাতীয় সচেতনতায়। সেইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়চেতনা এমন বিভিন্নমুখী উদ্যমে পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এই বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধকে বিশ্লেষণ করলে আরও কতকগুলি সূত্র চোখে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সনাতনপন্থী হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের সম্প্রদায়-চেতনা স্বভাবতই বেশি ছিল। ব্রাহ্মধর্মের নবীন প্রতিষ্ঠা এবং সনাতনপন্থীদের আপন শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা তার প্রধান কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশে নূতন ভাববিপ্লবের ফলে এই বিভেদের তীব্রতা যেন খানিকটা গৌণই হয়ে গেল। ব্রাহ্মধর্মের আত্মবিরোধকেই শুধু এর একমাত্র কারণ বলা চলে না। মনে হয়, বৃহত্তর জাতীয় কর্তব্যবোধও এর একটা কারণ ছিল। সেই কর্তব্যের আহ্বানে রাজনারায়ণ বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমভাবেই সাড়া দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মেরই শ্রেষ্ঠতা' রচনা করে ব্রাহ্মধর্মের অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মচেতনাও বৈষ্ণব এবং খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাবে কতকটা বর্ণান্তরিত হল। এই সময়ে সম্প্রদায়ের সীমারেখাগুলি খানিকটা ম্লান হয়ে এল। তখন বরং নূতনতর জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে সকলেই একটি সাধারণ লক্ষ্যকে স্বীকার করে নিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে নিভৃত আত্মজীবনের কথা বলতে গিয়েও এই জাতীয়তাবোধের উন্মাদনার কথা বলতে ভোলেন নি। বিপিনচন্দ্র কেশবের নূতন মতের বর্ণনা করতে গিয়েও তাতে জাগ্রত দেশপ্রেমের পিপাসাকেই তৃপ্ত হতে দেখেছেন।—

'খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে কেশবের বাদবিতর্ক শুধু তাঁর অনুগামীরাই নয়, অন্যান্যেরাও আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। মিশনারীদের উপর জয়লাভে কেশবের মতানুবর্তীরা ছাড়াও সাধারণভাবে তাঁর স্বদেশবাসীরা সকলেই গর্ব বোধ করত; তারই দ্বারা আমাদের স্বাজাত্যাভিমান চরিতার্থ হত।'

সুতরাং ধর্মোন্মাদনার মধ্যেও একটা অভিনব সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও একটা সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমন্বয়-সাধনের অন্যবিধ আয়োজন সার্থক হোক আর নাই হোক, এই জাতীয়তার একটা স্বার্থমুক্ত রূপ গড়ে উঠতে লাগল; সেটা যে নবজাগ্রত বাঙালীর বিভিন্নমুখী প্রবণতাকে সংহত করে নিয়ে আসছিল তাতে সংশয় নেই।

বিপিনচন্দ্র এই যুগেরই মানুষ। এক অর্থে তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং চিন্তায় এই যুগের দ্বন্দ্ব সংশয় এবং মীমাংসা এমনভাবে রূপ লাভ করেছে যে ঠিক আর কাউকে তাঁর সমধর্মী ভাবতে পারা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ— এঁরা বাংলার জাগরণের ফলস্বরূপ বিভিন্ন বাণী এবং আদর্শকে দিয়ে গিয়েছেন। বিপিনচন্দ্র নিজে কোনো বাণী রচনা করতে পারেন নি, কিন্তু জাগরণের বিভিন্নমুখী প্রভাবকে এক সঙ্গে তিনি বহন করে গিয়েছেন। তিনি আচারনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারের সন্তান হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পৌরাণিক সমন্বয়-কল্পনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন; ব্রাহ্ম-বিশ্বাসে অবতারবাদের স্থান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র রচনা করতে থাকলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে তার প্রতিবাদ করতে বলেছিলেন। বিপিনচন্দ্র অবতারবাদ স্বীকার করে বলেছেন, 'বাহিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, জাগিতে পারে না। ভগবানকে

বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তাঁর সত্য জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এইজন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয় তাঁহারাই জগতে সকল ধর্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন'।[২] ব্রাহ্ম ও পৌরাণিক ধর্মের যুগপৎ অবস্থানকে বিস্ময়কর বলে মনে হয়, কিন্তু তার পরেও বৈষ্ণব ধর্মের গভীর বিশ্বাসও বিপিনচন্দ্রের অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আর-একটি দিক। এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের উদার মুক্তবুদ্ধি মননশীলতাও সমানভাবেই স্মরণীয়। বাংলার জাগরণের এমন পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট ব্যাখ্যাও আর কেউ করেন নি। বস্তুত 'নবযুগের বাংলা'র ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির কথা বাদ দিলেও 'চরিতকথা'র মধ্যেও তারই অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যাবে। 'নবযুগের বাংলা'য় জাগরণের ইতিহাস যেখানে থেমেছে, 'চরিতকথা'য় রচিত হয়েছে তার পরের অধ্যায়। ইতিহাস এবং সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তিকে স্থাপন করে তার আবির্ভাবকে যে ভাবে অর্থপূর্ণ করে তুলতে তিনি পারতেন, তার তুলনা সত্যই বিরল। অবশ্য চরিতকথার আলোচনাতে বিপিনচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পেরেছেন কি না সন্দেহ, কিন্তু বিচার এবং বিশ্লেষণের ক্ষুরধার দীপ্তি তাতেও অক্ষুণ্ণ আছে। এই যুক্তিবাদ বিপিনচন্দ্রের আর-একটি দিক। এই সব বিভিন্নমুখী প্রবণতা বিপিনচন্দ্রের মানসজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল।

এই বিচিত্র এমন-কি বিরোধী বিশ্বাস এবং বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় চিন্তানায়কদের ভিতর প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলার জাগরণ এমন বিচিত্র সৌন্দর্য লাভ করেছিল এঁদেরই দানে। বিপিনচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা করেছেন ; এই বিষয়টিতে তাঁর মনীষা যত মুক্ত এবং উজ্জ্বল অন্য কিছুতেই তত নয়। সম্ভবত বিপিনচন্দ্র নিজে এই সামাজিক অভ্যুত্থানের সৃষ্টি বলেই এই বিষয়টিতে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। এই বিভিন্ন আদর্শ তাঁর চিত্ত ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক জীবননীতির সৃষ্টি করে তুলতে পারে নি সত্য, কিন্তু বাংলা দেশের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান যেমন সমষ্টিগত কল্যাণধর্ম রচনা করল বিপিনচন্দ্র তেমনি ব্যক্তিহৃদয়ের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ করে দেশের কল্যাণচিন্তাকেই প্রধান করে তুলেছিলেন। জাতীয়তার ধ্যান বিপিনচন্দ্রের আর-সব চিন্তাতেই আচ্ছন্ন করল। আজও বিপিনচন্দ্রের পরিচয় জাতীয়তাবাদী নেতা বলেই। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের কীর্তি যাই থাক্, বাংলা সাহিত্যের পাঠক জানেন বাঙালী সমাজের চিন্তাশীল ভাষ্যকার রূপে তাঁর স্থান ভূদেব-বঙ্কিমের সঙ্গেই। তাঁর এই মনীষা যে বাংলার জাগরণেরই ফল, তাও আমরা দেখেছি। তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও সেই শতাব্দীর বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধ থেকেই অনুপ্রেরিত, সে কথাও সত্য। বিপিনচন্দ্রের এই স্বাজাত্যবোধে বাংলা দেশ এবং সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন ; তাঁর পত্রিকার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন'। বাংলা দেশ সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহ একটা খুব স্বাভাবিক কারণেই গড়ে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে, এক যুগে নব্যবঙ্গদের মুখপত্রের নামও ছিল 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'— বঙ্গদর্শন নামটিকে তারই অনুবাদ বলে ধরা যেতে পারে। নব্যবঙ্গের আলোচ্য বিষয়ে ও পদ্ধতিতে সংকীর্ণতা ছিল না; তাঁরা দেশের ইতিহাস, সমাজ-নীতি, সাহিত্য এবং ধর্মের আলোচনা মুক্তবুদ্ধি দিয়েই করেছিলেন। তাঁদের বিষয়বস্তুতে বাংলা দেশ যদি কোনো কারণে কখনও প্রধান হয়ে উঠে থাকে সেটা ঐতিহাসিক কারণেই

২ "অশ্বিনীকুমার দত্ত", চরিতকথা

হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যেতে পারে। তিনি বাংলা দেশের ইতিহাস গড়তে চেয়েছিলেন, তাঁর বঙ্গপ্রীতিও আন্তরিক, কিন্তু বাংলা দেশ নিয়ে কোনো অন্ধতা প্রকাশ করেন নি। বাংলা দেশের সংস্কৃতি এবং সাধনার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে পর্যালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের রচনাতেই। পূর্বেকার জাতীয়তাবাদের বিংশ শতাব্দীতে একটা বিস্তার ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় আদর্শের বৃহৎ উপলব্ধি ক্রমেই আরও একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই শতাব্দীর নূতনতর যুগচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে আন্তর্জাতিকতায়। সাহিত্যের দিক দিয়ে বলা যায় দ্বিতীয় দশক থেকেই এর প্রসার। প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সাহিত্য-শিষ্যরা অনুসরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই এই সময়ের বিবর্তিত চিন্তাধারাকে।

বিপিনচন্দ্র কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর স্বসমাজনিষ্ঠ জাতীয়তাবোধে অবিচল ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথকেও এর সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেছি। এই আন্দোলনের মূলে শুধুই রাজনীতি ছিল না, এতে ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের দুশ্চিন্তা। সেই জন্য এর মধ্যে বাঙালীর সমগ্র সত্তা যেন সাড়া দিয়েছিল। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির চিন্তা এবং ধ্যান এরই ভিতর দিয়ে বাঙালী চিত্তকে অভিভূত করল। বিপিনচন্দ্র রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলা দেশকে মাত্র লক্ষ্য করেন নি, এ কথা সত্য। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ এবং তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে তাঁর প্রত্যয় ছিল অক্ষুণ্ণ। তিনি বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এই বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি শুধু ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেন নি, বৈষ্ণব ধর্মকে আধুনিক আদর্শের প্রতীক রূপেও বিশ্বাস করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কৃষ্ণচরিত্রকে পৌরাণিক অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে আধুনিক যুগের রুচি এবং যুক্তিসংগত মনোভাবের উপযোগী করে নিয়েছিলেন, বিপিনচন্দ্রও তেমনি বৈষ্ণব ধর্মকে অনেকটা নূতন আদর্শেই গ্রহণ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র যখন অবতারবাদের সমর্থন করেন তখন ধর্মবিশ্বাসের জন্য যতটা না হোক বাস্তব প্রয়োজনের জন্য তার চেয়ে কম সমর্থন করতেন না। নারায়ণ তাঁর কাছে মানবতারই প্রতীক।

এরই ফলে বৈষ্ণব ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের তত্ত্বচিন্তার দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মনে হয়, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে ব্রাহ্ম হলেও হিন্দু ধর্মের নির্বিশেষ লজিকটাকে তিনি জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে বঙ্কিমী যুগের মনীষারই তিনি উত্তরাধিকারী। বিপিনচন্দ্রের মনীষাকে এইভাবে বুঝতে পারলে বাংলার ভাবুক-সমাজে তাঁর স্থানটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে দুটি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্রকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চিত্তরঞ্জন দাশ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর পক্ষেই স্থাপন করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা করে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবন্ধধারার উদ্‌ভব হল বিপিনচন্দ্র ছিলেন তার প্রতিপক্ষ। বিপিনচন্দ্র দেশ এবং জাতির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছিলেন এবং এটা খানিকটা আসক্তিতেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধরীতির আর-একটা বৈশিষ্ট্য যেটা তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ পেল সেটা হচ্ছে বক্তব্য এবং ভাষার অলংকারহীনতা। ভাষার শিল্পকলা ছিল তাঁর কাছে অপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যভাষা-প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন। ভাষাকে শুধু অর্থের ভার বহন করতে না দিয়ে ব্যঞ্জনার ধর্মও তাতে এনে দিলেন। এই পরিবর্তন অনেকেরই পছন্দ হয় নি। গদ্যের কাজ যে তথ্য এবং যুক্তির দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যকেই প্রকাশ করা, এ বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ গদ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সূচনা

করলেন। আপন কবিসত্তার প্রবল নির্দেশকে তিনি অমান্য করতে পারেন নি। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিবাদের একটা ঝড় বয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে অস্পষ্টতা, বাস্তবতাহীনতা, জীবনবিমুখতার অভিযোগ করে একটি বড়ো প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ; রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার সম্বন্ধে বলেছেন 'বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই ; তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন এবং জীবনের এমন সকল ভাগ, এমন সকল ঘটনার দিক দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো যোগ নাই।' সত্য সত্যই বিপিনচন্দ্র জীবন এবং সাহিত্যকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে তার প্রতিকূল সিদ্ধান্তে আসবার জন্যই বিপিনচন্দ্র এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা অবশ্য মেনে নেওয়া শক্ত। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধ-রচনার এটাই ছিল পদ্ধতি। 'চরিতকথা' বইটিতে তিনি যে কয়জনের জীবনী আলোচনা করেছেন, সব কয়টিতেই তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে, সমাজনেতাদের জীবনীর আলোচনায় এই পদ্ধতি বাঞ্ছনীয়, কারণ তাঁদের কর্মচেষ্টা বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত। সাহিত্যবিচারেরও কি এই নীতিই হওয়া উচিত ?

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই সূত্রটি আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনাতে জীবন ও সাহিত্যের যোগকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। এই মনোভাবটিকে উনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক দৃষ্টিরই ফল বলা যেতে পারে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তুআশ্রয়ী যুক্তিবাদী জীবননীতির প্রভাবে সাহিত্যের এই আদর্শও গড়ে উঠেছিল। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনদেবতার উল্লেখ করেছিলেন, তখন অনেকে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্র 'জেলের খাতা'য় লিখেছেন, 'ইহা অসংখ্যবার উপলব্ধি করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দিতেছেন।' তাঁর এই উপলব্ধির মধ্যে মিস্টিসিজ্‌ম্ অবশ্যই আছে, তবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবাদের সঙ্গে প্রভেদ কি ? প্রভেদ সম্ভবত এইটুকুই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত আর বিপিনচন্দ্রের অদৃশ্য শক্তি তাঁর ধর্মসাধনার বিষয়। মানুষের সঙ্গে যেখানে মানুষের যোগ সেখানে প্রত্যক্ষতা এবং বাস্তববোধ থাকা চাই। সমষ্টিকল্যাণই জীবনের পরম লক্ষ্য। কাব্যসৃষ্টিই হোক আর রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাই হোক মানুষের জীবনকে বুঝতে গেলে এই বস্তুগ্রাহ্য সামাজিক দিক দিয়েই বুঝতে হবে। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে একটা কঠিন যুক্তিবাদিতা আছে, যা অবশ্য গণিতের বা দর্শনের নয়। জীবনকে কল্যাণপ্রতিষ্ঠ করবার অদম্য বাসনার ফলে ইতিহাসের সংকেতকে বুঝবার চেষ্টা থেকেই তাঁর এই যুক্তিবাদিতার উদ্ভব। তাই বিপিনচন্দ্রের চিন্তা abstract বা theoretical নয়। তাঁর যা-কিছু চিন্তা সমাজদর্শন নিয়েই। সে সমাজ বাংলারই সমাজ। ইতিহাস-বোধ এই চিন্তায় প্রবল। আধুনিক বাঙালী সমাজের ধর্মগত নীতিগত এবং আদর্শগত লক্ষণগুলিকে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ দিকে এমন একটি সহজাত আনন্দ ও তৃপ্তি তিনি বোধ করতেন যে কখনও কখনও মূল আলোচ্য থেকে সরে গিয়েও সেই ইতিহাসকে তিনি অনুসরণ করতে ভালোবাসতেন।

এইসব আলোচনাতে জাতীয় প্রকৃতিতে একটা অবিচল বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত ভাবগুলিকে তিনি জাতীয় প্রকৃতির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইতিহাসের আলোচনা করেছেন, ততক্ষণ তাঁর মনীষা অসামান্য বলেই মনে হবে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা এবং প্রয়োগের প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আসে। য়ুরোপীয় চিন্তার যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁকে অনেক দিক দিয়ে মুগ্ধ করে। নবযুগের বাংলা গঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভাবসম্পদের দান যে অপরিসীম সে কথা তিনি বিশ্বাস করেন—

'ব্রিটিশ ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষা সঞ্চার হয় নাই, বাঙালী তখনও এই মুক্তিমন্ত্রসাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এইজন্যই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও সজীবতা বাঙালীর স্বাদেশিকতার ধর্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শুদ্ধি ও শুদ্ধতা এ-সকল এ পর্যন্ত ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে দেখা যায় নাই।

অথচ বাঙালী সমাজের ধর্মগত এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা এবং তার সম্পর্কে একটা গর্ববোধ বিপিনচন্দ্রের মনীষার আর-একটি লক্ষণ। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টা আধুনিক বাংলার চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদেরই একটি লক্ষ্য ছিল। অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই চেষ্টা করেছেন। বিপিনচন্দ্রও করেছিলেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, ভাব বা চিন্তার ক্ষেত্রে ততখানি অগ্রসর হন নি। তাঁর রচিত গল্পগুলি গল্প হিসাবে যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে তা বলা না গেলেও সেখানে এই দ্বন্দ্বসংশয়-চিহ্নও ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'র উত্তরে তিনি যে 'মৃণালের উত্তর' রচনা করেছিলেন, তাতে স্বাভাবিক ঘটনার পরিবর্তে একটা কল্পিত এবং কৃত্রিম পরিস্থিতিতে মৃণালকে স্থাপন করে প্রাচীন পারিবারিক প্রথা এবং সামাজিক আদর্শের প্রতি অনুরাগই প্রকাশ করেছিলেন। গল্প হিসাবে তাঁর 'সত্যমিথ্যা' সার্থক হয় নি, তার প্রধান কারণই ছিল তত্ত্বপ্রবণতা। প্রবন্ধ রচনাতেই ছিল তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের যথার্থ মুক্তি। এবং এতেই বাংলা সাহিত্যের প্রধানদের মধ্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বিপিনচন্দ্র পাল স্বদেশী-আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক্

নির্মলকুমার বসু

বাংলাদেশের ভাবালুতা সম্পর্কে একটি অপবাদ আছে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বাংলা ভাবের আবেগে যাহা গ্রহণ করে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মনের রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ করে। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম যেমন সে গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই ভাবে নব্যন্যায়ের মত সূক্ষ্ম বিচারপদ্ধতি এখানেই উদ্ভূত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ রহস্যের মত জটিল তত্ত্ব এখানেই প্রকাশিত হইয়াছে। যে ভাবধারা বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, তাহা ভারতের এই প্রাচ্যভূমিতে স্থায়ী আসন রচনা করিতেও পারে নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম উন্মাদনা যখন স্তিমিত হইয়া আসিল তখন এক দিকে স্বাধীনতাকামী পুরুষগণ রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘর্ষণের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে আয়োজন নির্মাণে ব্যাপৃত হইলেন; অপর দিকে চিন্তার রাজ্যে শিল্পে সাহিত্যে নানাভাবে বাংলার সৃজনীশক্তি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্রস্পর্শে বাংলার জীবনে প্রাণসঞ্চার ঘটিলেও, ক্রমে আরও সাত আট বৎসরের মধ্যে সেই ধারা শ্রেণীবিশেষে পর্যবসিত রহিল, বিপুল জনসাধারণের মধ্যে তাহার আর কর্মপ্রকাশ রহিল না, বিপ্লবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও তাহার ফলে ক্রমে ভাবের সংকোচন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ১৯১৫ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯১৯-২০ নাগাদ ক্রমে রাজনৈতিক পটভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২০-২১ সালে যখন তিনি রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় জনসমুদ্রের প্লাবনের যথাযোগ্য আয়োজন করেন, তখন দেশে এক অভাবনীয় জাগরণের সূচনা দেখা যায়। এতদিন যাহা অল্পসংখ্যক সাধকের জীবনে প্রবহমান ছিল, এইবার তাহা বহুজনের কর্মচেষ্টার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ওঠে। বাংলাদেশ এই ভাবের ও কর্মের বন্যায় নূতন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিল।

কিন্তু অল্পদিনে কেহ কেহ অনুভব করিতে লাগিলেন যে স্বদেশী আন্দোলন যে-ভাবে বাংলার চিত্ত ও বুদ্ধিকে স্পর্শ করিয়াছিল, অসহযোগ ঠিক যেন তেমনটি করিতেছে না। বিপুল জনসমূহের কর্মশক্তির আবর্তের একটা উন্মাদনা আছে। অসহযোগ আন্দোলনের এই কর্মতৎপরতায় যাঁহারা মুক্তি পাইলেন, তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির বন্ধ্যা অনুসরণকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। যাহারা বুদ্ধিজীবী এবং অহিংস অসহযোগকে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লওয়ার পক্ষপাতী তাহাদের অপবাদ ঘটিল যে, তাহারা কর্মের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কর্মজীবনের তুলনায় বুদ্ধিজীবন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত স্থান অর্জন করিল।

বাংলায় যে কয়জন চিন্তাশীল নেতা এই সময়ে স্বধর্ম হইতে কর্মের তাগিদে ভ্রষ্ট হন নাই বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কংগ্রেস-কল্পিত স্বরাজের আদর্শকে বিচার করিয়া বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। 'ডেমক্রেটিক স্বরাজ' নামে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, ইংলণ্ডেও গণতন্ত্র যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কয়েক বৎসর অন্তর প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার সে দেশে আছে, ইহা সত্য। কিন্তু যদি জনসাধারণের কর্মশক্তি নীচে হইতে অঙ্কুরিত না হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে

প্রয়োজনবোধে বাতিল করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে এবং গুরুতর প্রশ্ন সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার ব্যাপারে জনসমূহের অধিকার না থাকে (Initiative, Recall, Referendum) তবে নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা শাসনযন্ত্র চালিত হইলেও সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিনিধিমণ্ডল সে-ক্ষেত্রে এক নূতন শাসক-সম্প্রদায়ে (Ruling Classএ) পরিণত হন। ভারতবর্ষের জন্য তিনি মনে করেন, গ্রামে গ্রামে স্বায়ত্তশাসন এবং স্থানীয় পরিচালন-ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বায়ত্তশাসিত গ্রামসমূহের সংঘরচনা করিয়া জেলার শাসন, বিভিন্ন জেলার সংঘ-রচনার ফলে প্রাদেশিক এবং বিভিন্ন প্রদেশের সংযোগফলে সর্বভারতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হওয়া উচিত। এইরূপ ফেডেরাল গঠনতন্ত্রকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

যে-প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে তিনি আরও বলেন, ভারতের হিন্দুসভ্যতা এইভাবে বহু জাতির, বহু সংস্কৃতির একীকরণের দ্বারাই রচিত হইয়াছে। এই একীকরণ বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধনের দ্বারা সাধিত হয় নাই, বহুকে এক সূত্রে গাঁথিবার কৌশলের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতে যেমন বহু ভাষা বর্তমান, এবং প্রতি ভাষার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার অধিকার আছে, তেমনই এই দেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ পার্শী বা খ্রীস্টীয় ধর্মেরও স্থায়ী অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। প্রতি সম্প্রদায়কেই কালোপযোগী সংস্কার সাধন করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যের সাধনার দ্বারা সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইবে।

'প্যান-ইসলামিজ্‌ম্' নামে অপর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র ইসলাম ও মুসলমান সমাজের বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করেন, তাহা অত্যল্প ইসলামধর্মীর পক্ষেই সম্ভব। ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের গভীর জ্ঞানের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইসলামে দীক্ষিত জনগণের মধ্যে সমতার বোধ, ধর্মে পুরোহিতের স্থানের অভাব, একটি সহজ একেশ্বরবাদের উপরে বিশ্বাস, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের পক্ষে মক্কার দিকে ফিরিয়া নমাজ পড়ার ব্যবস্থায় যে একতার বোধ সৃজিত হইয়াছে, তাহাকে তিনি সম্যক্ মূল্যদান করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলেন যে, মুসলমানের আধ্যাত্মিক একতার বোধ কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক ঐক্যের সহিত রাজনৈতিক স্বার্থের ঐক্যের সম্পর্ক ছিল না। এবং এই কারণেই ১৯১৯-২০ সনে যখন ভারতে খিলাফত আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্যান-ইসলামিজ্‌ম্ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে তখন বিপিনচন্দ্র সমগ্র জাতিকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন।

দেশ তখন নবকর্মের উন্মাদনায় মত্ত, চিন্তা এবং বুদ্ধিকে তখন ব্যাঘাতসৃজনকারী বলিয়া মনে করা হইতেছে, স্বেচ্ছায় বৃত সর্বাধিনায়ক মহাত্মা গান্ধীকে নির্বিচারে অনুসরণ করাই দেশজোড়া সৈনিক সম্প্রদায়ের ধর্ম বলিয়া আমরা মনে মনে স্থির করিয়াছি। এ অবস্থায় বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা চিত্তামণি -প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাণী কর্মকোলাহলে আমাদের চিত্ত বা বুদ্ধিকে স্পর্শ করিল না। খিলাফত-সমস্যা তুর্কীর নবজাগরণের ফলে নিষ্ফল হইয়া গেল ; কিন্তু সেই আন্দোলনের আওতায় মুসলিম সমাজের যে স্বকীয়তা ভারতীয় সাজাত্যবোধের পরিপন্থী হইয়া দেখা দিল, তাহাই উত্তরকালে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া আমাদের সমূহ ক্ষতিসাধন এবং স্থায়ী সমস্যার মধ্যে পরিণতি লাভ করিল।

বিপিনচন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা যেমন খিলাফত-আন্দোলন কালে তাঁহাকে জাতীয় জাগরণের স্রোত

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তেমনই অপর একটি কারণেও তিনি এ দেশে অধিকতর নিঃসঙ্গ হইতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি প্রায় সর্ববিষয়ে সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু কাউন্সিল-বয়কট তিনি কোনোক্রমেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। যে দেশে গণতন্ত্রের সাধনাই আধুনিক ধারায় সম্পন্ন হয় নাই সেখানে আইনসভা এবং নির্বাচনের সুযোগ লইয়া রাজনৈতিক শিক্ষা এবং সংগঠনের ব্যবস্থা যেমন এক দিক দিয়া করিতে হইবে, তেমনই আইনসভার মধ্যেও প্রয়োজনবোধে সংগ্রামমূলক কর্মচেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ব্যক্ত করার সময়ে তিনি এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদনভার বর্জন করিয়া পুনরায় দুঃখ এবং অনিশ্চয়তার পথ বরণ করিয়া লন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের চলিত ধারার বিরোধিতা করার বিষয়ে বিপিনচন্দ্রের আরও একটি যুক্তি ছিল। ইহার পশ্চাতে কর্মের উন্মাদনাজনিত বুদ্ধিজীবনের অস্বীকৃতি যেমন দেখা দিয়াছিল, তেমনই নির্বিচারে গুরুবাদ বা মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের অন্ধ অনুসরণের লক্ষণও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র ব্যক্তিপূজার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে, ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে, দুইবার তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। রাজনৈতিক জীবনে তাহার পুনরাবৃত্তির সূচনা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি ইহাকে গণতন্ত্রগঠনের পরিপন্থী ভাব বিবেচনা করিয়া তীব্রভাবে আঘাত করেন।

তাঁহার ইহাও মনে হইয়াছিল, অসহযোগ যে মুখে চলিয়াছে তাহাতে দেশের মন এক সংকীর্ণ জাতীয়তার গলিপথে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। এই আন্দোলনের কিছু পূর্বকাল হইতেই স্বদেশী-আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক্ বিপিনচন্দ্র বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা অপেক্ষা ইংরেজ জাতির সহিত স্বেচ্ছায় এবং সমসূত্রে বাঁধা এক সম্পর্ক-স্থাপনের বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন।

চিন্তার নানাবিধ মৌলিকতার ফলে বিপিনচন্দ্র ক্রমশ দেশবাসীর জীবনস্রোত হইতে যেন ঈষৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ অনুরূপ অবস্থায় কর্মত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই চিন্তাশীল কর্মবীর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও কর্মচ্যুত হইলেন না, স্বস্তির নীড় রচনার জন্য চেষ্টিত হইলেন না। তাঁহার শেষবয়সে যে জনসমাজ নিরন্তর তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল তিনি তাহাদের প্রদত্ত আঘাত সহ্য করিলেন সত্য, কিন্তু এক দিকে যেমন প্রয়োজন হইলে ঋণ করিয়াও পরোপকারে প্রবৃত্ত রহিলেন তেমনই নিজের অহংবোধকেও কিয়ৎপরিমাণে বিস্তৃত হইতে দিলেন। ইহার ফলে তাঁহার অন্তরে কোনও ক্ষতি সাধিত না হইলেও, অপরের পক্ষে তাঁহার সহিত কাজ করা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠিল। অনমনীয় সত্যনিষ্ঠার ফলে তিনি পূর্বেও যেমন একাকী পথ চলায় অভ্যস্ত ছিলেন, এবারে যেন সেই চলাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইল।

সমুজ্জ্বল বুদ্ধিজীবনের উপরে আস্থা, গুরুবাদকে বা অন্ধ ভক্তিকে স্বীকার না করার প্রবৃত্তি এবং যথাযথ ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাহার উচিত মূল্য দিবার যে সৎসাহস বিপিনচন্দ্রের চরিত্রে আমরা প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহা সর্বকালের সর্বমানবের পক্ষে গ্রহণীয় বা শিক্ষণীয় ধর্ম।

বিপিনচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স্, অহিংস প্রতিরোধ প্রভৃতি ভাবের আদিগুরু। ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কজনিত বহু শিক্ষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অতএব এইসকল গুরুঋণ আমাদিগের পক্ষে স্মরণ করা কর্তব্য।

কর্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবে কে কোন্ ভাবের জন্মদান করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসের পটভূমিকায় নগণ্য না হইলেও গৌণ পদার্থ। যে-সকল সমাজসেবার প্রচেষ্টা ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই কি খ্রীস্টান মিশনারীগণের আদর্শে রচিত নয়? ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে যুক্তিবাদ জাতীয়তাবাদ ও মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করার চেষ্টা চলে, তাহাই কি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজপ্রমুখ নানা ধারায় সঞ্চারিত হয় নাই? ব্রাহ্মসমাজকে বহু নবধর্মের উৎসমুখ না ভাবিয়া ইউরোপের যে ভাবধারা সেই উৎসমুখে পরিবেশিত হইয়াছিল, তাহাকেই বা আমরা যথাযথ মূল্য দিব না কেন?

বস্তুত, প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেশ এবং কালের ব্যবধান ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া যায়। মাটির উপর দিয়া চলার সময়ে ক্ষেতের আল বাধা ও ব্যবধানের সৃষ্টি করে। কিন্তু আকাশপথে বিচরণ করিলে এই-সকল ব্যবধান তুচ্ছ হইয়া যায়, এবং সমগ্র কৃষিভূমির একটি বিস্তৃত একীভূত ও সত্যতর রূপ নয়নের সম্মুখে বিকাশলাভ করে।

সেই দৃষ্টি লইয়া পরীক্ষা করিলে আমাদের বলিতে হয় যে, ইতিহাসে চিন্তাশীল বা কর্মশক্তিবিশিষ্ট নেতা এবং জনসমূহের সম্পর্ক, জগন্নাথের রথ যাহারা টানে এবং সেই রথের সম্পর্কের মত। যাহারা আকর্ষণ করে তাহারা সমবেত হইয়া, দড়ির সাহায্যে, বিশেষ এক দিকে রথকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে। রথ নিজের ভারে স্থাণু অবস্থায় আপাততঃ অটল হইয়া থাকে। অকস্মাৎ আকর্ষণের প্রাবল্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহা বেগে চলিতে আরম্ভ করে। ঘটনাচক্রে এমনও ঘটিয়া থাকে যে, যাহারা আকর্ষণ করিয়া রথকে চালিত করিল তাহারা চারি দিকের জনতার চাপে দ্রুত অগ্রসর হইতে না পারার ফলে নিজেরাই রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। ইহা দুঃখের ঘটনা, যুক্তিসংগত নহে, তবু ইতিহাসে বারংবার এরূপ ঘটিয়া থাকে।

ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস পর্যালোচনা না করিয়া যদি আমরা ব্যক্তিকে সমাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করি, জনসমূহের অসংলগ্ন গতি এবং আকর্ষণকারী তীর্থযাত্রীর দল উভয়কে ইতিহাস-নাট্যে যথাযথ স্থান ও মর্যাদা দিই, তবে উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে মানবসমাজ অবশেষে যে গতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে তাহার সম্যক্ ধারণা করা আমাদের পক্ষে আরও সহজ ও সম্ভবপর হয়। কাহারও বিশেষ দোষ বা কাহারও বিশেষ গুণ তখন এই বিশ্বরূপ-দর্শনের মধ্যে আমাদের নিকট অবান্তর হইয়া যায়। ইহাই ইতিহাসের চরম শিক্ষা।

SWADESHI AND SWARAJ : Bipin Chandra Pal : Rupees Six.

THE BRAHMO SAMAJ AND THE BATTLE FOR SWARAJ : Bipin Chandra Pal : Rupee One.

THE SOUL OF INDIA : Bipin Chandra Pal : Rupees Five.

CHARACTER SKETCHES : Bipin Chandra Pal : Rupees Six.

নবযুগের বাংলা। বিপিনচন্দ্র পাল। ছয় টাকা।

রাষ্ট্রনীতি। বিপিনচন্দ্র পাল। দুই টাকা।

মার্কিণে চারিমাস। বিপিনচন্দ্র পাল। দুই টাকা।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক, অন্য গ্রন্থগুলি যুগযাত্রী প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বাংলাদেশে ও সারা ভারতবর্ষে নব্য-স্বাদেশিকতার যে অভ্যুদয় হয়েছিল, তার অন্যতম উদ্‌গাতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। এই পরিচয়ই বিপিনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তিনি আধুনিক কালের একজন রাষ্ট্রনীতিগুরু। এ ছাড়াও তাঁর অন্য আর-একটি পরিচয় আছে, যা মনে হয় তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে, যদিও তা হবার কথা নয়। সেটি হল, শক্তিমান সাংবাদিক ও সমালোচক হিসেবে বিপিনচন্দ্রের পরিচয়। বিপিনচন্দ্র তাঁর কালের একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী সাংবাদিক, সুলেখক ও সমালোচক ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতার মতই মনকে আকর্ষণ করেছিল তাঁর রচনাকুশলতা। লেখনী যে তরবারির চেয়েও শক্তিশালী, এ-সত্য বিপিনচন্দ্র তাঁর জীবনে যতখানি প্রমাণ করেছেন তাঁর সমসাময়িক আর কোনো স্বদেশব্রতী ততখানি করেছেন কি না সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে কেবল অরবিন্দ ঘোষের কীর্তিই বিপিনচন্দ্রের মত স্মরণীয়। রচনা ও বক্তৃতা দুইই বিপিনচন্দ্রের নব্য-স্বাদেশিকতা প্রচারের কাজে প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। তাঁর অনেক রচনার মধ্যে সেইজন্য বক্তৃতার দোষগুণ দুইই মিলেমিশে রয়েছে এবং চিন্তাশীলতা বা মননশীলতার চেয়ে মাদকতার পদার্থ ই তার মধ্যে স্থান পেয়েছে বেশি। সেটা বিপিনচন্দ্রের রচনানৈপুণ্যের অভাবের জন্য হয় নি, তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যগ্রতার জন্য হয়েছে। 'নিউ ইণ্ডিয়া' 'বন্দে মাতরম্‌' প্রভৃতি পত্রিকার রচনাগুলি এমন সময়ে রচিত যখন বিচারের চেয়ে প্রচারের প্রয়োজন ছিল বেশি। সাংবাদিকতা এমনিতেই প্রচারধর্মী। অতএব স্বরাজ-স্বদেশীর যুগে বিপিনচন্দ্র তাঁর সাংবাদিক রচনায় প্রচারধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যায় করে নি কিছু। তার উপর, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রনেতা ও দেশকর্মী, সাহিত্যধর্ম-সাধনের অবকাশ তাঁর ছিল না। এ-প্রসঙ্গ উত্থাপনের আবশ্যক হত না, যদি বিপিনচন্দ্রের রচনা কেবল প্রচারধর্মী রাজনীতি হত (যেমন *Swadeshi and Swaraj* সংকলনগ্রন্থের অধিকাংশ রচনা)। তা হলে তাঁর রচনাগুলি কেবল সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল বলে স্বীকার করে এককথায় আলোচনার দায়িত্ব চুকিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু তা নয় বলে, এবং বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা বিচার-বিশ্লেষণ-মনন-ধর্মী সাহিত্য বলে (এমন-কি তাঁর বহু রাষ্ট্রনৈতিক রচনাও), প্রারম্ভেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হল।

বিপিনচন্দ্রের রচনার প্রধান বিশেষত্ব হল সমাজমুখীনতা। তাঁর সময়ে এ বিশেষত্ব বিরল ছিল বললেও ভুল হয় না। সমসাময়িক জগতের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা যে তাঁর মনীষার উন্মেষে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর যে-কোনো সুচিন্তিত রচনা পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথমেই তাঁর 'আত্মজীবনস্মৃতি'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর *Memories of My Life and Times*এর 'Foreword'এ তিনি লিখেছেন :

The individual and his Society are like the warp and woof of the social fabric. To truly understand the individual, we must see him in and through his social setting ; and to correctly appraise social values, we must see Society in and through the life and aspirations, the struggles and achievements, of its individual human units.

তার পরেই ইতিহাস-বিচার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

At one time, History was believed to be nothing more or less than the Biographies of the Great Men that stood on the top-wave of the social movements of their time. That was the view of the old individualism. The organic conception of both individual and social life and evolution had not been fully grasped as yet.

বিপিনচন্দ্রের সমস্ত রচনার ভালোমন্দ গুণ বিচারের চাবিকাঠি এই উক্তির মধ্যে রয়েছে। এ লেখা অবশ্য ১৯৩২ সালের, তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বের। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সারাজীবনের চলার পথে ও চিন্তার পথে আলোকসম্পাত করেছে। বিস্মিত হতে হয় তার স্বচ্ছতা দেখলে। এমন কথা অবশ্য বলা যায় না যে তাঁর সমাজমুখীন দৃষ্টি তাঁর সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রখর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট করে তুলেছে এবং পূর্বাপর কোথাও তার মধ্যে কোনো অসংগতি বা আত্মবিরোধ ঘটে নি। মধ্যে মধ্যে বেশ অসংগতি ঘটেছে, যেমন তাঁর *The Soul of India* গ্রন্থে, যেখানে তিনি ইয়োরোপ-আমেরিকার যীশুখ্রীস্টের মত শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের আত্মাস্বরূপ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। মনে হয়, তাঁর প্রখর সমাজবোধও মধ্যে মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অথচ দার্শনিক তত্ত্বালোচনার প্রলোভনমুক্ত হয়ে যখন তিনি দেশের সমাজ-শিক্ষা-অর্থনীতি-রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তখন তাঁর সমাজমুখীন দৃষ্টি সূর্যের মত কিরণ বিস্তার করে প্রতিটি সমস্যার আনাচ-কানাচ পর্যন্ত আলোকিত করে তুলেছে। বাস্তবিকই তখন তাঁর চিন্তাধারার ঋজু বলিষ্ঠতায় অবাক হয়ে যেতে হয়। বোঝা যায়, দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায় তাঁর স্বকীয় প্রতিভার প্রকাশ হত না। তিনি ছিলেন দেশকর্মী, সমাজকর্মী। কর্মের সঙ্গে চিন্তার অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল তাঁর জীবনে। এই যোগ দৃঢ়মূল হয়েছে তাঁর সমাজচিন্তার মধ্যে। *Swadeshi and Swaraj*, *Character Sketches*, 'নবযুগের বাংলা' ইত্যাদি রচনাসংকলনের মধ্যে তাঁর এই বলিষ্ঠ সমাজচিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু যখনই কর্মজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন করে চিন্তা কেবল তার নিজের খাতিরে বায়ুস্তরে ভর দিতে চেয়েছে, তখনই তার মধ্যে তাঁর স্ববিরোধ ফুটে উঠেছে সবচেয়ে বেশি।

বিপিনচন্দ্রের রচনাবলীর 'ভূমিকা' হিসেবে তাঁর আত্মজীবনস্মৃতি *Memories of My Life and Times* অবশ্যপাঠ্য। উনিশ শতকের চতুর্থ পাদের (১৮৭৫-১৯০০) সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস এই জীবনস্মৃতির মধ্যে (১০ থেকে ২২ অধ্যায়ে) তিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। এই সময়টাতেই বিপিনচন্দ্রের জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে। সেইজন্য উনিশ শতকের চতুর্থ পাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত ও আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত বিপিনচন্দ্রের প্রতিভার ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে সর্বপ্রথম বিচার্য। তাঁর ব্যক্তিচরিত্র, তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ, তাঁর বাস্তব ইহলোকমুখী জীবনবোধ, সবই এই সময়কার সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের ফলে গড়ে উঠেছে। এখানে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের অবকাশ নেই বলে আমরা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' থেকে কেবল কয়েকটি দিক-নির্ণায়ক ঘটনার উল্লেখ করব। মনে হয়, বিপিনচন্দ্রের কর্মজীবনের ও নৈতিক আদর্শের আভাস তার ভিতর থেকেই পাওয়া যাবে।

১৮৭৫ সালের গোড়াতে বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্ট থেকে কলকাতা শহরে আসেন কলেজে পড়তে। বয়স তখন তাঁর ষোলো-সতেরো। নব্য-স্বাদেশিকতার উদ্‌যোগপর্ব বলতে হলে এই সময়টাকেই বলা উচিত। এই নব্য-স্বাদেশিকতার অন্যতম হোতা তখন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর 'বঙ্গদর্শন', এবং কবি হেমচন্দ্র, ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবন্ধকার অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু। "'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস আমার প্রথম স্বাদেশিকতাবোধ জাগিয়ে তুলেছে, 'মেঘনাদবধ' কাব্য স্বজাতিগর্বের উদ্রেক করেছে, এবং হেমচন্দ্রের কবিতা দেশপ্রেমের উন্মাদনায় আমাদের যুবচিত্ত উদ্বেল করে তুলেছে" পৃ ২২৭-২২৯। সবেমাত্র আনন্দমোহন বসু তখন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে কলকাতায় ছাত্রসভা (Students' Association) গড়ে তুলেছেন, এবং সুরেন্দ্রনাথও 'সিবিল সার্বিসে'র দ্বন্দ্বে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে তাতে যোগ দিয়েছেন। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নেতা তখন কেশবচন্দ্র, কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও প্রভাব দুইই তখন ঘটনাচক্রে অস্তগামী। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধিকার -সংগ্রামে কেশবচন্দ্রের দান যুগান্তকারী, কিন্তু সেই সময় বহু পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারায় আবদ্ধ হয়ে তিনি ব্রাহ্মাদর্শকে এক ঘোর সংকটের সম্মুখীন করেছেন। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, সেই সময় কেশবচন্দ্রের চেয়ে সুরেন্দ্রনাথ যুবসমাজকে অনেক বেশি আকর্ষণ করেছেন। কেশবের জটিল ধর্মতত্ত্ব ও নীতিকথা ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শিক্ষিত যুবসমাজের বড় একটা অংশের বিরাগ জাগিয়ে তুলছিল। পাদ্রি Dyson ডাইসন তখনকার ব্রাহ্মবাদকে উপহাস করে তাই বলতেন যে ব্রাহ্মধর্ম 'conjugation of the verb to think'এ পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ 'I think, we think, you think, he thinks, they think'— এই হল ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সারকথা। এই অভিযোগ অনেকটা সত্য বলে বিপিনচন্দ্র স্বীকার করেছেন। রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবাদের মন্ত্র, নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার প্রদর্শনী ও উৎসব এই সময় বিপিনচন্দ্রকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। শঙ্কর ঘোষ লেনে নবগোপালের ব্যায়ামের আখড়ায় তিনি যোগ দেন ১৮৭৬ সালে। একদিকে সুরেন্দ্রনাথের এবং অন্যদিকে রাজনারায়ণ-নবগোপালের নূতন স্বদেশপ্রেমের আদর্শ যুবক বিপিনচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি ধীরে ধীরে শিবনাথের নূতন ব্রাহ্ম-আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন:

And the inspration of Surendra Nath's new patriotic and political propaganda on the one side, and Nabagopal's national propaganda on the other,

both contributed very materially to the motives and the ideals that drew me to Shivanath and moved me to throw myself unreservedly into the larger idealism of the Brahmo Samaj. পৃ ২৬৮।

বিপিনচন্দ্রের এই উক্তির গভীর তাৎপর্য আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্ম-আদর্শের প্রতি কেন তিনি এই সময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

Shivanath's Brahmoism was more attractive to me than that of Keshub··· Shivanath's Brahmo ideal was more instinct with the spirit of freedom and individualism··· Social freedom and national emancipation were both organic elements of Shivanath's religion and piety. পৃ ৩০৯।

এ-উক্তির তাৎপর্য গভীর এইজন্য যে এর ভিতরে বিপিনচন্দ্রের নব্য-স্বাদেশিকতার মৌলিক উপাদান যা-কিছু সবই রয়েছে। উনিশ শতকের শেষ পাদের স্বাদেশিকতা ছিল হিন্দু ঐতিহ্যোদ্‌বুদ্ধ। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, হিন্দু মেলা, হিন্দু বীর ও ধর্মপ্রবর্তক, হিন্দু উৎসব ইত্যাদি অবলম্বন করে নবীন জাতীয়তাবাদ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথকেও এই সময় 'শিখদের অভ্যুদয়' 'শ্রীচৈতন্য' ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করতে হয়েছিল, তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। রাজনারায়ণও এই সময় ব্রাহ্মধর্ম ও আন্দোলনকে বৈদেশিক ভাবাদর্শের মোহ থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রখর মনীষাদীপ্ত আলোচনার ঝড় তুলে। অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু এবং আরও কিছুদিন পরে পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সেই হিন্দুত্বের ঐতিহ্যগর্বকে স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতার চোরাগলিতে চালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়, প্রধানত ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সংকটের জন্য, রক্ষণশীলতার একটা প্রচণ্ড ঢেউ সমগ্র সমাজমানসকেই আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। সেই ঢেউয়ের গর্জন বিপিনচন্দ্র শুনেছিলেন এবং তাঁর যৌবনের মানসতটে তার আঘাতও তাঁকে যথেষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও, হিন্দু ঐতিহ্যের চেতনার প্রাখর্যকে তিনি কেবল রক্ষণশীলতার পুনরভ্যুত্থান বলে মনে করেন নি। রাজনারায়ণ-নবগোপাল-বঙ্কিমচন্দ্র-সুরেন্দ্রনাথ এবং তর্কচূড়ামণি-অক্ষয়চন্দ্র-কৃষ্ণপ্রসন্ন, এঁদের একগোষ্ঠীভুক্ত সমদর্শী ও সমভাবাপন্ন তিনি মনে করেন নি। যেমন 'আদিব্রাহ্ম' রাজনারায়ণ 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ইত্যাদি অনেক কিছু হিন্দুগন্ধী বিষয় নিয়ে লিখলেও তার প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিপিনচন্দ্র বুঝেছিলেন। রাজনারায়ণ সম্বন্ধে তাই তিনি লিখেছেন :

Rajnarain Bose could indeed hardly be called a conservative, or if he was a conservative at all, his conservatism was not due to any unreasonable attachment to current customs and institutions of Hindu society, but predominantly, if indeed not exclusively, it was due to his intense opposition to the imitation of European ideals and institutions by his countrymen. His conservatism was, in fact, inspired far more by political than by social motives. পৃ ২৬৩।

সতর্ক ও সজাগ বিচারবুদ্ধির জন্যই বিপিনচন্দ্র এই আদর্শের প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে নিজের পথটি ঠিকই বেছে নিতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'সমদর্শী' দল তখন এই পথের প্রদর্শকরূপে বাংলার যুবসমাজের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সামাজিক স্বাধিকারবোধ, ও দেশাত্মবোধ— এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের যে নূতন আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন তা সেদিনকার যুবসমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। বিপিনচন্দ্রের দীক্ষা হয় শিবনাথের এই আদর্শে এবং ১৮৭৮ সালে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার পর তাঁর জীবনের সঙ্গে সমাজের বন্ধন ক্রমেই প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় হতে থাকে কর্মসূত্রে। সমাজের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ তাঁর যত গভীর হতে থাকে, তত তিনি তাঁর সমসাময়িক উৎকট হিন্দুত্ববাদের প্রগতিবিমুখ রূপটি পরিষ্কার ধরতে পারেন, এবং বিনা দ্বিধায় তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন: "I was soon drawn into this new fight for freedom against reactionary forces let loose about us." পৃ ৪২৯।

প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ববোধে বিপিনচন্দ্রের জীবনের এই প্রস্তুতিপর্বের দুটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে কোচবিহাররাজের বিবাহের ব্যাপার নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যে আলোড়ন হয় তাতে যুবসমাজের মধ্যেও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। ছাত্রদের একটি প্রতিবাদসভা হয় ট্রেনিং অ্যাকাডেমির গৃহে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত দিকে। প্রতিবাদের প্রস্তাবটি সীতানাথ দত্ত (তত্ত্বভূষণ) উত্থাপন করেন, সমর্থন করেন বিপিনচন্দ্র। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের প্রকাশ্যভাবে যোগাযোগ প্রথম স্থাপিত হয় এইভাবে, "This was my first public association with the Brahmo Samaj" পৃ ৩৩৮। এই হল প্রথম ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনা হল, ১৮৮৪ সালে, যখন উৎকট হিন্দুত্ববাদীদের প্রচার অপ্রতিহত গতিতে চলছে, সেই সময় সাবিত্রী লাইব্রেরীর একটি সভায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্বে, অক্ষয় সরকার বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বিপিনচন্দ্র তখন *Bengal Public Opinion* পত্রিকার সহ-সম্পাদক। কৌতূহলী শ্রোতা হিসেবে তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন, বয়সও তখন তাঁর বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। অক্ষয়চন্দ্রের বক্তৃতার পর তিনি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিধবাবিবাহের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। বিদ্যাসাগর তখনও বেঁচে আছেন। জীবনসায়াহ্নে বিদ্যাসাগর উত্তরপুরুষের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করছিলেন নিশ্চয়। বিপিনচন্দ্র তখনও অখ্যাত হলেও, তাঁর বক্তৃতায় রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রকাশ্য জনসভায় এই বিপিনচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব এবং প্রথম বক্তৃতা: "This was practically my first appearance before a large and distinguished Calcutta audience" পৃ ৪৪০। এই দুটি ঘটনার ভিতর দিয়ে বিপিনচন্দ্রের মানসিক গড়নের পরিচয় এবং তাঁর ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের প্রচারকদের বিরুদ্ধে তিনি যুগপৎ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অথচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। আরও বিশ বছর পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রসার ও পরিবর্তন হল যখন, জাতীয় কংগ্রেসে যখন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি হল, এবং শাসকরাও যখন এই মধ্যবিত্তের সাবালকত্বের বিষয় খানিকটা উপেক্ষা করে একটির পর একটি আইন ও আদেশ জারি করে সেই অসন্তোষের ইন্ধন জোগাতে লাগলেন, তখন উনিশ শতকের বাংলার সংগ্রামশীল অগ্রগামী আদর্শের প্রকৃত

উত্তরসাধক যাঁরা, তাঁরাই অগ্রণী হলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। বিপিনচন্দ্র হলেন তাঁদের অগ্রগণ্য এবং স্বভাবতই তাই তাঁর আদর্শ হল 'স্বদেশী' আদর্শ, 'স্বরাজে'র আদর্শ। বিপিনচন্দ্রের জীবনের এই সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমিটুকু মনে রাখলে তাঁর অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক রচনা সকলের কাছেই সহজবোধ্য মনে হবে।

Swadeshi and Swaraj গ্রন্থে, ১৯০২-১৯০৭ সালে New India পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী এবং কয়েকটি বক্তৃতা, সংকলিত হয়েছে। ১৯০৭ সালে গ্রন্থকার নিজেই *New Spirit* নামে এর অধিকাংশ রচনা প্রকাশ করেছিলেন। সংকলনের Test of Patriotism, Composite Patriotism, The Cult of Patriotism, The New Patriotism এবং The New Spirit প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিপিনচন্দ্র যে নব্য-স্বাদেশিকতার অগ্রদূত ছিলেন তার মৌলিক উপাদানগুলি পরিষ্কারভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। 'স্বাদেশিকতার পরীক্ষা' প্রবন্ধে প্রথমে তিনি বলেছেন, এ দেশে রাষ্ট্রনৈতিক প্রচার ও আন্দোলন বস্তুটা ভিক্ষাবৃত্তির নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে : "We have always been begging, and begging. The Congress here, and its British Committee in London, are both begging institutions. We have given a new name to begging : we call it agitation". পৃ ৩। কংগ্রেসের 'ধীরে চল' -গোষ্ঠীর নিবেদননীতির তীব্র সমালোচনা করেও বিপিনচন্দ্র জাতীয়তার জাগরণের ইতিহাসে এই আর্জিপ্রধান রাজনীতিরও ঐতিহাসিক দান স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন : "Our agitations have done us great good, as instrument of political training, and have helped the growth of a national sentiment among us" পৃ ৪। এটা বিপিনচন্দ্রের বাস্তববোধের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এই বাস্তবতাবোধ ও সমাজবোধ তাঁর সমস্ত রচনার সবচেয়ে বড় গুণ, যে-গুণ আজকের দিনেও বহু দক্ষিণ-বামপন্থী রাষ্ট্রনেতার কথাবার্তায় ও লেখায় দুর্লভ। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে আপসবিরোধী চরমপন্থী হয়েও তিনি কোনোদিন সাময়িক উত্তেজনার উত্তাপে পূর্বসূরীদের কৃতকর্ম নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেন নি। বলেছেন, আর আবেদন-নিবেদনে চলবে না, কাল ও পাত্র দুয়েরই রূপ বদলে গেছে, দেশাত্মবোধ নূতন মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরতা (self-help) এবং আত্মোৎসর্গ (self-sacrifice) হবে সেই নূতন মন্ত্র। অর্থাৎ 'স্ব-রাজ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প হবে তার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা।

কিন্তু কার স্বরাজ, তার রূপই বা কিরকম? বিপিনচন্দ্র এর উত্তরে বলেছেন : "The new Indian Nation is· · an organic whole. Its component parts are Hindus and Mahomedans and Parsees and Christians and even the aboriginal tribes still living in primitive stages of social evolution" —প্রবন্ধ ২। তাঁর দূরদৃষ্টিতে ভারতের আদিবাসীদের ভবিষ্যৎও তিনি ১৯০৫ সালেই দেখতে পেয়েছিলেন, আজকে যা নাগা সাঁওতাল প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমান-পার্সী-খ্রীস্টান সকলের দেশ ভারতবর্ষ, সকলেরই অবশ্য-স্বীকার্য দান আছে ভারত-সভ্যতায় এবং সেইজন্য সকল জাতিকে নিয়েই ভারতের মহা-জাতীয়তার ঐকতান রচনা করতে হবে। জাতিক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের বিভেদনীতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ কথা মনে রেখে, ভারতের প্রত্যেক জাতি উপজাতি ও সম্প্রদায়কে তার নিজের

অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, যা-কিছু যার গৌরবের বস্তু তাকে নূতন আলোকে অতীত-বিস্মৃত জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে, তবে প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মগৌরববোধ জাগবে, সেই বোধ প্রত্যেকের স্বাদেশিকতাবোধ জাগিয়ে তুলবে এবং তারই মিলনে গড়ে উঠবে ভারতের বহুজাতির 'মিশ্র-জাতীয়তা' (Composite Patriotism)। হিন্দুরা যেমন শিবাজী-উৎসব রাখীবন্ধন-উৎসব ইত্যাদি করবেন, মুসলমানরাও তেমনি আকবর-উৎসব করবেন, পার্সী খ্রীস্টানরাও নিজেদের অতীত ঐতিহ্যের স্মরণোৎসবে যোগ দেবেন: "In this view we regard the Sivaji celebrations as much of a sacrament of national life, as we shall regard Akbar celebrations when these will be instituted among us" —প্রবন্ধ ৪। আমাদের দেশে জাতীয়তার উন্মেষপর্বে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার কলুষস্পর্শ সম্বন্ধে যাঁরা বিচলিত, তাঁরা বিপিনচন্দ্রের এই বিচারভঙ্গি থেকে চিন্তার খোরাক পাবেন। মনে হয়, এই সূত্র ধরে বিচার করলে তাঁরা রাজনারায়ণ বসুর তো বটেই, কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রেরও স্বাদেশিকতার স্বরূপ বুঝতে পারবেন।

উনিশ শতকের বাংলার ইংরেজি-শিক্ষিতদের দেশাত্মবোধের প্রতি কোনোরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও বিপিনচন্দ্র তাকে 'something positively more outlandish than indigenous, and decidedly more sentimental than real' বলেছেন। ইংলণ্ডই ছিল তার প্রেরণার প্রধান উৎস। এই বিজাতীয় দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে যে ঘোর প্রতিক্রিয়া একসময় দেখা দেবেই, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে, বিশেষ করে ১৮৮০-১৮৯০এর মধ্যে, সেই প্রতিক্রিয়া হিন্দুত্বের উৎকট চণ্ডমূর্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। তাতে, বিপিনচন্দ্র বলেছেন, আমাদের নব্য-স্বাদেশিকতা প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল, সমাজধর্মসংস্কার-সংগ্রামের ঐতিহ্য প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। প্রচণ্ড একটা পশ্চাদ্‌মুখী ধাক্কা খেয়েছিল অগ্রগামী ইতিহাস। কিন্তু এই ধাক্কার, রক্ষণশীলতার এই রণচণ্ডী মূর্তির, হয়তো খানিকটা প্রয়োজনও হয়েছিল তখন, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীদের আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ করবার জন্য এবং বিদেশ থেকে স্বদেশের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য: "However much one might regret the excesses to which this reaction went, it would be impossible to deny that it has partially helped the new thought in the country, by bringing it back to the realities of our national life and history" —প্রবন্ধ ৫। বিপিনচন্দ্রের ইতিহাস-বিচারে বাস্তবতাবোধের এও একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনস্মৃতির মধ্যেও এই বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন (২২ অধ্যায়, 'Hindu Religious Revival and Social Reaction') তার মধ্যে তাঁর প্রখর কালচেতনা ও সমাজবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা আছে। একটি প্রবন্ধে ইংরেজদের দান সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, ইংরেজরা আমাদের ফিউডাল সমাজের গড়ন ও মনোভাব অনেকটা ধ্বংস করতে সাহায্য করেছেন। সেটা সুখের কথা হত যদি তাঁরা তার বদলে নবযুগের গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের নূতন ভিত্ গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা পারেন নি, কেবল ভাঙন ও বিশৃঙ্খলার পথই ক্রমাগত নিষ্কণ্টক করেছেন: "there would absolutely be nothing to regret but much to be thankful for, in the decay of our old

and primitive forms and ideals of social and civic life. Our greatest misfortune is that the peace of Britain has killed our old life, but has failed to set up new organs suited to the progressive life of the nation, and to breathe new and modern life into us" —প্রবন্ধ ৮। 'জাতীয় সংগীত' সম্বন্ধে দুটি রচনার মধ্যেও তাঁর বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে নব্য-স্বাদেশিকতার উদ্বোধন-সংগীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশীযুগের চারণকবি তিনি: "Rabindranath Tagore's contribution to the hymnology of the new patriotism in Bengal stands first and foremost both in point of quality and quantity" —প্রবন্ধ ২১। 'বিজয়া' 'দুর্গাপূজা' 'শিবাজী-উৎসব' প্রভৃতি রচনার মধ্যেও তাঁর সমাজমুখীন দৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বাস্তবিকই বিরল। মাদ্রাজে প্রদত্ত পাঁচটি বক্তৃতার মধ্যে (প্রবন্ধ ২৪ - ২৮) বিপিনচন্দ্র তাঁর স্বরাজের আদর্শ, নীতি, স্বরাজপ্রতিষ্ঠার উপায়, তার অর্থনৈতিক তত্ত্ব, দেশীয় শিল্পের বিস্তার, বিদেশী পণ্য বয়কট, বৃত্তিশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষা'র (National Educationএর) ভিত্ স্থাপন— এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বক্তৃতার মধ্যে স্বভাবতই আবেগের আতিশয্য আছে, কিন্তু তার মধ্যেও সদাজাগ্রত একটা বিশ্লেষণমুখী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিপিনচন্দ্রের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবোধের আদর্শ নমুনা হিসেবে *The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj* নামে তাঁর ৫৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহনের যুগ, দেবেন্দ্রনাথের যুগ, কেশবচন্দ্রের যুগ এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুগ— এই চার যুগের পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়ে কিভাবে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রগামী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীকে প্রগতিশীল সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, এবং ক্রমে 'স্বরাজে'র আদর্শকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে, তার এমন বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ অনুরূপ আকারের সমসাময়িক আর কারও রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। শিবনাথ শাস্ত্রীর *History of the Brahmo Samaj*-এর দুষ্প্রাপ্য দুই খণ্ড ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের আর কোনো প্রামাণিক ইতিহাস নেই। দুষ্প্রাপ্যের মধ্যেও লিয়োনার্ডের বইয়ে বা কোলেটের পুস্তিকায় পর্যাপ্ত তথ্য ও তার বিশ্লেষণ নেই। বাকি যা আছে নানা গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এবং বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত কেন আজও লেখা হল না, এ কথা অনেকদিন মনে হয়েছে। যতদিন তা না লেখা হবে, ততদিন নবযুগের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রাহ্মসমাজের এই ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে, উৎসাহীরা বিপিনচন্দ্রের পুস্তিকায় তার খানিকটা আভাস পেতে পারেন।

The Soul of India গ্রন্থের রচনাগুলি গুরুগম্ভীর বেশি এবং তার মূল কেবল ভারত-ইতিহাসের উষাকাল পর্যন্ত নয়, মনের সুগভীর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিপিনচন্দ্রের ইতিহাসচর্চার গভীরতার পরিচয় তাঁর এই গ্রন্থের রচনার মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তায় তাঁর স্বকীয়তা যেমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তায়, মনে হয়, যেন তা যেন ম্লান হয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র তাঁর আদি দীক্ষাগুরু শিবনাথ শাস্ত্রীর পরবর্তী ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন:

"Even Pandit Shivanath Shastri had commenced slowly and imperceptibly to shed his earlier rationalism ; and what he was before the schism as Editor of the 'Samadarshee', he no longer was as Minister and Missionary of the Sadharan Brahmo Samaj." —অধ্যায় ২২, পৃ ৪২৩। বিপিনচন্দ্রের কোনো তরুণ শিষ্য Soul of India পড়ে এই ধরনের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধেও হয়তো করতে পারতেন। অথচ *Character Sketches* বা এই ধরনের রচনার মধ্যে তাঁর বাস্তব ইতিহাসবোধ দেখলে অবাক হতে হয়। ১৯০১-১৯৩১ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনচিত্র *Character Sketches*এ সংকলিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার, অরবিন্দ, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা, সংক্ষিপ্ত হলেও, ভাবসমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি চরিত্রচিত্রের বৈশিষ্ট্য হল যে, কোনোটিতেই অতিরঞ্জন নেই, স্তুতির আতিশয্য নেই, আছে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচারবিশ্লেষণ। সুরেন্দ্রনাথের মত রাষ্ট্রনেতার দান কি জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি তাই এ কথা বলতেও কুণ্ঠিত হন নি যে : "both by training and heredity, he has been like so many of his contemporaries far too much denationalised to make a true and ideal patriot" পৃ ৩০। ব্যক্তিপ্রতিভার বিশ্লেষণে বিপিনচন্দ্রের বাস্তব ইতিহাসবোধ মনে হয় যেন সবচেয়ে বেশি সতর্ক ও সজাগ হয়ে ওঠে।

এই বাস্তব ইতিহাসবোধ তাঁর 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'রাষ্ট্রনীতি' ও 'মার্কিণে চারি মাস' নামে ছোট বই দুইখানিও বিপিনচন্দ্রের বিশ্লেষণধর্মী মন ও সমাজচেতনার জন্য আজও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে। 'নবযুগের বাংলা'র এই গুণের আরও ব্যাপক বিকাশ হয়েছে দেখা যায়, অনেকটা তাঁর অতুলনীয় 'জীবনস্মৃতি'র মত। ১৩২৮-১৩৩১ সনে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় "বাংলার নবযুগের কথা" নাম দিয়ে তিনি যে ধারাবাহিক ষোলোটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেইগুলি 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্টে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে একটি অসমাপ্ত রচনা সংযোজিত হয়েছে। 'নবযুগের বাংলা' শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের মত উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয় ; বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনার সমষ্টি। মধ্যে মধ্যে সেইজন্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে এবং ছোট বড় অনেক ঘটনার যথাক্রম রক্ষিত হয় নি। ডিরোজিওপন্থী ও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা নেই বললেই হয়। শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের কাহিনীও সম্পূর্ণ বলা হয় নি। কিন্তু তা না হলেও, 'নবযুগের বাংলা' উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাস-সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দান হিসেবে স্বীকৃত হবে একাধিক কারণে। প্রথম কারণ, বিপিনচন্দ্রের বাস্তব ইতিহাসবোধ ও প্রখর সমাজচেতনা নবযুগের বাংলার ইতিহাসে নূতন আলোক-সম্পাত করেছে এবং নূতন চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর ইংরেজি রচনার মত বাংলা রচনার প্রসাদগুণ তাঁর বক্তব্য ও প্রতিপাদ্যকে সহজবোধ্য করেছে। তৃতীয় কারণ, বিরূপ সমালোচনাও তাঁর নঙর্থক কখনোই নয়, সর্বদাই সদর্থক, যে জন্য হৃদয়ের বদলে বুদ্ধির প্রখর আলোকে তিনি ইতিহাসের ব্যক্তি ও ঘটনাক্রম দুইয়েরই প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। দুটি বিষয়ের আলোচনায় সেইজন্য বিপিনচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে (এবং তাঁর জীবনস্মৃতিতেও) বিশেষ কৃতকার্য হয়েছেন মনে হয়— ব্রাহ্মসমাজের

আলোচনায় এবং উনিশ শতকের শেষপাদের হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণে। শেষোক্ত বিষয়ের আলোচনায় তাঁর বিশ্লেষণনৈপুণ্য সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কৌতূহলীরা এই উক্তির যাথার্থ্য যাচাইয়ের জন্য "রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ" (অষ্টম কথা), "হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র" (নবম কথা) এবং "বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা" (দ্বাদশ কথা), এই তিনটি রচনা পাঠ করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলেছেন : "একদিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধ মতবাদ ও জীবনের আদর্শ, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজের কোমল স্নেহের বন্ধন এবং কঠোর শাসনদণ্ড, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মাঝখানে পড়িয়া নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাহিরের এই সংগ্রাম তাঁহার ভিতরেও বাঁধিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা দ্বারা এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা ও ধর্মপ্রচারের মূল কথা। এই কথাটা না বুঝিলে বাংলার নবযুগের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যার স্থান কোথায় এবং মূল্য ও মর্যাদাই বা কি, ইহা বুঝিতে পারা যাইবে না" পৃ ১৮৫। দুঃখের বিষয়, এই কথাটি অনেকেই বুঝতে পারেন নি বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের এই উক্তিটুকু এখানে উদ্ধৃত করলাম।

বিপিনচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করে প্রকাশকরা নবযুগের বাংলার ইতিহাস-অনুরাগীদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রকাশনরীতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা যা আমাদের মনে হয়েছে উল্লেখ করছি। রচনাগুলি বহু গ্রন্থ-গ্রন্থিকায় বিভক্ত করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তার যথাক্রম রক্ষিত হয় নি এবং তার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রও ছিন্ন হয়েছে মনে হয়। তা ছাড়া, পাঠকদের মধ্যে যাঁরা খুব বেশি কৌতূহলী নন, তাঁরা সব গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সমান আগ্রহ নাও দেখাতে পারেন। তার ফলে কোনো কোনো বই ও রচনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠকদের দ্বারা উপেক্ষিত হতে পারে। সেইজন্য, আমাদের ধারণা, প্রকাশকরা যদি বিপিনচন্দ্রের ইংরেজি ও বাংলা রচনাবলী স্বতন্ত্র দুটি মাত্র খণ্ডে প্রকাশ করতেন, তা হলে তার উপযোগিতা বৃদ্ধি পেত। সম্পাদনকার্যেরও সুবিধা হত তাতে, বহু গ্রন্থে ভাগ করার জন্য যা অবহেলিত হয়েছে বলা চলে। সমসাময়িক ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তখনকার কয়েকটি পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করে যদি বিপিনচন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে সংযোজন করে দেওয়া যায়, তা হলে রচনা ও রচয়িতা উভয়েরই প্রতি সুবিচার করা হয়। আশা করি প্রকাশকরা বিষয়টির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে দেখবেন।

বিপিনচন্দ্রকে যাঁরা রাষ্ট্রনেতা বলে জানেন, তাঁরা তাঁর ইংরেজি ও বাংলা রচনা পাঠ করলে দেখতে পাবেন, তিনি একজন শক্তিমান সুলেখক ও বলিষ্ঠ সমালোচকও ছিলেন। তাঁর রচনার প্রধান দুটি গুণ হল, অর্থবৈমল্য ও ওজস্বিতা। পড়তে পড়তে একঘেয়ে বা বিবর্ণ মনে হয় না, দুর্বোধ্য তো নয়ই। সব চেয়ে বড় গুণ তাঁর বাস্তব ইতিহাসবোধ ও বলিষ্ঠ সমাজমুখীনতা। রাজনীতি ও সমাজ প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি এ যুগের সমাজবিদের মত বিশ্লেষণনৈপুণ্য দেখিয়েছেন এবং সেইজন্য তাঁর রাজনৈতিক প্রচারধর্মী রচনাও সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, নিছক সাংবাদিকতার স্তরে অবতরণ করে নি। তাঁর সাহিত্যবোধও যে কত সজাগ ছিল তা তাঁর রচনাতে নয় কেবল, সাহিত্যপ্রসঙ্গে (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি) আলোচনার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। বিপিনচন্দ্রের এই সাহিত্যকীর্তি, তাঁর রাজনৈতিক কীর্তির মতই, ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিনয় ঘোষ

গীতিগুচ্ছ

বিপিনচন্দ্র পাল

স্বদেশী গান

১

পূরবী। আড়াঠেকা

আর সহে না, সহে না, সহে না জননী,
এ যাতনা আর সহে না।
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন
পড়ে থাকি প্রাণ চাহে না।
তুমি মা অভয়ে জননী যাহার
কি ভয়, কি ভয়, এ ভবে তাহার—
দানবদলনী ত্রিদিবপালিনী
করালকৃপাণী তুমি মা।
উর মা আজিকে সে রূপে পরানে
ডাকি মা কালিকে, ডাকি মা সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী,
না হলে, এ ভয় যাবে না।

২

পূরবী। একতাল

বাজায়ো না আর মোহন বাঁশরি,
রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ' পরানে আসি।
ত্যজিয়া মুরলী ধরহ কৃপাণ,
শাণিত খাণ্ডা, অসি খরসান—
কুঞ্জে কুঞ্জে শ্মশান মশান ভীষণ সাজাও আজি।
দলিত করহ চরণতলে সকল ভীরুতা সব দুর্বলে—
সমরভেরীনিনাদ করালে নাচাও শোণিতরাশি।

ব্রহ্মসংগীত

৩

প্রাণসখা হে, বিহর হৃদয়-মাঝে।
নয়নে নয়নে থাক, আমি দেখি তোমায় প্রাণ ভ'রে।
যখন তোমায় আমি (আমি) ধরি প্রাণে,
জাগে সুবসন্ত হৃদ্‌কাননে। (এমন দেখি নাই, দেখি নাই।)
দেখি ত্রিভুবন হয় নব শোভাময়, অরূপের ছটা ফুটে।
আর জেগে উঠে প্রাণ গেয়ে নব গান, মোহ-আঁধার টুটে।
তখন আত্মপরজ্ঞান হয় অবসান, প্রেমতরঙ্গ ছুটে।
আর সর্বজীবে হয় প্রেমের উদয়, চিদানন্দ জেগে উঠে।
নরাধম আমি ধরে রাখতে নারি ঐ রূপের জ্যোতি হৃদ্‌কন্দরে—
আমার গতি কী হবে হে।
তাই বলি হে, বলি হে বন্ধু,
আমায় ছেড় না, ছেড় না, ছেড় না বন্ধু,
আমায় বেঁধে রাখো (রাখো) চরণতলে, আর পিয়াও সদা প্রেমমধু।
আমি দ্বারে দ্বারে মিছে ঘুরে মলাম।
তায় নিরবধি পাই বেদনা শুধু (বন্ধু, তোমায় ছেড়ে)।
তোমায় বন্ধু ব'লে (ব'লে) ডাকলে পরে,
(আমি আর তো কিছুই জানি না হে)
(নাম বিনা কিছুই জানি না হে)
আমার প্রাণে উথলে প্রেমসিন্ধু (শুধু বন্ধু ব'লে) ॥

৪

এস, পশিয়ে পরানে, মরমের কানে, শুনি সে মধুর নাম।
(কিবা মধুর মধুর রে, পরান আকুল করে।)
ঘুচিবে যাতনা ভয় ভাবনা, ঘুচিবে সকল কাম
(ব্রহ্মনামের গুণে)।
কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ নামগন্ধ যদি পায়
কাঁপি থরথর ভয়ে জড়সড় আপনি দূরে পলায়
(ব্রহ্মনামের তেজে)।
মায়ামোহজাল, ভবের জঞ্জাল, ছুঁইলে নামের আগুন,
আঁখির পলকে হয় ভস্মময়— এমন নামের গুণ।

জ্ঞানের গরবে স্ফীত যার প্রাণ সেও যদি নাম পায়
ত্যজি অভিমান তৃণের সমান সকলের পায়ে লুটায়
(মান আর থাকে না)।
আপনার প্রেমে, আপনার নামে, বাঁধা পড়ে দয়াময়—
নরাধম জন লইলে শরণ আপনি এসে কোলে লয় ॥

৫

রামকেলি। কাওয়ালি

গাও রে প্রভাতে ব্রহ্মনাম।
গাও রে আনন্দে ব্রহ্মনাম। কর ব্রহ্মপদে সবে প্রণাম।
করিছে উষাসতী মঙ্গল-আরতি, গায় বিহগ প্রেমগান—
ভূতল গগন প্রেমে নিমগন করে ব্রহ্মরূপ ধ্যান।
হেন শুভযোগে মোহঘুমে ম'জে কত আর রহিবে শয়ান?
খোলো রে নয়ন, হও সচেতন, ভজো রে করুণানিধান।
ব্রহ্মনামামৃত-পুণ্যসরসীনীরে কর রে কর ভাই স্নান,
প্রাণথাল ভরি প্রেমকুসুম লয়ে পূজ রে পূজ প্রাণারাম।
সাধুসন্ত-সাথে ব্রহ্মচরিতসুধা পিও রে পিও অবিরাম—
ভবভয়বন্ধন হইবে খণ্ডন, পাইবে হৃদয়ে স্বর্গধাম ॥

৬

মনোহরসাহী। খয়রা

প্রাণরমণ, হৃদিভূষণ, হৃদয়রতন স্বামী, ওহে হৃদয়রতন স্বামী,
আমি পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত, তথাপি তোমারি আমি।
আমার আর কেহ নাই, কেহ নাই, তথাপি তোমারি আমি ॥
ওহে তুমি হে আমার জীবন-আধার, চিরদিন তব আমি ॥
আমার আঁখির জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কণ্ঠমাঝে তুমি বাণী,
আমার শরীরে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, মনোমাঝে চিন্তামণি ॥
আমার দর্শন শ্রবণ পরশ মনন সকলেরই মূলে তুমি,
তবু তোমায় না দেখিয়ে মোহে অন্ধ হয়ে করি শুধু 'আমি' 'আমি'
ওহে দাও খুলে আঁখি, প্রাণ ভরে দেখি, তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী—
ওহে অন্তরে বাহিরে নিরখি তোমারে, শুনে চলি তব বাণী ॥

স্বরলিপি : প্রাণরমণ, হৃদিভূষণ

'ঈষৎ বিলম্বিত' লয়ে গেয়

কথা ও সুর : বিপিনচন্দ্র পাল স্বরস্মৃতি : শ্রীমতী অমিয়া দেব স্বরলিপি : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

II {মা -া পা । মা মধা ধপা । মা -পধা ধপা । মা মগা মা} I
প্রা ০ ণ র মং ণ হৃ ০০ দি ভূ ষ ণ

[র্সা র্সা নর্সনা ধা]
I {পা ধা ধণধা । পা পা পমা । পা -ধা পধা । -নর্সা -ধনা (র্সর্সা)} I পধা I
হৃ দ য়০০ র ত নং স্বা ০ মীং ০০ ০ ওহে আমি

I {ধা ধর্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা । পর্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সর্রর্সা I
পা পেং ক লঙ্ কি ত মোং হে অ ভি ভূ ত০০

I না নর্সা নার্স । ধাণ ধা পমা । পা -ধা পধা । -নর্সা -ধনা (পধা)} I পপা I
ত থাং পি তো মা রিং আ ০ মিং ০০ ০ আমি আমার্

I {পা -া ধা । র্সা র্সা -া । -া -া র্সা । না ধা -পা} I
আ র্ কে হ না ০ ০ ই কে হ না ই

I পা পধা পা । পধা পধা পমা । পা -ধা পধা । -নর্সা -ধনা -া II
ত থাং পি তোং মাং রিং আ ০ মিং ০০ ০ ০

-া II {মা পা পা । পা পা -া । মা পধা ধপা । মা মগা -মা} I
০ তু মি হে আ মা র্ জী বং ন আ ধা র্

[র্সা র্সা নর্সনা ধা]
I {পা ধা ধণধা । পা পা পমা । পা -ধা পধা । -নর্সা -ধনা (র্সর্সা) } I -া II
চি র দিং০ ন ত বং আ ০ মিং ০০ ০ ওহে ০

-া II {মা পা পা । পা -া পা । মা পধা ধপা । মা মগা মা} I
০ আঁ খি র জ্যো ০ তি শ্র বং ণে র শ্রু তি
০ দর্ শ ন শ্র ব ণ প রং শ ম ন ন
০ দা ও খু লে আঁ খি প্রা ০ণ্ ভ রে দে খি

[র্সা র্সা নর্স´না ধা]
I {পা ধা ধণধা । পা পা পমা । পা -ধা পধা । -নর্সা -ধনা (র্সর্গা)} I -া I
কণ্ ঠ মা০০ ঝে তু মি০ বা ০ ণী০ ০০ ০ আমার্ ০
স ক লে০০ রি মূ লে০ তু ০ মি০ ০০ ০ আমার্ ০
তু মি প্রা০০ ণ আ মি০ প্রা ০ ণী০ ০০ ০ ওহে ০

I {পা ধর্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা । পর্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সর্রর্সা I
শ রী০ রে শ ক তি হৃ০ দ য়ে ভ ক তি০০
তো মায়্ না দে খি য়ে মো০ হে অন্ ধ হ য়ে০০
অন্ ত০ রে বা হি রে নি০ র খি তো মা রে০০

I না নর্সা নার্স । ধাণ ধা পমা । পা -ধা পধা । -নর্সা -ধনা (পধা)} I -া II II
ম নো০ মা ঝে চিন্ তা০ ম ০ ণি০ ০০ ০ আমার্ ০
ক রি০ শু ধু আ মি০ আ ০ মি০ ০০ ০ তবু ০
শু নে০ চ লি ত ব০ বা ০ ণী০ ০০ ০ ওহে ০

বিপিনচন্দ্রের রচনাশক্তি সংগীতরচনাতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল— তাহার নিদর্শনস্বরূপ দুইটি স্বদেশী গান, ও চারিটি ব্রহ্মসংগীত উদ্‌ধৃত হইল। ইহার মধ্যে তিনটি (৪-৬) সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে (একাদশ সংস্করণ, মাঘ ১৩৩৮) মুদ্রিত আছে; রচনার তারিখ এবং সুরনির্দেশ ঐ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। উহাতে মুদ্রিত টীকা হইতে অনুমান হয়, ৪ সংখ্যক গানটি ১৩০০ সালের মাঘ মাসে ব্রাহ্মসমাজের নগরসংকীর্তনে ব্যবহৃত। ৩ সংখ্যক গানটি ব্রহ্মসঙ্গীত (দশম সংস্করণ, ব্রাহ্মাব্দ ৯২) হইতে গৃহীত, শ্রীমতী অমিয়া দেব জানাইয়াছেন ইহা বিপিনচন্দ্র-রচিত।

স্বদেশী গান দুটি বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে লিখিত; ১ সংখ্যক গানটি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-প্রণীত ‘কংগ্রেস’ গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৮, পৃ ১২৮), ২ সংখ্যক গানটি কোনো কোনো স্বদেশী গানের সংগ্রহে মুদ্রিত আছে। গান দুইটির সুর তাল নির্দেশ শ্রীমতী অমিয়া দেব কর্তৃক প্রদত্ত।

মহর্ষি কার্বে

অন্নদাশঙ্কর রায়

বিশ বছর আগে পুনা বেড়াতে যাই। পুনার অন্যতম দ্রষ্টব্য মহর্ষি কার্বের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েক বছর পরে লেখা 'চেনাশোনা'য় এর উল্লেখ আছে। তুলে দিচ্ছি।—

"পরের দিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলুম। মহারাষ্ট্রের আরেকটি অনুপম কীর্তি। কার্বের দর্শন পাওয়া গেল। সাদাসিধে নিরীহ মানুষটিকে দেখে দিনমজুর ভেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। অল্‌তেকর বললেন, ইনিই কার্বে। অশীতিপর বৃদ্ধ। সেকালের মহাস্থবির। একদা এঁরাই ভারতের সংঘপতি ছিলেন। কখনো মিলিত হতেন পাটলিপুত্রে, কখনো পুরুষপুরে, কখনো নালন্দায়, কখনো বিক্রমশিলায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু কার্বের কাজ মহিলাদের নিয়ে। তাঁর আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মাতৃজাতির শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। মরাঠীর মতো একটি প্রাদেশিক ভাষায় ক'খানাই বা কেতাব আছে যা পড়ে ইতিহাসে দর্শনে গণিতে বা রসায়নে গ্রাজুয়েট হওয়া যায়? তবু কার্বের দুঃসাহসে তাও সম্ভব হয়েছে। পরে এক গুজরাতী কুবেরজায়ার দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে। গুজরাতী মেয়েদের জন্যে শিক্ষার বাহন হয়েছে গুজরাতী। তাদের সুবিধার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত হয়েছে বম্বেতে। পুনায় যেটুকু আছে সেটুকু দেখে সম্যক ধারণা হল না।"[১]

তখন তো কল্পনাও করি নি যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত কৃশকায় সেই অশীতিপর বৃদ্ধ শতায়ু হবেন। যেমন-তেমন করে শতায়ু হতে আরো কেউ কেউ পেরেছেন। মহর্ষি কার্বের বৈশিষ্ট্য হল প্রতিদিন কর্ম করতে করতে শতায়ু হওয়া। একদিনও তিনি বললেন না যে, আর পারছি নে, এবার অবসর নেব। একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান পত্তন করতে করতে চলেছেন। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কীর্তিমালার মধ্যে আদ্য নয়, অন্ত্য নয়।

বাল্যকাল থেকে কঠোর পরিশ্রম ও স্বাবলম্বনের দ্বারা উচ্চশিক্ষায় উপনীত হয়ে তিনি স্থির করলেন অপরকে শিক্ষাদানই তাঁর জীবনের কাজ। সামান্য বেতনে পুনার ডেকান এডুকেশন সোসাইটির সভ্যরূপে ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো অধ্যাপক হলেন সমাজসংস্কারক। স্বয়ং বিধবা বিবাহ করে দৃষ্টান্ত দেখালেন। বিধবা কন্যাদের জন্যে স্থাপন করলেন 'অনাথ-বালিকাশ্রম'। হৃদয়ঙ্গম করলেন যে বিধবা কন্যার বিবাহ পরের কথা, তার আগের কথা শিক্ষা ও স্বাবলম্বন। এ কাজে তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করে অভিভাবকরা পাঠাতে চান বিধবা কন্যার সঙ্গে কুমারী বোনকেও। তখন প্রতিষ্ঠা করতে হল মহিলা বিদ্যালয়। অধ্যাপক অবসর নিয়ে স্ত্রীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। নারীকে তিনি এমন শিক্ষা দেবেন যার ফলে নারী হবে সুগৃহিণী, সুমাতা, অথচ প্রয়োজন হলে স্বাবলম্বিনী। সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক উৎকর্ষও হবে।

এই নিয়ে তিনি আছেন, এমন সময় তাঁর হাতে পড়ল জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্র। কার্বের বয়স তখন সাতান্ন। কোথায় বানপ্রস্থের আয়োজন করবেন, তা নয়, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে

---

১ দেশকালপাত্র, পৃ ২৩-২৪

আচার্য ধোন্দো কেশব কার্ভে

জন্ম ১৮৫৮

ক্ষেপলেন। বন্ধুরা বললেন, মেয়েদের জন্যে আলাদা একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন, বাপু? আর, তোমার সে বিশ্ববিদ্যালয় টিকবেই বা কতদিন? আর তুমি তো বিশ বছর ধরে বিধবা ও কুমারী কন্যাদের পড়িয়ে একজনকেও ম্যাট্রিক পাস করাতে পার নি। তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে কারা? কার্বে নাছোড়বান্দা। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তিনি গড়বেনই। পড়াশুনার মাধ্যম হবে মরাঠী বা মাতৃভাষা। সব রকম বিদ্যাই শেখানো হবে, তবে জোর দেওয়া হবে নারীর স্বতন্ত্র প্রয়োজনের উপর। এতে বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক নটরাজনের আপত্তি। নারীকে স্বতন্ত্র শিক্ষা দেওয়া তো তাকে পুরুষের সমকক্ষ হবার সুযোগ না দেওয়া। নারী তা হলে চিরকাল শূদ্রের মতো অধম থেকে যাবে। দেখা গেল কার্বের পিছনে যেমন রক্ষণশীলরা নেই তেমনি উদারনীতিকরাও নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় একটু একটু করে দাঁড়িয়ে গেল। ক্রমে ডালপালা মেলল। পুনা থেকে গেল বম্বে। সেখানে গুজরাতী শাখা মরাঠীর সমান হল। এখানে বলে রাখি শিক্ষার মাধ্যম না হলেও অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল ইংরেজি। গান্ধীজীর আপত্তিসত্ত্বে।

কার্বে কারো মন জোগাবার পাত্র নন। পদে পদে মতান্তর হয়েছে গুরুজনের সঙ্গে, সমাজের দশজনের সঙ্গে, বন্ধুজনের সঙ্গে। মতান্তরকে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, সহিষ্ণুতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। দীর্ঘ জীবনে একবারমাত্র তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। 'নিষ্কামকর্ম মঠ' অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। এটা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে। আশি বছর বয়সে কার্বে উপলব্ধি করলেন এতদিন যা-কিছু করেছেন তা মধ্যবিত্তদের জন্যে। চাষীমজুরদের জন্যে তো কিছু করা হয় নি। তখন গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্যে এক সমিতি করলেন। ক্রমে উপলব্ধি করলেন মানুষে মানুষে সমতা নেই। তার কী উপায়? উপায় 'সমতা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা। তার পর নব্বুই বছর বয়সে এই ব্রাহ্মণসন্তান অনুভব করলেন যে জাতিভেদ থাকতে সমতা অসম্ভব। সৃষ্টি করলেন 'জাতিনির্মূলন সংস্থা'। শতজীবী পুরুষের বর্তমান ধ্যান ভারতবর্ষ থেকে জাতিপ্রথা উৎসাদন করা। ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় নির্ব্রাহ্মণ নির্বৈশ্য নিঃশূদ্র নিষ্পঞ্চম করা। তা হলে আরো এক শতাব্দী বাঁচতে হয় তাঁকে। আমরা এই ভারতরত্নের দ্বিতীয় শতাব্দীপূর্তি তথা ব্রতসিদ্ধি কামনা করি।

আচার্য কার্বে জীবনকথা

সুশীল রায়

আজ থেকে শত বর্ষ আগে মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করল সামান্য একটি শিশু। সে শিশুর কাছে কারও কোনো প্রত্যাশা ছিল না, কেউ কোনো ভরসাও সম্ভবত রাখে নি তার উপর।

দারিদ্র্য ও অনটনের সংসারে আবির্ভূত হয়ে তখন কেবল ভারই বাড়িয়েছিল সেই সন্তানটি।

কিন্তু কে জানত একদিন সেই শিশুই হয়ে উঠবে ভারতরত্ন— ভারতবর্ষের এক আদর্শ মহাপুরুষ।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তারিখে ধোন্দো কেশব কার্বে জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়। এই বছরই সারা ভারতে বৃটিশ রাজের প্রতিষ্ঠা কায়েম হয়। এর পূর্ব বছরে সিপাহীদের বিদ্রোহ তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে না পেরে ব্যর্থ হল, এবং তার ফলে বৃটিশ প্রভুত্ব সমস্ত দেশে হল সুপ্রতিষ্ঠিত।

এমনি এক দিনে কার্বে জন্মগ্রহণ করলেন এই দেশে— মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত গ্রামে। গ্রামের নাম শেরাওলি। এ গ্রামে তাঁর মাতুলালয়। তাঁর পিত্রালয় হচ্ছে মুরাদ গ্রামে।

অনেক দিনের কথা হল, শত বর্ষ আগের। শতায়ু মানুষের সংখ্যা অতি সামান্য। কিন্তু এই অসামান্য মানুষটি শত অতিক্রম করে আজও বর্তমান আছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এও এক স্মরণীয় ঘটনা।

উপনিষদে আছে— কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এই উপদেশ সর্বান্তঃকরণে পালন করেছেন আচার্য কেশব কার্বে। তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করার জন্যে হৃষ্টচিত্তে শতবর্ষব্যাপী জীবনধারণ করে চলেছেন।

খুব দরিদ্র পিতামাতার তিনি সন্তান। কিন্তু কার্বে-পরিবার এককালে খুবই ধনশালী ছিলেন। দুই পুরুষ আগে এই পরিবারের কাছ থেকে বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড় কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নেন। সে ঋণ নাকি কখনো আর পরিশোধ করা হয় না।

দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু দীনতা ছিল না হয়তো এই কারণে। নিজেদের পারিবারিক মর্যাদা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন তাঁর মাতাও। এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। বরোদার মহারাজা ব্রাহ্মণদের দশ টাকা করে দক্ষিণা দিচ্ছেন, এই সংবাদে তাঁর দুই পুত্র— ভিকু ও ধোন্দো— সেই দক্ষিণা আনার জন্যে ব্যগ্র। কিন্তু তাঁদের মাতা তাঁদের নিবারণ করলেন। ঐ দক্ষিণা লাভ করলে অবশ্যই সংসারের সাশ্রয় হত। কিন্তু তিনি পুত্রদের কাছে বিবৃত করলেন ঐ মহারাজ-বংশের এবং তাঁদের এই বংশের উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্কের কথা। ঋণী বংশের কাছ থেকে আজ ঐ দক্ষিণা নেওয়া চলে না, এবং ও-ধরনের দক্ষিণা তো ভিক্ষারই অনুরূপ।

বালক কেশব কার্বে তাঁর মাতার মুখ থেকে তাঁদের বংশের বৃত্তান্ত শুনলেন। তাঁর মনেও জেগে উঠল মর্যাদাবোধ। সে বোধ আজও সমান ভাবে বিরাজ করছে তাঁর মনে।

অতি ক্ষীণ স্বাস্থ্য এবং দেখতে খুব ছোটখাটো এই বালকটির মধ্যে কি পরিমাণ কর্মশক্তি জমা ছিল বোঝা যায় নি আগে। যখন বিপত্নীক কার্বে বিধবাবিবাহ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর সেই

ভাবী ভার্যাকে তো অনেকে নিরুৎসাহই করেছিল, বলেছিল, যার স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন, সে-লোক তার বরাতেই-বা বাঁচবে কত দিন! ওকে বিবাহ করলে অচিরেই পুনরায় বৈধব্য বরণ করতে হবে।

কিন্তু সে বিবাহ করেছিলেন কার্বে ; এবং প্রায় ষাট বছর দাম্পত্যজীবনও অতিবাহিত তাঁরা করেছেন এবং ১৯৫০ সালে তাঁর এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও আজও শতায়ু কার্বে আমাদের মধ্যে বর্তমান।

যাঁরা তাঁর আয়ু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের কারো সাক্ষাৎ আজ আর পাওয়া যায় না।

অসাধারণ কর্মশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কার্বে। অত ক্ষুদ্র ও কৃশ ছিলেন বলেই সম্ভবত তাঁর উপর ভরসা ছিল না কারো। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তো আজ প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুদ্রতম বস্তুর মধ্যেও অসামান্য শক্তি জমা থাকে। তাঁরা পরমাণু ভেঙে সে-শক্তির সন্ধান পেয়েছেন।

তাই মনে হয়, মহর্ষি কার্বের মধ্যে যেন সঞ্চিত ছিল সেই পরমাণবিক শক্তি। তা না হলে, শতসহস্র বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধক পার হয়ে একটি ক্ষীণজীবী মানুষ এমন অসাধ্যসাধন করতে বুঝি পারতেন না।

জীবনের সূত্রপাত থেকেই সংগ্রাম আরম্ভ হল। এগারো বছর বয়সের বালক তার গ্রাম মুরাদ থেকে বোম্বাই যাত্রা করল। অমনি এল দুর্যোগ। ঝড় ও বৃষ্টিতে যাত্রাপথ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সদলবলে এই বালক পদব্রজে অগ্রসর হল সাতারার দিকে, প্রায় এক শ দশ মাইল পথ এই ভাবে অতিক্রম করে যেদিন সাতারায় এসে পৌছল সেই দিনই পরীক্ষা। সে সময়ে মারাঠী ষষ্ঠ মানে ভর্তি হতে হলে বোম্বাই কিংবা অন্য কোনো জেলা সদরে গিয়ে পরীক্ষা দেবার রীতি ছিল।

সাতারায় পৌছে, তখনই পরীক্ষা দেবার জন্যে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাকে দেখে পরীক্ষা-পরিচালক জানালেন, একে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ষোলো বছর এখনো পূর্ণ হয় নি, সুতরাং পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না।

পরীক্ষা দেওয়া হল না। এই দীর্ঘপথ-পরিক্রমার ক্লেশ ব্যর্থ হল। কিশোর মনে এ-আঘাত কতটা প্রবলভাবে লেগেছিল অনুমান করা যেতে পারে।

কিন্তু যে-নদীর স্রোত প্রবল, তার পথে বাধা ও বাঁক তার ধারা রুখতে পারে না, বরঞ্চ এইসব বাধার মুখে স্রোত প্রবলতর হয়ে ওঠে।

কার্বের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রবলতর হয়ে উঠল। সব বাধা অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। এবং ১৮৮৪ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হলেন। তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল গণিত। বুদ্ধিকে ও কর্মশক্তিকে শাণ দেওয়ার ব্যাপারে গণিত সম্ভবত অপরিহার্য।

তাঁর আত্মজীবনী 'আত্মবৃত্তে' তিনি তাঁর জীবনের অনেক কথা জানিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মন বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট। অর্থাৎ সামান্য একটা সীমার মধ্যে বন্দী না রেখে তিনি তাঁর মনকে একেবারে উন্মুক্ত স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছিলেন। কোন্ গ্রামে যাত্রা হচ্ছে, কোথায় থিয়েটার, কোথায় খেলা, কোথায় নাচ— সব তাঁর দেখা চাই ; হরিসংকীর্তনের আসর কোথাও বসেছে জানতে পারলে সেখানে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনা চাই সেই পালা।

দুরন্তপনাও ছিল নানা রকম। তার উপর ছিল সাঁতার কাটার শখ। একবার খুব বিপদে পড়েছিলেন এক গভীর কূপের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্য না করলে তাকে বাধা দেবে কে।

আর ছিলেন একগুঁয়ে আর জেদী। তাঁর মাকে উত্যক্তও করেছেন নানা ভাবে। কিন্তু তাঁর মনের মত কাজ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর জেদ ত্যাগ করেন নি।

কার্বের জীবনকে তাই বলা যায়, দুঃসাহসের জীবন, দুরন্তপনার জীবন, এবং সর্বোপরি জেদের জীবন। মনে মনে যা তিনি সংকল্প করেছেন তা সাধন না করা পর্যন্ত তাঁর সে-ব্যাপারে কর্মোদ্যম থামে নি।

বি. এ. পাস করার পর তিনি বোম্বাইয়ের দুইটি স্কুলে পার্টটাইম কাজ এবং সেইসঙ্গে অনেকগুলি প্রাইভেট টিউশনি করতে আরম্ভ করলেন। শেষরাত্রের অন্ধকারের মধ্যে উঠে তিনি প্রত্যহ আরম্ভ করতেন তাঁর দিনের কাজ। এই কাজ তিনি করে চলেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন, এই কাজই তাঁর জীবনের লক্ষ্য নয়। তিনি সর্বদা এমন কাজ আরম্ভ করার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন, যার আখ্যা হবে— সর্বভূতহিতবাদ।

শতবর্ষ পূর্বের সমাজকে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। বর্তমানেও আমাদের সমাজে অনেক সংকীর্ণতা অনেক অন্ধসংস্কার এবং অনেক ভেদাভেদ আছে, কিন্তু আজ থেকে প্রায় শত বৎসর আগে এইসব গ্লানিই কতটা ভয়ংকর রূপে ছিল তা আমরা সম্ভবত একটু চেষ্টা করে কল্পনা করতে পারি। তা যদি পারি, তা হলেই বুঝতে পারব সেইসব সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রামের জন্যে উদ্যত হওয়ার সাহস কল্পনাতীত।

মহর্ষি কেশব কার্বে সেই সাহসের অধিকারী।

সমাজের অন্ধতা ও অশিক্ষা, এবং তার দরুন সমাজে নারীদের জন্যে নির্দিষ্ট যে স্থান ছিল— এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল কার্বের। এবং এর প্রতিকারের পথ অন্বেষণ করাই তাঁর জীবনের ধর্ম বলে তিনি গ্রহণ করেছেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ছিল সামাজিক অকল্যাণ বলে গণ্য, অতি অল্পবয়সে তাদের বিবাহ দেওয়া এবং তার পরিণামে বিবাহ কথাটির অর্থ বোধগম্য হবার পূর্বেই বৈধব্যবরণ, আর সেই দুর্বহ জীবন শত প্রকার দীনতা হীনতা ও ক্লেশের মধ্যে অতিবাহিত করাই ছিল নারীধর্ম বলে স্বীকৃত।

মেয়েরাও নীরবে মেনে চলেছে এই জীবন। এর বিরুদ্ধে তাদের কোনো কথা বলার ছিল কি না, তা জানার উপায় ছিল না। তারা অন্তঃপুরের নেপথ্যে নগণ্য জীবের মত জীবন কাটাত।

এই নিয়মের পরিবর্তন কাম্য বলে মনে করলেন কার্বে। তিনি তাদের বেদনা নিজের বেদনা বলে অনুভব করলেন। এবং এর প্রতিবিধানের জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন নিজেকে।

ইতিমধ্যে তিনি, ১৮৯১ সালে, পুনা থেকে তাঁর পুরাতন বন্ধু গোপালকৃষ্ণ গোখলের আমন্ত্রণ পেলেন। লোকমান্য টিলক -প্রতিষ্ঠিত সেখানকার ফারগুসন কলেজে গণিতের অধ্যাপক-পদের জন্যে। কিন্তু এ কাজ গ্রহণে তাঁর দ্বিধা হল। তিনি একজন বি. এ. মাত্র, সেখানে পড়াতে হবে বি. এ. ছাত্রদের। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে তিনি এ কাজ নিলেন, এবং এই কলেজে যোগ্যতার সঙ্গে তেইশ বছর কাজ করে ১৯১৪ সালে অবসর গ্রহণ করলেন।

ফারগুসন কলেজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন আগে তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। এতে তাঁর মন একটু অবসন্ন হয়ে পড়ে। এইজন্যে জীবনে তিনি পরিবর্তনও খুঁজছিলেন। এবং পরিবর্তনের প্রস্তাবও এল উপযুক্ত জায়গা থেকেই। পুনায় যেসব প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেরা ডেকান এডুকেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি তাঁদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেলেন। তাঁর বয়স যখন পনর এবং তাঁর স্ত্রীর আট, সেই

সময় তাঁর বিবাহ হয়। পনর-ষোলো বছরের বিবাহিত জীবনের পর তাঁর স্ত্রী রাধাবাঈ লোকান্তরিত হলেন। নতুন জীবন অতিবাহিত করতে কার্বে গেলেন পুনায়।

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগ রে সকল দেশ'— ঠিক এই কথাটিই নয়, অনুরূপ কথা নিশ্চয়ই অনুরণিত হত কার্বের মনে। সমাজের বেহিসাবী নিয়ম পরিবর্তনের জন্যে সংগ্রামে তিনি উদ্যত। কেবল নিজের কথা দিয়ে নয়, নিজের কাজ দিয়ে, তিনি সেই নিয়ম সংশোধনে উদ্যোগী হলেন।

নারীদের শিক্ষিত করা এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করা তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। বিপত্নীক কার্বেকে পুনরায় বিবাহ করার জন্যে আত্মীয়-বন্ধুরা অনেক পিড়াপিড়ি করেছেন, বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব নেই দেশে— এ কথাও তাঁরা বলেছেন। কিন্তু কার্বের এক কথা। তিনি নিজে বিপত্নীক, যদি বিবাহ তাঁকে করতে হয় তিনি বিধবাবিবাহ করবেন। তাঁর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়েছে, হতবাক্ হয়েছে, ভীত হয়েছে সকলে। এ রকম কাজ করলে সামাজিক পীড়নের কথা ভেবে শঙ্কিতও হয়েছে তারা।

কিন্তু কার্বে বিধবাবিবাহই করলেন। ১৮৯৩ সালে। যাঁকে বিয়ে করলেন তাঁর নাম গোদুবাঈ, বিবাহান্তে তাঁর নূতন নামকরণ হল আনন্দীবাঈ।

ইনি এলেন কেবল স্ত্রী-রূপে নয়, কার্বের জীবনের সহায় হয়ে সহচরী হয়ে এবং সহধর্মী হয়ে।

এখানে গোদুবাঈ সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া দরকার।

রত্নগিরি জেলার দেওরুখ নামক গ্রামের মেয়ে তিনি। তাঁর বয়স যখন আট তখন মাখজন নামক গ্রামের পঁচিশ বছর বয়সের এক বিপত্নীক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্বামী বোম্বাইতে কাজ করতেন। বিয়ের পর মাস-তিন মাত্র কেটেছে, এমন সময়ে বোম্বাই থেকে খবর এল যে, তাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন।

বিধবা গোদুবাঈ বারো বছর তাঁর শ্বশুরবাড়িতে সাংসারিক কাজ করে কাটালেন। এতদিন বিধবার বেশ ধারণ তাঁকে করানো হয় নি নেহাত বালিকা বলে। কিন্তু এখন তাঁর বয়স কুড়ি-একুশ হয়েছে, এবার একটু সাবধান হতে হয় বলেই হয়তো তাঁর মস্তক মুণ্ডন করে দেওয়া হল, এবং মহারাষ্ট্রী রীতি অনুসারে রাঙাবাস পরানো হল।

এতদিন তিনি বুঝতে পারেন নি বৈধব্যের অর্থ কি, এবার যেন সমস্ত বেদনা অনুভূত হতে লাগল।

বছরে একবার করে পিত্রালয়ে যেতেন গোদুবাঈ, এবং মাস-খানেক কাটিয়ে আসতেন সেই দেওরুখ গ্রামে। একবার তাঁর দাদা প্রস্তাব করলেন যে, গোদুবাঈকে তিনি বোম্বাই নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চান। কিন্তু বৃদ্ধা মাতা এতে রাজি না। কিন্তু সুযোগ এল। বোম্বাইতে তাঁর দাদার স্ত্রী মারা গেলেন। তাঁর সংসার দেখার জন্যে গোদুবাঈকে এবার যেতেই হল বোম্বাইতে।

গোদুবাঈএর বয়স তখন চব্বিশ, এই সময়ে বর্ণপরিচয় ও ধারাপাত -পাঠ আরম্ভ হল। তাঁর দাদাই তাঁকে পড়াতেন। এমন সময়ে একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে, বোম্বাইতে পণ্ডিতা রমাবাঈ নামে এক বিদুষী মহিলা মেয়েদের জন্যে একটি স্কুল খুলছেন।

রমাবাঈ একজন সংস্কৃত-স্কলার। এঁর জীবনও বিবিধ কষ্টে কাটে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সংস্কৃত-শাস্ত্রী। রমাবাঈয়ের বয়স তখন অল্প, সেই সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং তার কিছুদিন পরেই তাঁর মা এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী লোকান্তরিত হন। উপায় না দেখে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে

১৮৭৮ সালে আসেন কলকাতায়। এ সময়ে তাঁর বয়স কুড়ি বৎসর। তাঁর বিদ্যা ও তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সেকালের কলকাতার বিদ্বজ্জনবর্গ বিস্মিত হন এবং সাধারণ সভা ডেকে তাঁরা রমাবাঈকে মানপত্র ও পণ্ডিতা উপাধি দান করেন। তাঁর কলকাতা-বাসের সময়ে তাঁর ভ্রাতাও মারা গেলেন, রমাবাঈ হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ একা। সুহৃদ্ যাঁরা, তাঁরা এই মহিলার প্রতি দয়াপরবশ হলেন এবং উদ্যোগ করে বিপিনবিহারী মেধাবী নামক এক বঙ্গযুবকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে। বছর দেড় কেটেছে, ইতিমধ্যে লোকান্তরিত হলেন রমাবাঈএর স্বামী। তাঁর কোলে তখন একটি শিশুকন্যা, তার নাম রাখা হয়েছে মনোরমা। বুকে এই কন্যা এবং শোক নিয়ে রমাবাঈ ফিরে গেলেন বোম্বাইতে। তার পর তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রওনা হলেন। কয়েক বছর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি মেয়েদের জন্যে বোম্বাইতে স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা জানালেন। এই স্কুলের নাম সারদা-সদন। ১৮৮৯ সালে এই স্কুল খোলা হল।

সারদা-সদনে অনধিক কুড়ি বছর বয়সের মেয়েদের নেওয়া হবে বলে স্থির হয়। কিন্তু গোদুবাঈয়ের বয়স হয়েছে চব্বিশ। দ্বিধা নিয়ে তাঁর দাদার সঙ্গে গোদুবাঈ তবু এলেন স্কুলে। রমাবাঈ যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে রাজি হলেন তাঁকে ভর্তি করে নিতে। গোদুবাঈই সারদা-সদনের প্রথম ছাত্রী। চৌপাটির একটি বাংলোতে এই স্কুল। গোদুবাঈ রোজ ছাতা হাতে নিয়ে পায়ে জুতো পরে গিরগাঁও থেকে চৌপাটিতে আসতে আরম্ভ করলেন। মুণ্ডিতমস্তক এক বিধবার এইভাবে জুতো-ছাতা নিয়ে পথচলা দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেত।

এখানে ভর্তি হওয়ার আগে গোদুবাঈ যখন তাঁর দাদার কাছে পাঠ নিতেন, তখন কার্বেও মাঝেমাঝে তাঁকে পড়া দেখিয়ে দিতেন। কার্বে তাঁর দাদার বন্ধু, এবং দু জনে মিলে একই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

গিরগাঁও থেকে চৌপাটি যাতায়াতে গোদুবাঈয়ের খুব অসুবিধে হচ্ছে বিবেচনা করে রমাবাঈ প্রস্তাব করলেন সারদা-সদনে এসে থাকতে। এতে সুবিধে হল। গোদুবাঈ সারদা-সদনে থেকে লেখাপড়া শিখতে লাগলেন।

এর কিছুদিন পরেই কার্বে গেলেন পুনায়— ফারগুসন কলেজে।

পণ্ডিতা রমাবাঈএর তত্ত্বাবধানে গোদুবাঈএর জীবন কেটে চলেছে সারদা-সদনে। কিছুদিন পরে সারদা-সদনও গেল পুনায় উঠে।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে মহারাষ্ট্রে বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আন্দোলন করেন বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত। তাঁকে সকলে মহারাষ্ট্রের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলত। ১৮৫৬ সালে আইন-অনুযায়ী বিধবাবিবাহ সিদ্ধ হয়। আইন হল বটে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য স্থানের মত মহারাষ্ট্রেও জনমত এর ঘোরতর বিরোধী। এই বিরোধ উপেক্ষা করেও ১৮৬২ সালে একটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এর পরে কার্বের উদ্যোগে একটি বিবাহ হয়। তার পর আর দু-একটি ঘটে, এবং অতঃপর কার্বে স্বয়ং অনুরূপ বিবাহ করে পথপ্রদর্শন করলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ মার্চ। সারদা-সদন থেকে বিদায় নিলেন গোদুবাঈ নূতন জীবনে পদার্পণ করার জন্যে। সারদা-সদনে ভর্তি হবার পর থেকে তিনি মাথার চুল রেখেছেন। আজ বিবাহ-বেশে সজ্জিত হয়ে, কপালে কুমকুমের টিপ পরে তিনি পণ্ডিতা রমাবাঈএর হাত ধরে অন্যান্য বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে চললেন আপ্পাসাহেব

ভাণ্ডারকরের গৃহে। আন্নাসাহেবও এই মতের সমর্থক, কয়েক বছর আগে তিনি তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। এই গৃহে শুভউৎসব অনুষ্ঠিত হল।

কার্বের জীবনে নূতন চেতনা এল, এবং সেইসঙ্গে নূতন প্রেরণা। তিনি তাঁর সহচরী রূপে পেয়েছেন তাঁরই মত একজন সংগ্রামীকে।

কার্বের জীবনের প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল এতদিন, এবার তাঁর জীবনের কর্মারম্ভ ঘটল। এইরূপ বিবাহের জন্য সকল দুয়ার রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর কাছে, আত্মীয়-স্বজনেরা বিমুখ হলেন। কিন্তু তার জন্যে ভীত হলেন না কার্বে।

তিনি একটি সংঘ গঠন করলেন এই বছরই, তার নাম হল উইডো রিম্যারেজ আসোসিয়েশন। এই সংঘের মধ্য দিয়ে তিনি জনমত-গঠনে ব্যাপৃত হলেন, তার পর ১৮৯৬ সালে অনাথ বালিকা অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করলেন— ১৮৮৭ সালে বঙ্গদেশে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হোম ফর উইডোজ স্থাপন করেন, কার্বের অনাথ বালিকা সংঘ এরই আদর্শে গঠিত হল। কয়েক বছর পরে, ১৯০০ সালে, তিনি পুনার উপকণ্ঠে স্থাপন করলেন একটি আশ্রম, অনাথ বালিকাদের আশ্রয় ও শিক্ষা দেওয়াই হল এর কাজ। তার পরে, ১৯০৭ সালে, তিনি পুনায় মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন : মহারাষ্ট্রে মহিলাদের শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে এটি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু তিনি সম্ভবত উপযুক্ত কর্মীর অভাব অনুভব করেছেন। এবং এই অভাব মোচনের জন্যে উপায় চিন্তা করছিলেন। অবশেষে ১৯০৮ সালে তিনি এক অভিনব প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন, তার নাম নিষ্কাম কর্ম মঠ। প্রথমে তিনি এবং তাঁর দুই বন্ধু এই মঠের শপথ গ্রহণ করলেন : আমার নিজের বলে এতদিন যা-কিছু মনে করে এসেছি আজ থেকে তার উপর থেকে সব স্বত্ব ও অধিকার পরিহার করলাম ; এই মুহূর্ত থেকে আমি নিজে এই মঠের সম্পদ ; এই মঠ আমার জন্যে ও আমার পরিবারের জন্যে যা বরাদ্দ করবে প্রফুল্ল চিত্তে তাই গ্রহণ করব।

১৯১৪ সালে ফারগুসন কলেজ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন।

প্রায় ষাট বছর বয়স তখন কার্বের। সাধারণ মানুষ এই সময়ে সর্বপ্রকার কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে থাকে। কিন্তু কার্বের কাজ এখনো চলল পূর্ণ উদ্যমে। কলেজের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে তিনি সমস্তটা সময় নিয়োগ করলেন যেন নিজের কাজে।

প্রেরণা নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি সংগ্রহ করেন সর্বক্ষেত্র থেকে। জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি কাগজপত্র তাঁর হাতে আসে। সেসব দেখেই, অনুরূপ একটি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন, এবং তা কার্যে পরিণত করতে বিলম্ব ঘটে না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকার্সে উইমেন'স ইউনিভার্সিটি নামে খ্যাত।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা বিষয়ে অর্থ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেছেন। তার পর সত্তর বৎসর বয়সে তিনি যাত্রা করেন বিদেশে, বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে তিনি যে জ্ঞান সঞ্চয় করে আসেন তা তাঁর নিজের জন্যে নয়— তাঁর প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যেই।

১৯৩৬ সালে, যখন তাঁর বয়স ৭৮, তিনি মহারাষ্ট্র ভিলেজ প্রাইমারি এডুকেশন সোসাইটি নাম দিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটি সংঘ গঠন করেন, এবং কয়েকটি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৪ সালে তিনি আর-একটি সংঘ গঠন করেন। এর নাম দেন সমতা-সংঘ। বিশ্বের সমস্ত মানবের মধ্যে সমন্বয়সাধনই এই সংঘের উদ্দেশ্য বলে তিনি ঘোষণা করেন; এবং মানবী সমতা নামে এই সংঘের মুখপত্র প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ আর যাতে না ঘটে, তার উপায়, তাঁর মতে, এই সমতা-সংঘের আদর্শে সকলের কাজ করা; মানুষে-মানুষে ভেদ ঘুচে গেলেই পৃথিবী বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু সে তো একটু বৃহৎ বিষয়। এই বৃহৎ বিষয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি তুলনামূলকভাবে ছোট বিষয়ের কথা বিস্মিত হন নি। সে হল আমাদের জাতিভেদ-প্রথা। ভুলে যান নি বলেই ১৯৪৮ সালে, ৯০ বৎসর বয়সের তরুণ কার্বে, প্রতিষ্ঠা করলেন জাতিভেদপ্রথা-দূরীকরণ সমিতি— কাস্ট অ্যাবলিশন সোসাইটি।

একটি মানুষের জীবনে এতটা কর্মশক্তি থাকতে পারে, কার্বে স্বয়ং তাঁর জীবনের কৃত কর্মের দ্বারা আমাদের দেখিয়ে না দিলে আমরা বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মান দেখিয়েছে— কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪২), পুনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩), শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকার্সে উইমেন্'স্ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৫), বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭)। এ ছাড়া ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং ১৯৫৮ সালে তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেন— ভারতরত্ন।

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক
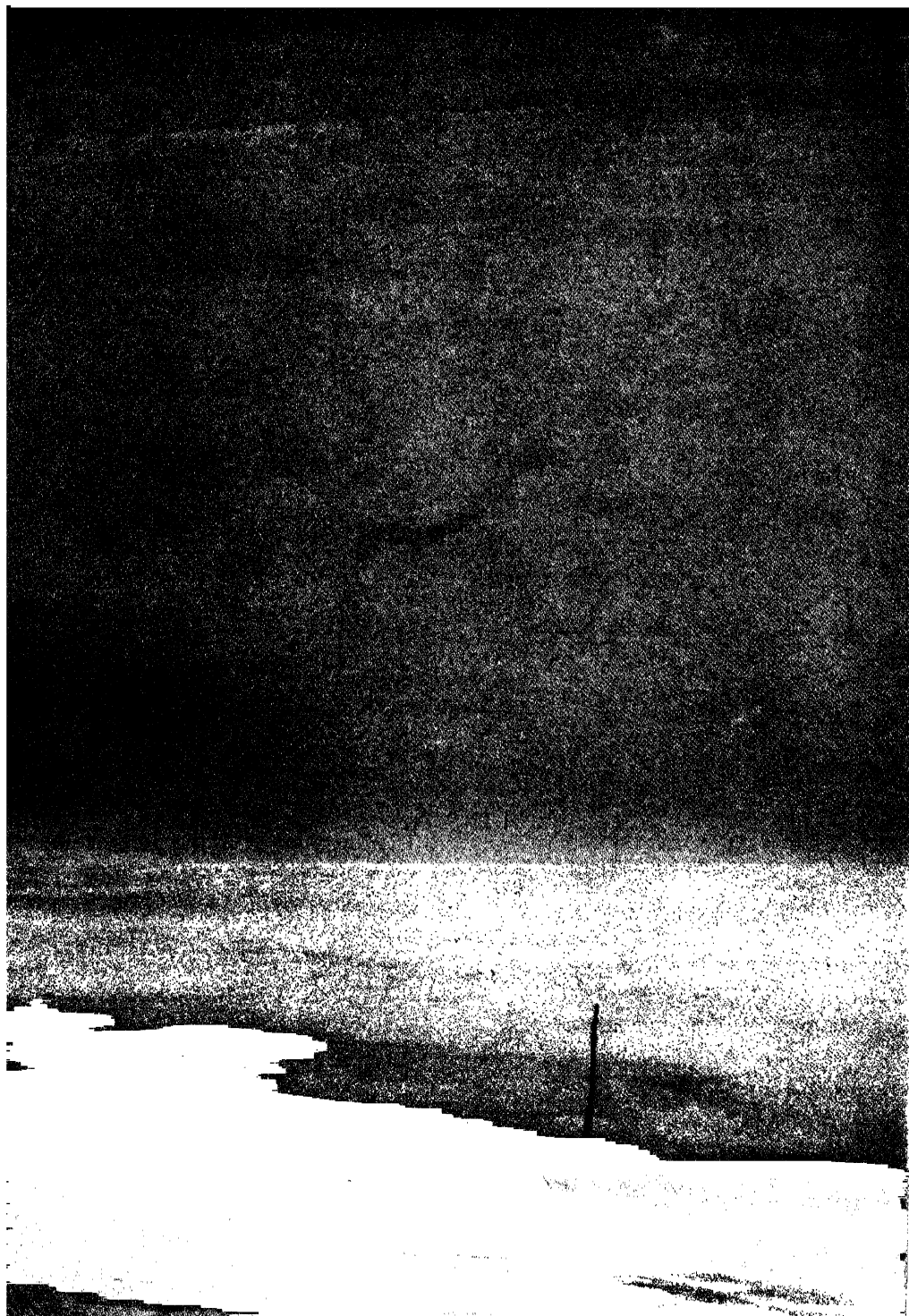
চিঠিপত্র শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

দার্জিলিঙ

কল্যাণীয়াসু

আমের প্রতি আমার প্রবল লোভ। তোমাদের উত্তরবঙ্গের চাপড়ঘণ্ট এবং বেতের সুক্তনি আমার রুচির পক্ষে বেশি তীব্র; তাদের সম্বন্ধে আমার রসনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু নাম শুনলে গুরুমশায়ের পাঠশালা মনে পড়ে। যাই হোক এই ফলের অর্ঘ্যযোগে তোমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেবা আমাকে আনন্দ দিয়েচে। এই পর্য্যন্ত যেই লিখেচি সেই মুহূর্ত্তেই আমার সেবক তোমার দানের ডালি থেকে কয়েকটি ফল একটি পাত্রে সাজিয়ে আমার সামনে ধরল। আমার মন সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েচে। ফলভোগ সমাধা হোলো আমার। কিন্তু অবকাশ নেই। আজ সার জগদীশচন্দ্র মধ্যাহ্নভোজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন। কোথাও বেরই নে, এ রকম ভোজেও আমার রুচি নেই, কিন্তু জগদীশের আহ্বান এড়াতে পারিনে। সাজসজ্জা করে বেরতে হবে। এদিকে অম্বুবাচীর আকাশ অম্বুবাচনে মুখর হয়ে উঠেচে। কিন্তু গিরিরাজের প্রকাশ বাষ্পে আচ্ছন্ন।

চিঠির মধ্য দিয়ে তোমার লেখা যতই পড়ি যেমন আনন্দিত ও বিস্মিত হই তেমনি মনে বেদনাও বোধ করি। তোমার মধ্যে যে সংরাগ ও আবেগ যে প্রবল প্রকাশের শক্তি তা প্রতিহত হয়ে তোমাকে পীড়িত করচে। বিধাতা তোমাকে শক্তি দিয়েছেন অথচ ক্ষেত্র দেননি এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছু হতে পারে না।

আজ আর সময় নেই। ইতি ৯ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

১২

ওঁ

দার্জিলিঙ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্রে যে বাচিক ভোজ দিয়েচ সেটা উপাদেয় বলে মনে হোলো। তোমার মীরা মাসীর রান্নায় হাত আছে তাকে দিয়ে বাচিকটাকে কায়িক করে নেব। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা ছিল প্রতিদিন তাঁকে একটা কিছু

সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ খাওয়াব। মীরার মা ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যে— তিনি খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। কিন্তু নতুন খাদ্য উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি। সেই সকল অপূর্ব্ব ভোজ্যের বিবরণসহ তালিকা আমার স্ত্রীর খাতায় ছিল। সেই খাতা আমার বড় মেয়ের হাতে পড়ে। এখন তারা দুজনেই অন্তর্হিত। আমার একটা মহৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হ'ল। রূপকার রবীন্দ্রনাথের নাম টিকতেও পারে, সূপকার রবীন্দ্রনাথকে কেউ জানবে না।

তোমার চিঠির সঙ্গে একটুকরো রূপকথা পাঠিয়েছ। সম্পূর্ণ করো না কেন? ছেলেদের পাঠ্য বই আমাদের দেশে নেই বললেই হয়। এই কাজে তুমি হাত দাও না কেন? যত পার রূপকথা সংগ্রহ করে একখানা বই যদি বের কর, খুব কাজে লাগবে। আর্থিক দিক থেকেও তাতে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

আগামী ১০ই নভেম্বর তারিখে কলকাতায় যাব। চার পাঁচ দিন সেখানে কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাব। ইতি ৫ নভেম্বর ১৯৩১

দাদা

১৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত। এ কয়দিনের সম্মানের অভিঘাতে অভিভূত।

তুমি গৃহের ও সম্প্রদায়ের কঠোর বন্ধনে শৃঙ্খলিত। এ রকম বন্দিদশা আমার অভিজ্ঞতার বাহিরে। কৃত্রিম ও সঙ্কীর্ণ নিয়মের নাগপাশে মানবাত্মাকে এমন করে সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করাকে আমি অধর্ম্ম বলেই জানি। এ বন্ধনকে তুমি যখন নিজেই স্বীকার করে নিয়েছ, একেই তুমি যখন্ মুক্তি বলে কল্পনা কর তখন উপায় নেই। এ অবস্থায় বন্ধনে সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দেওয়াতেই তুমি আরাম পাবে। যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ দ্বিধার টানাটানিতে তোমাকে বেশি দুঃখ দেবে।

আমার প্রকৃতি অত্যন্ত নিরাসক্ত। আমার মধ্যে স্নেহ প্রেম ভক্তির প্রবলতা নেই তা নয় কিন্তু তা আমাকে বাঁধে না। আমার নেশা নেই। সমস্তই আমি সহজে স্বীকার করি। আমাকে কিছুতে ক্ষুব্ধ করবে এমন কথা তুমি কখনোই মনে কোরো না। আমি নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র। আমি যাকে যা দিই তার থেকে নিজের জন্যে কোনো অংশ ফিরিয়ে নিইনে। কিছুতে তোমাকে আমি ভুল বুঝব এমন আশঙ্কা নেই। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯৩২

দাদা

১৪

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আগে কাজের কথাটা শেষ করি। তোমার সেই মাতৃমূর্ত্তি-রচনার সঙ্কল্প জানিয়ে চিঠি যখন লিখেছিলে তখন ছিলেম বরানগরে, ভেবেছিলেম অবনের সঙ্গে দেখা হলে প্রস্তাবটা তাঁকে জানাব। দেখা হয়নি। যথাসময়ে যদি স্মরণ করিয়ে দাও কলকাতায় গিয়ে ওটাকে পুনরুত্থাপন করব।

আজ প্রাতে এখানে নববর্ষের উপাসনা হয়ে গেল। আশ্রমে এটা একটা বিশেষ দিন। সম্বৎসরে আমাদের ব্রত-পালন পথের পাথেয় সঞ্চয়ে যা ক্ষয় হয়েছে ক্ষতি হয়েছে আজ তাই পূরণ করে নেবার চেষ্টা করি।

ঘোর ঘনঘটা করে এলো বৃষ্টি। মাঠ ভেসে গেল জলে। নিবিড় ধারাবর্ষণের আবরণে আমার ঘরের সামনেকার গাছগুলি অবগুণ্ঠিত, আর্দ্র বাতাস বইচে বেগে, বৃষ্টির আঘাতে গোলক চাঁপাগুলি ঝরে পড়চে মাটিতে, তালগাছের ছাঁটা ডালে কাক বসে আছে পাতার নীচে, অনতিদূরে কোথা থেকে ডেকে উঠ্‌চে একটা গোরু, বোধ করি বন্ধনমোচনের আবেদন জানিয়ে; আমার নিভৃত ঘর ছায়াচ্ছন্ন, আসর জমাবার মতো লোক নেই। আগেকার মতো দায়িত্ববিহীন অবকাশ যদি থাকৃত তা হলে বাদুলে সুর দিয়ে গান তৈরি করতুম, কিম্বা লিখতুম ছোটো গল্প।

আজ এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে একটা বিয়ে আছে। সকালে গায়ে হলুদ হয়ে গেল— অত্যন্ত বেসুরো গ্রাম্য সানাই বর্ব্বর তারস্বরে আজ প্রাতঃকালের মেঘমেদুর আকাশকে যেন ক্ষতবিক্ষত করেছে এতক্ষণে ধারাপতনের তরল কল্লোলে তার শুশ্রূষা সমাধা হোলো।

নববর্ষের শুভকামনা জানিয়ে শেষ করি এই পত্র। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪০

দাদা

১৫

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নিতান্তই চুপচাপ করে থাকব পণ করে ছিলুম। চারদিকের ছোটোখাটো দাবী চারদিক থেকে ঠেলা মেরে আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি সানুনয়ে সবার কাছ থেকে ছুটি চেয়েছি। অনেককাল দশের ফরমাস জুগিয়ে হয়রান হলুম, যে কয়টা দিন বাকি আছে নিজের খেয়ালের রাজ্যে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করে সময় কাটাব এইটে দাবী করবার অধিকার আমি অর্জ্জন করেছি। কিন্তু ভিড়ের ধাক্কা এখনো ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। একটু ফাঁকা পেলে বাঁচি, পাইনে। প্রথম বয়সে জীবনে এই ফাঁকা ছিল, সেই ছিল বাল্যলীলার ক্ষেত্র; মাঝ বয়সে ডাক পড়ল কর্মশালায়, ফাঁকি দিই নি। আজ দিনাবসানে তারার আলোয় বড়ো করে আসন বিছিয়ে বসতে হবে,— কিছুই না করবার সেই আয়োজনও প্রশস্ত জায়গা চায়। ঠেলাঠেলির মধ্যে খেলাও হয় না বিরামও হয় না।

কলকাতায় একদিন আমার অনুপস্থিতিকালে তোমার প্রেরিত মিষ্টান্ন পেয়েছিলুম— এখানে এসে তার ভোগ সমাধা হোলো। তোমার সেই মেলায় কেনা চিত্রিত হাঁড়িগুলো আমার টেবিলের উপর নৈষ্কর্ম্ম্যে বিরাজমান। আমার চেয়ে তাদের ভাগ্য ভালো— রান্নাঘরে কেউ তাদের টানাটানি করবে না, রঙীন অবকাশ ভোগ করচে তারা। ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩৪০

দাদা

১৬

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার বয়সের নিশ্চিত খবর আমার কাছে জানতে চেয়েছ। আমি ত্রিকালজ্ঞ নই তবু ধ্যানযোগে যেটুকু জানলুম তাতে বোধ হচ্চে তোমার বয়স একশো দেড়শোর কম হবে না— দাশরথি রায়ের চেয়ে বোধ করি কিছু ছোটো হবে। ষাট বছর পূর্ব্বে আধুনিক কালের প্রথম যুগে রবিঠাকুর যে সব ছড়া রচনা করত সেগুলো স্বভাবতই তোমার প্রাচীন বয়সের মনঃপূত ছিল। বর্ত্তমান যুগের নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা রচনা করে তার অর্থ বোঝবার মতো বয়স তোমার অনেক কাল হোলো পেরিয়ে গেছে— বোধ করি রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার পূর্ব্বেই। তোমার আগামী জন্মদিনে তোমাকে শিবায়ন মনসামঙ্গল কিনে পাঠিয়ে দেব— পড়ে খুসি হবে, ভূষণের মাকেও পড়ে শোনাতে পারবে— কিন্তু খুকুকে শোনাবার চেষ্টা করলে অশান্তির কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা করি।

আমার এখানে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী নামে একটি ভদ্রলোক আছে রন্ধন ব্যাপারেই তার সব চেয়ে উৎসাহ। তোমার পূর্ব পত্রের এক অংশ শুনে তার ঔৎসুক্য প্রবল হয়েছিল। তোমার এবারকার চিঠির ত্রয়োদশপদী মোচার ঘণ্টর তালিকা দেখিয়ে তার উল্লাসবর্দ্ধন করব এই আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সেটা মীরা নিয়ে গেল বলপূর্ব্বক। তারও রাঁধবার শক্তিও আছে অনুরাগও আছে। তার সকলের চেয়ে বড়ো সখ বাগানে। তার বাড়িটি ঘিরে যে বাগান বানিয়েছে যে দেখে সেই বিস্মিত হয়।

তোমাকে পুরো বহরের চিঠি লিখতে পারব না। দুর্ব্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলুম বোটে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংগ্রহ করে দুর্ব্বলতর অবস্থায় ফিরে এসেছি— কিছুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন।

সেই যে পথিক ভদ্রলোকটির মাথায় বৃক্ষবৃষ্টির দ্বারা তরোরিব সহিষ্ণুতা সাধনার সুযোগ ঘটিয়েছিলে তাঁর হাল অবস্থা জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত আছি। তাঁর বাড়ির গৃহিণী অনির্দ্দিষ্টার উদ্দেশে কী রকম বাক্যবৃষ্টি করছেন সেটাও জানবার যোগ্য। ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩

দাদা

১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পিঠেরচনাপ্রণালীর তালিকা বৌমাকে দিয়েছি— আশা করি দেওয়াটা সার্থক হবে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে রবিঠাকুর পিঠের নৈবেদ্য মাঝে মাঝে পেয়েছেন।

সেদিন ভূমিকম্প যখন ঘটল সেই সময় চৌকিতে বসে আমার ডেস্কটাকে আবর্জ্জনামুক্ত করছিলুম। ডেস্ক এবং চৌকি এক সঙ্গেই মাথা নাড়লে, সেটাকে আমি দৈবসঙ্কেত বলে মনে করিনি। প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্যে মানুষের পাপপুণ্যকে দায়ী করবার মতো মনোভাব আমার নয়, অন্ধ নির্ম্মম প্রকৃতি আমাদের কৃত্য অকৃত্যের হিসাব রাখে না, তার হিসাব জড়শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে। এখানে আমার

কাজ আছে ২৩শে মাঘ পর্য্যন্ত। তার পরে কলকাতার প্রতি মনোযোগ করবার অবকাশ হবে। হয়তো ২৫ তারিখে কলকাতায় যাব। সেখানে আমাদের ঘরকন্নার ব্যবস্থা যথোচিত নেই তাই আশ্রয় নিতে হবে বরানগরে। বরানগরের ঘাটে আমাদের বোট আছে সেখানেও কদাচিৎ দিন যাপন করব। কচিকে বোলো কোনো এক সময়ে তোমাকে নিয়ে আসবে তাহলে দেখা হতে পারবে। শীত খুব প্রবল সেটাও আমার বিশ্বাস সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোনো একটা বোঝাপড়া নিয়ে— পূর্ব্বজন্মে তুমি দর্জ্জির দেনা শোধ করতে ভুলেছিলে বলে নিশ্চয়ই নয়। ইতি ৮ মাঘ ১৩৪০

দাদা

১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে যখন তুমি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করো তখন বুঝতে পারি সেটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার শিক্ষা আমার হয়নি, কিন্তু তোমার পিঠে প্রস্তুতের প্রকরণ পড়লে পরীক্ষার পূর্ব্বেই বুঝতে পারি সেগুলি শ্রদ্ধার যোগ্য। এমন কি বৌমা তোমার রচিত পৈষ্টকী সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন— শাস্ত্র অনুসারে তোমার এই লেখাগুলিকে কাব্য বলা যেতে পারে কেননা সাহিত্যদর্পণ বলেচেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।— তোমার চিঠিতে ভূমিকম্পকে আমাদের পাপের ফল বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলে। মনে আছে এর আগে বাংলাদেশে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তারি কিছুকাল পরে জাহাজে করে কটকে যাচ্ছিলুম। শুনতে পেলুম আমার চৌকির কাছাকাছি বসে একটি বাঙালী মেয়ে তার সঙ্গিনীকে কানে কানে বলছিল, হবে না ভাই? দেখলি ত আমাদের পাড়ায় অমুক ইত্যাদি। তোমার মুখেও ঐ ধরণের কথা শুনেচি। তার পরে কাল খবরের কাগজে পড়ে দেখলুম মহাত্মাজিও ঐ ধরণের কথা বলেছেন, জানিয়েছেন অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচারের ফলে ভূমিকম্প ঘটচে। …এর পরে ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মন্ত্র তোমার কাছেই আমাকে নিতে হবে দেখচি। বিধাতা তাঁর পুণ্যের জোরে সৃষ্টি করেন, আমরা পাপের জোরে তা ভেঙ্গেচুরে দিতে পারি এ তো কম অহঙ্কারের কথা নয়। জীবনে অনাচার অত্যাচার অনেক করেচি ভয় হচ্ছে কোন্‌দিন সকালে উঠেই দেখব সূর্য্য গেছে নিবে, আর রান্না চড়িয়ে দেখা যাবে উনন থেকে জলের ফোয়ারা উঠচে। যতদূর পারি ভালো ছেলে হবার চেষ্টা করব। ১৩ মাঘ ১৩৪০

দাদা

সামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সংস্কৃতি কি, তা এক কথায় বলা যায় না। এলিয়ট বলেছেন, শিল্প সাহিত্য অভিনয় হতে শুরু করে বেশবিন্যাস, এমনকি স্যালাড সাজাবার ধরণটি পর্যন্ত, সংস্কৃতির পরিচায়ক। ফুলের গন্ধ যেমন হাওয়ায় ভাসে, তাকে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না, সংস্কৃতির ব্যাপার খানিকটা তেমনি। তার নানাভাবে বাহ্যপ্রকাশ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন্‌টা ভালো এবং কেন ভালো, আর কোন্‌টি রুচির মানদণ্ডে ওৎরালো না তার লক্ষণ মিলিয়ে বিধান রচনা করা যায় না।

সংস্কৃতির সত্তা এই রকম খানিকটা অনির্বচনীয় হওয়া সত্বেও সংস্কৃতির বিচার অসম্ভব নয়। তার অনেকগুলি বাহ্যপ্রকাশ আছে। যেমন গান অভিনয় কবিতা, এমনকি, বেশভূষা ও চালচলন। কালে কালে, দেশে দেশে, অথবা গোষ্ঠীবিভেদ অনুসারে এগুলির চেহারাবদল হয়ে থাকে। বোঝা যায়, পৃথক মন বা পৃথক জীবনদর্শন তাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে এবং বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিক বা বিভিন্ন ধরণের কলাকৌশল অবলম্বন করে তা প্রকাশ হতে চাইছে। এর মধ্যে যেগুলিতে মানুষের হৃদয় আনন্দ পায়, বলে ওঠে— আহা, শেষপর্যন্ত তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। কেননা, শেষপর্যন্ত, এইসব বিচারে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপাই নেই যে, সচেতসামনুভবঃ প্রমাণস্তত্র কেবলম্‌। সচেতস্‌দের অনুভবই সেখানে একমাত্র প্রমাণ।

সংস্কৃতির এইসব লক্ষণ ও উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত আলোচনা করলে দেখা যাবে, সংস্কৃতির বিকাশের মোটামুটি কয়েকটি নিয়ম আছে, যাকে সাধারণ নিয়ম বলা যেতে পারে। আজকাল এই কথাই স্বীকৃত যে, সংস্কৃতির বিকাশ সরলরেখার উর্ধ্বগতি নয়, তার বিকাশরেখার অলাতচক্রের চংক্রমণ গতি। ঘুরে ঘুরে সে চলে, কিন্তু ঘুরে সে আর পূর্বের বিন্দুতে আসে না, হয় পূর্ববিন্দুর উপরে অথবা নীচে গিয়ে হাজির হয়। সমাজ জটিল ব্যাপার, মানুষের মন আরও জটিল, এই দুয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে সেই জটিলতা আরও বাড়ে। কাজেই সেই জটিলতার মধ্যে সংস্কৃতির রেখা ঘুরে ঘুরে চলবে না, একেবারে টানা লাইনে উপরের দিকে উঠে যাবে— এমন কথা হতেই পারে না। বস্তুত টানা লাইনের সমর্থন করা মানে এইসব জটিলতার দিকে চোখ বুজে থাকা। যার কোনো অর্থই হয় না, বিশেষত আজকালকার যুগে।

কথাটির আর-একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত সোরোকিন বলেছেন, জৈবসত্তায় বা বস্তুতে শুধু বস্তু আছে, প্রাণসত্তার মধ্যে বস্তুও আছে প্রাণও আছে। কিন্তু সংস্কৃতির মধ্যে শুধু এ দুটি থাকলেই চলবে না, আরও কিছু চাই। তার মধ্যে একটি 'অ'-বাস্তব পদার্থও চাই, যা বস্তুর অতীত, এক হিসেবে (শুধু জীবনধারণের অর্থে) প্রাণেরও অতীত, যার নাম অর্থ। উদাহরণ দিতে গিয়ে সোরোকিন বলেছেন, বই হিসেবে প্লেটোর গ্রন্থাবলীর কিছু রাসায়নিক মূল্য আছে (যেমন কাগজ); কিন্তু তার প্রতি আকর্ষণ কেবলমাত্র ইঁদুর ও পোকাদের, অন্য কারও নয়। তেমনি শুধু অর্থবোধ করে পড়লেও তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না, কেননা, বলা যায়, একটা

এক শো টাকার নোট দেওয়ার অর্থ ঋণশোধ হতে শুরু করে চুরি পর্যন্ত সবই হতে পারে। আসল কথা, তাৎপর্য বোঝা চাই। সেইখানেই চিন্তা আরম্ভ হয়, এবং সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। শুধু চিন্তা নয়, সেই অনুসারে কাজও। শুধু বসে বসে ভাবনা নয়, সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আচরণও। এ রকম বেশি লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁরাই সংস্কৃতির স্বষ্টিকর্তা এবং ধারক।[১] তা না হলে সংস্কৃতির স্বষ্টি হয় না। আমি বৌদ্ধধর্ম ও আচরণ সম্বন্ধে পুঁথি পড়ে থাকতে পারি, কিন্তু এই শুষ্ক জ্ঞানই আমায় বৌদ্ধ শীল ও সংস্কৃতি স্বষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ করবে না, যদি না আমার জ্ঞানের সঙ্গে অনুশীলনও থাকে।

সংস্কৃতির এই ক্রিয়া স্বীকার করলে আরও কয়েকটি কথা স্বীকার করতেই হয়। প্রথম কথা হল সমাজ এবং গোষ্ঠী। সমাজ ছাড়া অনুশীলন হয় না, তার উপর আজকাল সমাজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—নানা গোষ্ঠী; তার মধ্যে কোনো গোষ্ঠীর প্রভাব বেশি কোনো গোষ্ঠীর কম। কাজেই আদিম যুগে হয়তো গোটা সমাজটাকে ধরলেই চলত, কিন্তু এ যুগে তা চলে না। সুতরাং সংস্কৃতির বিচারে প্রথম বিচার সামাজিক বিচার ও গোষ্ঠীগত বিচার। তাদের মধ্যে যোগ সুস্পষ্ট।

কিন্তু এই যোগ খুঁজবার সঙ্গেসঙ্গে তার বিপ্রয়োগও দেখতে হবে। কারণ সমাজের গতি ও সংস্কৃতির গতি সব সময়ে সমান স্তরে থাকে না, এমন-কি সব সময় এক দিকেও চলে না, সমান বা সমান্তরাল গতিতেও চলে না। পূর্বেই বলেছি, সংস্কৃতির বিকাশ হয় চক্ররেখায়। তার কারণ এখানেই নিহিত।

ভেবে দেখলে দেখা যায়, এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে অন্তত কয়েকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে: ১. প্রথম হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান কি কি আছে সেগুলির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা। ২. তার পর বুঝতে হবে সেই উপাদান কতখানি বস্তুজগতের উপরে উঠছে না, কতগুলি চিত্তক্ষেত্র অবধি প্রসারিত হচ্ছে, আর কতগুলি অনুশীলন পর্যন্ত বিস্তারিত হচ্ছে। ৩. সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রকৃতি ও গতির বৈষম্য— বিশেষত তারা বিরোধমুখে চলেছে অথবা অন্বয়মুখে চলেছে। ৪. শেষপর্যন্ত বুঝতে হবে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক পটভূমি— তা হতেই সমস্ত সমাজেরও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা বোঝা যাবে।

২

প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায় বঙ্গসংস্কৃতি আর্যসংস্কৃতির বাইরে, এখানে আর্যসংস্কৃতি প্রসারিত হতে অনেক দেরি হয়েছিল। সেইজন্য এ দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করবার নির্দেশ ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে বাংলাদেশের প্রতি কটুভাষণও কম ছিল না। সেসব কথার অন্য অর্থ যাই থাক্, এই অর্থটা স্পষ্ট যে সাধারণ বেদবিদ্যার অনুশীলন ও আচরণ বাংলাদেশে শিকড় গাড়ে নি। এ ছিল প্রধানত শবরচণ্ডালদের দেশ, তার সভ্যতা অন্যরকম, সংস্কৃতির উপাদানও অন্যরকম। ইতিহাসের এই গহন অরণ্যে প্রবেশ করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাসের কয়েকটা বড় বড় পর্বের দিকে চোখ বুলিয়ে গেলেও

১ "Such phenomena are found only in the world of hindful human beings, functioning as meaningful personalities, who meaningfully interact with one another and create, operate, accumulate, and objectify their meanings in and through an endless number of 'material vehicles'."—Sorokin: *Social Philosophies in an Age of Crisis*, p. 104.

কয়েকটা কথা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে, এ দেশে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি কতদূর স্থাপিত হয়েছিল জানি না, কিন্তু স্থাপিত হলেও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠল এই পূর্বপ্রান্ত হতেই। বেদাচারের বিরুদ্ধে যতগুলি প্রধান প্রতিবাদ উঠেছিল— যেমন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, সেগুলি উঠেছিল এই বিহার-বাংলা অঞ্চল হতেই। তার বিস্তারও লাঢ়াভূমি (রাঢ়) ও বজ্জভূমিতে (পূর্ববঙ্গ) প্রচুর হয়েছিল এবং বহুকাল ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যখন বেদান্তধর্মের পুনরুত্থান ঘটল, তখন সে পুনরুত্থান বাংলাদেশে দেখা যায় নি। বস্তুত বাংলায় বৈদিক আচার ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন, সেইজন্য বেদজ্ঞ পঞ্চব্রাহ্মণ আমদানি করতে হয়েছিল। বস্তুত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত পুরো বৈদান্তিক অভ্যুদয় বাংলায় হয় নি। যখন হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপিত হল তখন তা হল বটে, কিন্তু নবকলেবরে হল। একদিকে দেখা দিল সব বিষয়ে বাংলার নিজস্ব রীতি— নব্যন্যায় নব্যস্মৃতি দায়ভাগ ইত্যাদি; আর অন্যদিকে প্রবলবেগে উঠল নতুন ধর্ম— শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম।

রঘুনন্দনের স্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার অনেকবার মনে হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া আর অন্য কোনো জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, উত্তরভারতের মত এখানে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রাখেন নি। জাতের পর্যায়ে শূদ্র বলে অভিহিত হওয়া অবমাননাকর, সেইজন্য যখন ১৯০১ সালের সেন্‌সাসের সময় রিজলি সাহেব জাতের খবর লিখতে প্রবৃত্ত হন সেইসময় হতেই বহু জাত শূদ্রত্ব ছেড়ে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করে আসছেন। এই নিয়ে তর্ক বিচার ও উত্তেজনা যথেষ্ট আছে। যাঁরা রঘুনন্দনের হিসেবে শূদ্রের কোঠায় পড়ে গিয়েছেন তাঁরা রঘুনন্দনের প্রতি বিদ্বিষ্ট। এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। আমার কিন্তু মনে হয়, তখন বাংলার যে সামাজিক অবস্থা ছিল তাতে রঘুনন্দনের এই ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। তখন কিছু ব্রাহ্মণ পশ্চিম থেকে এসে কিছুকাল এ দেশে বসবাস করছেন বটে, কিন্তু সমাজে তাঁদের প্রভাবের না হয়েছিল প্রসার, না ছিল গভীরতা। সমাজের বৃহত্তম অংশ নিজেদের ধারায় চলত। সেই অংশের মধ্যে নানা জাতির মিশ্রণ, নানা সংস্কৃতির ধারা, নানা লোকাচারের ধারা। এর প্রভাব এত গভীর ও বিস্তৃত নিশ্চয়ই ছিল যে, এদের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ সৃষ্টি করে বিভেদ রচনা করার দুঃসাহস রঘুনন্দনেরও সম্ভবত হয় নি। তাই তিনি ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগুলিকে একদিকে বেড়াজালে বেঁধে দিয়ে বাকি সকলকে একত্রই রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলার জনসাধারণ নিজের চালেই চলুক, গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ আপাতত বেঁচে থাক্, পরে যা হয় দেখা যাবে। এই তত্ত্বের অবশ্য আরও পাথুরে প্রমাণ চাই, তবু যেটুকু আভাস-ইঙ্গিত আমরা পাই তা হতে এ কথা মিথ্যা মনে হয় না।

অবশ্য এর চেয়ে অনেক বড় এবং দৃঢ় প্রমাণ মেলে বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বে ও আচরণে। সে সময় তখন ইসলামধর্মের প্রবল অভিঘাত এসে পড়েছে। এ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিকড় উত্তরভারতের মত অত গভীর না থাকায় বিশেষত হিন্দুসমাজের নীচের স্তরে অনেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণও করছে, সমস্ত সমাজজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ন। কিছুকাল ধরে বাংলায় যে মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা হয়েছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এ কাব্যগুলি হতেও স্পষ্ট বোঝা যায় সমাজের নীচের তলার লোকেরাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেসব কাব্যের নায়ক ব্যাধ-শবরদের দল, দেবদেবী অন্য, তারাই রাজত্ব অধিকার করে বসেছে। পরে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে এই মঙ্গলকাব্যগুলির চেহারারও বদল হল, তারাও অন্যরকম রূপ নিল। বাংলার শেষ মঙ্গলকাব্য অন্নদামঙ্গল তো সমকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ের কাহিনী— তার চিত্রের পিছনে

ছিল রানী ভবানী ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজ। কিন্তু সে কথা পরের কথা, গোড়ায় তার চেহারা অন্যরকম ছিল। তারিখ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, হয়তো কোনোটা আগে কোনোটা কিছু পরে। কিন্তু এইসব বিভিন্ন চিত্রের সমগ্র রূপটি ধরলে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হল এই যে, তখন সমাজ নাড়াচাড়া খাচ্ছে এবং হিন্দুসংস্কৃতি আত্মরক্ষা করতে পারছে না। বাস্তবিক, ব্রাহ্মণাচার ও জাতিভেদের মধ্য দিয়ে সে আত্মরক্ষা সম্ভবও ছিল না। সেইজন্য যখন বৈষ্ণবধর্ম যজ্ঞক্রিয়া তুলে দিয়ে কেবলমাত্র হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা করল, কোনো জাতের বাধা আর রইল না, এমনকি যবনকে আত্মসাৎ করতেও দ্বিধা হল না, তখনই তা এক প্রবল আন্দোলনের রূপ নিতে পেরেছিল এবং বাইরের আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাও করতে পেরেছিল। সেদিক দিয়ে বলা যেতে পারে এত বড় কালোপযোগী বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন সে যুগে আর হয় নি।

বস্তুত আজও বাংলার সংস্কৃতির পর্যালোচনা করলে এইসব ধারার প্রচুর চিহ্ন পাওয়া যায়। দক্ষিণবাংলায় বনবিবি দক্ষিণরায় মনসা শীতলা প্রভৃতি আর্যেতর দেবতার পূজা, পশ্চিমবাংলায় ধর্মরাজের পূজা, গাজনে মড়া-খেলানো প্রভৃতি আদিম জাতির অভ্যাস, আমাদের মধ্যে গোপরাজাদের বাগ্‌দিরাজাদের প্রবল প্রতাপ, এমনকি শৈবধর্মের বিস্তার ও প্রতিপত্তি, বৌদ্ধ শীল ও আচরণের ক্রমে ক্রমে তন্ত্রাচারের মধ্য দিয়ে আর্যীকরণ করবার প্রচেষ্টা, তৎসত্ত্বেও আউল-বাউল-দরবেশ-সহজিয়াদের স্বকীয় সাধনার ধারা— ইত্যাদির সামগ্রিক রূপটির কথা ভাবলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এই দেশে আর্যের সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতি ও লোকাচার কত বেশি পরিমাণে মিশে গিয়েছে। এমনকি লোকসমাজে আর্যেতর সংস্কৃতিরই প্রাধান্য, এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় নয়।

এ ছাড়া আরও একটি কথা আছে। এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি তার ভৌগোলিক সীমানা মোটামুটি মধ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গ। কিন্তু উত্তরবঙ্গ— যা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গণ্য করতে হবে— সম্পূর্ণ অন্য চেহারার। সেখানে কোচ মেচ প্রভৃতি বহু জাতির সমাবেশ, তাদের সমাজগঠন ও সংস্কৃতির ধারা অন্যরকম। সেখানে পড়েছে অহোমরাজের ছায়া, শান-মিকিরদের আক্রমণের ঢেউও কিছুটা তরঙ্গ তুলেছে এখানেও— এখানকার ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য। তা বাংলার অন্যান্য অংশের বাঁধাছকের বাইরে। বস্তুত, বাংলার ইতিহাসের এই ধারা আজও বাংলায় ছড়িয়ে আছে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে জাতিগত যে তথ্য দেওয়া আছে তা আলোচনা করলে দেখা যায় গঙ্গা ও ভাগীরথীর কূলে কূলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের প্রাধান্য, অন্তত তাঁদের বসবাস এই নদীর ধারেই বেশি। আর যত দূরে যাওয়া যায় ততই তপশীলীজাতির প্রাধান্য বেশি।

এইসমস্ত আলোচনা হতে যে কথাটা বোঝা যায় সেটা হল এই যে, বঙ্গসংস্কৃতির প্রথম উপাদান হল এখানকার স্থানীয় সংস্কৃতি— সেইটেই এখানকার সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কথা। উত্তরভারতের সঙ্গে তার একটা বড় তফাতও এইখানে। বঙ্গসংস্কৃতির কথা আলোচনা করতে গেলেই এই কথাটা সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে হবে। এ গেল প্রথম কথা।

৩

এইবার দ্বিতীয় কথার অবতারণা করি। খুব বেশি পুরোনো কালের কথায় না গিয়ে মোটামুটি একালের কথায় আসা যাক। দুটি কথা এই প্রসঙ্গে উঠে পড়ে।

২

এই দুটি কথারই মূলসূত্র হল সংস্কৃতির ঐক্য। যা তৎকালীন অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসেরও সহায়তা পেয়েছিল, শহর ও গ্রামের মধ্যে খুব বেশি বিভেদ না থাকাতেও সহায়তা পেয়েছিল। কালক্রমে পশ্চিম-বাংলায় এখন এই দুটি দিকেই ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠছে। এই কথা দুটির কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

ইংরেজ-পুর্ব পশ্চিমবাংলায় (পূর্ববাংলা ধরলে তো এ কথা আরও বেশি সত্য) দু-চারটি শহরের ঐশ্বর্যের কথা শোনা যায় বটে। মুর্শিদাবাদ শহরের ঐশ্বর্য ক্লাইভের চোখে লণ্ডনের দ্যুতিকেও ম্লান করে দিয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু এরকম শহর দু-চারটি যাই থাক্‌-না কেন, তখন সেই শহরের আলাদা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নি, যে সংস্কৃতি বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি হতে বিভিন্ন এবং যে সংস্কৃতি চিত্তের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা একটি সম্পূর্ণ নতুন কালচার-প্যাটার্ন এনেছে। তখন সংস্কৃতির বিভাগ মোটামুটি দুটি ছিল বলা যায়। কিছু ব্রাহ্মণপণ্ডিত শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকতেন বটে, কিন্তু এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ছেড়ে দিলে বাকি যে বিপুল জনসাধারণ ছিল সেই জনসাধারণের একটি নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ছিল এবং সেই সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট রূপকল্পও ছিল। রামায়ণ মহাভারত পাঠ, রামায়ণ-গান, কথকতা, আউলবাউলদের গানে সহজিয়া ধর্মতত্ত্বপ্রচার, কীর্তন, ইত্যাদি কতকগুলি রূপ ছিল। আর তখন সংস্কৃতির খণ্ডীভবন এতদূর অগ্রসর হয় নি যে, সমাজের উপরস্তর যা থেকে রসগ্রহণ করতেন তা সমাজের নীচের স্তরের পক্ষে বোধগম্য ছিল না। মোটামুটি একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল। থাকাও অস্বাভাবিক নয়, কেননা তখনও বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনেকখানি এক ছিল। ওটা না হলে ফসলের যে ক্ষতি হত সে ক্ষতি হতে ব্রহ্মত্রভোগী ব্রাহ্মণও বাদ যেতেন না, দরিদ্র চাষীও নয়।

তৎকালীন সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশের এই ধরণের একটা মোটামুটি সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেল ইংরেজ-সাম্রাজ্যের অভিঘাতে। তার দুটি বড় কারণ। একটি হল নতুন করে অন্য ধরণের শ্রেণীবিন্যাস ; দ্বিতীয় হল, নতুন করে সংস্কৃতির খণ্ডীভবন এবং শহুরে (মধ্যবিত্ত) সংস্কৃতির উদয়।

৪

শেষের কথাটি প্রথমে আলোচনা করা যাক। ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের কিছু কাল আগে হতেই আমাদের অর্থনীতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছিল, সমাজ হয়ে উঠেছিল জরাজীর্ণ। কোনোরকমে নিজের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে আত্মরক্ষা করে ছিল বটে, কিন্তু তার নিজস্ব কোনো জোর ছিল না। সেই অবস্থায় যখন পশ্চিম হতে অর্থনৈতিক বদল ছাড়াও নবজাগ্রত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবল অভিঘাত এল তখন সে অভিঘাতে সবই বদলিয়ে গেল। তা ছাড়া নতুন ব্যবসাবাণিজ্যে যেসমস্ত নতুন শ্রেণী গড়ে উঠল তাদের সংস্কৃতির ধারা ছিল নতুন, তাদের পরিবেশ ছিল অন্য। অবশ্য এক ধাপেই সে বদল হয় নি। প্রথমে এই দুই ধারার অভিঘাতে ভাঙন আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল, দেখা দিয়েছিল বর্ণসাংকর্য। শ্রীযুত বিনয় ঘোষ তাঁর নানা রচনায় এই যুগসন্ধির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। ভবানীচরণ সেকালের বাবুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কাননভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥" পূর্বাকালেও 'বাবু'রা ছিলেন বটে, তাঁদের চেহারা ছিল অন্য। এতখানি মেরুদণ্ডহীন বিলাসসর্বস্ব শহুরে বাবুশ্রেণী

আগে ছিল না। ফলে এই সস্তা রুচির বাবুর দল যে নবহুল্লোড় বাধালেন তার মধ্যে না ছিল রুচির লক্ষণ, না ছিল বিকাশের সম্ভাবনা। শ্রীযুত বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন[২] যে, আমাদের সংস্কৃতির যখন এই অবস্থা তখন তার কেন্দ্রস্থল ক্রমে স্থানান্তরিত হতে লাগল শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ হতে হুগলী-চুঁচড়া-শ্রীরামপুর হয়ে কলকাতার দিকে। তখন সংস্কৃতি-ভাগীরথীর ভগীরথ ছিল টাকা ও বাণিজ্য এবং তার লেনদেনের মালিকেরা। অর্থাৎ এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন পোর্তুগীজ, ফরাসি, ডাচ আর বৃটিশ বণিকেরা এবং তাঁদের বাঙালি দালাল গোমস্তা দেওয়ান বেনিয়ান ও মুন্‌শীরা। স্বভাবতই এর সঙ্গে এসেছিল নানা বিকৃত জিনিস, — আখড়াই, হাফ-আখড়াই, ঝুমুর ও তরজা গান, বাইনাচ ইত্যাদি। অবশেষে এর মধ্যেই নতুন কালচারের একটা কেন্দ্র স্থাপিত হল শোভাবাজারে— মহারাজা নবকৃষ্ণের ছত্রচ্ছায়ায়। তিনি হঠাৎ নতুন কিছু করেন নি। ভট্টাচার্য ও টোল, বৈষ্ণব ও আখড়া, কবিগান ও পাঁচালি— এ সবই তাঁর আশ্রয় পেয়েছিল। আর সেইসঙ্গে দেখা গেল (যেমন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আমলে) যেসব সাংস্কৃতিক রূপকল্প (যেমন কীর্তন) লোকশিক্ষার এবং লোকসংস্কৃতির বাহন ছিল, প্রবল সামাজিক অস্ত্রও ছিল, এই যুগের রূপকল্পগুলি সে চেহারা হারিয়ে নতুন পৃষ্ঠপোষকদের বৈঠকখানায় গিয়ে আশ্রয় নিল— সে কি কবি সে কি পাঁচালি। আর সেইসঙ্গে এরা ক্রমে শহরের এই নব-অভ্যুদিত শ্রেণীর কবলে পড়ে গেল, গ্রামে গ্রামে তার প্রচার ও প্রসার রইল না।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর একটা খুব গভীর ও সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল। বাংলার অর্থনৈতিক জীবন পূর্বে গ্রামাশ্রয়ী ছিল। এইসময় হতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, গ্রামসর্বস্বতার অন্ত, বড় শহর, বিশেষ করে কলকাতার অভ্যুদয়, প্রভৃতি যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল, সাংস্কৃতিক জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। তার ফলে শহরেই ঘটল নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয়। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান হল এইসব শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ। এর আরও গভীর এবং স্থায়ী ফল হল শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদ। পূর্বে বলেছি, আগের যুগে এক লোকসংস্কৃতির ধারা সমাজের বৃহৎ অংশকে আচ্ছন্ন করে ছিল। সংস্কৃতির খণ্ডীভবন (অর্থাৎ সমাজে শ্রেণীবিন্যাস) প্রবল না থাকায় ভট্টাচার্য টুলো পণ্ডিত, গ্রামের জমিদার হতে মুদী ও চাষীরা হয়তো রামায়ণ-গান বা অষ্টপ্রহর গান শুনেই সমান আনন্দ পেত। কিন্তু নবযুগের থিয়েটার বা কাব্য আর সকলকে আনন্দ পরিবেশন করতে থাকল না। তার সীমাবদ্ধতা খুব স্পষ্ট।

পরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করেছি, কিন্তু এইখানেই বলা চলে যে, এই সময় হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে একটি গভীর পরিবর্তনের ধারা চলে আসছে। সেটি হল শহরের ও গ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণ তফাত, সমাজের উপরতলা ও নীচের তলায় যোগাযোগের সম্পূর্ণ অভাব। একটু বিচার করে দেখলেই এ কথাটার তাৎপর্য বোঝা যাবে। শোভাবাজার-সংস্কৃতির যুগ পার হয়ে যখন বাংলায় সত্যই বিস্ময়কর নতুন সংস্কৃতির অভ্যুদয় হল, যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করলেন মাইকেল-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহামনীষীরা, সেই সংস্কৃতি অদ্ভুত অত্যুজ্জ্বল সংস্কৃতি বটে, কিন্তু তা সর্বসাধারণের সংস্কৃতি নয়, নব-অভ্যুদিত শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতি। একদিকে লোকসমাজ অন্ধকার হয়ে যেতে লাগল, অন্যদিকে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণী নব হতে নবতর সংস্কৃতিতে ঝলমল করতে লাগল। এই দ্বিধাবিভাগ শ্রেণীবিন্যাসেরই ফল। এইখানেই সংস্কৃতির বিচারে সমাজবিন্যাস ও শ্রেণীবিন্যাসের কথা এসে পড়ে।

---

২ কলকাতা কালচার, পৃ ১১৫

৫

আসল কথা, উনিশ শতকে বাংলায় যে নব-সংস্কৃতির সৃষ্টি হল তার প্রথম কথা হল, সেই সংস্কৃতি লোক-সংস্কৃতি ছিল না, তা ছিল নবজাগ্রত একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সংস্কৃতি। সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হল, সেকালে যে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস গড়ে উঠছিল তা এই সংস্কৃতির অত্যন্ত সহায়ক ছিল— বস্তুত ও দুটি হাত-ধরাধরি করে পাশাপাশি চলছিল বলাও অত্যুক্তি হবে না। তৃতীয়ত, কর্মের ক্ষেত্রে যেমন চিত্তের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্থনৈতিক তাগিদ ও মনের প্রেরণা এমন ভাবেই কাজ করছিল যে পূর্বের সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি ও আচার-মোহগ্রস্ত সমাজকে ভেঙে ফেলে চিত্তের স্বারাজ্য ও মনের উদার অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল। সমাজে যেমন দেখি ইংরেজদের সঙ্গে মেশা, খানাপিনা করা (ইয়ং বেঙ্গল দলের কথা কে-ই বা না জানেন— কিন্তু তা ছাড়া অন্যত্রও এসব দেখা যাচ্ছিল), বিলেত যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটছিল, অন্যদিকে তেমনি দেখি ওরিয়েণ্টালিস্টদের পরাজয়, ইংরেজিশিক্ষার প্রবর্তন, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা, সমাজে প্রচলিত কু-অভ্যাসের প্রতিবাদ ও নিরসন, সাহিত্যে মনের মুক্তি কাব্যের মুক্তি ছন্দের মুক্তি। তা না হলে মাইকেলের কাব্যের নায়ক রাম না হয়ে রাবণ হবেন, এমন কথা আগে কেই বা ভাবতে পারত? বঙ্কিমচন্দ্রই বা দেবদেবীর কাহিনী ছেড়ে মানবজীবনের সুখদুঃখ ভালোবাসা এমনকি অবৈধ প্রেম নিয়ে সাহিত্যরচনা করতে গেলেন কেন? কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত এমনকি আরও আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক অসারতা ও ভণ্ডামির উপর তীব্র কশাঘাত হানতে গেলেন কেন? এসবের পিছনে যে দুটি কথা সবচেয়ে বড় সে দুটি হচ্ছে তখন যুক্তির যুগ (Age of Reason) শুরু হয়েছে এবং সেই যুগের প্রবর্তন করছেন সে যুগের বিদ্বজ্জন বা élite.— সে যুগের অর্থনৈতিক প্রসারসম্পন্ন শিক্ষিতশ্রেণী থাকার ফলেই এই বিদ্বজ্জন-শ্রেণী গড়ে ওঠাও সম্ভব হয়েছিল।

জর্মান পণ্ডিত ম্যানহাইম এই বিদ্বজ্জনশ্রেণী গড়ে ওঠার তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যখন কোনও লিবারাল-গণতান্ত্রিক সমাজে বিদ্বজ্জনশ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু হয় তখন অন্তত প্রথম দিকে তিনটি নীতি অনুসারে বিদ্বজ্জন নির্বাচন হয়। তার প্রথমটি হল বংশ, দ্বিতীয় হল অর্থসম্পত্তি, তৃতীয় হল গুণ।[৩] অন্যান্য দেশে এই ধাপগুলি পর পর অতিক্রান্ত হতে (যদিচ এগুলির বিশুদ্ধ রূপ কোনো সমাজেই পাওয়া যায় না, সব সময়েই কিছু-না-কিছু মিশাল থাকে) অনেক সময় লেগেছে, কিন্তু আমাদের সমাজে এই বিবর্তন অনেকখানি তাড়াতাড়িই ঘটেছে। তা অবশ্য ঘটেছে আমাদের বিশেষ সামাজিক অবস্থার ফলেই, কিন্তু তা ঘটেছে। আরও ঘটেছে আমাদের অ-সম সামাজিক বিবর্তন। পর পর এক ধাপ হতে আর-এক ধাপে সমাজ

---

৩ "If one calls to mind the essential methods of selecting élites, which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished: selection on the basis of *blood, property* and *achievement.* Aristocratic society, especially after it had entrenched itself, chose its élite primarily on the blood principle. Bourgeois society gradually introduced, as a supplement, the principle of wealth, a principle which also obtained for the intellectual élite, inasmuch as education was more or less available only to the offspring of the well-to-do. It is, of course, true that the principle of achievement was combined with the two other principles in earlier periods, but it is the important contribution of modern democracy (as long as it is vigorous) that the achievement principles increasingly tends to become the criterion of social success." Mannheim: *Man and Society,* p. 89.

অতিক্রমণ করে নি, এক ধাপে থাকতে থাকতেই আর-এক ধাপ ঢুকে গিয়েছে। সে যাই হোক, আমাদের সমাজ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারা আলোচনা করলেই দেখা যাবে, প্রথম যুগে আমাদের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে বংশ ও সম্পদের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট।[৪] কিন্তু ক্রমে ক্রমে গুণই প্রধান হয়ে উঠেছে। আজকের যুগের আলোচনায় দেখা যাবে, আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, এখন বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে।

৬

এই পটভূমিকায় আজকের পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্র বিচার করতে গেলে কয়েকটি কথা বিচার করতে হবে। প্রথম কথা, সংস্কৃতির পথিকৃৎ কারা। দ্বিতীয় কথা, সংস্কৃতির পোষক কারা। বলা বাহুল্য, উভয়ে অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ। বস্তুত পোষকদেরই পরোক্ষ প্রতিফলন হলেন পথিকৃতেরা, যদিচ ব্যতিক্রম আছে এবং অবশ্যই থাকবে, কেননা প্রতিভা শেষপর্যন্ত কোনো বাঁধন মেনে চলে না।

পোষক-সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যেখানে জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র সাক্ষর, বাকী সবাই নিরক্ষর, সেখানে পোষকশ্রেণী নিতান্তই সীমাবদ্ধ এ কথা স্বীকার করতেই হবে। যদি লোকসংস্কৃতির ধারাটি অব্যাহত থাকত এবং যুগোপযুক্তভাবে পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হতে পারত তা হলেও কিছু কথা ছিল। কিন্তু, পূর্বেই বলেছি, তা হয় নি। সে ধারা পঙ্কিলতায় রুদ্ধস্রোত হয়ে গিয়েছে। তার উপর পশ্চিম বা দক্ষিণ বাংলায় তার ধারা যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে অন্যান্য জায়গায়, যেখানে সেই সাংস্কৃতিক ধারা তেমন বিকশিত হয় নি, সেখানে তো কোনো কথাই নেই। সোরোকিনের যে কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম: এদের অনুভবের ক্ষমতাই নেই, অনুশীলন করবে কি করে? মোট কথা, এদিকটায় প্রায় অন্ধকার। আমাদের পরমসৌভাগ্যে এই মাটিতে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার উদয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর অপূর্ব কাব্যের রসাস্বাদন করবার মত মানসিক উপকরণ এইসমস্ত রুদ্ধস্রোত চিত্তক্ষেত্রে ক'জন মানুষের আছে? এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। সেইজন্য উনিশ শতকে যে ধারাটির গোড়াপত্তন হয়েছিল, অর্থাৎ অন্য সবাইকে প্রায় বাদ দিয়ে এক অত্যুজ্জ্বল মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আজও কিছুটা বদল হওয়া সত্ত্বেও সেই ধারাই মোটামুটি বজায় রয়েছে।

ঠিক এই অবস্থা সংস্কৃতির পথিকৃৎদের মধ্যেও। আজ পশ্চিমবাংলার শ্রেণীবিভাগ করলে মোটামুটি এই কয়টি শ্রেণী পাওয়া যাবে: ১. শহরে— তার মধ্যে (ক) ব্যবসায়ী (খ) নানা ধরণের মধ্যবিত্ত, চাকুরিয়া, স্কুলকলেজের ছাত্র ইত্যাদি (গ) তলার শ্রেণী, শ্রমিক মজুর ইত্যাদি। ২. গ্রামে— তার মধ্যে (ক) ভূমি-আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত (খ) বৃত্তিজীবী, কিছুটা ভূমির সঙ্গেও জড়িত (গ) চাষী মজুর শ্রেণী। সাংস্কৃতিক উপকরণের দিক হতে এই শ্রেণীগুলির পুনর্বিন্যাস করলে দেখা যাবে, কি শহর কি গ্রাম কোথাও চাষী-মজুর-শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষাই বহু ক্ষেত্রে নেই, আধুনিক অর্থে সাংস্কৃতিক উপকরণও নেই। শহুরে ব্যবসায়ীরা অন্য শ্রেণীর মানুষ, তাঁদের কারবার লক্ষ্মীর সঙ্গে বেশি, সরস্বতীর সঙ্গে তেমন নেই। কাজেই শেষপর্যন্ত সংস্কৃতির পথিকৃৎদের শ্রেণীবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রায় সকলেই এসেছেন শহর বা গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে।

---

৪ দ্র' শ্রীযুত বিনয় ঘোষ লিখিত "বাংলার বিদ্বৎসমাজ" প্রবন্ধ: "চতুরঙ্গ", কার্তিক ১৩৬২ এবং বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩।

বস্তুত এ কথা অস্বাভাবিকও নয়। জগতের ইতিহাসেই দেখা যায়, বিদ্বজ্জন নির্বাচনের প্রথম যুগ কেটে যাবার পর, অর্থাৎ বংশগত ও সম্পত্তিগত প্রভাব কেটে যাবার পর, যখন গণতন্ত্র প্রসারিত হতে থাকে তখন গণতন্ত্র (এমনকি সত্যকারের গণতন্ত্র হলেও) সকলের জন্য হলেও সংস্কৃতির পথিকৃৎদের উদ্ভব হয় সাধারণত মধ্যবিত্ত সমাজ হতেই। এটি মধ্যবিত্তসমাজের জগৎজোড়া অধিকার বললেও চলে। আর যখন অর্থনৈতিক সংকট আসে, গণতান্ত্রিক সংকটও দেখা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজ ভাঙে, তখন সংস্কৃতির সংকটও দেখা দেয়।

একালে এইরকম সংকট বহু দেশেই দেখা দিয়েছে। তারই তত্ত্ব আলোচনা করে ম্যানহাইম কতকগুলি মূলসূত্র নির্দেশ করেছেন। সেগুলি উল্লেখের যোগ্য। তিনি বলছেন, যুক্তির যুগের আরম্ভে যদি গণতন্ত্র প্রসরণশীল হয় এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে, যার ফলে সকল শ্রেণীরই আশা থাকে যে সে তার পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে পারবে, সেই অবস্থায় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীই যে ভালোভাবে গড়ে ওঠে তাই নয়, সমাজে যুক্তিবাদী (rational) এবং খামখেয়ালীদের দ্বন্দ্বে (irrational) যুক্তিবাদীদেরই জয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি দেশে বুদ্ধিবাদী ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করলে এই কথাটাই প্রমাণিত হয়। তখন সমাজের মধ্যে প্রগতিতে বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল, ভবিষ্যতে আস্থা ছিল। কিন্তু কাল যত বিবর্তিত হয় ততই এ অবস্থা কেটে যায়। যুক্তিবাদ তখনই বলবৎ থাকতে পারে যদি সমাজ প্রয়োজনমত বদলায় এবং যে অর্থনৈতিক ও মানসিক পরিবর্তন হতে থাকে সমাজও সেই অনুসারে চেহারা বদলায়। সমাজ যদি তা না বদলায় তখনই সংঘাত বাধে এবং যৌক্তিকতার বদলে অযৌক্তিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজে অগ্ন্যুৎপাত দেখা দেয়। সমাজ প্রয়োজনমত বদলাবে এই আস্থা না থাকলে সমাজে খামখেয়ালি প্রবল হয়ে উঠবে এ কথা তো খুবই স্বাভাবিক।

আজকের কালে সারা জগতে তো বটে, পশ্চিমবাংলাতেও যে কতকগুলি ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে প্রথম হল মূলধনের পুঞ্জীভবন। সমাজের উৎপাদনশক্তি মাত্র কিছু লোকের হাতে। তার উপর আজ উৎপাদনপদ্ধতি আর সহজ সরল নেই, তা সুদূরপ্রসারী ও অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই যাঁদের হাতে উৎপাদন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তাঁরা যে মূলধনের প্রভাবেই প্রতিপত্তিশালী তা নয়, তাঁরা সমাজের বিন্যাস বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সামাজিক শক্তিও নিয়ন্ত্রণ করছেন। শক্তির এই সংহতি আর নিয়ন্ত্রণ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও বিকাশের সহায়ক নয়। কেননা এই জটিলতার মধ্যে সাধারণ লোক দিশাহারা— তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ দূরে থাক্ তারা চিন্তাশক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে না।[৫] তার

৫ "The fact that in a functionally nationalized society the thinking out of a complex series of actions is confined to a few organizers, assures these men of a key position in society. A few people can see things more and more clearly over an ever-widening field, while the average men's capacity for rational judgment steadily declines once he has turned over to the organizer the responsibility for making decisions. In modern society not only is the ownership of the means of production concentrated in fewer hands, but . . . there are far fewer positions from which the major structural connections between different activities can be perceived, and fewer men can reach these vantage points. This is a state of affairs which has led to the growing distance between the élite and the masses . . . The average person surrenders part of his own cultural individuality with every new act of integration into a functionally rationalized complex of activities.. Mannheim: op. cit., p. 58.

ফলে একদিকে দেখা যায় সংস্কৃতির সংকীর্ণতা ও সংকট, অন্যদিকে দেখা যায় সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বৃহৎ হতে বৃহত্তর জনসংখ্যার অংশ গ্রহণে অক্ষমতা।

সংস্কৃতির পক্ষে এ অবস্থা যে মোটেই সহায়ক নয় সে কথা তো বলাই বাহুল্য, বরং বলতে হয় রীতিমত ক্ষতিকর। কেননা, সমাজ কখনও চুপ করে বসে থাকে না, ঠিক পথে না হলে সে বেঠিক পথেই এগিয়ে চলবে। বাস্তবিক, তা চলছেও। আজকালকার যুগে প্রায় প্রত্যেক সমাজেই মোটামুটি দুটো জিনিস ঘটছে। একটি হল, সমাজের এখন স্বাভাবিক টানই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলা। শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, যাকে ম্যাক্স শীলার বলেছেন 'অনুভূতি গণতন্ত্র' (democracy of emotions) সেদিকেও। অনুভূতিসামান্য চাই। বস্তুত দেখা গেছে যে যুগে অনুভূতিসামান্য যত খর্ব হয়েছে অনুভূতি-খণ্ডতর সংকীর্ণতর হয়ে উঠেছে সে যুগে ব্যঙ্গরচনা বৈহাসিক কবিতা হয়তো সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোনো মহৎ সৃষ্টি হয় নি, সংস্কৃতির মহৎ যুগ দেখা যায় নি। এরই সঙ্গে সমাজে আর-একটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেটি হল সমাজে পারস্পরিক নির্ভরতা। সুদূর ডাণ্ডীতে পাটকল চলবে কি না তা নির্ভর করত পূর্ববঙ্গের পাটচাষীর উপর। উৎপাদন-ব্যবস্থা এতই জটিল ও সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে।

সমাজ যখন আপন গতিবেগে এই দুটি শক্তি সৃষ্টি করে চলেছে তখন সমাজের কাঠামোও যদি ঠিক সেইভাবে আপনাআপনি পরিবর্তন হতে থাকত তা হলে সংস্কৃতির উত্তরোত্তর বিকাশ সহজ হত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটছে না বলেই সংস্কৃতিতে সংকট দেখা দিয়েছে। একদিকে গণতন্ত্রের দিকে টান, যার দিকে সমাজ অনিবার্যগতিতে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে মূলধন শক্তি ও সংস্কৃতির পুঞ্জীভবন এবং জনগণের অসহায়তা— এ অবস্থায় সাংস্কৃতিক সংকট না ঘটাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এর নাম দিয়েছেন ম্যানহাইম গণতন্ত্রের প্রসার নয়, গণতন্ত্রের উলটো অভিব্যক্তি— negative democratization। তার ফলে জনসাধারণ কাজের আসরে এসে পড়তে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু তাদের না থাকে চিন্তার শক্তি, চিত্তের বিকাশ বা সংস্কৃতির ধারা। তার ফলে সৃষ্টি হয় না, গোলমাল বাড়ে, সংকট তীব্রতর হতে থাকে।

যখন এইরকম উলটো পাকে গণতন্ত্র চলতে থাকে তখন কয়েকটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। প্রথমে ঘটে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সংখ্যাবৃদ্ধি। প্রথমে বহু লোক আসতে আরম্ভ করে, তাতে প্রথমটায় যে সুফল পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কিছুকাল গত হলেই দেখা যায়, বৈচিত্র্যের বদলে নানা ধরণের হালকা জিনিস ও ভাসা ভাসা ভঙ্গিসর্বস্বতা দেখা দিতে আরম্ভ করে। তখনই দেখা দেয় দ্বিতীয় স্তর। তখন গুণের চেয়ে সংখ্যা বেশি হয়ে পড়ে, মহৎ সৃষ্টির পরিবর্তে দেখা দেয় ভঙ্গিসর্বস্বতা, নতুন নতুন চটকের চেষ্টা। তার ফলে সংস্কৃতি দিক হারায়, সত্যিকারের রুচিবোধ গড়ে উঠতে পারে না। এ যুগে গুণগত উৎকর্ষই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। কিন্তু সেই গুণ ফুটবার আগেই যদি কেউ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে প্রবেশ লাভ করেন তা হলে সংস্কৃতিসৃষ্টির গোড়ার উপকরণেরই অভাব ঘটতে থাকে। সবশেষ স্তরে দেখা যায় সংস্কৃতির চূর্ণীভবন। তখন সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটি ভেঙে-চুরে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী প্রবল হয়ে ওঠে (বাংলায় তা দেখা যাচ্ছে), এবং সামগ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে নানা স্থানীয় সংস্কৃতি ধর্মবিশ্বাস ও দলীয় ঐতিহ্য প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইসব লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কি?

এ কথা অবশ্য সত্য যে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি, বিশেষতঃ সাহিত্য, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের হতাশা

কাটিয়ে উঠে নতুন পথে যাত্রা করতে শুরু করেছে। কাব্যে জীবনস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে, নতুন প্রত্যয়েরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে, নতুন নতুন (এবং সার্থক) পরীক্ষাও দেখা যাচ্ছে। গল্প-উপন্যাসেও আমাদের কৃতিত্ব কম নয়। এসব সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে সমাজের সামগ্রিক বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের সাংস্কৃতিক সংকট এখনও গভীর। সেই সংকট কাটবে না যতক্ষণ না সংকটের কারণ দূরীভূত হবে। সমাজের কোন্ অবস্থায় সাংস্কৃতিক সংকট ঘনীভূত হয় তার যে আলোচনা উপরে করেছি সেই অনুসারে বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের সমাজ যত ভাঙবে, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী যত ভাঙবে, অযৌক্তিকতা ও অসুস্থতাবোধ যত বাড়বে সাংস্কৃতিক সংকট ততই বাড়বে। বিশেষত আরও মনে রাখতে হবে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সংস্কৃতিই গোটা বাংলার সংস্কৃতি বলে মনে করা হচ্ছে, তা চিরকাল চলতে পারে না। কালক্রমে গণতন্ত্রের উলটো পাক যখন ক্রমাগত এই বন্ধ দরজায় ঘা দিতে থাকবে তখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও ভাঙন আরও গোলমাল দেখা দেবে। তা হতে উদ্ধার মিলবে যদি গণতন্ত্রকে উলটো পাকে ঘুরতে না দেওয়া হয়। সেই সংকটের মোচন চিত্তের উদারতম ও বিস্তৃততম স্বারাজ্যে, বুদ্ধির উদার অনুশীলনে— যাতে যত সম্ভব বেশি জনসংখ্যা অংশগ্রহণ করে, অনুভব করে, অনুশীলন করে— কেবলমাত্র গোষ্ঠীবিশেষ নয়। ম্যানহাইমের কথা দিয়ে শেষ করি : "পূর্বকালের সমাজে যৌক্তিকতার অনুশীলন সকলে না করলেও চলত কারণ সে সমাজের কাঠামোই ছিল সেইরকম। কিন্তু আজকের সমাজেও যদি তাই চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সমাজই চলবে না।"[৬]

---

৬ "Societies which existed in earlier epochs could afford a certain disproportion in the distribution of rationality and moral power, because they were themselves based on precisely this social disproportion between rational and moral elements ... In modern society, neither the general lack of rationality and morality in the control of the total process, nor their unequal distribution will allow it to go on." Mannheim : Op. cit., p. 44.

কাব্যে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

আবু সয়ীদ আইয়ুব-দত্ত

সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ তার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন— যা মনের সঙ্গে বিশ্বের 'সাহিত্য' অর্থাৎ সম্মিলন ঘটায়। যোগাযোগ অবশ্য দুই প্রকারের হতে পারে। মানুষকে জৈবধর্ম পালন করতে হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত, আহার সংগ্রহ করতে হয় তাকে জলমাটি থেকে, সূর্যের আলো ও উত্তাপ থেকে। অন্য দিকে আত্মরক্ষার তাগিদেই তাকে সমাজ গড়তে হয়েছে; অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি শিক্ষা ও পালন করতে হয়েছে। একক মানুষ প্রাকৃত শক্তির কাছে নতশির, বহু মানুষের সঙ্গে কর্মে যুক্ত না হলে সে মাথা তুলে বাঁচতেই পারে না। এই প্রকারের সমস্ত যোগসূত্র কিন্তু গরজের যোগ, উদ্দেশ্য তার আত্মরক্ষা ও পুষ্টি। কিন্তু তা ছাড়াও মানুষ নিজেকে মেলে দিতে চায় নিজের বাইরে, বা বাহিরকে ধরতে চায় তার হৃদয়পুটে— কোনো গরজে নয়, অকারণ আনন্দে ও প্রেমে। প্রথমটাকে বলেছি আত্মরক্ষা ও পুষ্টির গরজ, দ্বিতীয়টাকে বলতে পারি আত্মপ্রসার ও প্রকাশের আনন্দ। সাহিত্য যে-সংযোগ ঘটায় তা এই দ্বিতীয় প্রকারের; ব্যক্তিসত্তার বেড়া ভেঙে রসিকচিত্ত সেখানে সর্বতোগামী, সর্বতোগ্রাহী, সর্বানুরাগী।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, আর মিলনের সেতু নয়, বিচ্ছেদের প্রাচীর হয়ে উঠেছে ইদানীং। কবিতার বাহন অবশ্য ভাষা, কিন্তু ভাষার দ্বারা যোগ এবং বিয়োগ দুইই সম্ভব। ভাষা যদি হয় স্বচ্ছ কাচের মত দৃষ্টিভেদ্য, তবেই ওপারের আলো নিয়ে আসতে পারে, মনকে প্রসারিত করতে পারে বিশ্বের অসীমতায়। "বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অধিকারভুক্ত করতে।"— এই ইচ্ছার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিকর্মকে যুক্ত করেছিলেন। আধুনিক কাব্যস্রষ্টা ও কাব্যতাত্ত্বিকের কাছে কবিকর্মের লক্ষ্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। প্রায় সত্তর বছর আগে মালার্মে অনুজ সহধুরীদের যে উদ্ধৃতিমলিন উপদেশ দিয়েছিলেন—"one makes poetry with words, not with ideas" (শব্দ দিয়ে কাব্য রচনা করতে হয়, ভাব দিয়ে নয়)— তারই মধ্যে এই লক্ষ্যান্তরের পথনির্দেশ ছিল বোধ করি। শব্দকেই কবিতার মূল তন্মাত্র এবং ভাবকে বাহ্য জ্ঞান করার ফল হল এই যে, কাব্য-সৃষ্টিতে শব্দযোজনা কেবল ধ্বনির দিকেই লক্ষ্য রেখে হতে লাগল, কবিতার ভাষারও যে একটা বোধগম্য অর্থ থাকা আবশ্যক এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে কবিদের বিদ্রোহ ক্রমাগত প্রবলতর হয়ে উঠল।

আলংকারিকদের ভাষায় বলতে গেলে কাব্যের দুই প্রকার অর্থের কথা বলা যায়— বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ। বাচ্যার্থ সাদাসিধেভাবে অর্থ বলতে যা বোঝায় তাই। ব্যঙ্গ্যার্থ বলতে কী বোঝায় সেটা স্পষ্ট করে বলা খুব সহজ নয়, এবং এই ব্যঙ্গ্যার্থেই কাব্যের প্রাণ। সেকেলে অর্থাৎ মালার্মে-পূর্ববর্তী কাব্যে বাচ্যার্থ তো থাকতই, তদুপরি থাকত ব্যঙ্গ্যার্থ; গদ্যের চেয়ে অর্থবল বেশি বই কম ছিল না কবিতার। আজ শুনছি অর্থের বোঝা পারাপার করতে আছে গদ্যরূপী গাধাবোট; কবিতার ময়ূরপঙ্খী-নায়ে যে-শৌখিন ভাষা ভেসে বেড়ায় তার সঙ্গে অর্থের আসবাবপত্র থাকলে নৌকাসুদ্ধ ভরাডুবি হবে।

এলিয়ট বলেছিলেন, কাব্যের বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থটা ছেঁটে ফেললে ক্ষতি নেই কারণ তার কাজ সামান্যই, পাঠকের প্রহরীচিত্তের সামনে ফেলে দেওয়া এক টুকরো মাংসের চেয়ে বেশি নয়। ঐ প্রহরীটিকে একটা কিছু দিয়ে ভুলিয়ে তবেই কবিতা ঢুকতে পারে অন্তঃপুরে। এটা ত্রিশ বছর আগের কথা। দশ বছর আগে আধুনিক সাহিত্যের আর-এক জন কর্ণধার, জ্যাঁ পোল সার্ত্র্, ঘোষণা করলেন যে কাব্যের পক্ষে অর্থমাত্রই অনর্থকারী। গদ্যের ভাষা স্বচ্ছ কাচের মত, নিজেকে দৃষ্টিগোচর না করে আমাদের দৃষ্টিকে এগিয়ে দেয় ওপারের বস্তুগুলির দিকে। কবিতার ভাষা কিন্তু নিজেকেই চোখের সামনে তুলে ধরে, দৃষ্টিকে আটকে রাখে, অন্য কিছুকে দেখানোর গরজ নেই তার। আমরা কখনও কখনও ফুলকেও তো ভাষার মত ব্যবহার করে থাকি, গোলাপকে প্রেমের সংকেত বানিয়ে তুলি, পদ্মকে পূজার, ইত্যাদি। কিন্তু যখন তা করি তখন ফুলের গন্ধ বর্ণ কোমলতা মসৃণতাকে আর গ্রাহ্য করি না, আমাদের লক্ষ্য ফুলের বাস্তবিকতাকে স্বচ্ছন্দে ভেদ করে (অর্থাৎ তাকে সংকেতরূপে গণ্য বা নগণ্য করে) চলে যায় সংকেতচিহ্নিত বস্তু বা গুণের দিকে। সেটা কিন্তু ফুলের পক্ষে স্বধর্মচ্যুতি, ফুলের স্রষ্টার দিক থেকে তার প্রতি অবিচার। তেমনি কবিতার ভাষাকে যদি অর্থবাহী করে ফেলি, অন্য যে-কোনো বিষয় বা বস্তুর সংকেতরূপে ব্যবহার করি, তবে তারও ধর্মহানি হয়, পাঠকের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় তার স্বকীয়, স্বয়ম্ভর, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ সত্তা। কাব্যপদসমূহের শ্রুতিময়তা ও চিত্রলতাই সার্ত্র্-এর মতে তার সবটুকু, তার প্রথম ও শেষ সার্থকতা। কবিতা কান দিয়ে শুনবার জিনিস, কল্পনার চোখে দেখবার জিনিস— বোঝবার জিনিস নয়। মোট কথা, আগের দিনের কবিরা তাঁদের ভাষাকে অর্থব্যঞ্জনাঘন ও ইঙ্গিতময় করে তুলতে যত সচেষ্ট ছিলেন আজকের অনেক কবিই তাঁদের রসাত্মক বাক্যকে অর্থরিক্ত, অর্থাৎ বাক্য নয়, সংকেত নয়, বস্তুমাত্রে পরিণত করতে ততোধিক যত্নশীল।

কথাটা একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে কি? কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যে আমি অত্যন্ত বাড়িয়ে বলছি, এমন-কি বানিয়েই বলছি হয়তো। সার্ত্র্ লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক এবং কৃতার্থ সাহিত্যিক, তাই তাঁর জবানীতেই কাব্যবিষয়ে অধুনা-প্রচলিত মতটি উপস্থাপিত করেছিলাম। তবু প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে বড় প্রমাণ নেই, সুতরাং দু-একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করা দরকার। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ-দুটির রচনাকালে প্রায় সত্তর বছরের ব্যবধান; কাব্যসাহিত্যে যে-আধুনিকতার ধারা এ-প্রবন্ধের আলোচ্য, প্রথম উদাহরণটিকে তার সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থল ও দ্বিতীয়টিকে তার শোচনীয় পরিণাম ভাবা যেতে পারে।

sonnet

Her pure nails very high dedicating their onyx,
Anguish, this midnight, upholds, the lampbearer,
Many vesperal dreams by the Phenix burnt
That are not gathered up in the funeral urn

On the credences, in the empty room: no ptyx,
Abolished bibelot of sounding inanity

(For the Master is gone to draw tears from styx
With this sole object which Nothingness honours.)

But near the window void Northwards, a gold
Dies down composing perhaps a decor
Of unicorns kicking sparks at a nixey,

She, nude and defunct in the mirror, while yet,
In the oblivion closed by the frame there appears
Of scintillations at once the septet.

Stephane Mallarmé

hot rod

vellum list fell dole
packed pendulum red roar
esteem wet spindle
auricular thy lung
scut thews cold selvage
out angular out out odd
yet not.

little war

geometric my alkahest
migrant fists passion vale
flash high o paraclete
all violet vast
eyelashes entelechy
stone water-swords
white shock.

Herbert Read

মালার্মের সনেট বিষয়ে বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন ফরাসী সমালোচক শার্ল্ মোরঁ বলছেন যে এর মূল প্রেরণা ছিল কতকগুলো অসম্ভব মিলের সমাবেশ ঘটিয়ে একটি অসাধ্য সাধন করে দেখানো। মিল, অনুপ্রাস, তরল ও কঠিন ব্যঞ্জনবর্ণ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের সুচারু বিন্যাস ইত্যাদি নানাবিধ কালোয়াতি করতে গিয়ে কবিতাটির অর্থগ্রহের পথ প্রায় বন্ধ করে ফেলা হয়েছে বটে, তবু, মোরঁ বলছেন, "the words themselves, rare and chiselled, suffice to give the poem the air of a jewel in gold and agate." মালার্মে মহৎ কবি বলেই সুবিদিত এবং কয়েকটি স্বচ্ছ মহৎ কবিতা যে তিনি লিখেছেন তাতে আমারও সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের শূন্যবাদী নন্দনতত্ত্বের গোলকধাঁধায় দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতিভাজাত কবিকর্মকে কষ্টার্জিত কারিগরিতে পরিণত করে উক্তরূপ জড়োয়া গয়না গড়ে নিজের ও পাঠকের চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাতে আপত্তি নেই। আমার আপত্তি তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা চিত্তবিনোদন ও রসোপলব্ধিতে ভেদ রাখেন নি, সুচতুর শব্দের খেলাকে সুমহৎ কাব্যকলা বলে ভুল করলেন এবং ভ্রান্ত কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হলেন।

পরবর্তী কবিতাদুটি মার্চ ১৯৫৯ সংখ্যা Encounterএ প্রকাশিত হার্বার্ট রীডের কবিতাগুচ্ছ থেকে নেওয়া। এগুলি একেবারেই অর্থশূন্য ধ্বনিবিন্যাসমাত্র, বা কোনো গূঢ় ব্যঙ্গ্যার্থবাহী, কিংবা আধুনিক কবিদের

চূড়ান্ত আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করেই লেখা— সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলতে আমি ভরসা পাচ্ছি না। আন্দাজ করছি যে এরা তৃতীয় অর্থাৎ প্যারডি শ্রেণীভুক্তই হবে। কিন্তু কবি স্বয়ং কিংবা তাঁর কোনো ভক্ত পাঠক যদি দাবি করে বসেন যে এগুলি সৎকাব্য, গভীর রসের উপাদান তাতে রয়েছে, তা হলেও খুব আশ্চর্য হব না। ব্যক্তিগত আলোচনা-প্রসঙ্গে দুজন শীর্ষস্থানীয় আধুনিক বাঙালী কবির অভিমত জানবার সুযোগ হয়েছে আমার। বুদ্ধদেব বসু বললেন, রাঁডের এই কবিতাগুলি চতুর প্যারডি ছাড়া আর কিছু নয়; বিষ্ণু দের মতে ভালো হোক মন্দ হোক এগুলি তন্নিষ্ঠ (serious) কবিতা, ঠাট্টা করে লেখা নয়। আমরা আনাড়ি পাঠকেরা বুঝতে পারলাম আধুনিক কাব্য এমন-এক পরম দশায় এসে ঠেকেছে যেখানে সদসৎ ভেদজ্ঞান মায়া বলেই প্রতিপন্ন হয়। এলিয়ট যাঁকে বলেছেন বর্তমান কালের কাব্যসাহিত্যের অবিসংবাদিত প্রতীক সেই ভালেরী স্বয়ং বিশ্বাস করতেন যে কবিতায় অর্থ কেন, শব্দও তেমন গুরুতর নয়: "Refrain for as long as possible from emphasising words; so far there are no words, only syllables and rhythms"। এর পরে পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন না যে ফরাসী দেশে এমন কবিও আছেন যাঁরা বাক্য বা শব্দের ধার ধারেন না, কেবলমাত্র স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিচিত্র বিন্যাসে কাব্যরচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর মতে বোদলেয়র চেয়েছিলেন "যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি"। পরবর্তীদের অভিলাষ আরও অগ্রসর হল— যা কিছু বাস্তব তা থেকে কবিতার সম্পর্কচ্ছেদ। জাক মারিতঁ্যার ভাষায় "Modern poetry endeavours to extenuate, if possible to abolish, the intermediary signification, *this definite set of things* whose presence is due to the sovereignty of the logical requirements of the social signs of language, and which is, as it were, a kind of wall of separation between the poetic intuition and the unconceptualisable flash of reality to which it points".[১] এবং যেহেতু কি গদ্য কি পদ্য কোনো ভাষারই এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই যে জাগতিক বস্তুসমূহকে হেলায় অতিক্রম করে বাস্তবাতীত সত্তার (যদি তেমন কিছু থাকেও) উপলব্ধি পাঠকের চিত্তে ফুটিয়ে তুলতে পারে (মনে রাখা ভালো যে প্রকৃত মিস্টিকমাত্রেই নির্গুণ পরব্রহ্মকে বর্ণনাতীত বচনাতীত ইত্যাদি বলে ঘোষণা করেছেন), তখন অগত্যা কবিতার ভাষা বস্তুজগৎকে অন্ত্যজ করতে গিয়ে সর্বপ্রকার অর্থ সুদ্ধ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়, ফলে হয়ে ওঠে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির অর্থহীন শ্রুতিমধুর বিন্যাস— অন্তত সেই চেষ্টাতেই "কবিতার মুক্তি" খোঁজেন আধুনিকতর কবিরা।

স্বীকার করছি যে বিশুদ্ধ ধ্বনির শক্তিও কিছু কম নয়, তা দিয়েও মহৎ শিল্পরচনা সম্ভব। কিন্তু সে শিল্প কবিতা নয়, সংগীত। তাতে সাতটি সুর, একাধিক স্বরগ্রাম, ধ্বনির তারতম্য, মীড় ও মূর্চ্ছনা, তালমান-লয়ের বিচিত্র খেলা— সবই থাকা চাই। একটি কবিতা পড়লে বা শুনলে তো এসবের কিছুই পাওয়া যায় না, তদুপরি কবিতার মূলৈশ্বর্য যে অর্থ-ব্যঞ্জনা তাও যদি ঘুলিয়ে যায় তবে থাকে কী? চিত্রময়তা অবশ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে কল্পচিত্র অর্থাৎ কলমে আঁকা চিত্র কি কখনও তুলি দিয়ে আঁকা চিত্রের মত

১ *Creative Intuition in Art and Poetry*, p. 214.

বর্ণাঢ্য বা সূক্ষ্মরেখ হতে পারে? পঠিত কাব্য কণ্ঠসংগীত বা যন্ত্রসংগীতের তুলনায় অতীব ক্ষীণবল— যদি তাকে অন্যায়ভাবে বিশুদ্ধ সংগীতের আদর্শেই বিচার করি। তেমনি চিত্রের আদর্শে বিচার করলে ভাষার চিত্র তুলির চিত্রের সঙ্গে কোনো মতেই তুলনীয় নয়। অর্থঘন ইঙ্গিতময় বাক্য একটি অতুলনীয় বলশালী শিল্পোপকরণ। যেসব কবি এবং কাব্যবিচারক বাক্যনির্ভর শিল্পকে কেবল ধ্বনির বিন্যাসে এবং চিত্রের সমাবেশে পরিণত করতে তৎপর তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন এর পরিণাম কী হবে? কবিতার ন্যায় মহৎ শিল্পকলাকে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ভিন্নজাতীয় দুটি শিল্পের অক্ষম অনুকরণের পথে জোর করে নিয়ে যাওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রয়াস আমার কাছে খুব শ্রদ্ধেয় ঠেকে না। কবির ভাষা অবশ্যই সুরেলা ও চিত্রল হবে, এর গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। আমার বক্তব্য এই যে কবিতার সুর ও চিত্র সংকেতরূপেই মূল্যবান, বস্তুরূপে নয়। অর্থাৎ এসবই তার সম্যক অর্থ-ব্যঞ্জনার সহায়, প্রতিকল্প (substitute) হতে পারে না, অন্তরায় হলেও বিপদ।

কিন্তু কেন? কবিতার ভাষাকে এমন একান্ত প্রযত্নে অনচ্ছ ও অনধিগম্য বস্তুতে পরিণত করে বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলন নয়, বিচ্ছেদ ঘটাতে আজকের কবিরা এমন দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন কেন? তার কারণ নিশ্চয়ই জটিল ও বহুব্যাপ্ত, এক নয় একাধিক হেতুসমবায়ের কার্যস্বরূপ এমনটা ঘটেছে। তবু তার মধ্যে যে কারণটা আমার কাছে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য মনে হয় সেটা এই। আসল কথা হচ্ছে যে জগৎব্যাপারটাই আধুনিক সাহিত্যকর্মী, শুধু সাহিত্যকর্মী কেন ভাবুকমাত্রের চোখে বড় বিশ্রী, বড় ক্লিন্ন ও কলুষিত, ন্যক্কারজনক ও ধিক্কারের পাত্র হয়ে উঠেছে। তাই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের ভাষা দিয়ে 'সাহিত্য' নয় ব্যবধানই সৃষ্টি করতে চান, বাইরের অধম সৃষ্টিকে তাঁদের উত্তম সৃষ্টির যবনিকার আড়ালে রাখতে ইচ্ছুক। ভাবখানা অনেকটা এই যে দেখতে হলে এই যবনিকার নিখুঁত কারুকর্মটাকে দেখ, তার ওপারে যা কিছু আছে তা যে দেখবার যোগ্যই নয়।

প্রৌঢ় বয়সেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ বলতে পেরেছিলেন যে যদিও "things which I have seen I can now see no more," তবু

> I love the brooks which down their channels fret
> Even more than when I tripped lightly as they;
> The innocent brightness of a new-born day
> Is lovely yet.

অপর পক্ষে স্বল্পবয়সেই মালার্মে ঘোষণা করলেন যে সমুদ্র, আকাশ সবই তাঁর কাছে ঘৃণ্য (And I, I detest the beautiful blue), এবং তরুণতর কবিদের উপদেশ দিলেন:

> Exclude if you begin
> The real as being base,
> Its too sharp sense will
> Overscrawl your vague literature.

আরও পূর্বে বোদ্‌লেয়রের "বিষাদ পরিণত হয়েছিল বিতৃষ্ণায়— শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি"[২]। নারীকে তিনি জ্ঞান করতেন "জৈবতার প্রতীক" এবং "প্রোজ্জ্বল ক্লেদ"। প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর বিতৃষ্ণা আরও প্রগাঢ়। একটি কবিতায় লিখছেন :

তোকে ঘৃণা করি, সিন্ধু ! যত তোর লম্ফ, চেঁচামেচি,
খুঁজে পাই আমার আত্মার তলে। যে-তিক্ত উল্লাস
অপমানে ক্রন্দনে নিবিড় হয়ে বলে, 'হেরে গেছি'—
সে-বিরাট অট্টহাসি ফিরে দেয় তোর জলোচ্ছ্বাস।

কত সুখী হবো আমি, যদি চেনা ভাষায় প্রকট
নক্ষত্র কিরণে, রাত্রি, লুপ্ত ক'রে দিস একেবারে !
কেননা আমি যে খুঁজি কালো আর নগ্ন শূন্যতারে !

—বুদ্ধদেব বসু -কৃত অনুবাদ

দু-একজনের কথা নয়, আধুনিক কাব্যের বহু দিকপালই মনঃক্ষোভী ও রুদ্ধকপাট। সাম্প্রতিক জার্মান সাহিত্যের সবচেয়ে চমকপ্রদ কবি বোধ করি গটফ্রীড বেন। তাঁর একজন তরুণ বাঙালী গুণগ্রাহী লিখছেন : "গটফ্রীড বেনের কবিতা এমন-এক পরমতার সন্ধান করেছে যেখানে ঘটনা ও ঘটনার অর্থহীনতা লুপ্ত হবে, স্মৃতির ও ইন্দ্রিয়ের নির্ভরগুলি ধ্বসে পড়বে ; কবিতা তখন কৈবল্যের সারাৎসারে নিমজ্জিত হয়ে, সৃষ্টির পূর্বে অনন্তশয়ান দেবতার মত, শুধু আপনাকে ধ্যান করবে। তাঁর মতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ছিন্ন হয়েছে, মানুষ এবং পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে, এখন পরম নেতিবাদেই শুধু আস্থা স্থাপন করা সম্ভব ; শুধু সম্ভব নয়, সেটাই উচিত বিশ্বাস।"[৩]

বলা হয়ে থাকে সাহিত্যের উপজীব্য সাহিত্যিকের হৃদয়াবেগ এবং কল্পনা ; সত্য কথা অর্থাৎ প্রকৃতি বিষয়ে সমাজ বিষয়ে যথার্থ কথা যদি শুনতে চাই তবে বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বা সাংবাদিকের কাছে যেতে হবে আমাদের। কথাটা মিথ্যা নয়, তবে সত্যের যতটুকু অংশ থাকলে পুরো সত্য বলে ভ্রম হতে পারে ততটুকুই সত্য। প্রথমত হৃদয়াবেগের প্রসঙ্গটাই ধরা যাক। হৃদয়াবেগ মনের এমন-একটি ব্যাপার যা শূন্যমার্গে ঝুলে থাকতে পারে না ; কোনো কিছুকে অবলম্বন করেই কবির মনে বা পাঠকের মনে আবেগ জাগে। ভাষান্তরে বলা যায় যে আবেগ— সুখদুঃখ রাগদ্বেষ বিস্ময়বিরক্তি— এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাশ্রয়ী মানসিক ঘটনা বা অবস্থা নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার আমেজ বা বর্ণচ্ছটা মাত্র। যথা, প্রিয়জনের বিরহেই দুঃখের অনুভব হয়, নক্ষত্রখচিত আকাশের পানে চেয়েই বিস্ময় জাগে আমাদের মনে, ইত্যাদি। এটা মেনে নিলেও কিন্তু কথা উঠতে পারে যে আমাদের হৃদয়াবেগসমূহের উৎপত্তিস্থল বা আশ্রয়ভূমি একটা-কিছু থাকলেও সেটা-যে কোনো জাগতিক ব্যাপার বা বাস্তব ঘটনাই হবে এমন তো নয়।

কথাসাহিত্যে এবং কাব্যসাহিত্যেও যেসব ঘটনার নরনারীর নগর-গ্রাম-নদী-পর্বতের উল্লেখ থাকে সেগুলি প্রায় সর্বদাই সাহিত্যিকের কল্পনা-প্রসূত। তবে কল্পনার বস্তুগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয় যে

২ বুদ্ধদেব বসু। কবিতা, চৈত্র ১৩৬৫, পৃ. ২০৩

৩ জ্যোতির্ময় দত্ত। কবিতা, চৈত্র ১৩৬৪, পৃ. ১৫২

পড়লে প্রত্যয় জন্মায়, সত্যিই বুঝি এমনটাই ঘটেছিল ; গল্পের পাত্রপাত্রীরা আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে ওঠে আমাদের মানসপটে। সত্যপ্রতিম তবু সত্য নয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বা ইতিহাসের সত্য নয়। কিন্তু একেবারেই কি কপোলকল্পনা, মিথ্যা, মতিভ্রম বা মনের খেলামাত্র? আসল প্রশ্ন হচ্ছে সেই কবিরচিত কল্পলোকের উৎপত্তি বা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। এসব কাল্পনিক বস্তু ও ঘটনার বিন্যাস কি আপন খামখেয়ালে করেন সাহিত্যরচয়িতা, কিংবা পাঠকের মনোরঞ্জনার্থে? ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্রের কথা হচ্ছে না এখানে। আমার বিশ্বাস, অন্তত মহৎ সাহিত্যে কল্পনার গতি দিবাস্বপ্নের মত লক্ষ্যবিহীন ও বিশৃঙ্খল নয়, সম্পূর্ণরূপে কবির আজ্ঞাবহ ; এবং সে আজ্ঞা তাঁর কোনো নিগূঢ় উপলব্ধি থেকেই সঞ্জাত। এই উপলব্ধি শব্দমাত্রের, তৎসংশ্লিষ্ট ধ্বনি ও চিত্রকল্পমাত্রের উপলব্ধি নয়। এ যাবৎ আমরা তো জানতাম সৎকাব্যে একটি সত্যদৃষ্টি নিহিত থাকে, সমাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কোনো খাঁটি কথা কবি বলেন যা শাশ্বত সত্য অথচ বিজ্ঞানীর চোখে কিংবা ছকে যা ধরা পড়ে না, পড়বার নয়। সে সত্য কবির এবং পাঠকের ব্যক্তিস্বরূপ-নিরপেক্ষ সত্য না হলেও সত্যই, নিছক কল্পনার জালবোনা নয়। "রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে", বলছেন রবীন্দ্রনাথ ; কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে তথ্যসমূহকে "অধিকার" করেই রসসৃষ্টি সম্ভব, অস্বীকার করে নয়। বরঞ্চ তথ্যের স্বীকরণ বা আত্মীকরণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যের মূল উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন।

শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয় "বিশ্বসৃষ্টিতে কবি আপন অনুভূতির প্রতীককে খুঁজে বেড়ায়"— এ কথা রবীন্দ্রনাথ মানতেন, কিন্তু বোদ্‌লেয়র, মালার্মে, ভালেরী, র‍্যাঁবো, সার্ত্র্‌, বেন, মোরঁ, রিচার্ডস্‌ ও তাঁদের গোষ্ঠী মানতে নারাজ। কাব্যের উপরিতল ছাড়িয়ে তার অন্তস্তলেও কোনো গূঢ় সত্যোপলব্ধির সন্ধান তাঁরা পান না, দিতে চান না। তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস সত্যের একচেটিয়া স্বত্বাধিকারী বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কাজের কথা বলে, নানারূপ সুবিধা ঘটায় আমাদের জীবনে— অতএব বিজ্ঞানমেব জয়তে। এই সুবিধাবাদী বা প্র্যাগম্যাটিক সত্যের অত্যধিক মূল্য আছে উক্ত মনীষীদের জীবনে। এত অধিক যে, বিজ্ঞানবহির্ভূত কোনো সত্য আদৌ মানেন না এঁরা, তার জন্য কোনো শ্রদ্ধা বা আকূতি নেই এঁদের মনে, কোনো সহিষ্ণুতা পর্যন্ত আছে কি না সন্দেহ। কেমন করে থাকবে? সত্য মানে তো বাস্তব জগতেরই বিশেষ একটি স্বরূপ বা পরম রূপ উদ্‌ঘাটন, আর বাস্তব জগতের প্রতি যে এঁদের বিতৃষ্ণা অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কবি ও কাব্যতত্ত্বকারদের মতের দিক থেকে যতটা গরমিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বৈপরীত্য মনের গড়নের দিক দিয়ে ; হৃদয়াবেগের প্রতিন্যাসের দিক দিয়ে। সে-বৈপরীত্য মূলত আস্তিক ও নাস্তিক হৃদয়মনের। ভগবান মানা না-মানার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি জগৎব্যাপারের প্রতি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মনোভঙ্গির কথা: একদিকে বিস্ময় অনুরাগ আগ্রহ ও আনন্দ ; অন্যদিকে অনীহা বিরক্তি প্রত্যাখ্যান ও তিক্ততার কথা। আমার বিশ্বাস সৎকাব্য আস্তিক মনেরই সৃষ্টি, আত্মরতি নয় বিশ্বরতির মধ্যে তার উৎস। 'বিশ্বপ্রেম' কথাটা আজকে হয়তো অনেকের কানে ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে। শোনাক। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে বাস্তব জগৎকে ঘৃণা করে, অস্বীকার করে বা পরিহাস করে কি সত্যিকার মহৎ কাব্যরচনা সম্ভব? সম্ভব হয়েছে কি? কবি প্রেমিক এবং পাগলকে যাঁরা এক পংক্তিতে ফেলেছিলেন তাঁরা কবি আর প্রেমিককে

ঠাট্টা করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা কবি এবং প্রেমিক সত্যই একাত্ম; দুজনেরই চরম লক্ষ্য "সাহিত্য"। বয়ঃসন্ধিকালীন চপল অনুরাগে নয়, পরিণত মোহমুক্ত সম্যকদৃষ্টি ও বলিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ঝড়ঝাপটায় পরিস্নাত যে প্রেম তার মধ্যেই অবশ্য প্রেমিক ও কবির সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক কবিরা জগৎচরাচরের মধ্যে তাঁদের ভালোবাসার যোগ্য একটি বস্তু, মাত্র একটি বস্তু অবশ্য খুঁজে পেয়েছেন; সেটি হচ্ছে শব্দ। অর্থবান বা ইঙ্গিতময় শব্দ নয়, বস্তুধর্মী শব্দ— যে-শব্দের গাঁথুনি সব-কিছুকে আড়াল করে দিয়ে আমাদের মনের দরজা-জানালাগুলিকে রুদ্ধ করে দিয়ে প্রকাশ করে শুধু নিজের চমৎকারত্বই! সার্ত্র্ বলছেন, "nor do they [the poets] dream of naming the world, and this being the case they name nothing at all, for naming implies a perpetual sacrifice of the name to the object named."[8] তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত বিশ্বের চেয়ে একটি শব্দ গরীয়ান; "its sonority, its masculine or feminine endings, its visual aspect compose for him a face of flesh," আর ঐ মুখটি আধুনিক কবির কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও দামী। ঐ মুখের পানে চেয়ে এবং পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে যে ধরণের কবিতা লেখা হয়ে থাকে তার নমুনা আগে দিয়েছি। পাশ্চাত্য বিশেষত ফরাসী সিম্বলিস্ট ও স্যুর্-রিয়ালিস্ট কাব্য থেকে আরও এবং উজ্জ্বলতর অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করা যায়। আধুনিক বাংলা কবিতাও যে এদিক দিয়ে আমাদের হতাশ করবে এমন নয়।

উপসংহারে আবারও বলতে চাই-যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোদ্‌লেয়র ও তৎপরবর্তী "আধুনিক" পশ্চিমী এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত বাঙালী কবিদের তফাত মূলত ভঙ্গির নয়, ভাষার নয়, অভিজ্ঞতারও ততটা নয়, যতটা অভিজ্ঞাতার মন ও হৃদয়ের। এক কথায় তাকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মনের তফাত বলেছি। আধুনিক সাহিত্যে অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন একজন শ্রদ্ধেয় সমালোচক লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রমানস খণ্ডিত, sense of evil-এর অভাব তাঁকে পৃথিবীর মহত্তম কবিদের সমকক্ষ হতে দেয় নি— মালার্মেও যে-মহত্তম কবিদের অন্যতম বলে ঐ প্রবন্ধকারের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সমীক্ষায়, অশুভবোধের অভাব নয়, অপ্রাচুর্য হয়তো আছে। পক্ষান্তরে বোদ্‌লেয়র, মালার্মে, র‍্যাঁবো, ভালেরী, গটফ্রীড বেন -গোষ্ঠীর কবিমানস কি আরও খণ্ডিত, প্রায় বিকারগ্রস্ত নয় বিপরীত কারণে— বীভৎস রসের আতিশয্যে? বলিষ্ঠ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন কবিতার অভাব নেই রবীন্দ্ররচনাবলীতে; আমি কেবল দুটি কবিতার উল্লেখ করতে চাই এখানে। "শ্যামা" গীতিনাট্যের ভিতর দিয়ে যে-জগৎটাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সেটা কি রোমান্টিকতার রঙীন চশমা-পরা চোখে দেখা জগৎ, অথবা সৃষ্টির রূঢ় বীভৎস দিকটা কি আড়াল হয়েছে তাঁর চোখের? তবু চোখ এবং মন ফিরিয়ে নেন নি তিনি, গুটিয়ে ফেলেন নি নিজের উদ্বেলিত ব্যক্তিস্বরূপকে তাঁর আহত রুদ্ধ অহংবোধের মধ্যে। "পত্রপুট" গ্রন্থের তিন নম্বর কবিতাটি সকলের জানা আছে, তার গোড়াতেই কবি বলছেন:

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।

---

৪ *What is Literature*, p. 5.

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত করো তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ করো সুধা
বাম হাতে চূর্ণ করো পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত করো অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য করো বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে করো দুর্মূল্য,
কৃপা করো না কৃপাপাত্রকে।

এ কবিতার 'পৃথিবী' কেবল জড়প্রকৃতির প্রতিভূ নয়, ইতিহাসব্যাপী মনোপ্রকৃতির প্রতীকও বটে। এই "ললিতে কঠোরে বিপরীত" প্রাকৃতিক ও মানবিক সত্তাকে ইন্দ্রিয়ে হৃদয়ে মনে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শুধু "ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের শেষ প্রণতি" নয়, আজীবন কবিকর্মের মধ্যে তারই বেদীতলে প্রণাম নিবেদন করে গেছেন তিনি। তাঁর অতুলনীয় কলাকৌশল এই পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তার মুখের উপর বন্ধ করে দেওয়া রঙীন অনচ্ছ কাচের কপাট নয়— তারই "সাহিত্য" লাভের উপায়। সেকেলে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং শাশ্বত কালের, আধুনিক নন। আমার বিশ্বাস অর্ধ-শতাব্দী-জোড়া "আধুনিকতা"র কুয়াশা কেটে যাবে আজকের কবির মন ও ভাষা থেকে, কেটে যাচ্ছে।

"আধুনিকতা" কথাটা অবশ্য আমি একটু সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করেছি এখানে— যে-অর্থে আধুনিকতার তিনটি মূলনীতি ছিল বাস্তবজগতের প্রতি বিতৃষ্ণা, শব্দের প্রতি অত্যন্ত মোহ এবং শব্দার্থের প্রতি প্রায় নির্বাসনদণ্ড। আধুনিক কাব্যসাহিত্যের এটা লক্ষণবিশেষ, দুর্লক্ষণও বটে, কিন্তু একালের সব কবিই যে এ দুর্লক্ষণদুষ্ট এমন নয়। হপকিন্‌স্‌, রিলকে, ইয়েট্‌স্‌, এলিয়ট, পাস্টের্নাক প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ্য। ভাষার ওপারে এমন-কোনো সত্তার অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাসী যাকে শ্রদ্ধা ও প্রেমে গ্রহণ করতে পারেন তাঁরা। তাই তাঁদের কবিতার ভাষা অনচ্ছ কাচের শার্সি নয়, সেই বাস্তবেরই স্বচ্ছ প্রতীক। প্রাঞ্জলতা না থাক্‌, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যবর্তী যবনিকাটাকে সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা নেই এঁদের রচনায়। বরঞ্চ যবনিকা ভেদ করতেই তাঁদের কাব্যকৌশল ও শব্দবিন্যাস আত্মবিলোপী। আত্মবিলোপ সব ভাষারই শ্রেষ্ঠ গুণ, কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে। ভাষা, কবিতার ভাষাও, মূলত এবং ধর্মত সংকেত। কবিতার ভাষার পক্ষেও সংকেত-ধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম অর্থাৎ বস্তুধর্ম গ্রহণ করতে যাওয়া ভয়াবহ। বিজ্ঞানের ভাষাও সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় ; কাব্যের ভাষাও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্পর্করহিত হতে পারে না। আমার মতে জ্ঞানের ভাষার সঙ্গে রসের ভাষার প্রভেদ বিস্তর, তবে সেটা মাত্রাগত, গুণগত নয়। কবি এবং জ্ঞানী বিপক্ষ নন, বিজাতীয় নন ; কর্মক্ষেত্র তাঁদের ভিন্ন হলেও তাঁরা সহকর্মী। কিন্তু এ-প্রসঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যক, এখানে তার স্থানাভাব।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কলিকাতা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবে পঠিত।

বিধবাবিবাহ ও বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সনের ২৭ শ্রাবণ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ৩১ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে এই বিবাহ প্রসঙ্গে লেখেন :

"ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব-মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে, আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক ; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।"

বিধবাবিবাহের প্রবর্তন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তাঁর জীবনের কত বড় মহৎ কর্ম বলে মনে করতেন, তা এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, এই সংস্কারকর্ম তাঁর জীবনের 'সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম', এর জন্য তিনি 'সর্ব্বস্বান্ত' হয়েছেন, এবং আবশ্যক হলে 'প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ' নন। তিনি বলেছেন, 'আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক'। এ কথার গুরুত্ব আছে। বিধবাবিবাহের প্রবর্তক তিনি ঠিকই, কিন্তু এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক সংস্কারকর্মের আবশ্যকতা তিনি কি অকস্মাৎ একদিন অনুভব করেছিলেন? নিশ্চয় তা করেন নি। প্রচলিত সামাজিক প্রথা বা দেশাচারের গতানুগতিক ধারা পরিবর্তনের ইচ্ছা বা সংকল্প, সমাজের কোনো ব্যক্তির (individual) বা গোষ্ঠীর (group) মনে অকস্মাৎ একদিন উদিত হয় না। প্রথমে ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে পুরাতন সমাজে নানাদিক থেকে ভাঙন ও পরিবর্তনের সূচনা হয়। তার পর নূতন সামাজিক পরিবেষ্টনে নূতন নূতন ব্যক্তির গোষ্ঠীর ও 'ইনস্টিটিউশনে'র বিকাশ হতে থাকে। পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্বের মধ্যে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনেকটা অস্থির হয়ে থাকে। সমাজে তখন নূতন নূতন অভাব আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের উদ্ভব হয়, এবং পুরাতনের সঙ্গে তার অনিবার্য সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে সন্ধিক্ষণের সমাজ ধীরে ধীরে তার স্থৈর্য ফিরে পেয়ে আত্মস্থ হয়। কার্ল ম্যানহাইম এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

"How do new things break through the 'cake of custom'? The familiar

reference to the genius is not sufficient. To repeat, one need not ignore the role of leading individuals to consider the psychology of the pioneer secondary to the sociological question of what situations provoke new collective expectations and individual discoveries. The answer is almost implied in the question : Innovations arise either from a shift in the collective situation or from a changing relationship between groups or between individuals and their groups. It is such shifts which father new adaptation, new assimilative efforts and new creations."— *Essays on the Sociology of Culture*, pp. 84-85.

বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজের সমষ্টিরূপের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। রামমোহন ও তাঁর 'আত্মীয়-সভা', ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ (ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর তত্ত্ববোধিনী-সভা ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি নূতন সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাবে ও আদর্শ-সংগ্রামে সমাজমানসে নূতন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশ হতে থাকে। পরোক্ষে, এবং প্রত্যক্ষভাবেও, বিদ্যাসাগর এইসব সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং এই নূতন 'collective situation' থেকেই তিনি তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্মের' প্রেরণা পেয়েছিলেন। 'আত্মীয়-সভার' বৈঠকে, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর আলোচনাসভায় ও মুখপত্রে, উনিশ শতকের তিরিশে ও চল্লিশে বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়। তিরিশের শেষে ভারতীয় ল কমিশন (Indian Law Commission) শিশুহত্যা (Infanticide) -নিবারণের উদ্দেশ্যে এ দেশের মেয়েদের অকালবৈধব্যের সঙ্গে জড়িত নানাবিধ সামাজিক সমস্যার বিচার-বিবেচনা করেন, এবং বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনতঃ প্রবর্তন করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে আইনজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইংরেজ বিচারক ও আইনজ্ঞরা তখন অবশ্য বিধবাবিবাহ-আইন পাস করার বিরুদ্ধেই মত দেন। চল্লিশে এ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে রীতিমত আলোচনা হতে থাকে। পঞ্চাশের মাঝামাঝি বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৫৫ জানুয়ারি মাসে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না'—এই নামে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং অক্টোবর মাসে তিনি ভারত-সরকারের কাছে বিধবাবিবাহের আইন প্রবর্তনের জন্য আবেদন করেন। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই, নূতন সামাজিক পরিবেশে, বিধবাবিবাহ একটি সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল, এবং সেই সমস্যাটিকেই বিদ্যাসাগর ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। অকস্মাৎ একদিন তাঁর মনে বিধবাবিবাহ সমস্যারূপে দেখা দেয় নি, অথবা তা বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তন করার বাসনা জাগে নি।

ভারত-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগর তাঁর আবেদনপত্র পেশ করার পর, গ্রান্ট সাহেব যখন একটি খসড়া আইনসহ ব্যবস্থাপক-সভায় আলোচনার জন্য বিষয়টি উত্থাপন করেন, তখন ভারতের সকল অঞ্চলের লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের ঢেউ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আবেদনপত্র ভারত-সরকারের কাছে পৌঁছয়। এইসব পত্রের মধ্যে বিধবাবিবাহের

বিপক্ষের আবেদনই বেশি। কিন্তু তা হলেও ভিঞ্চুরের মারাঠা-নায়ক এবং সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহের পক্ষে স্পষ্টভাষায় তাঁদের আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। ভিঞ্চুরের মারাঠা-নায়ক তাঁর আবেদনপত্রে লেখেন :

"...It seems unnecessary for us to enter into details connected with the proposed Enactment. We merely wish to express our cordial approval of the principle on which the proposal is based, and to solicit that the Legislature will remove any bar, which may exist in the eye of the Law, to the remarriage of the Hindoo Widows."

Vinchoor

12th January 1856.

পুণার অধিবাসীরা ৪৬ জনের স্বাক্ষরসহ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি আবেদনপত্র পাঠান :

"We understand that there is a movement in Bengal headed by the enlightened portion of the Hindoo Community, which has for its object the removal of all legal objections to the remarriage of Hindoo Widows. Such a laudable movement cannot but be seconded by those who take a real interest in the welfare of India. We are far from thinking what the removal of legal disabilities will be followed by the immediate abolition of a practice, which not only entails innumerable hardships and misery on hundreds and thousands of innocent but unfortunate females, but lies at the very bottom of many of the existing social evils, and to much of the crime which at present has to be deplored. That which bears the stamp of ancient custom can only be eradicated from the Hindoo mind by the steps which are being taken in every direction, to diffuse knowledge to explore erroneous ideas, and thus undoubtedly to effect a gradual reformation in the state of Hindoo Society..."

সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও হিন্দুরা তাঁদের আবেদনপত্রে লেখেন :

"That we fully concurring in the spirit and letter of the Petition and Draft submitted by certain Hindoo Inhabitants of Bengal for legalising the marriage of Hindoo Widows, beg leave to submit a copy thereof, and to second this prayer."

বিধবাবিবাহের বিপক্ষেও এইসব অঞ্চল থেকে অনেক আবেদনপত্র এসেছিল। পক্ষের ও বিপক্ষের এই আবেদনপত্রগুলি পাঠ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলন কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে প্রায় একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকের সমাজ-

[illegible]

Rusic Krishna Mullick

Kissory Chand Mittra

Radhanath Sickdhar

Obhoy Churn Mullick

[illegible] C. Mookerjea

Peary Chand Mittra

Gooroodoss Chatterjea

Mudhoosoodun Bhuttacharjya

Hurry Churn Ghose

Bromonath Sen

Gopee Kissen Mitter

Hurrochunder Dutt

Mahendra Nath Roy

Hurry [illegible] Mullick

Jodoo Nauth Saha

ইয়ং বেঙ্গল দলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির আবেদন পত্রের স্বাক্ষর॥ সপক্ষে

শ্রীশ্রীদুর্গা

১

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
সমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভট্টপল্লী বংশবাটী কলিকাতা প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ি পণ্ডিতদিগের বিনীত বিনয়পুরঃসর সমাবেদনমিদং। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্যসম্প্রদায়ের কতিপয় যুবক সহযোগে আপনকারদিগের সমীপে প্রার্থনা করাতে আপনারা হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইনের যে সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে মনোযোগ করিতে আজ্ঞা হউক।

প্রথমতঃ হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ বেদস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

বেদ যথা

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে, যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ইতি।

স্মৃতি যথা মনু

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ১৫১

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ ১৫৭

আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥ ১৫৮

আবেদনপত্র

further delay than the necessary forms of your Honorable Council require.

That your petitioners have good reason to believe that the proposed Act if passed, will be hailed with joy in every part of the Empire as a powerful means towards the amelioration of the social condition of Hindoos, and as one of the greatest blessings conferred on the Country by the British Government.

And your Petitioners as in duty bound shall ever pray

Calcutta }

Kamaukhonauth Chatterjea

Rykissen Mookerjea

Dewarkanauth Bose

Shibchunder Dut

Degumber Mitter

Ahoy bhurn Bose

শ্রী রামনারায়ণ তর্করত্ন

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে

সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও হিন্দুদের বিধবাবিবাহের
আবেদনপত্রের স্বাক্ষর। সপক্ষে

To
W. Morgan Esqre.
Clerk to the Legislative Council of India
Fort William

Sir,

I, on behalf of the individuals that have signed the accompanying petition, beg leave to request the favor of your submitting it before the Council at their next weekly meeting.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedt. servant
Rajnarain Bose

Midnapore, 29th March 1856.

রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রেরিত আবেদনপত্র। সপক্ষে

[illegible]

উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের আবেদনপত্র। বিপক্ষে

সংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনই মনে হয় প্রথম সর্বভারতীয় সামাজিক আন্দোলন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দাক্ষিণাত্যে, প্রায় বাংলাদেশের মতই, বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। মনে হয়, বাংলাদেশের বাইরে দাক্ষিণাত্যই এই আন্দোলনের প্রধান ঝটিকাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। আবেদনপত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও, বাংলাদেশের পণ্ডিতদের মত, দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ জনসমাজেও বাদী ও প্রতিবাদী দুই দলের সৃষ্টি হয়েছিল। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যেসব আবেদনপত্র পাঠান তার মূল প্রতিপাদ্য এই :

দক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সময় শাসকরা দেশবাসীর কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁরা আমাদের হিন্দুধর্মের প্রচলিত ধ্যানধারণায় ও আচার-বিচারপ্রথায় কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না। আমাদের ধর্ম ও সমাজ ভালো কি মন্দ তা আমরাই বিচার করব, এবং কিছু সংস্কার করার প্রয়োজন হলে আমাদের দেশের লোকেরাই তা করবে। সমাজসংস্কারের সঙ্গে ধর্মসংস্কারও যখন অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, তখন বিদেশী শাসকরা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে অন্যায় করবেন, কারণ তাতে অন্যের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করা হবে। হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রথাবিরুদ্ধ ও আচারবিরুদ্ধ। কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে এতকালের একটি প্রথাকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আইনের বলে বলীয়ান হয়ে যাঁরা হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ দিতে উৎসাহিত হয়েছেন, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে বিবাহিতা হয়ে বিধবারা স্বামীপুত্র লাভ করলেও, কোনো কালেই সামাজিক মর্যাদা লাভ করবেন না।

বাংলাদেশ থেকেও প্রতিবাদপত্র অনেক পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় ৩৭ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ রাধাকান্ত দেবের পত্রখানি বিখ্যাত। এই পত্রখানি ছাড়াও নদীয়া-ত্রিবেণী-ভাটপাড়া-বাঁশবেড়িয়া-কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু প্রতিবাদপত্র ভারত-সরকারের কাছে পাঠানো হয়। তার মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পত্রখানি এখানে আংশিক উদ্ধৃত করছি :

"মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
সমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

"নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভট্টপল্লী বংশবাটী কলিকাতা প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ি পণ্ডিতদিগের বিহিত বিনয়পুরঃসর সমাবেদনমিদং। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্য সম্প্রদায়ের কতিপয় যুবক সহযোগে আপনকারদিগের সমীপে প্রার্থনা করাতে আপনারা হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক আইনের যে সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে মনোযোগ করিতে আজ্ঞা হউক।

"প্রথমতঃ হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ বেদস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।…

"দ্বিতীয়তঃ বিশিষ্ট হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ এ দেশের আচার-বিরুদ্ধ।…

"তৃতীয়তঃ বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন হইলে হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে উত্তরাধিকারী হইবার যেরূপ শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রচলিত আছে তাহাতে বহুতর ব্যতিক্রম হইবে…

"চতুর্থতঃ বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন করিয়া বিধবাগর্ভজ পুত্রকে উত্তরাধিকারিমধ্যে গণ্য করিলে এ দেশের মধ্যে অনেকের বংশলোপ হইবার সম্ভাবনা…

"পঞ্চমতঃ বিধবাবিবাহের আইন হইলে অনেক স্ত্রীর স্বধর্ম্মে মতি সত্ত্বেও অর্থলোভি সপিণ্ডাদির ষড়যন্ত্রে ধর্ম্মহানি হইবার সম্ভাবনা…

"ষষ্ঠতঃ আপনারা প্রজাদিগের হিতার্থ ঐ আইন সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু উপরিলিখিত কয়েকপ্রকরণ পাঠ করিলে অবশ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে যে ইহাতে হিত না হইয়া প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মতঃ ও অর্থতঃ অহিতই হইবে।…

"…আমরা যে আপনাদিগকে উপদেশ করি অথবা আপনাদের অভিপ্রায়ে ব্যাঘাত জন্মাই এতাদৃশ যোগ্যতা আমাদের নাই, পিতামাতার নিকটে বালকে যদ্রূপ প্রার্থনা করে তদ্রূপেই নিবেদন করিতেছি… আমরা কেবল ধর্ম্মদ্রোহ সম্ভাবনা দেখিয়াই এই আবেদনপত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি আপনারা বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন প্রচারে ক্ষান্ত হউন, আমরা নিয়তই আপনাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং করিব ইতি।"

প্রতিবাদীদের অন্যান্য আবেদনপত্রগুলি পাঠ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে এ ছাড়া আর অন্য কোনো যুক্তির অবতারণা করা হয়নি। তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ; বিধবাবিবাহের প্রচলন হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে বংশলোপের সম্ভাবনা আছে এবং পারিবারিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। বিধবাবিবাহের ফলে হিন্দুরা যে কেবল ধর্মচ্যুত ও আচারভ্রষ্ট হবে তাই নয়, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিধবাবিবাহের সপক্ষে প্রায় একহাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিদ্যাসাগরের নিজের আবেদনপত্র ছাড়াও, বাংলাদেশের নানাস্থান থেকে আরও অনেক আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি :

১. ২৬ জনের স্বাক্ষরসহ কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, কালীচরণ লাহিড়ী, ব্রজনাথ মুখার্জি, দুর্গাচরণ সেন, উমেশচন্দ্র শর্মা মৈত্র প্রভৃতির আবেদনপত্র।

২. ১২৯ জনের স্বাক্ষরসহ কৃষ্ণনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যক্তিদের আবেদনপত্র।

৩. কলিকাতা মিশনারি সম্মিলনের আবেদনপত্র।

৪. প্রায় ৩:৬ জনের স্বাক্ষরসহ বারাসত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যক্তিদের আবেদনপত্র।

৫. প্রায় ৬৮৫ জনের স্বাক্ষরসহ শিবচন্দ্র দেব, জীবনবরণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, অভয়চরণ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভবনাথ সেন, দীননাথ দাস প্রভৃতির আবেদনপত্র।

৬. প্রায় ৫৩১ জনের স্বাক্ষরসহ শান্তিপুরের জমিদার তালুকদার গোঁসাই ও অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিদের আবেদনপত্র।

৭. মুর্শিদাবাদের সার্কেল-পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আবেদনপত্র।

৮. মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ বসু ও অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিদের আবেদনপত্র।

৯. বাঁকুড়া ও বর্ধমানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র।
১০. বারাসত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আর-একটি আবেনপত্র।
১১. প্রায় ৩৭৫ জনের স্বাক্ষরসহ ইয়ংবেঙ্গল দলের আবেদনপত্র।
১২. চট্টগ্রামের হিন্দুদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র।

এই পত্রগুলি দেখে মনে হয়, কলকাতা শহরের পরেই বারাসত-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। মেদিনীপুর বর্ধমান মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও আন্দোলন কম হয় নি। বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার সমাজে এঁরাই ছিলেন সমাজপতি, সেইজন্য এঁদের সমর্থন সাধারণের মনে যথেষ্ট নৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গল দলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলের প্রধান মুখপাত্ররা বিধবাবিবাহের প্রস্তাবিত আইনটি সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থাপক-সভায় আবেদন করেছিলেন। আইনটি কেন সংশোধন করা প্রয়োজন সে কথা উল্লেখ করে তাঁরা লিখেছিলেন :

"It does not lay down what shall constitute valid widow marriage. Such definition appears to be absolutely necessary, since widow marriage, when it comes to pass, will be a new fact in the Hindu Social System, and it may be naturally expected that different men will employ different modes of solemnizing it, and also it may be apprehended that such marriages will often be disputed in a Court of Justice.

বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হলেও যদি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী তা অনুষ্ঠিত না হয়, তা হলে যে যেভাবে খুশি বিবাহ করবে, এবং তার ফলে সমাজে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে কোন্ বিবাহ সংগত এবং কোন্‌টি সংগত নয়, তা আদালতের পক্ষে বিচার করাও সহজ হবে না। সেইজন্য ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্ররা দুটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রস্তাব করেছিলেন :

"DECLARATION 'A'

"I...widower or bachelor, and I...widow or spinster, do hereby jointly and severally declare that of our own free will and accord, we have solemnized our marriage with each other on this day of...

Witness our hands etc. The above declaration was made in the presence of...

"AGREEMENT 'B'

"I...having taken...as my wedded wife on this day, do hereby bind myself not to contract a second marriage during her life-time, and in breach of this engagement on my part, to pay to her the sum of Company's Rupees...on the date of any second marriage."

বিবাহের পর ছয় মাসের মধ্যে এই চুক্তিপত্র দুটি রেজিস্ট্রি করতে হবে, এবং পাত্র-পাত্রী উভয়েই এই চুক্তির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। বিবাহিত জীবনে যতদিন তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরাগী ও বিশ্বাসী থাকবেন, ততদিন চুক্তি বলবৎ থাকবে, বিশ্বাস-ভঙ্গের কারণ ঘটলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

ইয়ং বেঙ্গল দলের এই আবেদনপত্রের তারিখ ১৮৫৬, ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে দেখা যায়, ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে কৈলাসচন্দ্র দত্ত, ৪৪ জন লোকের স্বাক্ষরসহ, বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি আবেদনপত্র পাঠান। কোনো সরকারি কর্মচারীর সামনে বিবাহ রেজিস্ট্রি করা না হলে সেই বিবাহ আইনসংগত বলে গণ্য হবে না, এই মর্মে একটি নূতন 'ধারা' (clause) বিধবাবিবাহ-আইনে যোগ করার কথা তাঁরা আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন—"for the insertion of a Marriage Registration Clause, under which marriage of Hindoo Widows in whatsoever manner performed, will be held valid provided they are Registered by the contracting parties before public officials appointed by the Government for the purpose."[1]

ইয়ং বেঙ্গল দল ও অন্যান্য যাঁরা বিধবাবিবাহ-আইন সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সামাজিক দৃষ্টি আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁরা এই আইনের মধ্য দিয়ে একটি বিবাহ-রেজিস্ট্রেশনের আইন পাস করাতে চেয়েছিলেন। আরও ষোল বছর পরে, কেশবচন্দ্র সেনের আমলে, ১৮৭২ সালে, Civil Marriage Act III পাস করা হয়েছিল। ব্রাহ্মবিবাহের জন্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মরাই আন্দোলন করে এই আইন পাস করিয়েছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগে দেখা যায়, বিধবাবিবাহ-আইনের আন্দোলনের সময় ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্ররা আইনটিকে 'সিভিল ম্যারেজে'র অনুরূপ একটি আইনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। "'বি' চুক্তিপত্রে" তাঁরা বিধবাবিবাহকারী পুরুষদের বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে ক্ষতিপূরণের কথা উল্লেখ করেছেন। বিবাহিতা নারীও যে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারেন, এ-প্রশ্ন সেদিন তাঁদের মনে জাগে নি, কারণ তখনকার সমাজে নারীর কোনো স্বাধীনতা ছিল না। সমস্যাটা পুরুষদের দিক থেকেই ছিল, এবং বহুবিবাহপ্রথার অত্যধিক প্রচলনের জন্য সমস্যাটি সত্যই সেদিন জটিল হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা চিন্তা করেছিলেন, এবং তা আইনসংগত-ভাবে প্রচলিত করার জন্য সর্বস্বপণ করে সংগ্রামও করেছিলেন। মানবতাবোধই ছিল তাঁর জীবনের এই 'শ্রেষ্ঠ সৎকর্মের' প্রধান উৎস। কিন্তু তিনি তাঁর গভীর মানবতাবোধের সঙ্গে বাস্তব সমাজবোধের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেন নি। এইখানেই তাঁর ত্রুটি ছিল, এবং এই ত্রুটির জন্য পদে পদে তাঁকে

---

১ এই রচনার অধিকাংশ উপকরণ National Archivesএ রক্ষিত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি থেকে সংগৃহীত।

অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের বিরোধের জালেই তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, এবং ব্যাকুল হয়ে মুক্তির পথও অনুসন্ধান করেছেন। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৫৬, ২৬ জুলাই, বিধবাবিবাহ-আইন পাস হয়। ইয়ং বেঙ্গল দলের রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। সেইজন্য আইনের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে 'সুহৃদ্ সমিতি' (The Association of Friends for the Social Improvement of Bengal) তাঁদের দ্বিতীয় বাৎসরিক সভার রিপোর্টে মন্তব্য করেন :

"It is, as it should be, permission law, but unfortunately it prescribes neither registration nor any other mode for establishing the validity of marriage in this land of false accusation, where it is so liable to be disputed by interested parties. The Committee cannot therefore help repeating their convictions that it must be soon followed up by more catholic Marriage Act like that contemplated by the Association on the defective Marriage Act (of 1856)"
—*The Hindu Intelligencer*, February 16, 1857

'সুহৃদ্ সমিতি' বিধবাবিবাহ-আইনকে কেবল 'অনুমতিসূচক আইন' বলে সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা যুক্তিসংগত, কারণ এই আইন পাস করে বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইনসম্মত অনুমতিই দেওয়া হল, আর কোনো দিক বিবেচনা করা হল না। বিবাহবন্ধন দৃঢ় ও অবিচ্ছেদ্য করার ব্যবস্থা তো হলই না, অন্যান্য সকলের মত বিধবাবিবাহকারী ব্যক্তির সামনে একাধিক বিবাহের পথও খোলা রইল। তার ফলে শেষ পর্যন্ত বিধবাবিবাহ অনেক ক্ষেত্রে শঠ ও প্রতারকদের একটি ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। বিধবাবিবাহের জন্য সর্বস্বান্ত হয়ে অবশেষে বিদ্যাসাগর নিজেই দেখলেন যে, একদল প্রতারক মহৎ আদর্শ পালনের নামে তাঁকে বঞ্চনা করেছে। তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে যাঁরা বিধবাবিবাহ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বিধবাবিবাহ উপলক্ষ করে বহুবিবাহ করেছেন মাত্র। এই প্রতারণা বন্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর পাত্রকে দিয়ে একখানি অঙ্গীকারপত্র সই করিয়ে নিতেন। পত্রের নমুনা এই :

"বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও আইনসঙ্গত কর্ম্ম জানিয়া আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, অদ্যাবধি আমরা পরস্পর দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম। অর্থাৎ তুমি আমার পত্নী হইলে, আমি তোমার পতি হইলাম। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি প্রকৃতরূপে পতিধর্ম্ম পালন করিব, অর্থাৎ তোমার যাবজ্জীবন সাধ্যানুসারে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব। তোমার প্রতি কখনও অযত্ন ও অনাদর প্রদর্শন করিব না; আর ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ করিব না। যদি দুর্ব্বুদ্ধির অধীন বা অন্যদীয় অসৎ পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ তোমার জীবদ্দশায় ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করি, তাহা হইলে তোমাকে আধিবেদনিকস্বরূপ এক সহস্র টাকা দিব। আর যদি আমি পুনরায় বিবাহ করাতে তুমি অসন্তুষ্ট বা অন্যবিধ অন্যায় আচরণ দর্শনে বিরক্ত হইয়া আমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে। তোমার গ্রাসাচ্ছাদনাদি ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতি মাসের আরম্ভে ১০৲ টাকা করিয়া দিব।·· আমি অবর্ত্তমানে তুমি ও তোমার পুত্রকন্যারা

প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে আমার পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত যাবতীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আর যদি আমি তোমাকে বা তোমার পুত্রকন্যাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনিয়োগ পত্রাদির দ্বারা আমার বিষয়ের অন্য কোন ব্যবস্থা করি, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে এই একরারপত্র লিখিয়া দিলাম।"

এক টাকার স্ট্যাম্প-কাগজে এই একরারপত্র লেখা হত এবং চার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাতে সই করতেন। ইয়ং বেঙ্গল দল যে-কারণে বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছিলেন তা যে কত যুক্তিসংগত তা বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পরে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিধবাবিবাহের জন্য পরে তিনি নিজেই যে একরারপত্র মুসাবিদা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলের পূর্বোক্ত বিবাহ-রেজিস্ট্রেশনের শর্তের সঙ্গে, অথবা ১৮৭২ সালের তিন-আইনের বিবাহের সঙ্গে, তার মূল পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। তবে তা সত্ত্বেও, তিনি বিধবাবিবাহ-আইনের আলোচনার সময়, অথবা পরে, ইয়ং বেঙ্গলের প্রস্তাব অনুযায়ী আইনটিকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন নি কেন? ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার জন্য 'সিবিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাস হলে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-পদ্ধতিতে বিবাহের আনুষ্ঠানিক রূপ-বদলের জন্য খুশি হন নি। খুশি হয়েছিলেন তিন-আইনে বহুবিবাহ বন্ধ হবার জন্য। প্রায় শেষজীবনে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে অনুরোধ করেছিলেন, তিন-আইন সংশোধন করে ব্রাহ্মবিবাহের সঙ্গে হিন্দুবিবাহেরও দাম্পত্য-বন্ধন দৃঢ় করার জন্য। তাঁর সেদিনের আশা সম্প্রতি 'হিন্দু কোড বিল' পাস হবার পর পূর্ণ হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের প্রবর্তক ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুবিবাহ-প্রথার সংস্কারক ছিলেন না। তাঁর গভীর মানবতাবোধ থেকে তিনি হিন্দু বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রচলিত হিন্দুবিবাহ-প্রথার ত্রুটিগুলির দিকে দৃষ্টি দেন নি। মনে হয়, হিন্দুবিবাহের সংস্কার-সাধন তাঁর লক্ষ্য ছিল না, অথচ বিধবাবিবাহের সাফল্যের জন্য তার প্রয়োজন ছিল। এ-সত্য তিনি বিধবাবিবাহের অভিজ্ঞতা থেকে পরে উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের সংস্কারচিন্তার সীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধ হয়তো শেষকালে তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন, কিন্তু তা কাটিয়ে ওঠার মত দৈহিক বা মানসিক সামর্থ্য কোনোটাই তখন তাঁর ছিল না। তাঁর সংস্কারচিন্তার অন্তর্বিরোধের জন্য তিনি ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন। তাঁর জীবনের 'শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম' বিধবাবিবাহের আংশিক সামাজিক ব্যর্থতাই তাঁর ক্ষতি। উনিশ শতকের ষাটে ও সত্তরে বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি এই অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এইসব ব্যর্থতার জন্য বিদ্যাসাগরের সংস্কারসংগ্রামের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব একটুও ম্লান হয় নি, বরং পরবর্তীকালের সংস্কারকরা লাভবান হয়েছেন, এবং তাঁদের সামাজিক দৃষ্টির স্বচ্ছতা বেড়েছে। হিন্দুবিবাহপ্রথার গলদের জন্য বিধবাবিবাহ, আইন পাস হওয়া সত্ত্বেও, আশানুরূপ সার্থক হয় নি বটে, কিন্তু তার সামাজিক আবশ্যকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলেই যে লোকসমাজে চেতনা জেগেছিল, সে কথা চিরস্মরণীয়। সেইখানেই বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার-আন্দোলনের আসল সার্থকতা।

সংস্কৃত-সাহিত্যে হরপার্বতীর চিত্র

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

দেবতাকে আমরা যে কালে যে দেশেই রূপ দান করিয়াছি সেইখানেই আমরা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মানুষকে আশ্রয় করিয়াছি ; কারণ, মানুষ ব্যতীত আমরা রূপ-গুণ আর কোথায় দেখিয়াছি ? মানুষের রূপ-গুণই যতটুকু পারি বাড়াইয়া বাড়াইয়া আমরা যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য রকমের দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি।

ঐতিহাসিক ক্রমে দেবদেবীর রূপ-গুণের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব বিভিন্ন যুগের সমাজ-জীবনের পটভূমিকাতেই এইসব দেবদেবী তাঁহাদের বিচিত্র রূপ-গুণ লাভ করিয়াছেন। অতিরিক্তভাবে সমাজজীবনের সহিত যুক্ত করিতে গিয়া স্থূল লৌকিকতা দ্বারা আমরা দেবদেবীকে অনেক সময় অতিমাত্রায় ক্লিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি এ কথাও যেমন সত্য, তেমনই আবার এ কথাও সত্য যে দেবদেবীকে আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া লইয়া আমরা আমাদের মানবীয় সম্বন্ধগুলিকে অনেক সময় আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছি, দেবতা-অবলম্বনে একটি স্নিগ্ধ অনন্তের আভাস মানবীয় মূর্তির পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মানবীয় সম্বন্ধগুলিকে আরও স্বাদনীয় এবং মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের মাটির ঘরের আঙিনায় নিত্য নব লাবণ্য ও রসমাধুর্য বিস্তার করিয়া খেলিয়া বেড়ায় যে শিশুটি তাহার 'অমিয়া ছানিয়া' আমাদের বৈষ্ণব কবিগণ 'নিত্য গোপালে'র মধুরলীলাময় মূর্তি দান করিয়াছেন। এই লীলাবর্ণনা দ্বারা তাঁহারা মানুষের মনেও কতগুলি সংস্কারপ্রবণতা জন্মাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন—যে সংস্কারপ্রবণতা আমাদের আঙিনার রক্তমাংসের গোপালটিকে 'নিত্য গোপালে'র সঙ্গে যুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। বাঙলা শাক্ত কবিরাও কৈলাসবাসিনী উমাকে বাঙলাদেশের সমতলে মাটির কুটিরের আঙিনায় নামাইয়া আনিয়া আমাদের রক্তমাংসে গড়া মর্ত্যের উমাকে নূতন মহিমা দান করিয়াছেন। রামপ্রসাদের গিরিরানী মেনকা বলিতেছেন—

গিরিবর, আর আমি পারি নে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥[১]

[১] শাক্ত পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই গান বাঙলাদেশের দেউলে-নাটমন্দিরে বাসরে-আসরে ঘাটে-মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়া ভাবে ও সুরে আমাদের গৃহাঙ্গনের উমাটির চারিদিকেও অনির্বচনীয় মহিমা আভাসিত করিয়া তোলে।

দেবদেবীগণের মধ্যে তিনটি যুগলরূপ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রসিদ্ধি ও লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, হরগৌরী বা উমামহেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ এবং সীতারাম। ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসিদ্ধি বিশেষভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে— তাহাও পূর্বভারত ও উত্তরভারতেই বেশি। সীতারামের ধারাটি অনেক প্রাচীন হইলেও ইহার জনপ্রিয়তা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে এবং তাহাও বিশেষভাবে উত্তরভারতে— মুখ্যভাবে তুলসীদাসের 'রাম-চরিত-মানস'কে অবলম্বন করিয়া। প্রাচীনতম এবং ব্যাপকতম ধারা হইল হরগৌরী বা হরপার্বতী বা উমামহেশ্বরের ধারাটি। পরবর্তী কালের জনপ্রিয় যুগললীলা হইল রাধাকৃষ্ণের লীলা; কিন্তু সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণলীলার ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া যাইবার একটা বাধা ছিল; রাধাকৃষ্ণ-প্রেম পরকীয় প্রেম— এ প্রেম সমাজবন্ধনবহির্ভূত একটি প্রেমাদর্শকে লইয়া লীলায়িত। রাধা দেবী বটেন, এবং সেই দেবীর ভিতর দিয়াই মানবীয় প্রেমের অনন্ত লীলাবৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু রাধার মধ্য দিয়া নারীত্বের সমগ্রতা বিকাশের সুযোগ ছিল না। রাধার মধ্যে কন্যামূর্তি অল্প, গৃহিণীমূর্তি নাই, মাতৃমূর্তি নাই— তিনি সর্বপ্রকার সমাজবন্ধনের বাহিরে নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী; তাঁহার মানবীয় রূপায়ণের মধ্যেও এই পরকীয়া প্রেয়সী রূপেরই প্রাধান্য। সীতারাম যুগলকে অবলম্বন করিয়া কোনও লীলাবিস্তার নাই; রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনা দ্বারা অত্যন্তভাবে তাঁহাদের জীবনকাহিনী সীমিত। কিন্তু দেবী পার্বতীকে আমরা পাইয়াছি অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্বরূপে, তাঁহাকে পাইয়াছি আধ-আধ বোলের বালিকা রূপে, অনূঢ়া কিশোরী রূপে, নবযৌবনের রূপগর্বিণী রূপে, নবোঢ়া প্রেয়সী রূপে, প্রেমকে মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য কঠোর তপস্বিনী রূপে; তাঁহাকে দেখিয়াছি ভিখারীর ঘরে মলিন ছিন্ন বসন পরিহিতা অনশনক্লিষ্টা ভিখারিণী রূপে, আবার দেখিয়াছি অন্নপূর্ণার মহৈশ্বর্যে; তাঁহাকে দেখিয়াছি 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' রূপে, আবার তাঁহাকে পাইয়াছি ভয়ংকরী অসুরনাশিনী রূপে; তাঁহাকে দেখিয়াছি কলানিধি নটরাজের লাস্যময়ী নৃত্যসঙ্গিনী রূপে, আবার দেখিয়াছি ব্যাঘ্রচর্মাবৃত জটাজূটধারী যোগেশ্বর শিবের নিত্যসঙ্গিনী জটাজূটধারিণী যোগেশ্বরী রূপে; কুমারী রূপে তিনি যেমন সর্বলাবণ্যময়ী, মাতৃরূপে তিনি তেমনই সর্বমহিমময়ী। এইজন্য ভারতবর্ষ এই পার্বতী দেবীকে যেমন করিয়া সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে এমন আর কোনও দেবীকে নয়।

ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পার্বতী'র প্রথম উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ দেখিতে পাই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যে। এই গ্রন্থখানি পরবর্তী কালের সংস্কৃত প্রাকৃত এবং ভাষা -সাহিত্যে দেবী-রূপায়ণের আকর গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। সাহিত্যে ও শিল্পে দেবীর অসুরমর্দিনী রূপের তেমন কোনও প্রভাব নাই, দেবীর মধুর মূর্তিরই প্রাধান্য। আমরা পরে লক্ষ্য করিব, অষ্টাদশ শতক এবং উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে যেখানে দেবীর মধুর রূপের সহিত অসুরনাশিনী রূপের মিশ্রণ ঘটিয়াছে সেখানেও দেবী ভয়ংকরী হইয়া উঠিতে পারেন নাই, সেখানেও দেবীর সকল ভীষণতাকে যতটা সম্ভব কমনীয় ও মধুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে বিবিধভাবে।

কালিদাসের কুমারসম্ভবের ভিতরে দেখিতে পাই, কবি তাঁহার নিজের সমাজজীবনের সহিত যুক্ত

করিয়া রূপ দান করিয়াছেন দেবী পার্বতীকে। প্রথমেই যখন পার্বতীকে গিরিরাজের গৃহে গিরিরানী মেনকার ক্রোড়ে বালিকামূর্তিতে দেখিতে পাইলাম তখন বুঝিতে পারিলাম এ-পার্বতী অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র ঘরের কন্যা নহে, এ পার্বতী অভিজাতগৃহের আদরিনী কন্যা। মন্দাকিনীর পুলিনে বেদী নির্মাণ করিয়া সেই বালিকা সখীগণের সঙ্গে খেলা করে— কখনও কন্দুক লইয়া খেলে, কখনও খেলে কৃত্রিম পুত্রক লইয়া[২]। তৎকালীন অভিজাত বংশের বালিকাদের যেমন বিদ্যাশিক্ষার রীতি ছিল পার্বতীও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে তেমনই বিবিধ বিদ্যার অধিকারিণী হইয়াছিলেন।[৩] এই বালিকা যখন কুমারী হইয়া উঠিলেন তখন কঠোর তপস্যা দ্বারা উমা মহাদেবকে স্বামিত্বে বরণ করিবার অধিকারিণী হইলেন; কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই অধিকারলাভের ব্যাপারে এক পার্বতী এবং শিবকেই দেখা গেলেও বিবাহব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই করিতে পারিলেন না। কালিদাস যে মনুশাসিত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন হরপার্বতীকেও সেই সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটি বিধি স্বীকার করিয়া পরিণয়াবদ্ধ হইতে হইল। মহাদেব উমার নিকট ধরা দিয়া 'তবাস্মি দাসঃ' এই কথা বলিবার সঙ্গেসঙ্গেই হরপার্বতীর দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করিবার অধিকার হইল না। সমাজবিধি সম্বন্ধে অতিসচেতন এবং সাবধান কালিদাস উমার মুখ দিয়াও সাক্ষাৎভাবে মহাদেবকে কোনও কথা বলাইলেন না, সখীগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দ্বারায় মহাদেবকে গোপনে বলাইলেন, 'গিরিরাজ হিমালয়ই আমার দাতা— ইহা বুঝিয়া তিনি সব ব্যবস্থা করুন।'—

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্।
দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি॥

মহাদেবও তখন 'স তথেতি'— 'আচ্ছা তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সপ্তর্ষিকে আশ্রয় করিলেন। দেবর্ষিগণকে এই সম্বন্ধ-প্রস্তাব লইয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া মহাদেব বলিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে তিনি তাঁহাদের আশ্রয় এইজন্যই গ্রহণ করিয়াছেন যে 'বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ'— সজ্জনকর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বন্ধ কখনও কোনও অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে না। দাম্পত্যজীবনের আদর্শরূপিণী সতী অরুন্ধতীকে সহ সেই দেবর্ষিগণ গিয়া গিরিরাজ হিমালয়ের নিকটে সামাজিক বিধানে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। দেবর্ষিগণ যে ভাষায় গিয়া গিরিরাজ হিমালয়ের নিকট এই সম্বন্ধের প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাও লক্ষণীয়—

উমা বধূর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্।
বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্‌ভূতয়ে বিধিঃ॥

'উমা হইল বধূ, আপনি (হিমালয়, সমাজেও যিনি উচ্চশির) হইলেন দাতা, আমরা হইলাম প্রার্থী, শম্ভু হইলেন বর; এ সম্বন্ধ আপনার কুলের মর্যাদার নিমিত্তই হইবে।'

---

২ মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ
সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং
ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে। —১।২৯

৩ তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ। —১।৩০

মেনকা ও গিরিরাজের সঙ্গে দেবর্ষিরা যখন এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন পিতার পার্শ্বে অধোমুখী হইয়া কুমারী পার্বতী তখন শুধু লীলাকমলপত্রগুলি গণনা করিতেছিল। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে উমা অরুন্ধতীকে পিতার আদেশে প্রণাম করিল, প্রণামের সময় নতমস্তক হওয়ায় উমার সোনার কর্ণকুণ্ডল স্খলিত হইয়া পড়িল— অরুন্ধতী ভাবী বধূ উমাকে টানিয়া নিজের কোলে বসাইলেন। ভাবী-বিরহ-বেদনায় গিরিরানীর নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল ; অরুন্ধতী জামাতার গুণকীর্তন করিয়া সেই শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই সামাজিক বিধিপূর্বক হরপার্বতীর বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা। পার্বতীকে বিবাহ-বেশে সজ্জিত করিবার বর্ণনাতেও কালিদাস সখীগণের চিরাচরিত রসিকতাকে বাদ দিতে পারেন নাই। কোনও সখী পার্বতীর চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করিয়া দিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, 'এই অলক্তক-রঞ্জিত চরণের দ্বারা পতির শিরস্থিত চন্দ্রকলাকে স্পর্শ কর'। পার্বতী প্রত্যুত্তরে শুধু নীরবে তাহাকে মালা ছুঁড়িয়া আঘাত করিল।—

> পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন
> স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্বম্।
> সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশী-
> র্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥

তাহার পরে গিরিরানী মেনকা তৎকালোচিত বিবাহের মঙ্গলাচরণ এবং স্ত্রী-আচার সবই পালন করিলেন। বর আসিলে পাড়া-প্রতিবেশিনী অঙ্গনাগণের মধ্যে যেন হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল ; কোনও রমণী মালার দ্বারা কেশপাশ বদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি মালা ফেলিয়া চুল হাতে করিয়াই আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইলেন ; কেহ পায়ে আলতা মাখিতেছিলেন, কাচা আলতার রঙে সমস্ত ঘর রঞ্জিত করিয়াই তিনি বাতায়নে দৌড়াইয়া গেলেন ; কেহ কাজল মাখিতেছিলেন, এক চোখে কাজল দিয়া অপর চোখে কাজল দিবার সময় হইল না, কাজল-শলাকা হাতে করিয়াই গবাক্ষে উপস্থিত হইলেন ; কেহ আলুলায়িতবসনা, তাড়াতাড়িতে আর বসন সংবরণ করিবার খেয়াল হয় নাই, বসন হাতে ধরিতে ধরিতেই আসিয়া অলিন্দে দাঁড়াইলেন। কালিদাসের এইসকল বর্ণনার সঙ্গে পুরাণে ও পরবর্তী কালের বৈষ্ণবসাহিত্যে কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণমিলনে ব্যাকুলা গোপীগণের বর্ণনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে। ইহার পরে দেখিতে পাই বরের রূপ-দর্শনে প্রতিবেশিনী রমণীগণের বিবিধ মন্তব্য। ইহারই অত্যন্ত স্থূল পরিণতি দেখিতে পাই বাঙলা মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতিতে এ জাতীয় স্থলে রমণীগণের পতিনিন্দায়। বিবাহ-বাসরে পিতা হিমালয় যখন জামাতা শিবের হস্তে উমাকে অর্পণ করিলেন তখন প্রথম পুরুষহস্তস্পর্শে উমারও যেমন রোমাঞ্চ দেখা দিল, মহাদেব হইলেও প্রথম প্রেয়সীস্পর্শে বরের হস্তাঙ্গুলি ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।—

> রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ
> স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ।

অজ্ঞাতনামা আর-এক কবি বিষয়টি লইয়া আরও রসসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। শৈলেন্দ্র হিমালয় কন্যা পার্বতীকে শিবের হস্তে দান করিতেছেন ; পার্বতীর হস্তস্পর্শে উল্লসিত শিবের রোমাঞ্চাদি বিকার উপস্থিত

হইল ; বিবাহবিধি ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিপালিত হইল না মনে করিয়া আকুল মহাদেব বলিয়া উঠিলেন—'তুহিনাচলের হাত দুখানির কি শৈত্য !' অন্তঃপুরচারিণীরা কিন্তু ব্যাপারটি বুঝিয়া শিবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।—

শৈলেন্দ্রপ্রতিপাদ্যমান-গিরিজাহস্তগ্রহ-প্রোল্লস-
দ্রোমাঞ্চাদি-বিসংষ্ঠুলাখিলবিধি-ব্যাসঙ্গ-ভঙ্গাকুলঃ।
হা শৈত্যং তুহিনাচলস্য করয়োরিত্যূচিবান্ সর্বতঃ
শৈলান্তঃপুরমাতৃমণ্ডলগণৈর্দৃষ্টোঽবতাদ্ বঃ শিবঃ ॥[৪]

কালিদাসের কালের জনপ্রিয় রীতি অনুসারে বিবাহের পরে বরবধূ হরপার্বতী নাটক-দর্শনও করিলেন। ইহার পরে নববিবাহিত বরবধূর স্নিগ্ধ-মধুর লীলাবিলাসের বর্ণনা ; এ-বর্ণনায় কবির অভিজ্ঞতা ও চাতুর্য উভয়েরই চমৎকারিত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিবাহের পরে মহাদেব নববিবাহিত পত্নী পার্বতীকে লইয়া বহু বিজন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ; ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তাঁহারা গন্ধমাদনকাননে প্রবেশ করিলেন। তথায় ধাতুরাগরঞ্জিত কাঞ্চনময় শিলাতলে পার্বতীকে বামে লইয়া উপবেশন করত মহাদেব অস্তগামী সূর্য দেখিতে পাইলেন এবং আকাশে ও পার্বত্য বনে সর্বত্র সন্ধ্যাসমাগমের গম্ভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারিলেন ; সন্ধ্যাহ্নিকের সময় উপস্থিত দেখিয়া মহাদেব বামবাহু-সমাশ্রিতা দেবীর নিকট কিছু সময়ের জন্য অবসর চাহিলেন ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া সন্ধ্যানুষ্ঠানের প্রতি মহাদেবের আসক্তি দেখিয়া দেবী অসূয়ান্বিত হইলেন ; তিনি মহাদেবকে ছাড়িয়া দিবেন না। মহাদেব সন্ধ্যাহ্নিকে গেলেন বটে, কিন্তু দেবী মান করিলেন ; ফিরিয়া আসিয়া দেবীর মান ভাঙাইতে মহাদেবকে বহু চাটুবাক্য ও অনুনয়-বিনয় প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। প্রথমেই আসিয়া বলিতে হইয়াছে—

মুঞ্চ কোপমনিমিত্তকোপনে
সন্ধ্যয়া প্রণমিতোঽস্মি নান্যয়া।
কিং ন বেৎসি সহধর্মচারিণং
চক্রবাকসমবৃত্তিমাত্মনঃ ॥—৮।৫১

'হে অনিমিত্তকোপনে, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর ; আমি সন্ধ্যা কর্তৃকই প্রণমিত হইয়াছি, অন্য কাহা দ্বারা (অন্য রমণী দ্বারা) নহে ; নিজের সহধর্মচারী (আমাকে) কি তুমি চক্রবাকসমবৃত্তি বলিয়া জান না ?'

মহাদেবের এই সন্ধ্যানুষ্ঠান লইয়া দেবীর কোপ মান ও উভয় পক্ষের বিবিধ ছলনা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বহু কবিতা রচনা হইতে দেখি। ঘরের পুরুষ বেশি সময় সন্ধ্যাহ্নিক লইয়া ব্যাপৃত থাকেন গৃহিণীগণের অনেক সময়ই এ জিনিসটি বিশেষ মনঃপূত নয়, বিশেষতঃ গৃহিণী যদি আবার নববিবাহিতা হন। মহাদেব-পার্বতীকে লইয়া এই ভাবটির সুকুমার প্রকাশ অনেক কবিতায় দেখিতে পাই। ইহা লইয়া ছলনাও অনেক। হালের 'গাহা সত্তসঈ'র প্রথম গাথাতেই দেখি—

পসুবইণো রোসারুণ-পডিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহঅন্দং।
গহিঅগ্ঘ-পঙ্কঅং বিঅ সংঝা-সলিলঞ্জলিং ণমহ ॥[৫]

---

৪ সূক্তিমুক্তাবলী, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারেও ধৃত, নির্ণয়-সাগর, বোম্বাই।
৫ ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত।

'পশুপতির সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলিকে নমস্কার কর যাহাতে গৌরীমুখচন্দ্রের রোষারুণ প্রতিমা সংক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহা গৃহীত অর্ঘ্যপঙ্কজের ন্যায় মনে হইতেছে।'

এই গ্রন্থের শেষ গাথাটিও অনুরূপ।—

সংঝা-গহিঅ-জলঞ্জলি-পডিমা-সংকন্ত-গৌরি-মুহ-কমলং।
অলিঅং চিঅ ফুরিওট্‌ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং ণমহ ॥[৬]

এখানেও দেখিতেছি হর সন্ধ্যার নিমিত্ত জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা গৌরীমুখকমল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হইয়া গেল, শুধু অলীক ভাবেই তিনি ওষ্ঠ নাড়াইতে লাগিলেন।

রাজশেখর কবির একটি শ্লোকে দেখি, সন্ধ্যার্চনের কথাতেই কুপিতা দেবীর মুখপদ্ম সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে; মহাদেব তখন যেন দেবীর সংকুচিত মুখপদ্মের তুলনা দিতে গিয়াই বলিলেন, 'দেবি, দেখ, আকাশ লোহিতবর্ণ ধারণ করার সঙ্গেসঙ্গে তোমার মুখের সঙ্গে উপমার যোগ্য ঐ সরোবরের পদ্মগুলির এই দশা উপস্থিত হইয়াছে'। এই কথা বলিয়া দুই হাতের দ্বারা পদ্মসংকোচনের প্রকটকরণের ছলে পার্বতীকে বঞ্চিত করিয়া মহাদেব কৃতাঞ্জলিদ্বারা সন্ধ্যার্চনা সারিয়া লইলেন:

দেবি ত্বদ্বদনোপমানসুহৃদামেষাং সরোজন্মনাং
পশ্য ব্যোমনি লোহিতায়তি শনৈরেষা দশা বর্ততে।
ইত্থং সংকুচদম্বুজানুকরণব্যাজোপনীতাঞ্জলেঃ
শম্ভোর্বঞ্চিতপার্বতীকমুচিতং সন্ধ্যার্চনং পাতু বঃ ॥[৭]

আবার—

প্রতিবিম্বিতগৌরীমুখবিলোকনোৎ-
কম্পশিথিলকরগলিতঃ।
স্বেদভরপূর্যমাণঃ শম্ভোঃ
সলিলাঞ্জলির্জয়তি ॥[৮]

সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলিতে গৌরীর মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; তাহা দেখিয়া মহাদেবের কম্পিত শিথিল করের জল গলিত হইতেছে—অন্যদিকে আবার ঘর্মের দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

অন্য একটি শ্লোকে দেখি—

পার্শ্বস্থপৃথ্বীধররাজকন্যা-
প্রকোপবিস্ফূর্জথুকাতরস্য।
নমো ঽস্তু তে মাতরিতি প্রণামাঃ
শিবস্য সন্ধ্যাবিষয়া জয়ন্তি ॥

৬ ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত।

৭ সুভাষিতরত্নকোষ, ডেনিয়েল এইচ. এইচ. ইঙ্গল্‌স্‌ কর্তৃক সম্পাদিত; মহেশ্বর ব্রজ্যা, ৫ সং শ্লোক। মতান্তরে শ্লোকটি শিতিকণ্ঠ রচিত।

৮ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার, বোম্বাই নির্ণয়-সাগর সংস্করণ।

শিব সন্ধ্যাহ্নিকে বসিয়াছেন, পার্শ্বে দেখিতেছেন পার্বতীকে—কোপে তিনি (পার্বতী) ফুঁসিতেছেন ; কাতর শিব বার বার প্রণাম করিলেন : 'হে মাতঃ, তোমাকে নমস্কার'। এ প্রণাম সন্ধ্যাবিষয়ে বটে— আবার পার্বতীর কোপপ্রশমন-বিষয়েও বটে।

অর্ধনারীশ্বররূপে সন্ধ্যাহ্নিকে মহাদেবের আরও বিপদ দেখিতে পাই। সেখানে দেখি, ওষ্ঠের একার্ধ জপবলে স্ফুরিত হইতেছে, অন্য অর্ধ (গৌরীর অর্ধ) প্রকোপবশতঃ স্ফুরিত হইতেছে, এক হস্ত প্রণামের জন্য মস্তকে স্থাপিত, অন্য হস্ত তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য উত্তোলিত, এক অক্ষি ধ্যানবশে নিমীলিত—অন্য অক্ষি সম্পূর্ণ বিকশিত না হইয়া তাহা লক্ষ্য করিতেছে ; এইরূপে একটি অনিচ্ছা এবং একটি কর্মচেষ্টা একই দেহে যুগপৎ দেখা দিয়াছে।

অর্ধং দন্তচ্ছদস্য স্ফুরতি জপবশাদর্ধমপ্যুৎপ্রকোপা-
দেকঃ পাণিঃ প্রণন্তুং শিরসি কৃতপদঃ ক্ষেপ্তুমন্যস্তমেব।
একং ধ্যানান্নিমিলিত্যপরমাবিকসদ্বীক্ষতে নেত্রমিত্থং
তুল্যানিচ্ছাবিধিৎসা তনুরবতু স বো যস্য সন্ধ্যাবিধানে ॥[৯]

অপর স্থলে আবার কিন্তু দেখি, শিবের সন্ধ্যাসলিলাঞ্জলি তাঁহার হস্তের বলয়ীকৃত সর্পের দ্বারাই পীয়মান হইতেছে, শিব 'গৌরীমুখার্পিতমনা', সুতরাং ইহার কথা জানিতেও পারিতেছেন না ; সখী বিজয়া শিবের অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন।

সন্ধ্যাসলিলাঞ্জলিমপি
কঙ্কণফণিপীয়মানমবিজানন্।
গৌরীমুখার্পিতমনা
বিজয়াহসিতঃ শিবো জয়তি ॥[১০]

অনেক সময় দেখা যায় গৃহিণী নিজে গৃহপতির সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটাইতে সাহস না করিয়া ঘরের ছোটদের এই কাজে উস্কাইয়া দেন। গৃহপতি কখনও হয়তো চটিয়া যান,—আবার কখনও খোশমেজাজে জিনিসটি গ্রহণ করেন। হরপার্বতীর সংসারেও আমরা সেই চিত্রটি দেখিতে পাই। এখানে দেখিতেছি হাতের উপরে হাত রাখিয়া আসনপূর্বক শঙ্কর সন্ধ্যাঞ্জলি দান করিতেছিলেন ; কার্তিক তাহা দেখিতে পাইয়া মাতা পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'মা, বাবা তাঁহার অঞ্জলিপুটে কি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন?' পার্বতী কহিলেন, 'বৎস, নিশ্চয়ই একটি স্বাদু ফল।' কার্তিক বলিল, 'আমাকে দিতেছে না।' পার্বতী বলিলেন, 'নিজে গিয়া আন।' এইরূপে মাতা কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া কার্তিক আগাইয়া গিয়া পিতার সন্ধ্যাঞ্জলি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, শম্ভুর সমাধি ভাঙিয়া গেল, কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না, ঈষৎ হাসির সঙ্গে সব জিনিসটিকে গ্রহণ করিলেন।—

---

৯ সদুক্তিকর্ণামৃত।

১০ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর।

মাতর্, জীব, কিমেতদঞ্জলিপুটে তাতেন গোপায়িতং,
বৎস, স্বাদু ফলং, প্রযচ্ছতি ন মে, গত্বা গৃহাণ স্বয়ম্।
মাত্রৈবং প্রহিতে গুহে বিঘটয়ত্যাকৃষ্য সন্ধ্যাঞ্জলিং
শম্ভোর্ভগ্নসমাধিরুদ্ধরভসো হাসোদ্গমঃ পাতু বঃ॥[১১]

বয়সে, আকৃতি-প্রকৃতিতে, বেশ-ভূষায়, আভরণ-বিলেপনে, বাসস্থানে, বাহনে, অভ্যাস-আচরণে কোনও দিক হইতেই শিব যে গৌরীর তুল্য বর নয়, পরন্তু সব বিষয়েই শিব ও গৌরী যে একটা শোচনীয় দ্বন্দ্বেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ কথা শিবপার্বতী অবলম্বনে সকল সাহিত্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে শিবায়নে পাঁচালীতে ও শাক্তপদাবলীতে ইহার বিশদ বর্ণনা পাই। বিশেষ করিয়া বাঘছাল-পরা, গায়ে ছাই-মাখা, সর্পভূষণ ও হাড়ের মালা গলায় জটাজূটধারী শিব যখন বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে শিঙা ফুঁকিয়া ভূতপ্রেতসহ গৌরীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তখন গৌরীমাতা মেনকা ও প্রতিবেশিনীগণের আর খেদের অন্ত নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখি—

কান্দয়ে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে॥
চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ।
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ-বলয়া সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খায়্যা হেন বরে দিলাম দুহিতা॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো॥
ঔষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে।
ঘৃত দিতে শিবের ললাটে বহ্নি জ্বলে॥

শুধু মেনকা নহেন—

বর দেখি এয়ো সবে করে কানাকানি।
চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি॥
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর।
দেখিয়া মেনকা দেবীর জ্বলিছে অন্তর॥

ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গলে' ইহার উপর আবার রঙ চড়াইয়াছেন।—

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়োর জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।

---

১১ সুভাষিতরত্নকোষ, মহেশ্বর-ব্রজ্যা, ৩০ সং।

উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়োর দাড়ী শণের নুড়া
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো।
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন ক'রে ওমা উমা করবে বুড়োর ঘর লো।
আমার উমা মেঘের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥

শাক্তপদাবলীতে দেখিতে পাই, বিবিধভাবে ইহারই বাৎসল্য-রসাশ্রিত করুণ বিস্তার। এই দ্বন্দ্বচিত্রটি আমরা কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র মধ্যেই বিশদভাবে দেখিতেছি। শিব-কামনায় তপস্যা-নিরতা উমাকে তপস্যা হইতে নিরস্ত করিবার জন্যই মহাদেব নিজে বটুব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া উমার নিকটে আসিয়া বহুভাবে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন। উমার সখীগণ যখন বটুব্রাহ্মণের নিকট উমার সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল তখন সেই বটুব্রাহ্মণ কিছুমাত্র হর্ষলক্ষণ ব্যঞ্জিত না করিয়া 'অয়ীদমেবং পরিহাস ইতি'— 'অয়ি, এ কথা কি এইরূপই না পরিহাস মাত্র'— উমাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। উমা ঐ কথাই ঠিক জানাইলে বটুব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, 'আমি সেই মহেশ্বরকে চিনি; সর্বপ্রকার অমঙ্গল অভ্যাসে তাহার রতির কথা বিবেচনা করিয়া তোমাকে সমর্থন করিতে আমি উৎসাহিত হইতেছি না। (৫।৬৫)। হে অবস্তুলাভতৎপরে, বিবাহসূত্রযুক্ত তোমার এই হাত সর্পবলয়যুক্ত-করে প্রথম যখন শম্ভু গ্রহণ করিবেন তখন তুমি কিভাবে সহ্য করিবে?'

অবস্তুনির্বন্ধপরে কথং নু তে
করো হয়মামুক্তবিবাহকৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা
সহিষ্যতে তৎপ্রথমাবলম্বনম্॥ —৫।৬৬

তাহা ছাড়া—

ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং
কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং
গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ॥ —৫।৬৭

'তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখ, নববধূর কলহংসলক্ষণ দুকূল বসন ও শোণিতবিন্দুবর্ষি গজাজিন—এই দুইয়ের কি কখনও যোগ (গ্রন্থিবন্ধন) হইতে পারে?'

আবার—

চতুষ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ
পরো হপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়ো-
বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু॥ —৫।৬৮

'কুসুমাস্তীর্ণ দিব্যগৃহাঙ্গনে বিন্যস্ত হয় তোমার পদযুগের অলক্তক-রঞ্জিত যে পদচিহ্নগুলি তাহা কেশ-পরিব্যাপ্ত প্রেতভূমিতে ন্যস্ত হইবে— ইহা পরেও অনুমোদন করিতে পারে না।'

অযুক্তরূপং কিমতঃপরং বদ
ত্রিনেত্রবক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়ে ঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে
পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি॥ —৫।৬৯

'ত্র্যম্বকের বক্ষ (আলিঙ্গন) তোমার নিকট সুলভ হইবে, ইহার পরে অযুক্তরূপ আর কি হইতে হইতে পারে বল। হরিচন্দনাস্পদ তোমার স্তনযুগল চিতাভস্মরজের আস্পদ হইবে!'

ইয়ঞ্চ তে ঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা
যদূঢ়য়া বারণরাজহার্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥—৫।৭০

'এই তোমার সম্মুখে আর এক বিড়ম্বনা,— যে তুমি গজরাজের দ্বারা বাহিত হইবার যোগ্যা— নবোঢ়া সেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষে আরূঢ়া দেখিয়া মহাজনেরাও স্মেরমুখ হইবেন।'

বটুব্রাহ্মণ আরও বলিলেন, 'সেই পিনাকীর সমাগম-প্রার্থনায় সম্প্রতি দুইটি জিনিস শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, একটি হইল, কলাবান্ (চন্দ্রের) কান্তিমতী কলা, অপরটি হইল জগতের নেত্রকৌমুদী তুমি।'— ৫।৭১। তাহার পরে—

বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্ বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে
তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে॥—৫।৭২

'(সেই শিবের) বপুটি বিরূপাক্ষ (বিরূপ অক্ষিবিশিষ্ট); জন্ম অলক্ষ্য; সম্পদ্ দিগম্বরত্বের দ্বারাই সূচিত; হে বালমৃগাক্ষি, বরের মধ্যে যাহা খোঁজা হয় তাহার একটিও কি ত্রিলোচনের মধ্যে আছে?'

শেষপর্যন্ত উমাকে নিবৃত্ত করিতে বটুব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাদেব হইলেন একটি 'শ্মশানশূল', যূপে অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্য বৈদিকী সৎক্রিয়া কখনও এই শ্মশানশূলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

কালিদাস মহাদেব ও উমার ভিতরকার এই যে দ্বন্দ্বাত্মকচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন পরবর্তী কালের সংস্কৃত কবিগণ এই চিত্রকে অবলম্বন করিয়া নানাভাবে রসবিস্তার করিয়াছেন।[১২] উমার বিবাহকালে বর-দর্শনে মেনকা এবং প্রতিবেশী এয়োগণের যে বিলাপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহারই অনুরূপ বর্ণনা পাই 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত অজ্ঞাতনামা কোনও এক কবির একটি শ্লোকে।

---

১২ বাঙলা সাহিত্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে (প্রথম ভাগ) দেখিতে পাই, 'কুমারসম্ভবে'র এ বর্ণনাকে ভাঙিয়াই কবি দ্বিজরূপ-ধারী শিবের দ্বারা উমাকে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।—

কহ গো নিরুপমা কাহার বোলে রামা
ইচ্ছিলা বুড়া জটাধরে;

মহাদেব দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া বিবাহের জন্য আসিয়াছেন; বিবাহবাসরে দেবীগণ বর খুঁজিতেছেন। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন— এ-জন ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু, ঐ হইলেন ত্রিদশপতি ইন্দ্র, ইঁহারা হইলেন লোকপালগণ; তবে এখানে জামাতা কে? ঐ যে ভুজগপরিবৃত ভস্মাবরণে রুক্ষ কপালী— ঐ-ই নাকি? তাহা হইলে 'হা বাছা উমা, তুমি ত বঞ্চিতা হইয়াছ'; এইভাবে দুঃখ করিতে লাগিলেন সেইসব দেবীগণ— যাঁহাদের কাছে বর ছিল অনভিমত। কিন্তু উমার মন কিন্তু তাহাতে টলে নাই— সব শুনিয়াও সে কিন্তু 'উপচিতপুলকা'।—

ব্রহ্মায়ং বিষ্ণুরেষ ত্রিদশপতিরসৌ লোকপালাস্তথৈতে
জামাতা কো ঽত্র যো ঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী।
হা বৎসে বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবরপ্রার্থনাব্রীড়িতাভি
র্দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বো ঽস্তু গৌরী।

পরে আমরা দেখিতে পাইব, গৌরীর এই মনোভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'উৎসর্গ' বইয়ের 'মরণ' কবিতায় একটি ভাবগূঢ় রূপ দান করিয়াছেন।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্য শিবায়ন প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, শিবের বেশ দেখিয়া মেনকা ও অন্যান্য রমণীগণ খেদ করিতে আরম্ভ করিলে মহাদেব মনোহর বেশ ধারণ করিলেন। সংস্কৃতেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই।—

হইয়া সুনারী ভজহ ভিখারী
দরিদ্র বর দিগম্বরে॥
...
তুমি গো রূপবতী দেহের হেমজ্যোতি
মাণিক্য-রুচির-দশনা।
ইচ্ছিলে এমন বরে তৈল নাহি পায়ে ঘরে
হইবে বিভূতিভূষণা॥
...
কাহার পুত্র হর না জানি কোথা ঘর
নাহি দেখি ভাই বন্ধুজন।
বরিয়া শূলপানি হইবে দুখিনী
দারুণ দৈবের কারণ।
...
বসন বাঘের ছাল গলায় হাড়ের মাল
উত্তরী যার বিষধরে।
প্রেত ভূত সঙ্গে চিতার ধূলি অঙ্গে
বরিবে কেন হেন বরে।
ইত্যাদি।

কথয়ত কথমেষা মেনয়া বিপ্রদত্তা
শিব শিব গিরিপুত্রী বৃদ্ধকাপালিকায়।
ইতি বদতি পুরন্ধ্রীমণ্ডলে সিদ্ধিলেশ-
ব্যয়কৃতবরবেষঃ পাতু বঃ শ্রীমহেশঃ ॥[১৩]

রমণীগণ খেদসহকারে বলিতেছিলেন,— 'আরে শিব শিব! কেন মেনকা পার্বতীকে দান করিল এই একটি বৃদ্ধ কাপালিকের করে! এই কথা বলিতে বলিতেই মহাদেব তাঁহার সিদ্ধির সামান্য অংশ ব্যয় করিয়াই মনোহর বরবেশ ধারণ করিলেন।

বাঙলা সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই বর শিবের সহচর সর্প-ভূতাদির ভয়ে পার্বতী ও বহু স্থলে পার্বতী-মাতা মেনকা নানাপ্রকার মন্ত্র ও ওষধির ব্যবহার করিয়াছেন কবি রাজশেখরের একটি শ্লোকেও এইরূপ পার্বতীকে বিবাহের পূর্বে এক-একটি উপদ্রব নিবারণের জন্য এক-একটি প্রতিষেধক ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই।—

গোনাসায় নিয়োজিতাগদরজাঃ সর্পায় বদ্ধৌষধিঃ
পাণিস্থায় বিষায় বীর্যমহতে কণ্ঠে মণিং বিভ্রতী।
ভর্তুর্ভূতগণায় গোত্রজরতীনির্দিষ্টমন্ত্রাক্ষরা
রক্ষত্বদ্রিসুতা বিবাহ-সময়ে প্রীতা চ ভীতা চ বঃ ॥[১৪]

পার্বতী শিবের অঙ্গস্থিত গোনাস সাপের (গোক্ষুর নাসার আকৃতির নাসাযুক্ত) জন্য লইয়াছেন বিষনাশক ধূলি, সর্পের জন্য দেহে বন্ধন করিয়াছেন ওষধি; হস্তস্থিত মহাশক্তিশালী বিষের প্রতিকারার্থে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন মণি, আর ভূতগণের প্রতিষেধার্থ গ্রহণ করিয়াছেন গোত্রজরতী-নির্দিষ্ট মন্ত্রাক্ষর; বিবাহসময়ে এইরূপে সজ্জিতা পার্বতী প্রীতাও বটেন— আবার ভীতাও বটেন।

এই সর্প লইয়া নানা স্থূল রসিকতা দেখা যায়। সর্পবন্ধনের দ্বারাই মহাদেব অজিনবসন বা ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান করিতেন। ধর্মাশোকের একটি শ্লোকে দেখি, ইন্দ্র গারুত্মতমণি ধারণ করিয়া শিবের সম্মুখে আনত হইয়া আছেন; মণিভয়ে অজিনবন্ধনের ফণিপতি পলাইয়া যাইতে থাকিলে শিব বসন-সম্বরণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; অদূরে পার্বতী অপাঙ্গবিক্ষেপসহ হাস্যমুখী হইয়া উঠিলেন।

পুরস্তাদানম্রত্রিদশপতিগারুত্মতমণের্
বতঃসত্রাসার্তেরপসরতি মৌঞ্জীফণিপতৌ।
পুরারিঃ সংবৃণ্বন্ বিগলদুপসংব্যানমজিনে
পুনীতাদ্বঃ স্মেরক্ষিতিধরসুতাপাঙ্গবিষয়ঃ ॥[১৫]

বঙ্গীয় কবিগণ অবশ্য ইহা লইয়া স্থূল রসিকতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। পার্বতী বা মেনকার ধৃত ঔষধ বা ওষধির ফলে সর্পগণের পলায়নে বিবাহ-বাসরেই তাঁহারা মহাদেবকে এয়োগণের মধ্যে দিগম্বর করিয়া ছাড়িয়াছেন।

১৩ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

১৪ সুভাষিতরত্নকোষ, মহেশ্বর-ব্রজ্যা।

১৫ সুভাষিতরত্নকোষ (অন্যান্য বহু সংকলনেও ধৃত)।

মহাদেবের আভরণ ও আচরণের মধ্যে বহু বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; মহাদেব সম্বন্ধে পার্বতীর চোখের দৃষ্টি ও মনের ভাবও তাই একই সময়ে অতি বিচিত্র। মহাদেব দিগ্বাস— পার্বতীর দৃষ্টি তখন লজ্জিত; মহেশ্বর মদনদ্বেষী— দেবী তাই মুগ্ধস্মিত; মহেশ্বর বিষমদৃষ্টিযুক্ত— দেবীর দৃষ্টি তাই সাশ্চর্য; মহেশ্বর কপালী— দেবী তাই ত্রস্ত; তাঁহার শিরে স্থাপিত জাহ্নবী— দেবীর দৃষ্টি তাই অসূয়াযুক্ত; সর্প মহেশ্বরের বলয়ীকৃত— দেবীর দৃষ্টি তাই সভয়; মহেশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেবীর দৃষ্টিতে যুগপৎ এতগুলি ভাবের বিকাশ।—

দিগ্বাসা ইতি সত্রপং মনসিজদ্বেষীতি মুগ্ধস্মিতং
সাশ্চর্যং বিষমেক্ষণোঽয়মিতি চ ত্রস্তং কপালীতি চ।
মৌলিস্বীকৃতজাহ্নবীক ইতি চ প্রাপ্তাভ্যসূয়ং হরঃ
পার্বত্যা সভয়ং ভুজঙ্গবলয়ীত্যালোকিতঃ পাতু বঃ॥[১৬]

ইহারই একান্ত অনুরূপ আর-একটি শ্লোক উদ্ধৃত দেখি বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলি'র মধ্যে।

সব্রীড়া দয়িতাননে সকরুণা মাতঙ্গচর্মাম্বরে
সত্রাসা ভুজগে সবিস্ময়রসা চন্দ্রেঽমৃতস্যন্দিনি।
সের্ষ্যা জহ্নুসুতাবলোকনবিধৌ দীনা কপালোদরে
পার্বত্যা নবসঙ্গমপ্রণয়িনী দৃষ্টিঃ শিবায়াস্তু বঃ॥[১৭]

নবসঙ্গম-প্রণয়িনী পার্বতীর দৃষ্টি ব্রীড়াযুক্ত দয়িতানন বিষয়ে, সকরুণ হস্তিচর্মের বসন দেখিয়া, ত্রাসযুক্ত সাপ দেখিয়া, সবিস্ময়রসযুক্ত অমৃতনিস্যন্দী চন্দ্র বিষয়ে, ঈর্ষ্যাযুক্ত জাহ্নবীকে অবলোকন করিয়া, আর দীনতা লাভ করিয়াছে কপাল দর্শনে।

মহেশ্বরের বিবিধ আভরণ ও বাহন অবলম্বন করিয়া রাজশেখর কবি আবার অন্যভাবে হর কর্তৃক দেবীসম্ভোগের বৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়াছেন।—

জটাগুল্মোৎসঙ্গং প্রবিশতি শশী ভস্মগহনং
ফণীন্দ্রো ঽপি স্কন্ধাদবতরতি লীলাঞ্চিতফণঃ।
বৃষঃ শাঠ্যং কৃত্বা বিলিখতি খুরাগ্রেণ নয়নং
যদা শম্ভুশ্চুম্বত্যচলদুহিতুর্বক্ত্রকমলম্॥

শম্ভু যখন অচলদুহিতার (পার্বতীর) মুখকমল চুম্বন করেন তখন চন্দ্র ভস্মগহন জটাগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ফণীন্দ্র তাহার ফণা সংকুচিত করিয়া স্কন্ধ হইতে অবতরণ করে, আর বাহন বৃষ তখন শঠতা অবলম্বন পূর্বক খুরাগ্রের দ্বারা নয়ন ঘষিতে থাকে।

প্রসন্নমনা দেবী স্বামীর সকলই সহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রণয়কুপিতা হইয়া তিনি অন্য রূপ ধারণ করিয়াছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-ধৃত ভগবদ্গোবিন্দের একটি শ্লোকে দেখি—

---

১৬ পিটার পিটার্সন সম্পাদিত।

১৭ শ্লোকটি সূক্তিমুক্তাবলীতে ঈষৎ পরিবর্তিত ভাবে ভাসের নামে পাওয়া যায়।—

ব্যানম্রা দয়িতাননে মুকুলিতা শার্দুলচর্মাম্বরে
সোৎকম্পা ভুজগে নিমেষরহিতা চন্দ্রে ঽমৃতস্যন্দিনি।
মীলদ্ভ্রূঃ সুরসিন্ধুদর্শনবিধৌ ম্লানা কপালোদরে
পার্বত্যা ইত্যাদি।

শিরসি কুটিলা সিন্ধুর্দোষাকরস্তব ভূষণং
সহ বিষধরৈঃ প্রত্যাসন্না পিশাচপরম্পরা।
হরসি ন হর প্রাণানেবং ন বেদ কথং ন্বিতি
প্রণয়কুপিতক্ষ্মাভৃৎপুত্রীবচাংসি পুনন্তু বঃ ॥[১৮]

'শিরে তোমার কুটিলা নদী, দোষের আকর (চন্দ্র) তোমার ভূষণ; বিষধরগণ সহ পিশাচপরম্পরা তোমার প্রত্যাসন্ন; হে হর, তুমি কেন প্রাণ হরণ করিতেছ না তাহা জানি না। প্রণয়কুপিতা পার্বতীর এই বচনসমূহ তোমাদিগকে পবিত্র করুক।'

শিবের বেশ-ভূষা প্রভৃতি লইয়া পার্বতীকে অত্যন্ত লজ্জায় পড়িতে হইয়াছে অন্য ভাবে। তাঁহাকে স্মিতমুখে লজ্জাবতী হইতে হইয়াছে একদিন যখন নিজের পুত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'মা পিতার জটায় সুরসরিৎ কেন, শেখরে কেন চন্দ্রমা, কপালে কেন অগ্নি, বুকে এবং কটিতে কেন লম্বিত সর্প? আর কেনই বা পিতার দুই জঘনমধ্যে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম?'

মাতস্তাতজটাসু কিং সুরসরিৎ কিং শেখরে চন্দ্রমাঃ
কিং ভালে হুতভুগ্ লুঠত্যুরসি কিং নাগাধিপঃ কিং কটৌ।
কৃত্তিঃ কিং জঘনদ্বয়ান্তরগতং যদ্দীর্ঘমালম্বতে
শ্রুত্বা পুত্রবচো২ম্বিকা স্মিতমুখী লজ্জাবতী পাতু বঃ ॥[১৯]

কালিদাসের বর্ণনায় এবং পরবর্তী কালের বহু কবির বর্ণনায় দেখা যায় বটে, শিবের সকল বিসদৃশ এবং বিরূপ বর্ণনা সত্ত্বেও শিববিষয়ে গৌরীর 'ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং', কিন্তু অপর দুই-এক কবির বর্ণনায় দেখিতে পাই এমন স্বামীর ঘর তিনি কিভাবে করিবেন এই চিন্তায় গৌরী কাতরা।

সন্ধ্যারাগবতী স্বভাবকুটিলা গঙ্গা দ্বিজিহ্বঃ ফণী
বক্রাঙ্গৈর্মলিনঃ শশী কপিমুখো নন্দী চ মূর্খো বৃষঃ।
ইত্থং দুর্জনসংকটে পতিগৃহে বস্তব্যমেতৎ কথং
গৌরীত্থং নৃকপালপাণিকমলা চিন্তান্বিতা পাতু বঃ ॥

দেবীর পতিগৃহে এক দিকে সতিনী গঙ্গা; তিনি এক দিকে যেমন অত্যন্ত রাগবতী (সন্ধ্যাকালে গঙ্গা রাগবতী বা রক্তিমবর্ণবতী হইয়া ওঠেন, গঙ্গাদেবীর স্থলে সেই সন্ধ্যারাগই তাঁহার পতিপ্রতি অনুরাগের দ্যোতনা), তেমনই তিনি আবার স্বভাবকুটিলা; স্বামীর সঙ্গে আছে দ্বিজিহ্ব সর্প; চূড়ায় আছে চন্দ্র— যাহা বক্রতাহেতু মলিন; আর আছে বানরমুখ নন্দী— আর আছে একটি মূর্খ বৃষ! আর যে গৌরীর কমলের ন্যায় হস্ত তাহাতে আছে একটি নরকপাল! ইহা লইয়াই তাঁহাকে করিতে হইবে স্বামীর ঘর!

দেবীকেই শুধু চিন্তান্বিতা দেখিতে পাই তাহা নহে, অনুচর ভৃঙ্গীরও ভিক্ষাবৃত্তিনির্ভর ভর্তা শিবের সম্বন্ধে উদ্বেগ কম নহে। এক দিন কার্তিক পিতৃগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে বাহির হইয়া আসিলে ভৃঙ্গী একটু ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে, কোথা হইতে আসিতেছ'? কার্তিক বলিল, 'তাতগৃহ হইতে'। ভৃঙ্গী বলিল, 'বল দেখি সেখানকার নূতন কি বার্তা!' কার্তিক বলিল, 'দেবীকর্তৃক

১৮ সুভাষিতরত্নকোষ, মহেশ্বর-ব্রজ্যা।

১৯ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

দেব জিত হইয়াছেন।' শুনিয়া ভৃঙ্গীর মেজাজ খারাপ হইয়া গেল ; আরও বক্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'জিতিয়া কি কি পাইয়াছে বল না, একটি বৃষ? আর ডমরু? খানিকটা চিতাভস্ম, আর সাপ আর চন্দ্র?' ভিক্ষাবৃত্তি শিবকে জয় করিয়া ইহার অধিক আর কি-ই বা পাওয়া যাইতে পারে!

কস্মাত্ত্বং, তাতগেহাৎ, অপরমভিনবা ব্রূহি কা তত্র বার্তা,
দেব্যা দেবো জিতঃ, কিং বৃষ-ডমরু-চিতাভস্ম-ভোগীন্দ্র চন্দ্রান্।
ইত্যেবং বর্হিনাথে কথয়তি সহসা ভর্তৃভিক্ষা-বিতৃষ্ণা-
বৈগুণ্যোদ্বেগজন্মা জগদবতু চিরং হা-রবো ভৃঙ্গরীটেঃ ॥[২০]

হরকণ্ঠলম্বিত সর্পের প্রসঙ্গে পার্বতী সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিতে'।

হরকণ্ঠগ্রহানন্দমীলিতাক্ষীং নমাম্যুমাম্।
কালকূটবিষস্পর্শজাতমূর্ছাগমামিব ॥

'হরের কণ্ঠগ্রহণে আনন্দে নিমীলিতাক্ষী উমাকে নমস্কার করিতেছি—যাঁহাকে মনে হয় কালকূটবিষের স্পর্শের দ্বারা মূর্ছাগতার ন্যায়।'

হরচূড়ালগ্ন খণ্ডচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে ধর্মপাল কবির।

স পাতু বিশ্বমদ্যাপি যস্য মূর্ধ্নি নবঃ শশী।
গৌরীমুখতিরস্কার-লজ্জয়েব ন বর্ধতে ॥

গৌরীমুখের দ্বারা তিরস্কৃত হইবার ভয়ে শিবের চূড়ার চন্দ্র চিরকাল নব চন্দ্র বা বাল চন্দ্রই রহিয়া গেল, আর বাড়িল না।

পরবর্তী কালের বাঙলা ও অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের ভিতরে পার্বতীর সংসারের আর একটি ঝঞ্ঝাট দেখিতে পাই, তাহা হইল পার্বতীর সংসারের পরিজনগণের বাহন লইয়া। আমাদের বাঙলা মঙ্গল-কাব্য, শিবায়ন, পাঁচালী প্রভৃতিতে দেখিতে পাই এইসব বাহন লইয়াও দেবীকে কম ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে[২১] দেখি—

বাপের সাপে পোয়ের ময়ুর সদা করে কেলি।
গণার মুষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গালি ॥
বাঘ-বলদে দ্বন্দ্ব সদা নিবারিব কত।
অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত ॥
ময়ুর মুষায় দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বি সদাই কন্দল।
ওই নিমিত্তে সদা গালি মোর কর্মফল ॥

অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বর্ণনা বহু দেখিতে পাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির হরপার্বতী-বিষয়ক পদগুলির মধ্যে এ-বিষয়ে একটি পদ দেখিতে পাই।—

আই তঁ সুনিঅ উমা ভল পরিপাটী।
উমগল ফিরে মূস ঝোরী মোর কাটী ॥

---

২০ সুভাষিতরত্নকোষ।
২১ প্রথম ভাগ।

ঝোরীরে কাটিএ মূস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈসল সুরসরি জল পীবে॥
বেটারে কাতিক এক পোসল মজুর।
সেহো দেখি ডর মোর ফনিপতি ঝুর॥
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা।
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা॥[২২]

'আজি শুনি উমা ভাল পরিপাটী; ছুটাছুটি করিয়া ফিরে মূষিক আমার ঝুলি কাটিয়া। ঝুলি কাটিয়া মূষা জটা কাটিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, আর মাথায় বসিয়া গঙ্গার জল পান করিবে। বেটা কার্তিক পুষিল এক ময়ূর, তাহাকে দেখিয়া ডরে আমার ফণিপতি (সাপ) কাঁদিতে থাকে। তুমি যে পুষিলে গৌরী মোটা এক সিংহ, তাহাকে দেখিয়া ডরায় আমার বৃষটি।'

বাহন লইয়া এই পারিবারিক গোলমালের আভাস খানিকটা সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি হরের ফণী আর গুহের (কার্তিকের) শিখী লইয়া গোলমাল।

ফণিনি শিখিগ্রহকুপিতে
শিখিনি চ তদ্দেহবলয়িতাকুলিতে।
অবতাদ্বো হরগুহয়ো-
রুভয়পরিত্রাণকাতরতা॥[২৩]

অন্য শ্লোকে দেখিতে পাই সিংহের নিকট হইতে বৃষকে এবং ময়ূর হইতে সর্প রক্ষার সমস্যা।

চর্চায়াঃ কথমেষ রক্ষতি সদা সদ্যোনুমুণ্ডস্রজ
চণ্ডীকেশরিণো বৃষং চ ভুজগান্ স্নোর্ময়ূরাদিতি।

কিন্তু এতসব ঝঞ্ঝাটের পরেও আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠি যখন একটি শ্লোকে দেখিতে পাই বিবাহের পরে মা পার্বতীর প্রভাবে বিবাগী ছন্নছাড়া শিব আবার রীতিমতন ঘরগৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

উজ্ঝিত্বা দিগমম্বরং বরতরং বাসো বসানশ্চিরং
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাসহর্ম্যাশ্রয়ঃ।
ত্যক্ত্বা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগনিচয়ঃ শ্রীখণ্ডসারদ্রবৈ-
র্দেবঃ পাতু হিমাদ্রিজাপরিণয়ং কৃত্বা গৃহস্থঃ শিবঃ॥

পার্বতীকে বিবাহ করিয়া শিব দিক্-রূপ অম্বর পরিত্যাগ করিয়া ভালো বসন পরিধান করিলেন, শ্মশানবাস পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসের হর্ম্য আশ্রয় করিলেন; ভস্ম পরিত্যাগ করিয়া চন্দন-সারের দ্বারা অঙ্গবিলেপন করিতে লাগিলেন; এইভাবে শিব গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন।

---

২২ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদারের সংস্করণ।

২৩ সুভাষিতরত্নমহাকোষ।

বৌদ্ধধর্ম ও তার নানা শাখা

শ্রীঅরুণা হালদার

ভূমিকা

বুদ্ধজয়ন্তীর উৎসব-সূত্রে বৌদ্ধধর্মের মানবিকতার দিক, আধুনিক পঞ্চশীল, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি জাগতিক শ্রেয়ঃ প্রতিষ্ঠায় এবং সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের শিল্পগত কৃতিত্বের সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পেরেছি। এসব সম্পর্কে কিছু নূতন গ্রন্থ, প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্রও জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রণীত বা প্রচারিত হয়েছে। বুদ্ধের জন্মভূমি বুদ্ধদেব ও তাঁর ধর্মকে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে পুনরাবিষ্কার করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসরণ করে ভারতীয় বিদ্বজ্জনও সেই লুপ্তপ্রায় সুমহৎ ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে লোকচক্ষে তুলে ধরেন। বর্তমানে আশা করা যায় ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) ভারতরাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করে নবায়মান বৌদ্ধধর্ম মানবিকতার এক নূতন মহাশক্তি হয়ে উঠবে। হয়তো এতে তার পূর্বতম তত্ত্বরূপও কতকটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। অন্ততঃ ষড়্‌দর্শনের অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধনীতির মধ্যে মানবকল্যাণের একটা আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর, এরূপ ক্রমপরিবর্তনশীলতা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও তত্ত্বের পক্ষে একান্ত আকস্মিক নয়।

বর্তমান ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিচয়

বৌদ্ধধর্মের সাধারণ পরিচয় আমরা গত এক শত বৎসরে যা লাভ করেছি তা পর্যাপ্ত নয়। ভারতীয় চিন্তারই এক বিশিষ্ট ধারা হলেও অন্যান্য ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একটা বিরোধ পূর্বাপর বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। মনে হয় শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কোপেই বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি থেকে অতীতে নির্বাসিত হয়ে যায় নি। হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মকে কতকাংশে ভারতের বাইরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। পরবর্তী শাখা, নবীন বৌদ্ধধর্মের মহাযান ও তন্ত্রমতাবলম্বী শাখা দেখে এরূপ অনুমান অসংগত হবে না যে, সেসব কতকটা হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপস-রফার ফল। সেই সঙ্গে অনেক হিন্দু দেবদেবীকেও স্বীকৃতি দান ও তন্ত্রমতের সাধনাও পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এসকলের আরও একটি কারণ অনুমান করা যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন দিকটি সত্যই বুদ্ধি-আশ্রিত ও যুক্তিবাদী। তার মননশীলতা ও তীক্ষ্ণ যৌক্তিকতায় বারবার তৎকালীন ন্যায়দর্শন ও পরবর্তী বেদান্তদর্শনকে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু, পরেকার যুগের বৌদ্ধধর্মের রূপ দেখে মনে হয়, দেশকালপাত্র বিবেচনা ক'রে হয়তো বৌদ্ধধর্ম তার বুদ্ধিগত দিকটির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সহজলভ্য হৃদয়গত আচারকেও নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। তার ক্রমপরিবর্তমান মহৎ সঞ্জীবতার এও একটা কারণ বলা যায়। আবার, অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে গিয়ে পড়লেও বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক জৈনধর্ম কিন্তু যে করে হোক হিন্দুধর্মের পাশাপাশিই একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও বৌদ্ধমত

বৌদ্ধধর্মের পরম্পরা কত বৎসর পূর্বে ভারত থেকে লোপ পেয়েছিল তা বলা কঠিন। হিন্দুদর্শনের সংস্কৃত গ্রন্থাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পরম্পরা টোল ও চতুষ্পাঠীর মধ্য দিয়ে এখনও চলে আসছে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শন

পালি বা সংস্কৃত যে ভাষাতেই লেখা হোক, তার পঠন-পাঠনের সেরূপ ব্যবস্থা বহুদিন ধরে প্রায় ছিল না। 'ন্যায়বিন্দু'র মত জটিল বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ পূর্বপক্ষী ন্যায় হিসাবেই কাশীতে ন্যায়-পরীক্ষার্থীকে পড়তে হয়। বৌদ্ধদর্শনের যেসকল গ্রন্থ সংস্কৃতে লেখা তারও প্রমেয়-ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির ; সেই সংস্কৃত ভাষাও ভিন্ন ধরণের। এসব কারণে হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নে অনেকেই উৎসাহবোধ করেন না। তা ছাড়া, সংস্কৃতাশ্রয়ী পণ্ডিতেরা অনেকেই পালি জানেন না। এসব অসুবিধার জন্যই আমাদের কাছে বৌদ্ধধর্মের একটা সামগ্রিক পরিচয় লাভ সহজ হয় নি। পণ্ডিতেরা অনেকেই এরূপ মত পোষণ করেন যে, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একই মূল থেকে উদ্ভূত। উপনিষদের মধ্যেও বলা হয় বৌদ্ধধর্মের বীজ আছে। এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে অসুবিধা ঘটে। কারণ সকল হিন্দুদর্শনের গোড়ার কথাই হল স্থিরাত্মা বা স্থির সত্তাবাদে বিশ্বাস। অপরদিকে বৌদ্ধদর্শন আত্মাকেই অস্বীকার করে এবং ঈশ্বরকারণতাবাদও মানে না। উপনিষদের সঙ্গে তার সামান্য একটু মিল যে না পাওয়া যায় তা নয়। উপনিষদের যুগে 'বানপ্রস্থ' ও 'যতি' কথাগুলি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখনও লোক সংসার ছেড়ে অধ্যাত্মচর্চা করতে যেত। সেই অবস্থার নামই বানপ্রস্থ ও যতি। বুদ্ধের সমকালেও যে তীর্থিক, পরিব্রাজক, কাপালিক প্রভৃতি ত্যাগী বৈরাগীর দল ছিলেন তার কথা বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। সংঘ গণ প্রভৃতি কথাও পাওয়া যায়। অর্থাৎ বুদ্ধ যখন ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপন করেন তখনও তা পূর্বাপর পরম্পরা থেকে একেবারে পৃথক ছিল না, এ কথা বলা যায়। বরঞ্চ এরূপও ধরা যেতে পারে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আরও পূর্বতন কোনো আচার বা ক্রিয়াকাণ্ড সাম্প্রদায়িক দলের মাধ্যমে কিংবা তন্ত্রের মাধ্যমে এসে পড়েছে। বিশেষভাবে এ কথা মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতগুলির পরবর্তী অবস্থার ভগ্ন রূপ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে।

অপরপক্ষে, মহাযান বৌদ্ধমতের প্রাচীনতর রূপ মাধ্যমিক দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে শূন্যতা-প্রতিপাদন দর্শন-জগতে এক মহৎ অবদান। শাংকর-দর্শনের উপর সেই মাধ্যমিক দর্শনের, শুধু ছায়াপাতই নয়, একরকম স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করার মত। অবশ্য বিদ্বদ্মণ্ডলীর মধ্যে এ কথা নিয়ে বহু মতভেদ বিদ্যমান কিন্তু বিশ্বাসের অবলম্বন বাদ দিয়ে সাংস্কারিক তথ্যবিচারে এ কথা স্বতঃই মনে হয় যে, শাংকর-বেদান্তের ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে যে বিবর্ত সৃষ্টি তা অন্তঃসারহীন এবং এজন্যই তা শূন্য। ব্রহ্ম বস্তুকে শংকর বিধির উপায়ে সতর্ক ভাবে স্থাপন করার সময়ও তাঁর দর্শনের কাঠামোটি যে বৌদ্ধমত-অনুস্যূত এ কথা ভুলতে পারেন নি— এমন প্রমাণ তাঁর শারীরক ভাষ্যের বহু স্থানে মিলবে। প্রাচীন ন্যায়মত ও বেদান্তমত উভয়েই বৌদ্ধ দার্শনিকের যুক্তিকে সচেষ্ট সাবধানতায় খণ্ডন করতে যেভাবে তৎপর হয়েছে, তার গতিবিধি লক্ষ্য করার মত। এ থেকে মনে হয় হিন্দু-দর্শনকে বারম্বার বৌদ্ধ যুক্তির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করতে হয়েছে। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের অবলোপের সঙ্গে এ বিরোধিতার সম্পর্ক আছে কি না তা ভেবে দেখার মত।

পালিতে লেখা বৌদ্ধশাস্ত্র

ভারতের বাইরে নানাস্থানে বৌদ্ধমত ছড়িয়ে থাকলেও তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা সম্রাট অশোকের পূর্বে লিখিতভাবে পাই না। অশোকের সময়েই মহাস্থবির তিষ্যের নেতৃত্বে 'তৃতীয়া মহাসংগীতি' উদ্‌যাপিত হয়। সিংহলের পালিভাষার গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'চুল্লবগ্‌গ'। এই পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির সঙ্গে অশোক-পুত্র (মতান্তরে, ভ্রাতা) থের মহেন্দ্রের নাম জড়িত। মহেন্দ্র সিংহল

যাবার পূর্বে মালবের শাসক ছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে পালিভাষার রূপ হল মালব বা উজ্জয়িনী অঞ্চলের কোনো তাৎকালিক স্থানীয় ভাষা। এ কথা ভাবা চলে যে, বুদ্ধভক্ত মহেন্দ্র মালব-দেশের কথ্য ভাষাতেই লেখা শাস্ত্রগ্রন্থাদি নিয়ে সিংহলে যান। রিস ডেভিড্‌স্ দম্পতি প্রমুখ অন্যান্য পাশ্চাত্য বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এই পালিভাষায় লেখা গ্রন্থাদির সাহায্যেই বর্তমান যুগে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের একটা পরিষ্কার রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সিংহলে চট্টগ্রামে ব্রহ্মে শ্যাম-কাম্বোজে এই পালি ত্রিপিটক যাঁরা মানেন তাঁরা প্রায় সকলেই স্থবিরবাদী বা থেরবাদী বৌদ্ধ। মহেন্দ্র-প্রচারিত শাস্ত্রগ্রন্থই উত্তরকালে বর্ধিত কলেবর ত্রিপিটক হয়ে ওঠে। চুল্লবগগ অন্যান্য বৌদ্ধসংগীতিগুলিরও উল্লেখ আছে, সেকথা পরে বলা যাবে। স্থবিরবাদের উদ্ভবকাল বুদ্ধনির্বাণের আনুমানিক শতবর্ষকালের মধ্যে এ কথা বলা যায়।

সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধশাস্ত্র

অপর দিকে বৌদ্ধশাস্ত্রের কিছু কিছু সংস্কৃতে লেখা অংশ পাওয়া গেল নেপালে, তিব্বতে, মধ্য-এশিয়াতে, মঙ্গোলিয়াতে। কিছু অংশ পাওয়া গেল চীনা ভাষায় সম্পাদিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে চীনে ও জাপানে। এসব তথ্য দেখে মনে হয়— এককালে কাশ্মীর গান্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের কোনো কোনো শাখার বহু প্রচলন ছিল। এ সকল শাখারও ত্রিপিটক ছিল, তা সংস্কৃতে লেখা। সেই বৌদ্ধধর্ম ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের পথানুসরণ করে ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার সীমান্ত দেশগুলি পার হয়ে মধ্য-এশিয়া ও মঙ্গোলিয়া হয়ে চীন জাপান কোরিয়ায় প্রসারিত হয়ে যায়। কিছুকাল মাত্র পূর্বে আফগান-সীমান্তে আরামাইক ভাষায় লেখা অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। আরামাইক ভাষা ছিল ইহুদী জাতির প্রাচীন কথ্য ভাষা। সেই সমাজেও এককালে বৌদ্ধমতের প্রচার ছিল এ তথ্য তাই প্রমাণ করে। কালক্রমে বৌদ্ধশাস্ত্রের ঐসকল সংস্কৃতগ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেলেও চীনা কিম্বা অন্য দেশীয় ভাষায় অনূদিতরূপ এখনও পাওয়া যায়। কাশ্মীর অঞ্চলে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের স্থান অধিকার করে শৈবধর্ম। শৈবতন্ত্রমতের এই কাশ্মীর-প্রচলিত রূপটি অনুধাবন করলে দেখা যায় তার মধ্যেও বৌদ্ধদর্শনের মূলীভূত সারাংশ, 'পরিবর্তমানত্ব' (dynamism), রয়ে গেছে। 'শিবসূত্রভাষ্য' গ্রন্থের সংস্কৃতভাষাও সাধারণ সংস্কৃতভাষার রূপ থেকে কতকটা ভিন্ন। বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের সংস্কৃতভাষায় লেখা কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়; বর্তমানে উৎসাহী পণ্ডিতেরা কেউ কেউ চীনা বা তিব্বতী অনুবাদ থেকে কতক গ্রন্থের সংস্কৃত-ভাষান্তর পুনর্গঠন করেছেন; কতক গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষাও একটু পৃথক। আধুনিক পণ্ডিতেরা এ ভাষাকে Hybrid Buddhist Sanskrit ভাষা নাম দিয়েছেন।

আধুনিক যুগ

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে (Burnouf) বুর্নুফের গ্রন্থে, এবং শেষভাগে (Kern) কের্নের রচনায় বৌদ্ধধর্মের এই লুপ্তপ্রসার সংস্কৃত শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। তার পরই আচার্য শার্বৎস্কী ও সিলভ্যাঁ লেভির অভ্যুদয়। ভারতেও তখন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের বৌদ্ধধর্মের রূপ আবিষ্কার করেছেন। শরৎচন্দ্র দাস ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ পথে আরও অগ্রসর হলেন। তারও পরে বেলজীয় পণ্ডিত লুই দ্য লা ভ্যালি পুসাঁ, জাপানী পণ্ডিত ড. টাকাকুসু, সুজুকি, ও ওয়গীহারা, প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্‌গণের উদ্যমে বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হল। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক তুচ্চি,

আচার্য বিধুশেখর ভট্টাচার্যশাস্ত্রী, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, ত্রিপিটকাচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন, লুই দ্য লা ভ্যালি পুসাঁর সুযোগ্য ছাত্র ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত, ড. নরেন্দ্রনাথ লাহা, ড. বিমলাচরণ লাহা প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় তিব্বতী ও চীনা থেকে অনূদিত বহু গ্রন্থ ও প্রাচীন বৌদ্ধমতের বহু লুপ্ত শাখাও জনসমাজের কাছে ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠল। তথাপি, ভাষার অসুবিধার জন্যও কতক পরিমাণে এসব গ্রন্থ ও তথ্য সাধারণভাবেই দুরধিগম্য রয়ে গেছে। তিব্বত ও নেপালে প্রাপ্ত পুঁথির এক বিরাট সংগ্রহ ত্রিপিটকাচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন আনয়ন করেন; সেগুলির অনেক অংশই অপঠিতভাবে চীনা ও তিব্বতী ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের পাঠোদ্ধারের প্রতীক্ষায় পাটনা মিউজিয়ম ভবনে বিহার রিসর্চ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আছে। কবিগুরুর আনুকূল্যে শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ধরে বৌদ্ধ শাস্ত্রানুশীলনের ও চীনা ভাষা অধ্যয়নের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে অভিধর্মসমুচ্চয়ঃ, সম্মিতীয় নিকায়শাস্ত্র, ও জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্রের মত মহাগ্রন্থের কিয়দংশ বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের দ্বারা সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। নবনির্মিত নালন্দা পালি ইনস্টিট্যুট ও মিথিলা সংস্কৃত ইনস্টিট্যুটও যত্ন সহকারে কিছু কিছু বৌদ্ধগ্রন্থ সম্প্রতিকালে সম্পাদনা করেছেন। এ কথা বলা প্রয়োজন যে, এইসকল শাস্ত্রগ্রন্থ ও পূর্বোক্ত পালিভাষায় লেখা শাস্ত্রগ্রন্থের মর্মার্থ পরস্পর একেবারে পৃথক না হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের দ্বারাই অধীত ও অনুশীলিত হত। সংস্কৃতে লেখা শাস্ত্র যেসকল বৌদ্ধেরা প্রণয়ন করেন তাঁরা স্থবিরবাদী নন। সেই বৌদ্ধরা অনেকেই 'অষ্টাদশ নিকায়ে'র বা আঠারোটি ভিন্ন ভিন্ন মতের সমর্থক। বিভিন্ন গ্রন্থের মত পর্যালোচনা করে একটি সাধারণ সত্য আমাদের কাছে জেগে ওঠে: বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা বহু পরিমাণে নির্ভর করে পালি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় লেখা শাস্ত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও অনুশীলনের উপর। বর্তমানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের এই সামগ্রিক রূপটির ইতিহাস পুনরালোচিত হতে দেখা যাচ্ছে। বৌদ্ধধর্মের নানা-শাখাবিহারী এ রূপটিও বিচিত্র। আর, মনে হয়, এই পরিবর্তমান বৈচিত্র্যও বৌদ্ধধর্মের সজীবতারই আর একটি লক্ষণ।

বৌদ্ধদর্শনের পশ্চাৎপট

বৌদ্ধধর্মের পুনর্গঠিত ইতিহাসের মালমসলা উৎকীর্ণ লিপি বাদ দিলে বেশির ভাগই এসেছে ভারতের বাইরে থেকে। শাস্ত্রগ্রন্থ ও তার উপর লেখা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আলোচনা-গ্রন্থ সমন্বয় করে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রাবাহিক রূপকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের বড় বড় দুটি তথাকথিত শাখাকে পণ্ডিতেরা কেউ কেউ দক্ষিণী মত ও উত্তরাপথের মত বলেছেন (Southern and Northern Buddhism); কেউ বলেছেন পালি বৌদ্ধ শাখামত ও সংস্কৃত বৌদ্ধ শাখামত (Pali and Sanskrit Buddhism); ধর্মমতের দিক থেকে তথাকথিত হীনযান ও মহাযান মতও সুপ্রচলিত। বলা বাহুল্য পরবর্তী যুগের মহাযানী মতের লোকেরাই প্রাচীনতর বৌদ্ধমতের রূপকে 'হীনযান আখ্যা' দিয়েছিলেন। প্রাচীন মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা কেহই নিজেদের হীনযানী বলেন না। অপরদিকে এই প্রাচীনপন্থীরা মহাযানীদের নিকায়গত অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। বলা প্রয়োজন যে, মহাযানীগণের ত্রিপিটক নেই। অবশ্য এ কথাও লক্ষণীয় যে, বৌদ্ধমতের প্রথম যুগে ত্রিপিটক কেন, পিটক কথাটাই প্রায় অশোকপূর্ব-শাস্ত্রে নেই। মহাযানীদের শাস্ত্র প্রজ্ঞাপারমিতা। প্রথম শতাব্দীর দার্শনিক নাগার্জুনের লেখা মূলমাধ্যমিককারিকা তাঁদের অন্যতম মূল দার্শনিক গ্রন্থ।

সাধারণভাবে শোনা যায় যে, আচার ও কৃত্যভেদে মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধমত স্বীকৃত হয়। ইতিহাসের দিক থেকে এই দুই মতের সৈদ্ধান্তিক নির্ণয় ঠিক করা যায় না। ত্রিপিটকের অন্যতম অভিধর্মপিটকে সূত্রপিটকের দার্শনিক মীমাংসা দেওয়া আছে। অভিধর্মমতে শ্রাবকযান, প্রত্যেক বুদ্ধযান ও সম্যকসম্বুদ্ধযান তিনটিই গৃহীত হয়। সমাধি ও পুণ্যসঞ্চয়ের তারতম্য অনুসারে এই তিনমার্গের মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধযানকে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়। সেইজন্যই তা 'মহাযান'। পরবর্তীকালে আবির্ভূত মহাযানী মতাবলম্বীগণ অন্য দুটি পন্থাকে 'হীনযান' আখ্যা দিয়েছেন ; এটি ত্রিপিটকাচার্য রাহুল-সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ অনেকের মত। অপর পক্ষে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের মতে মহাযান মতের উৎস—'মহাসাংঘিক' বৌদ্ধমতের একটি শাখা লোকোত্তরবাদ। এই লোকোত্তরবাদীদের দর্শনের সঙ্গে মহাযানী দর্শনের প্রচুর মিল দেখে এরূপই ডক্টর বাগচী অনুমান করেন। কিন্তু, মহাসাংঘিকদের বিনয়গ্রন্থ 'মহাবস্তু' মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গেছে। তা দেখে রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের ধারণা হয়েছে যে, মহাসাংঘিকদের সঙ্গে বরঞ্চ স্থবিরবাদেরই মিল বেশি ; আর সাধারণভাবে স্থবিরবাদীকেই হীনযানী বলা হয়। সুতরাং হীনযান-মহাযান সমস্যার সমাধানে মহাসাংঘিকদের অবদান খুব বড় নয়। অবশ্য বিনয়গ্রন্থের মিল দেখে কিছু স্থির করা কঠিন। কারণ 'বিনয়' হল আচার নিয়ম পালন করার বিধিনিষেধ ; সেক্ষেত্রে সকলের পক্ষেই বিনয়গ্রন্থ একরকম হওয়ার সম্ভাবনা। আসলে প্রভেদ ধরা যায় অভিধর্ম বা দার্শনিক সিদ্ধান্তের রূপ থেকে। কিন্তু মহাযানীদের ত্রিপিটক নেই, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বৌদ্ধমতের চার প্রস্থান

বর্তমানে সাধারণভাবে স্থবিরবাদী বৌদ্ধ ছাড়া সকলকেই মহাযানী বলা হয়। মহাযানমতে শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে সম্যক্‌সম্বুদ্ধত্ব লাভ করার উপদেশ দেওয়া হয়। বোধিসত্ত্ব-পূজা মহাযানমতে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরে তাই নেপাল তিব্বত চীন প্রভৃতি দেশে প্রচলিত বহু দেবদেবীর ও প্রথম দুটি দেশে প্রচারিত হিন্দুতন্ত্র ও হিন্দু দেবদেবীর পূজানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। নেপালে তিব্বতে বঙ্গদেশে এইভাবে তান্ত্রিক মতের মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি বৌদ্ধমতগুলি গড়ে ওঠে। বাংলাভাষার প্রাচীনতম রূপ চর্যাপদ গ্রন্থে সন্ধ্যাভাষায় লেখা চর্যাগীতির মধ্যে বৌদ্ধমতের এই ক্ষীয়মান বিকৃত রূপ লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবমতের প্লাবনে ও শৈবমতের তন্ত্রসম্মত সাধনায় পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে ভারতের দক্ষিণে ও পশ্চিমে সর্বত্র বৌদ্ধধর্মকে নির্জিত করে, করে কতকাংশ নিজের সঙ্গে মিশিয়েও নেয়। হয়তো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্রমক্ষয়মান বৌদ্ধধর্মকে বৌদ্ধ-সহজিয়ামত, আউল বাউলের গান, বা নাথযুগী সম্প্রদায়ের সাহিত্যে আর চিনতেও পারা যাবে না বা হিন্দুধর্মেরই অঙ্গীভূত রূপ বলে মনে হবে। কারণ, সত্যই তার মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সুতীক্ষ্ণ মনীষা ও গভীর সত্যবোধ ও যুক্তির অনুশীলন দেখা যায় না ; আর সত্যকথা বলতে গেলে বৌদ্ধধর্মের বোধি বা প্রজ্ঞা একপ্রকারের নিরন্বয় 'যুক্তিবাদ' (Pure Rationalism)। মহাযানমতের অর্বাচীন শাখাগুলির হৃদয়বত্তার অমার্জিত অনুষ্ঠান থেকে তার রূপ একেবারে পৃথক। হয়তো এককালে স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিয়মেই তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে একটা হৃদয়ের চাহিদা উঠেছিল ; তথাকথিত হীনযানমতের উচ্চ আদর্শ ও যুক্তিনিষ্ঠা সর্বসাধারণের প্রাপ্য ছিল না। নিশ্চয়ই তথাগত নিজেও উচ্চ কুলজ শিক্ষা-দীক্ষা

ও ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর সময় ও তাঁর নির্বাণের অব্যবহিত পরেও সংযমের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠার কড়াকড়ি ছিল। সেই নিষ্ঠা কালক্রমে দেশাচারপ্রভাবে শিথিল হয়ে আসে। হৃদয়ের চাহিদায় 'পূজা'ও অনুষ্ঠিত হয়; এবং পরিশেষে তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রথার আরও বিকৃতি দেখা দেয়।

অবশ্য এ কথা বললেও ভুল বলা হবে যে, মহাযানমত মানেই বিকৃত, বা সর্বত্রই তা হীনযানমতের থেকে সম্পূর্ণ পৃথগীকৃত। প্রাচীন মহাযানী দার্শনিক নাগার্জুন ও তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ মূল মাধ্যমিক কারিকার নাম পূর্বেই করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে মৈত্রেয় শিষ্য অসঙ্গ ও তাঁর ভ্রাতা বসুবন্ধুর লেখা শাস্ত্রগ্রন্থ উচ্চাঙ্গের রচনা। অবশ্য বসুবন্ধু জীবনে প্রথম যুগে হীনযানী ছিলেন। তাঁর অভিধর্মকোশ কারিকা ও কোশভাষ্য সর্বাস্তিবাদ বৌদ্ধমতের প্রামাণিক গ্রন্থ। অধুনা ফ্রাউওয়ালনার প্রমুখ কেউ কেউ দুই বসুবন্ধু দুই পৃথক্ কালের লোক বলে বলেছেন। কিন্তু ড. টাকাকুসু ও উইনটারনীট্জ্ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে একই বসুবন্ধু প্রথমজীবনে হীনযানী ছিলেন ও পরে মহাযানী হন। এই মতই অধিকতর উপযোগী মনে হয় দুই কারণে— যথা, তখনকার দিনের সুলিখিত ইতিহাস না থাকায় সন-তারিখের নির্দেশ যথার্থ নয়, এবং হীনযান ও মহাযান, দুই দার্শনিক মত স্বাভাবিক নিয়মেই পাশাপাশি গড়ে উঠছিল। সুতরাং দুই বসুবন্ধুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করার চেয়ে একই বসুবন্ধু প্রথমে যুক্তিবাদী ও পরে কতকটা অধ্যাত্মবাদী হয়ে পড়েন এরূপ অনুমানই যুক্তিসহ। বসুবন্ধুর কথা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহাযানী মতে এক শাখা শূন্যবাদের প্রবর্তক নাগার্জুন; অপর শাখায়, যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদের দার্শনিক অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু। হীনযানের দুটি প্রধান শাখার একটি হল বৈভাষিক ও অপরটি সৌত্রান্তিক; বৈভাষিক মত অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর। এ দুটি মতের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য শাখা মতের কথা পরবর্তী প্রসঙ্গে দেওয়া গেল। বৈভাষিকগণ 'বিভাষা গ্রন্থে'র নির্দেশে চলেন। এককালে মথুরা গান্ধার কাশ্মীরে এ মতের বহুল প্রচলন ছিল। সৌত্রান্তিকেরা সূত্রমাত্রে বিশ্বাসী। আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রত্যেক মতই নিজের সম্প্রদায়কে বুদ্ধবচনের যথাযথ নির্দেশে চালিত বলে মনে করেন। আর তা সত্ত্বেও এই চারিটি মতের প্রধান প্রধান দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভিন্ন হয়ে উঠেছে। যেমন, বৈভাষিক মতে সংসারও সত্য আর নির্বাণও সত্য। সৌত্রান্তিকদের সিদ্ধান্ত হল সংসার সত্য কিন্তু নির্বাণ অসৎ বা প্রজ্ঞপ্তি সৎ। বলা বাহুল্য এই দুটিই হীনযানী মত, তাই প্রাচীনতর বৌদ্ধমতের দুই রূপ। শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক দর্শনের মতে সংসার ও নির্বাণ উভয়েই সর্বদা অসৎ। আর যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদের মত হল— সংসার অসৎ কিন্তু নির্বাণই সৎ। শেষোক্ত দুটি মত মহাযানী। মাধ্যমিক দর্শনের উদ্ভব প্রথম-দ্বিতীয় শতকে— যোগাচার মতের আবির্ভাব তারও আনুমানিক দুই শতাব্দী পরে। ভারতের বৌদ্ধধর্মের চার প্রস্থানের এই হল সংক্ষিপ্ত রূপ।

চার প্রস্থানের পারস্পরিক সাপেক্ষতা

উপরি উক্ত এ চার প্রস্থানের যথার্থ পরিচয় পেতে গেলে বলতে হয়— মহাযানী মতের অন্তর্ভুক্ত যোগাচারী শাখার গ্রন্থই প্রধান উপায়। ন্যায়দর্শনের মত 'প্রমেয়'গুলির ঘাট বেঁধে নিয়ে যুক্তি বিন্যাস করার প্রথা নিশ্চয় বৌদ্ধ দর্শনেও অনুসৃত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, যুক্তির ক্ষেত্রে প্রমেয়-পদার্থের খণ্ডন মণ্ডনে উপরি উক্ত চার প্রস্থানের অবশ্য তারতম্য আছে। সাধারণতঃ যা কিছু বিবাদ তা ঐ প্রমেয়গুলির সংখ্যা ও গুণাগুণ নিয়েই। তা হলেও দর্শনের ক্ষেত্রে উপলব্ধ চার প্রকারের গ্রন্থেরই পঠন পরম্পরা

প্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে— চীন ও জাপানে মহাযানী মতই সমধিক আদৃত; তাঁদের মতে মহাযান হীনযানের পরিপূরক দর্শন। বসুবন্ধুর লেখা অভিধর্মকোশ ও ভাষ্য, এবং সেই ভাষ্যের উপর লিখিত সৌত্রান্তিক দার্শনিক যশোমিত্রের স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা— সেসব দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-পরম্পরা

পূর্বোক্ত চার প্রস্থানের কথা বলতে গেলে বৌদ্ধদর্শনের অধুনালুপ্ত বহু আশ্রয়-শাখার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। একটা ধর্মমত (Religious Insitution) বেঁচে থাকে একটা সম্প্রদায়ের (Church বা Order) মধ্যে। সেই ধর্মমতের যুক্তিসিদ্ধরূপ হল দর্শন। ধর্ম কিন্তু বহু পরিমাণে অযৌক্তিক। বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও এরূপ একটা প্রভেদ আছে। অথচ বৌদ্ধদর্শনের আশ্রয় বৌদ্ধধর্মই। আর, বৌদ্ধধর্মকে বুঝাতে গেলেই বুঝতে হয় বৌদ্ধ সংঘ এবং তথাগত বুদ্ধকে।

তথাগত বা গৌতমবুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০-তে তাঁর পরিনির্বাণের সময় তাঁর বয়স ছিল আশী বৎসর। প্রধানতঃ তিনি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নানাস্থানে নিজের ধর্মপ্রচার করেন। তাঁর ধর্মাচরণের বিরোধী কতকগুলি ধর্মনেতাও তাঁর সমসাময়িক কালে ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শারীপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়নের মৃত্যু বুদ্ধের জীবিতকালেই ঘটেছিল। বুদ্ধ তাঁর সংঘকে নিয়ম ভাঙতে সহজে দিতেন না। স্বাভাবিক কারণেই অনুমান করা যায় যে, সেজন্য সংঘের ভিতরেও কিছু লোক অসন্তুষ্ট ছিল। বুদ্ধের নির্বাণের পরেই সুভদ্র নামের এক ভিক্ষুকে আনন্দিত হতে শোনা যায়। এসকল কারণেই সংঘের মধ্যে বিভেদ ঘনিয়ে উঠতে থাকে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই আনন্দ উপালি ও মহাকাশ্যপ প্রমুখ বুদ্ধশিষ্যগণ উদ্যোগী হয়ে বুদ্ধের নির্বাণলাভের বৎসরেই রাজগৃহে এক মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। পাঁচশত ভিক্ষু সেখানে সম্মিলিত হন। আনন্দ ও উপালি আপন আপন স্মৃতি থেকে বুদ্ধবচন সংগ্রহ করে উল্লেখ করলেন। এই সংগ্রহ পরে যথাক্রমে সূত্র ও বিনয় সংগ্রহ বা সূত্রপিটক ও বিনয়পিটক আখ্যা পায়। এই রাজগৃহের সভা সাতমাস ধরে চলে। এই প্রথমা-মহাসংগীতিকে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়।

বোঝা যায়, বিভেদের বীজ এ সভাতেও ছিল। আনন্দর অর্হৎ ও অশৈক্ষ অবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন ওঠে। অপর দিকে পুরাণ ও গবাম্পতি নামে অন্য দুজন প্রমুখ বুদ্ধশিষ্য, পূর্বোক্ত বুদ্ধবচনসংগ্রহকে বুদ্ধের যথার্থবচন বলে গ্রহণ করতে পারেন নি, এমন অনুমানের কারণ পাওয়া যায়।

বুদ্ধের নির্বাণের আনুমানিক শতবর্ষকালের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে প্রসারিত হয়ে যায়। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের সংঘে স্বাভাবিক কারণেই আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতা বাড়তে থাকে, কোথাও কোথাও বৌদ্ধ-শাসন-বিগর্হিত অনাচারও দেখতে পাওয়া যায়। চুল্লবগ্‌গ অনুসারে দেখা যায় যে, প্রাচ্য দেশীয় বৈশালীয় বৃজি ভিক্ষুর আচারে 'বিনয়' লঙ্ঘিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, বৃজিরা এমনিতেই গণ-শাসন ব্যবস্থা জানত। তাদের আচারব্যবহারে তাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রকাশ পেত। যশ নামে এক পশ্চিমদেশীয় ভিক্ষু এদের মধ্যে 'বিনয়' পরিপাটিভাবে পালিত হচ্ছে না দেখে দুঃখিত মনে "পাবেয়ক" ও "দক্ষিণাপথক" ভিক্ষুদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন; উপালির শিষ্য শাণবাস তখন মথুরা প্রদেশে ছিলেন। ভিক্ষুরা সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে ঐসব দোষের বিচার করার জন্য স্থবির রেবতকে এনে বৈশালীর বালুকারামে এক মহাসভা করলেন। এটি দ্বিতীয়া মহাসংগীতি।

দ্বিতীয়া মহাসংগীতির কর্মসূচী হল ধর্ম ও বিনয়ের সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ। মনে হয়, এ সভায় নানা বিরুদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। মহাদেব নামে এক সুপণ্ডিত ভিক্ষুর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি পাঁচটি সংশোধনী-নীতি উত্থাপন করেন। সেগুলি সংক্ষেপে হল—১ অর্হৎ অবস্থা থেকেও পতন ঘটতে পারে। ২ অর্হৎও সর্বজ্ঞ নন। ৩ অর্হতের সন্দেহ থাকতে পারে। ৪ অর্হৎও অন্যের কাছে জ্ঞান পেতে পারেন। ৫ প্রজ্ঞালাভের অবস্থাপ্রাপ্তির সময়ে 'অহো' এ কথাটি উচ্চারিত হতে পারে।

বলা বাহুল্য, মহাদেবের নীতি প্রাচীনপন্থীরা গ্রহণ করেন নি। এই সভায় বৃজি ভিক্ষুদের বিচার করার জন্য একটি আট জনার সংস্থা (Body of Referees) গঠিত হয়। সে সংস্থার সদস্যরা চারজন পূর্বী ও চারজন পশ্চিমী ছিলেন, এরূপই অনুমান হয়। 'উব্‌বাহিক' বা 'ভোট' ব্যবস্থায় সাব্যস্ত হয় বৃজি ভিক্ষুদের আচার দূষণীয়। প্রাচীনপন্থীরা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানালেন যে সংঘে অনাচার চলবে না। কিন্তু তাঁদের এই অনমনীয় মনোভাব বৃজি ও পূর্বাঞ্চলিক ভিক্ষুরা উপেক্ষা করলেন। ফলে অন্ততঃ দশ হাজার ভিক্ষু মূল সংঘ থেকে পৃথক হয়ে যান। এখন থেকে প্রাচীনপন্থীগণ হলেন 'স্থবিরবাদী' বা থেরবাদী। পৃথগ্‌ভূত ভিক্ষুরা কৌশাম্বীতে পৃথক এক সভায় নিজেদের 'মহাসাংঘিক' আখ্যা দিলেন। এই ভাবে দ্বিতীয়া মহাসংগীতির কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে মনে হয় এই সভায় প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী ভিক্ষুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। প্রাচীনপন্থীগণ অবিচল থাকেন। নবীনপন্থীগণ সংশোধিত নীতি ও কিছু কিছু স্বাধীন মত সংঘে চালাতে থাকেন; মহাসাংঘিকদের এই নবীনপন্থী বলা যেতে পারে। স্থবিরবাদের প্রতিপত্তি অধিক ছিল, বলাই বাহুল্য। তার ইতিহাস বর্তমানেও বেঁচে আছে। মহাসাংঘিকদের ইতিহাস কতকটা অজ্ঞাত ও অবলুপ্ত। তবে এককালে পশ্চিম ভারতে (কাড়লা গুহায়), মধ্যভারতে অন্ধ্রদেশে (নাগার্জুন কোণ্ডা, অমরাবতী), উত্তরে ভারতের বাইরে আফগান ও চীন দেশে পর্যন্ত তাঁদের নানা শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় মহাসংগীতির পর শতবর্ষকালের মধ্যেই উপরি উক্ত দুটি বিভিন্ন শাখা থেকে ক্রমে ক্রমে আরও আঠারটি (মতান্তরে পঁচিশটি) শাখামত জন্মলাভ করে। কথাবত্‌থু অঠ্‌ঠ কথা, সিংহলের শাস্ত্রাদি বসুমিত্র ভব্য ও বিনীত দেবের রচনা ভিক্ষুবর্ষাগ্র পরিপৃচ্ছা থেকে আমরা এ সকল শাখা মতের একটা ধারণা পাই। সন-তারিখের কথা ঠিকমত বলা যায় না। ড. নলিনাক্ষ দত্ত তাঁর *Early Monastic Buddhism* গ্রন্থে (পৃ ৪৭) এই শাখামতগুলিকে পাঁচটি প্রধান মূল শাখায় ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রতিটি শাখার রচনা ত্রিপিটক, ও দর্শনাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিচারও তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এ সকল শাখার বেশির ভাগেরই অস্তিত্ব বর্তমান ভারতে নেই। চীন জাপান মঙ্গোলীয়ায়, সেসব দেশের দেশাচারভেদে কালক্রমে আরও নূতন নূতন বৌদ্ধশাখামতের আবির্ভাব ঘটেছে। এসকল মতেরও প্রাচীন ও নবীন অবস্থা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মূল বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ থেকে তারা কতদূর সরে গিয়েছে। ভারতের চট্টগ্রাম ও সিংহল ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে স্থবিরবাদ এখনও জাগ্রত হয়ে আছে।

দ্বিতীয় সংগীতির পরে মৌর্যসম্রাট অশোকের সময় তৃতীয় মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রানুকূল্য ধর্মের পক্ষে একটা অপরিহার্য দিক। বৌদ্ধধর্মও মৌর্যসম্রাটের আনুকূল্যে তার গৌরবচূড়ায় পৌঁছেছিল। অশোক-পুত্র মহেন্দ্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অশোকের ভ্রাতা তিষ্য স্থবিরবাদী

ছিলেন। তৃতীয় মহাসংগীতি অধিবেশনে তিনিই নেতৃত্ব করেন। 'কথাবতথুপ্পকরণ' তাঁরই রচনা। এরূপ অনুমান করা যায় যে, তিষ্য উদ্যোগী হয়ে স্থবিরবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ; সেসময় থেকে মগধে আর স্থবিরবাদ ছাড়া অন্যান্য মতবাদগুলির চর্চারও অবনতি ঘটতে থাকে।

অশোকের সময় থেকেই তাই সর্বাস্তিবাদ প্রভৃতি শাখামতগুলি স্থবিরবাদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। যে কারণেই হোক তৃতীয় মহাসংগীতির অধিবেশনকালে ভিন্ন ভিন্ন মতের খুব বিরোধিতা হয়েছিল, এ কথা বেশ ভাবা চলে। সেই অধিবেশনে সূত্র ও বিনয় সংশোধনকার্যই লক্ষ্য ছিল ; সেই সূত্রে দার্শনিক মতবাদ ও অভিধর্ম গ্রন্থাদিও রচিত হয়। পূর্ণ ত্রিপিটকের উল্লেখ সেই সময় থেকে পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখামতকেও অস্বীকার করা হয়। সেই কারণেই, পরবর্তী যেসব শাস্ত্রগ্রন্থে অন্যান্য সভার কথা খুঁটিয়ে লেখা আছে সেসব গ্রন্থেও এই তৃতীয়া মহাসংগীতির উল্লেখ নেই। সিংহলে প্রাপ্ত শাস্ত্রাদি অবশ্য স্থবিরবাদেরই গ্রন্থ, সে কথা বলা বাহুল্য। অশোকের সময় বৌদ্ধ প্রচারকগণ ভারত ও ভারতসীমান্তের দেশগুলিতে ধর্মপ্রচার করতে যান। বিভিন্ন অশোক-অনুশাসন অশোকের ধর্মপ্রচারস্পৃহার মূল্যবান পরিচায়ক। অশোকের আনুকূল্যে স্থবিরবাদের যেমন পুষ্টি ঘটে তেমনি অপরাপর শাখামতগুলি অবহেলিত অবস্থায় ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গান্ধার কাশ্মীর প্রভৃতি দূরদেশে ছড়িয়ে যায়। 'সর্বাস্তিবাদ' শাখামত তেমনি একটি মতবাদ। পরবর্তী কালের সম্রাট হর্ষবর্ধন সম্ভবতঃ 'সম্মিতীয়' মতবাদ বিশ্বাসী ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, তৎকালে এসকল পৃষ্ঠপোষক রাজারা কেউ প্রব্রজ্যাধারী ভিক্ষু হতে পারতেন না। অশোক হর্ষবর্ধন গৃহস্থভক্তেরা সকলেই ছিলেন 'উপাসক'।

অশোকের কাল থেকেই শুধু বৌদ্ধধর্মের নয়, একরকম ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা স্থির হদিস পাওয়া যায়। তার আগে লিখিতভাবে কোনো ইতিহাসের ধারা পাওয়া যায় না। মৌর্যযুগের শেষ ভাগে মগধে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটতে থাকে। সুঙ্গবংশের আধিপত্যকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কথা সুবিদিত। হিন্দুধর্মের জাগৃতির ফলেই হোক আর যে করেই হোক অশোক-পোষিত 'স্থবিরবাদ' ক্রমশঃ মগধ ছেড়ে গিয়ে সাঁচীতে আশ্রয়লাভ করে। তারও পরে সে ধর্ম গুজরাট দক্ষিণ-ভারত সিংহল শ্যাম কম্বোজ পর্যন্ত প্রসারিত হতে থাকে। অন্যদিকে স্থবিরবাদ থেকে বহির্ভূত শাখাগুলির অন্যতম সর্বাস্তিবাদ-শাখা একটি প্রধান শাখা হয়ে ওঠে। প্রথম যুগে মথুরা ও পরবর্তীকালে কাশ্মীর গান্ধার সেই মতের কেন্দ্র ছিল। সর্বাস্তিবাদ শাখামতের গ্রন্থাদি সম্ভবতঃ সংস্কৃতভাষার পুনর্জাগরণের প্রভাবেই সংস্কৃতে লেখা হতে থাকে। 'মাথুর সর্বাস্তিবাদে'র গ্রন্থ 'অশোকাবদান' বর্তমানেও উল্লেখযোগ্য। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও ভারতের বাইরে এ মতের যথেষ্ট প্রচার ছিল। চীনদেশে জাপানে এখনও 'কুশশী' 'বিভাষশী' নামে এই শাখামতের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সুঙ্গাধিপত্যের কাল থেকে কুষাণযুগ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম-ভারতে সর্বাস্তিবাদ অব্যাহত ছিল।

কুষাণরাজ কণিষ্ক বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন। কণিষ্কের রাজ্যকালে (কণিষ্কের রাজ্যকালের সম্বন্ধে বহু বিরোধী সন-তারিখ পাওয়া যায়) চতুর্থ মহাসংগীতির অধিবেশন হয়। সম্ভবতঃ কণিষ্ক সর্বাস্তিবাদ মতেই বিশ্বাস করতেন। ঐতিহাসিক-মহলে এ নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকেই বলেন যে, কণিষ্ক মহাযানী ছিলেন ; কণিষ্কের রাজ্যকালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ মহাসংগীতির অধিবেশনে কবি অশ্বঘোষ উপস্থিত ছিলেন। অনেকে বলেন এই সভায় কণিষ্ক মহাযানী মতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি

আলোচনা করলে মনে হয় কণিষ্ক মহাযানী ছিলেন না। তথাকথিত হীনযানী মতের সর্বাস্তিবাদ শাখা-মতের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক নিকট ছিল।

মহাযানমতের শূন্যবাদ-দর্শনের আচার্য নাগার্জুন ও কণিষ্কের সমকালীন মনে হয়। এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে, কণিষ্কের রাজ্যকালে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত (মতান্তরে, জলন্ধরে কিংবা কাশ্মীরে) এই মহাসভায় স্থবির বসুমিত্র (সর্বাস্তিবাদী) নেতৃত্ব করেন। এ সভায় মাথুর-সর্বাস্তিবাদ শাখা থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে কাশ্মীর ও গান্ধার সর্বাস্তিবাদ শাখামতগুলি একমত ও সমসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সূত্র বিনয় ও অভিধর্মের উপর যথাক্রমে বিরাট টীকাগ্রন্থ, উপদেশশাস্ত্র, বিনয়-বিভাষা ও অভিধর্ম-বিভাষা রচিত হয়। এই বিভাষার অনুসারী যাঁরা তাঁরাই কালক্রমে বৈভাষিক আখ্যা পান। কাশ্মীর এককালে এই বৈভাষিকদের একটি বড় কেন্দ্র হয়। কাশ্মীর বিভাষা মতবাদ প্রধানতঃ 'জ্ঞানপ্রস্থান' গ্রন্থ ও আরও সাতটি প্রকরণগ্রন্থ নিয়ে স্থাপিত। পরবর্তী কালে আচার্য বসুবন্ধু কতকাংশে সৌত্রান্তিক মতাবলম্বী হয়েও কাশ্মীর-বিভাষাদর্শনের সারসঙ্কলন হিসাবে অমূল্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ অভিধর্মকোশ ও তার ভাষ্য রচনা করেন। স্থবিরবাদের অনুরূপ গ্রন্থ হিসাবে বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমগ্‌গ ও অনুরুদ্ধের অভিধম্মত্থ সংগ্‌গহের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে।

উপসংহার

পরবর্তী কালে সিংহলে দুটি মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মেও অনুরূপ মহাসংগীতি হয়েছিল। গত ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত বোধগয়াতে বৌদ্ধগণের এক সম্মেলন বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতসরকারের আনুকূল্যে উদ্‌যাপিত এই অনুষ্ঠানকেও আমরা মহাসংগীতি আখ্যা দিতে পারি। সম্প্রতি কালে রেঙ্গুনে সমগ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের এক মহাসভা হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে বহুদেশের বহুশাখার বৌদ্ধগণও এখানে সমবেত হয়ে কিভাবে একটি সমন্বিত শাখামত নূতনভাবে তৈরি করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দেশকাল ও মানবমনের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র সর্বদাই মানবকল্যাণ ও শুদ্ধ বুদ্ধিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। পুনর্জাগ্রত বৌদ্ধধর্মের নবায়মান রূপকেই আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এখন দেখতে পাচ্ছি। বৌদ্ধধর্মের আশ্রিত কলালক্ষ্মীর রূপেও সর্বদেশকালের মানুষ আজ আনন্দ পায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের গমনাগমন ভিন্নরুচির মানুষদের মধ্যে প্রীতি-মৈত্রীর রাখীবন্ধন স্থাপন করছে ও করবে। 'অহিংসা'-সাধনা সম্যক্‌রূপে দেশে দেশে গৃহীত হলে মানুষের একটি উর্ধ্ব চেতনাকেই বাস্তবে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পাব, এমন আশাও করতে পারি। মৈত্রী ও করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা মানুষের জীবনসংগ্রামকে কবে সহনীয় করে তুলবে ?

কথাশেষ

সর্বশেষে বৌদ্ধধর্মের সমগ্র ইতিহাস, দার্শনিক অভিযান, বিরাট ঐতিহ্য এবং যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করে দুটি কথা আমাদের মনে হয়।

১. বৌদ্ধধর্ম এক যুগে বিজ্ঞান-বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল ; সে যুগের বিজ্ঞান-চিন্তা হয়তো বস্তুনিষ্ঠায় অগ্রসর ছিল না। জীবনের তত্ত্বকে খুঁটিয়ে দেখা ও সেই দেখার ফলেই অনিবার্যভাবে নির্বাণমুখী হওয়া এই ছিল বৌদ্ধমতের লক্ষ্য। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দূরদর্শী তথ্য অনেক বেশি পরিমাণে উপলব্ধ। পরিচ্ছন্ন জ্ঞাননিষ্ঠা বর্তমান বিজ্ঞানেরও প্রাণ। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মানুষের সুখ ও আরামের

কল্যাণের পথ খুলে দেওয়া— আজকের মত করে। সেদিনের বৌদ্ধধর্মও তাই চাইত ; মানবকল্যাণ তারও লক্ষ্য ছিল, অবশ্য তার মত করে। আর, বৌদ্ধধর্মকে যদি নেতিবাদের কোঠায় ফেলা যায় তা হলে আজকেও একটা জিজ্ঞাস্য থেকে যায়— আজকের যুগের বিজ্ঞানই কি একটা দুর্জ্ঞেয় দুরধিগম্য তত্ত্বকে আশ্রয় করতে চাইছে না ?

২. তত্ত্বের কথা বাদ দিয়ে যে কথাটা বাকী থাকে তা হল 'ব্যক্তি'-সম্পর্কের কথা। বৌদ্ধধর্মের ঝোঁকটা হল 'অনাত্ম'ত্ব ও নিরীশ্বরত্বের উপর এবং পরিবর্তনশীলতার উপর। অনাত্ম তত্ত্বটির বিশ্লেষণ করলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটা বড় দিক পাওয়া যাবে। বদ্ধমূল Ego Sense থেকে বহুবিধ অকল্যাণের উদ্ভব হয়। মন যে 'বস্তু' নয়— একটা যে পরিবর্তনশীল ক্রিয়ামাত্র— এ কথা আমরা কজন বাস্তবে মানি ? 'নিরীশ্বরত্ব' বা ঈশ্বরকারণতাবাদের বিরুদ্ধ যুক্তি একদিক দিয়ে মানুষের কর্মশক্তির উপর আস্থাই জাগায়। দৈবকে বাদ দিয়ে পুরুষকারের প্রতি নিষ্ঠা আনে। আর নিয়ত পরিবর্তিত বস্তুসত্তা যেন সত্যাসত্যের ভারসাম্যে চিন্তাকেই দ্বৈধীযুক্তি বা dialeticsএর সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে চলে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তথাগত ভবিষ্যতের মানব মননকে 'মধ্যমা প্রতিপদে'র যে প্রেরণা দিয়েছিলেন সেই যুক্তিসম্মত ভিত্তির উপর আজকের মানুষও দাঁড়াতে পারে— বৌদ্ধধর্মের বিরাট ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের সার্থকতা সেইখানে।

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩০১-১৩৬৪

বিশ্বভারতী পাঠভবনের অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে পরলোকগমন করেছেন। শান্তিনিকেতনের সমাজজীবনে এই সুদীর্ঘকাল তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। অধ্যাপনা তাঁর নিকট জীবিকামাত্রে পরিণত হয় নি, অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ব্রত উদ্‌যাপনের নিষ্ঠা নিয়েই তিনি শিক্ষাদানের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাদানের মর্যাদা এবং গুরুত্ব ছিল গবেষণা বা শিল্পসাধনারই সমতুল্য। মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপক একদিন কোনো প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে পাঠভবনে পড়াতে গিয়ে তাঁর নিজের পড়াশোনা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তনয়েন্দ্রনাথ উক্ত অধ্যাপকের এই উক্তিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শিশুদের শিক্ষকতা তাঁর মনের ঔৎসুক্যকে কখনো ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে নি। বস্তুত তাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে কত বিচিত্র বিষয় ও বস্তু সম্বন্ধে তাঁর মনে ঔৎসুক্য জেগেছে। সে ঔৎসুক্যের পরিসমাপ্তি শুধু পল্লবগ্রাহী জ্ঞানাহরণে কোনোদিন হয় নি। তাই স্কুলের শিক্ষকতায় নির্দিষ্ট কর্মপন্থার দিনের পর দিন পুনরাবৃত্তির ফলে শিক্ষকের মননবৃত্তির জড়ত্ব যে অনিবার্য এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না।

শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষকতায় তনয়েন্দ্রনাথ নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের তৃপ্তিই যে শুধু ছিল তা নয়, এতে ছিল তাঁর আনন্দ। তুলির প্রতি টানে যখন রূপ এবং ভাব আকার গ্রহণ করতে থাকে তখন শিল্পীর যে আনন্দ, সেই আনন্দের আস্বাদ তিনি পেতেন যখন তাঁর চেষ্টার ফলে কোনো শিশুর মন জেগে উঠত, বুদ্ধি পরিণতির পথে অগ্রসর হত। তাই তিনি কখনো শিক্ষাক্ষেত্রের তথাকথিত উচ্চস্তরে শিক্ষকতার সুযোগ অন্বেষণ করেন নি। এমনকি শান্তিনিকেতনের কলেজ বিভাগে যখন এক সময় জোর করেই তাঁকে কিছু কাজ দেওয়া হয় তখন অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করে তার থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন। শিক্ষকতায় এমন গৌরববোধ, এমন পরিপূর্ণ আনন্দ, এমন সার্থকতাবোধ জীবনের প্রতি আত্মসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্লাবনের দিনে সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। যে সমাজ অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রা জড়বুদ্ধির অক্ষমতা বলে গোপনে উপহাস করে না সে সমাজে এই মনোভাব রক্ষা করা সহজ।

'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তনয়েন্দ্রনাথ বলছেন— "প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয়তার উপর। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটি পর্বের প্রতি মুহূর্তে তাঁর উদ্দীপ্ত চোখের দৃষ্টি ছাত্রদের মুখে চোখে কিরকম পরিভ্রমণ করে বেড়াত তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনো ভুলতে পারবেন না। সে দৃষ্টিতে একদিকে যেমন প্রকাশ পেত তাঁর ব্যাকুলতা আলোচ্য বিষয়ে ছাত্রদের পরিপূর্ণ মনঃসংযোগ সম্বন্ধে, অপর দিকে প্রকাশ পেত এমন একটি সকরুণ ভাব যার স্নেহতাপে প্রত্যেক ছাত্রের নিগূঢ় মননশক্তি বিগলিত হয়ে তার জিজ্ঞাসাকে অনর্গল করে দিত।" শিক্ষকের এই রূপটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই আদর্শেই তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। ক্লাসে

এই রকমই সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকতে তাঁকে আমরা দেখতাম। বয়স তাঁর এই সক্রিয়তার বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারে নি। আর তাঁর মধ্যে সেই ব্যাকুলতাই দেখেছি আলোচ্য বিষয়ে ছাত্রদের পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াসে। ক্লাসে বিষয়ের সীমারেখাকে কখনো তিনি অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকার করতেন না। ছাত্রছাত্রীর মনকে সজাগ এবং বুদ্ধিকে সক্রিয় করে তোলাই তিনি তাঁর কাজের প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাদের মনে জিজ্ঞাসা ও অসংকোচ প্রকাশের প্রবৃত্তি জাগ্রত করে তোলবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে যেতেন। ভাষার শিক্ষক তিনি, কিন্তু ক্লাসে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা টুকিটাকি তাঁর পাঠনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ত। অবশ্য যে কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষা এখনো সম্পন্ন হয় তাতে শিক্ষার্থীকে তার সহজ অবস্থায় পাওয়া বা তার জিজ্ঞাসা ও প্রকাশের প্রবৃত্তিকে মুক্ত করা অনেক সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ বিষয়ে ফলের স্বল্পতা বা ব্যর্থতা মাঝে মাঝে তনয়েন্দ্রনাথকে নিরাশ করলেও, এই প্রয়াসের সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস কখনো ক্ষীণ হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তনে তাঁকে আমরা শিক্ষাদানের উদ্যোগপর্বে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। পাঠপর্যায়ের অন্তর্বর্তী কালে পরের দিনে কাজের প্রস্তুতির জন্য নিয়মিত পরিশ্রম তো তিনি করতেনই, দীর্ঘ অবকাশগুলির অধিকাংশও তাঁর ব্যয় হত এই কাজে। এতে তাঁর বিরক্তি ছিল না, ক্লান্তি ছিল না। পাঠরচনাকালে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের নাম, চরিত্র, ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখের সামনে যেন ছবির মত ভেসে উঠত। তাদের এইভাবে চোখের সামনে রেখেই তাঁর পাঠ তিনি রচনা করতেন। আর অবকাশের অন্তে একই উদ্যোগে সহকর্মীরূপে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন অসুস্থতার জন্য শয্যাগ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তখন ছাত্রছাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মনে কী ব্যাকুলতাই-না দেখেছি। নিজের শরীরের অক্ষমতায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। আবার এর মধ্যেই যেদিন একটু সুস্থ বোধ করেছেন তাঁর অনুপস্থিতি-জনিত ক্ষতির পূরণ কিভাবে করবেন তারই পরিকল্পনা করেছেন, আমাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

Freedom and Discipline প্রবন্ধে তনয়েন্দ্রনাথ একস্থানে বলছেন—"Infinite patience, no humbug about prestige, a serene disposition quietly to explore the complexes of the growing mind, and a never-failing resourcefulness to hit upon the right occasion of applying the soothing balm of sympathetic understanding when the entire youthful mind is groaning under the piling little acts of injustice real or imaginary— these are the keys that will open the priceless caskets, that are the hearts of the young"। শিক্ষকের আদর্শ সম্বন্ধে এ যে শুধু তাঁর কল্পনা তা নয়, এই আদর্শকে তাঁর নিজের জীবনে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা আমরা দেখেছি। স্নেহ এবং সহানুভূতি ছিল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের মূল সুর। যাদের শিক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করেছেন তাদের সমগ্রভাবে জানা— শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয়, তাদের চিত্তবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ সংবাদ রাখা, তিনি তাঁর শিক্ষাদান-পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। আর ছেলেমেয়েদের সমগ্রভাবে জানতে

হলে, তাদের হৃদয় ও মনের দুয়ার খুলতে হলে যে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশটি জানা এবং সম্ভব হলে তাদের পরিবারের সঙ্গেও একটি সৌহার্দপূর্ণ সম্বন্ধ গড়ে তোলা দরকার এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই ক্লাসের গণ্ডীর মধ্যেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ থাকত না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাদের দেখতে চাইতেন, জানতে চাইতেন। তাই প্রৌঢ় তনয়েন্দ্রনাথকে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শিশুদের আবাসগৃহের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষছায়ায় তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মার্বেল খেলতে বা লাট্টু ঘোরাতে দেখা যেত, কিংবা শীতের মধ্যাহ্নে গৌরপ্রাঙ্গণে বালকদের সঙ্গে ডাণ্ডাগুলি বা ক্রিকেট খেলতে দেখা যেত। আবার দেখা যেত বনভোজনের দিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান উৎসাহে তিনি তরকারি কুটছেন, নদী থেকে জল বয়ে আনছেন, পরিবেশন করছেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে তিনি ভালোবাসতেন। শেষ পাঁচ-ছয় বৎসর বাদে বরাবর তিনি তাদের সঙ্গেই একত্রে খেয়েছেন। তাদের খেলার কোনো প্রতিযোগিতায়, সাহিত্যসভায় বা অভিনয়ে দর্শক হিসাবে 'তনয়দা' উপস্থিত নেই এ রকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার এই আগ্রহ, জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের দেখবার এই ইচ্ছা তাঁর শিক্ষাদান-পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এ কথা সত্য। এটি কিন্তু শিক্ষাবৃত্তিতে সাফল্যলাভের একটি কার্যকর কৌশল ছিল না। তাঁর শিশুদের প্রতি স্নেহ ছিল তাঁর হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এই স্নেহে ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। সেজন্য সব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের পিঠ চাপড়িয়ে তাদের প্রিয় হবার চেষ্টা তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। অন্যায় দেখলে, ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখলে কঠোরভাবে তিনি তিরস্কার করেছেন। আবার কেউ কোনো বিষয়ে একটু ক্ষমতার পরিচয় দিলে, চারিত্রিক মহত্ত্বের পরিচয় দিলে অকৃত্রিম খুশীতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ঠিক ভয় না করলেও তাঁর সম্পর্কে সম্ভ্রম বোধ করত সর্বদাই, আর তাঁকে না হলে তাদের কোনো অনুষ্ঠানই যেন জমতে চাইত না।

ছেলেমেয়েদের কেউ কোনোদিন তনয়েন্দ্রনাথের কাছে 'অপদার্থ' বলে গণ্য হয় নি। সকলে একই প্রকার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। যার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সেগুলির পূর্ণবিকাশে সহায়তা করাই প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের এই অভিমতে তনয়েন্দ্রনাথের মনের পুরোপুরি সায় ছিল। দস্তুরে বাঁধা লেখাপড়ায় পারদর্শিতা দেখাতে যারা ছিল যে কোনো কারণে অক্ষম তাদের প্রতি তনয়েন্দ্রনাথের বিশেষ একটি মমতা ছিল। এদের জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করতেন। শুধু ক্লাসে নয় তার বাইরেও নানা ভাবে এদের সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন। খেলাধূলায় সভাসমিতিতে যেসব ছেলেমেয়ে তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিত, সমাজ জীবনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানা পরিশ্রমসাধ্য কাজে যারা হাসিমুখে এগিয়ে আসত, তারা সবাই ছিল তাঁর প্রিয়। আর এসবের মধ্যেও যাদের প্রাণের আবেগ নিঃশেষিত হত না, দেখা দিত দুষ্টুমির বিচিত্র রূপ নিয়ে, সেই সব দুরন্ত ছেলেমেয়ের প্রতিও তাঁর স্নেহ ছিল স্বতঃ উৎসারিত। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন দিন অনেক গিয়েছে যখন প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষকগণের অনেকেই এজন্য তাঁর উপর বিরক্ত হয়েছেন। মনে করেছেন এই সব ছেলেমেয়েদের তনয়েন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় পেয়ে এরা অন্য কাউকে গ্রাহ্য করতে চায় না। প্রশ্রয় তিনি দেন নি কোনোদিনই। এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো মসীময় চিত্র তাঁর মনে

স্থান পায় নি। এদের উদ্দাম প্রাণপ্রবাহের উচ্ছলিত ধারা কোথাও কখনো আবর্তের সৃষ্টি করেছে, তাঁর সস্নেহ স্বচ্ছ দৃষ্টি শুধু সেইটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। এদের চরিত্রে মহৎ যা-কিছু তা তিনি দেখেছেন, অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছেন এরা একদিন ভদ্র হবে, কর্তব্যপরায়ণ হবে, দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ নাগরিক রূপে সমাজে স্থান গ্রহণ করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বিচারে যে ভুল হয় নি, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

শান্তিনিকেতনে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের শিক্ষাদান-ব্রতে তনয়েন্দ্রনাথকে আমরা খুব অল্পই বাইরে যেতে দেখেছি। এই কাজে যোগ দেবার পর থেকে শান্তিনিকেতনই তাঁর দেশ, শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরাই তাঁর আপনার জন হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সুনামে তিনি আনন্দিত হতেন, গৌরব বোধ করতেন। এর নিন্দার কোনো কারণ ঘটলে ব্যথা পেতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা কবির এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁর কাছে প্রিয় করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণপর মনে ব্যক্তিত্বের বা প্রতিভার তীব্র দ্যুতিতে অভিভূত হয়ে অন্ধভক্তি-লালনের স্থান ছিল না। মনুষ্যত্বের যে রূপটি রবীন্দ্রনাথে রূপায়িত তনয়েন্দ্রনাথের মনের গভীরে অঙ্কিত মানবমহত্বের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। শিক্ষার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন, সে আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টায় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন তা তনয়েন্দ্রনাথের প্রকৃতির অনকুল মননের সুসদৃশ ছিল। এখানকার শান্তি, অবারিত প্রান্তর, উদার আকাশ, ছাত্রছাত্রী ভৃত্য কর্মী গুরু এবং গুরুপরিবার সকলকে নিয়ে স্নেহ শ্রদ্ধা সহযোগিতার একটি ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান তনয়েন্দ্রনাথকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল। বিচিত্র সৌন্দর্যের ও আনন্দের স্বত উৎসের ধারার সন্নিকটে শিশুকে স্থাপন করে তার চিত্তকে রসসিক্ত এবং রুচিকে মার্জিত করে তোলার যে ব্যবস্থা, নিছক পঠন-পাঠনকেই শিক্ষা জ্ঞান না করে বিবিধ উপায়ে শিশুর বিভিন্ন শক্তিকে পরিপুষ্ট করবার যে প্রয়াস, শিশুকে সজীব সত্তা হিসাবে বিশেষ একটি ব্যক্তিরূপে গণ্য করবার যে প্রবৃত্তি এখানে তিনি দেখেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত সামঞ্জস্য ছিল। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে শিক্ষককে যে মর্যাদা দিয়েছেন, বিবিধ পরীক্ষার এবং পরিকল্পনায় যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর সমগ্র বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের মতামতের যে মূল্য দিয়েছেন তাতে শিক্ষক হিসাবে তাঁর সকল শক্তির একটি সহজ বিকাশলাভ সম্ভবপর হয়েছে, তাঁর আত্মপ্রত্যয় বর্ধিত হয়েছে— এবং কোনোদিন তিনি শিক্ষাদানের দম-দেওয়া যন্ত্রে পরিণত হন নি— নিজের স্বভাবেই নিজে সার্থক হতে পেরেছেন।

তনয়েন্দ্রনাথের মনের ঔৎসুক্য চিরদিন শিশুমনের মতই সজীব ছিল। নূতন কোনো লোক, নূতন কোনো বস্তু তাঁর জিজ্ঞাসু মনে সহজেই সাড়া জাগাত। প্রকৃতি-প্রীতিও তাঁর ছিল অসাধারণ।

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার ছিল— গম্ভীর প্রকৃতি স্পষ্টভাষী এই মানুষটির মনুষ্যসঙ্গপ্রীতি। শুষ্ক শূন্য সামাজিকতায় তাঁর ছিল বিতৃষ্ণা। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির, ভিন্নরুচির এত মানুষের সঙ্গে মিশতে, আলাপে গল্পেগুজবে আনন্দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে তাঁর মত আর কাউকে আমরা দেখি নি। শান্তিনিকেতনে একজন কিছুদিন থেকে বাস করছেন অথচ তিনি তাঁকে চেনেন না বা তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন নি এমন ঘটনায় তনয়েন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ করতেন। ছেলেমেয়েদের চড়ুইভাতি কিংবা অনুরূপ ছোটখাট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর প্রচুর আগ্রহ ছিল। বাঁধা রুটিনের বাইরে অনেকের সঙ্গে একত্রে মিলনই ছিল সেই আনন্দের মুখ্য উপাদান।

ভারতবর্ষের পুরাগত জীবনাদর্শের প্রতি তনয়েন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। অর্থের প্রতি, উপকরণের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণই ছিল না। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর তিনি যে বেতন পেতেন অন্য যে-কোনো বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকরূপে অথবা কলেজের অধ্যাপকরূপে তার চেয়ে অধিক অর্থ তিনি অনায়াসে উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু সে কথা একদিনের জন্যও তাঁর মনে উদয় হয় নি। সেই সামান্য বেতনে, দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সেই স্বল্পতার মধ্যেই পূর্ণ আনন্দে তাঁর দিন কেটেছে। তার পর শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের অবস্থার পরিবর্তনে তাঁর আর্থিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন যখন হয়েছে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতা দেখা দিয়েছে, তখনো তিনি সমান নিরাসক্ত। ভবিষ্যতের জন্য, দুর্দিনের জন্য দুশ্চিন্তা বা সঞ্চয়প্রয়াস তাঁর ছিল না বলা চলে।

দেশের এক ক্ষুদ্র প্রান্তে, সমাজের দৃষ্টিতে যে কাজের মর্যাদা সামান্যই এমন কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে, তনয়েন্দ্রনাথ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি দেশবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে তাঁর নাম অতি অল্প লোকেই শুনেছেন। কিন্তু আমাদের এই অনতিবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি এই ক্ষুদ্র 'স্কুলমাস্টার'দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা, শিক্ষাদানব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিকাশোন্মুখ জীবনের প্রতি অনুরাগ, ধৈর্য, অভিনিবেশ— এগুলি সঞ্জীবিত রাখতে সহায়তা করেছেন। দেখিয়েছেন মানুষের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রণালী নয়, উপকরণ নয়, মানুষই প্রধান উপায় ও অবলম্বন। দেশসেবা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত উক্তির প্রতিধ্বনি করে তাই বলতে হয় যে লোকচক্ষুর অন্তরালে, আত্মপ্রচারের তুমুল ঢক্কানিনাদের আলোড়নের বাইরে, জীবন দিয়ে যে ক্ষুদ্র দীপশিখাটি তিনি জ্বেলেছিলেন তার আলো বহুদূর আলোকিত করে নি সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য যে দেশের প্রান্তে প্রান্তে এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ দু-চারটি করে জ্বলে উঠে একদিন দীপালি-উৎসবও হতে পারবে, ক্রমে রাত্রি প্রভাত হবে, দেশের শুভদিন আসবে।

শ্রীনিরঞ্জন সরকার

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনারত। ১৯২৬

অক্ষয়কুমার বড়াল

১৮৬০ - ১৯১৯

অক্ষয়কুমার বড়াল -প্রণীত প্রদীপ (১২৯০), কনকাঞ্জলি (১২৯২), ভুল (১২৯৪), শঙ্খ (১৩১৭), এষা (১৩১৯) এবং গ্রন্থাকারে অপূর্বমুদ্রিত বা অপূর্বপ্রকাশিত বিবিধ কবিতাবলী (১৩৬৩)। প্রকাশক : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস।

বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্র-সমকালীন কবিকুলের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের বিশিষ্ট দান ও বিশেষ মর্যাদা আছে। মধুসূদন রঙ্গলাল হেম নবীনের রচনা যে বস্তুনিষ্ঠ প্রাঞ্জল কাব্যরীতির নিদর্শন রবীন্দ্রপ্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে তার রূপান্তর হল। উভয় যুগের সংযোগস্থলে রয়েছেন বিহারীলাল। ব্যক্তিসত্তার অভিব্যক্তি, ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি ও অভীপ্সার প্রকাশ, কোন্ অপরূপতায় উত্তীর্ণ হতে পারে তাঁরই রচনায় তার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় ও প্রবল প্রত্যয় উপস্থিত হল নূতন কালের নূতন সাহিত্যে। তাই বিহারীলালকেই গুরু ব'লে স্বীকার করেছেন অক্ষয়কুমার এবং রবীন্দ্রনাথ। এঁদের সমসাময়িক কবিকুলে আপন আপন বিশিষ্টতায় উল্লেখ্য হলেন— দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দ দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রায়। এঁরা বিহারীলালের পরবর্তী আর রবীন্দ্রনাথের সমকালীন— সোজাসুজি যাকে লিরিক বলা হয় সেই গীতসগোত্র আবেগ-উপলব্ধি-নির্ভর 'খণ্ডকাব্য'-রচনাতেই এঁরা ঝুঁকেছেন ও বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন; মধুসূদন হেম নবীনের মতো 'মহাকাব্য' অথবা 'আখ্যানকাব্য' ছন্দোবদ্ধ করেন নি বা কদাচিৎ ক'রে থাকলেও তাতেই তাঁদের প্রতিভার বিশেষ স্বাক্ষর নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেখানে এঁদের মিল তার চেয়ে যেখানে অমিল, অসাদৃশ্য, সেখানেই সেকালে অনেক কাব্যরসিক বা রসিকম্মন্য ব্যক্তির দৃষ্টি না পড়ে পারে নি এবং তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন— রবীন্দ্রনাথের কাব্য অবাস্তব হেঁয়ালি আর এঁদের ক্ষেত্রে তা নয়। আসলে, বস্তু এবং কল্পনা, ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বজনীনতা— দুটির কোনোটি না হলেই যে কাব্য হয় না— দুটি কিভাবে মিলেছে মিশেছে, অথবা জোড়া লেগেছে, অথবা অখণ্ড ঐক্য পেয়েছে, সেইটেই যে বিশেষ প্রণিধানের বিষয়— এ কথা অনেকেই খেয়াল করতেন না, বা মৌখিক স্বীকার করলেও বিচার-প্রয়োগের বেলায় প্রমাদে পড়তেন। অর্থাৎ, ভালো ভালো তত্ত্বকথার একান্ত দুর্ভিক্ষ না হলেও রসবোধে বা প্রসঙ্গ-বিচারে হয় সে সবের প্রয়োগ হ'ত না, নয়তো উপযোগিতাই ছিল না।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ খৃস্টাব্দ) বঙ্গসাহিত্যে যে কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন, রচনার প্রাচুর্য তার কারণ নয়। বর্তমান গ্রন্থাবলীর মধ্যেও প্রদীপ শঙ্খ এষা এই কাব্যত্রয়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় সমকালে (১৮৫৮-১৯২০ খৃস্টাব্দ) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন অশোকগুচ্ছ শেফালিগুচ্ছ পারিজাতগুচ্ছ গোলাপগুচ্ছ অপূর্ব-ব্রজাঙ্গনা অপূর্ব-বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সম্ভবতঃ আরো প্রচুর কবিত্বসম্পদ বাঙালি কাব্যরসিক-সমাজে উপস্থিত করেছেন। অল্পায়ু (১৮৮২-১৯২২ খৃস্টাব্দ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও কবিকৃতি অল্প হবে না, যদি বা তাঁর অপূর্বসুন্দর ভাষান্তরনিচয়— তীর্থসলিল তীর্থরেণু প্রভৃতি গ্রন্থ গণনা না করি। কিন্তু কবিপ্রতিভার বিশেষ সাফল্য পরিমাণগত নয়, গুণগত। কোন্ কোন্ গুণে বড়াল কবি আমাদের মনোহরণ করেছেন বা করবেন সেইটেই বিশেষ বিচার্য। কনকাঞ্জলি[১] অথবা ভুল[২] কাব্য এই আলোচনার

১ প্রথম প্রকাশ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, কবির বয়স ২৫ ?

২ প্রথম প্রকাশ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, কবির বয়স ২৭ ?

বিষয় করতে চাই নে, কারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ছন্দের সংহত বেগ বা শব্দসংগীতের বিমোহন চমৎকারিত্ব বিরল বলা যেতে পারে। সেকালের কাব্যে হৃদয়াবেগের প্রবলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, জীবনস্মৃতির 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে তা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে যে জিনিসটা সেদিন তাঁদের 'খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা'।

আবেগের প্রবলতা অক্ষয় বড়ালের স্বভাবধর্ম নয় ব'লেই তার মায়া পরে তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। উচ্ছ্বাস দূর হয়েছে। ভাষা এবং ছন্দ উভয়ই চারুতর হয়ে উঠেছে। পরিমার্জিত রূপে প্রদীপ শঙ্খ এবং এষা কবিপ্রতিভার সেই বাঞ্ছিত পরিণতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই কবি বলেছেন—

আহা, প্রাণারাম কিবা নির্মল উজ্জ্বল বিভা
চারি দিকে খেলিছে তোমার,
ছড়াইছে সৌন্দর্য অপার।[৩]

এ সৌন্দর্য নারীপ্রকৃতির অথবা বিশ্বপ্রকৃতির, অথবা কবিতার? তারও উত্তর কবি দিয়েছেন—

একবার, নারী, তব প্রেমমুখ হেরি
আরবার প্রকৃতির শ্যাম বুক হেরি
মনে হয় দুই জনে দুখানি মেঘের মত
রহিয়াছে জগতেরে ঘেরি।
আমি তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎ-সম
চকিতে জ্বলিয়া
মিশায়ে মিলায়ে যাই মিশিয়া মিলিয়া।

এই বিশিষ্ট প্রতিভার সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপপরিচয়, মনে হয়, এর চেয়ে সংক্ষেপে যেন বলা যেত না।—

ক্ষুদ্র বনফুল-বাসে সারাটা বসন্ত ভাসে,
ক্ষুদ্র-উর্মি-মূলে বুলে প্রলয়প্লাবন,
ক্ষুদ্র শুকতারা-কাছে চির-উষা জেগে আছে—
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।

ভূতলের এই ক্ষুদ্র স্বর্গখণ্ডগুলির কবি হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। এই প্রসন্ন সীমাস্বর্গভূমে শোক এসে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছে, সে কথা আমরা যথাকালে আলোচনা করব (শোকের দুঃসহ দাহে আর অশ্রুশিশিরস্নানে সুন্দর অবশেষে সুন্দরতর রূপে ফুটে ওঠে তাও আমরা জানি)— বিচার বিতর্ক ও মনন এসে সংগীতে তাল কেটে দিয়েছে বা শ্যামস্নিগ্ধ সৌন্দর্যে শুষ্কতার সঞ্চার করেছে, সেটিও উল্লেখ করতে হয়।—

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ…
দীঘীটি গিয়াছে ভরে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কানায় কানায় কাঁপে জল

---

৩ মূল গ্রন্থের বানান বা জটিল চিহ্নাদি আমরা উদ্‌ধৃতিসমূহে বর্জন করেছি।

শ্রাবণপ্রকৃতির এই বিশদ চিত্র সুন্দর এবং সহজ। এমন-কি—

চেয়ে আছি শূন্য-পানে, কোনো কাজ হাতে নাই—
কোনো কাজে নাহি বসে মন…
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন…
কী গান, কাহার গান! কী সুর, কী ভাব তার!
ছিল কভু আজ মনে নাই!

কবিমনের এই রোমান্টিক রসাবেগও সুন্দর একটি সংগতিতে শেষ হয়েছে, সেটি তেমন অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু, প্রদীপ কাব্যের অন্য অনেক কবিতা— মানববন্দনা, প্রেমগীতি, কামে প্রেমে, দুর্বহ জীবন, হৃদয়সংগ্রাম, কোথা তুমি— বাস্তব অভিজ্ঞতা, হৃদয়াবেগ, তত্ত্বচিন্তা, রোমান্টিক ভাবনা, কল্পসুষমা, এতগুলি বিরুদ্ধ বা বিসদৃশ বস্তুর মিলনে এক দেহে একই-প্রাণ-সঞ্জীবিত সত্তায় জেগে উঠেছে এমন বলতে পারি নে। প্রতিভার স্বধর্মে বা রসের প্রেরণে এগুলি যে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য পায় না তা নয়। কেমন করে পায় বলা যায় না। কিন্তু সেই ঐক্য না পেলে পৃথক্ পৃথক্ গণনায় হিসাব মিলে গেলেও কবিতা ব্যর্থই হয়। আপন প্রতিভার প্রকৃতি বুঝে স্বধর্মে স্থির থাকতে পারলে তবেই এরূপ ব্যর্থতা এড়ানো যায়। আমরা পূর্বে বলেছি বটে, অক্ষয়কুমার হৃদয়াবেগের আতিশয্য ত্যাগ করে কাব্যরূপের স্পৃহণীয় সংহতিতে ও সৌন্দর্যে পৌঁছে গিয়েছেন উত্তরকালে। সে কথা হয়তো আলোচ্য কাব্যত্রয়ীর সকল কবিতা সম্পর্কে সত্য নয়। অথবা, পুরানো কবিতাকে অনেক ঘষা মাজা ক'রে যতই দৃঢ়বদ্ধ ক'রে থাকুন, সকল সংস্কার সত্ত্বেও সেই-সব কবিতার যথার্থ পুনর্জন্ম বা রূপান্তর হয় নি আর হতেও পারে না।

ভাষায় ভাবে রূপে ছন্দে বড়াল কবির অপূর্ব সৃষ্টি হল 'বঙ্গভূমি'—

প্রণমি তোমারে আমি সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্যময়ি, অয়ি জননি আমার!
তোমার শ্রীপদরজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

সমস্ত কবিতাটিতে মৃণ্ময়ী বাংলা চিন্ময়ী হয়ে উঠে একটি অপূর্ব অখণ্ড মূর্তিতে জাগ্রত। এমন সংহতি, এমন শব্দসংগীত, এমন পরিস্ফুট রূপকল্প সমুদয় বাংলা কাব্য-সাহিত্যেই বিরল বলা চলে।—

শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কালভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা-দুখানি আগ্রহে শার্দূল!

এরই রূপান্তর দেখি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়—

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস বিরসমুখে!
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমলমালা দোলায় বুকে!

কিন্তু ভাস্করক্ষোদিত অপরূপ দেবীমূর্তির মতো রূপ পেয়েছেন অথচ সজীব সচল হয়ে উঠেছেন বঙ্গমাতা, সে ঐ অক্ষয়কুমারেরই ছন্দোবন্ধে—

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে আছ মেঘস্তূপে অসিতবরণা!…

হেরি তুমি সাশ্রুনেত্রে অবনতশিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !…
চূতমুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎপদ্মাসনে সর্বার্থসাধিকে !…
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা ! গণেশ-স্মৃতি !
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !…

এই ছিন্ন ছিন্ন উদ্‌ধৃতিতেও, আশা করি, কবির বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার বৈশিষ্ট্য এবং আবেগসংহত ছন্দোবন্ধের রসাভিমুখিতা মনোযোগী পাঠকের (শ্রোতার) অগোচর থাকে না। বস্তুতঃ এখানেই অক্ষয়-প্রতিভার বিশেষ উৎকর্ষ ও বিশেষ পরিচয়। কবির রোমান্টিক ভাবনার অনাবিল রূপ হল এই—

এ জীবনে পূরিত সকল
সে যদি গো আসিত কেবল
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্নে[৪] বাকি হইতে সফল।

সরল ভাষায় সহজ ছন্দে উৎসুক-সুন্দর ভাবনা তার আর সন্দেহ থাকে না ; সেই সঙ্গেই মনে হয় এই কবিমানসের আবেগ বা কল্পনা খুব একটা উচ্চগ্রামে বাঁধা হয়েছে এমন নয়, ভাষা বা ছন্দে ব্যঞ্জনাগুণও অল্পই।

সূক্ষ্ম সুকুমার কল্পনার অভাব, ব্যঞ্জনাগুণের অল্পতা কবি অক্ষয়কুমার-রচিত অধিকাংশ কবিতারই একটি বিশেষ ত্রুটি। অনেক কবিতায় হৃদয়াবেগের অভাব নেই, কিন্তু সে আবেগ হৃদয়ারণ্যে পথহারা তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও একদা প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ সেই মোহগহন সংশয়জালজটিল অরণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভূতলে ও অন্তরীক্ষে অবাধ সচ্ছন্দ সঞ্চরণের অধিকার অর্জন করেছেন। বড়াল কবির সম্পর্কে তা বলতে পারি নে। তিনি যেন ফিরে ফিরেই সেই অরণ্যে প্রবেশ করেছেন, অথবা কী জানি পুরাতন কবিতার সংস্কার-ছলে স্মৃতিতে বা স্বপ্নে পূর্ব-অভিজ্ঞতা বার বার নূতন করে জাগিয়ে তুলেছেন কি না। আর, বয়স ও অভিজ্ঞতা -বৃদ্ধির ফলে যখন তিনি সত্যই হৃদয়ারণ্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন তখনও প্রত্যক্ষ এবং পরিচিত সমতল ভূমি ছেড়ে বেশি দূর যেতে চান নি বা পারেন নি। অর্থাৎ, এক দিকে বড়াল কবির সারা জীবনের কাব্যসাধনা রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, বড়ো জোর মানসীর কোনো কোনো কবিতা— এগুলির সমপর্যায়ে থেকে গেছে ; আর-এক দিকে দেখি তাতে স্বচ্ছ সুন্দর প্রকাশ। প্রাঞ্জল ভাবনা কল্পনা— সংযত মধুর গম্ভীর ভাষা ও ছন্দ— তাঁর পরিণত মনের রচনাকে সত্যই মনোরম করেছে। ভাবে ভাষায় ছন্দে প্রদীপ-শঙ্খ-কনকাঞ্জলিতে সন্ধ্যাসংগীত বা মানসীর সাজাত্য যেখানে যেখানে দেখতে পাই সে যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাববশতঃ তা হয়তো নয়— উভয় কবির রচনায় পারম্পর্য খুঁজে দেখি নি— কিন্তু একই যুগপ্রবণতা, একই গুরুর আদর্শ উভয়ত্র কাজ করেছে এই মাত্র বলা যায়। (রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ছন্দের চারুতা অধিক তা হয়তো না বললেও চলে এবং অবকাশ ও ধৈর্য থাকলে একরূপ প্রসঙ্গ উভয়ের কাব্য থেকে আহরণ ক'রে পাশাপাশি সাজিয়েও দেখানো যায়।) কিন্তু

৪ 'ভুল' কাব্যের পাঠই ঠিক মনে হয়। 'শঙ্খ' কাব্যের পাঠ— স্বপ্ন।

রবীন্দ্রনাথ এই তারুণ্য-টল্‌টলে ভাব পরে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন, কড়ি ও কোমলে এবং মানসীতে এই তারল্য এই অস্থিরতা ক্রমশঃই নিরাকৃত হতে হতে, কবিচেতনার সোনার কাঠির স্পর্শে অবশেষে সোনার তরীতে এসে সত্যই সোনা হয়ে গিয়েছে। অক্ষয়কুমারের কবিকৃতি সম্পর্কে অসংশয়ে তা বলা যায় না।

নানা দেশের নানা যুগের উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টির প্রমাণে আর সামগ্রিক রবীন্দ্রকাব্যের পর্যালোচনাতেও দেখতে পাই— কবিতা ব্যঞ্জনাগুণে মন্ত্রের মতো চেতনা-উদ্‌বোধক হতে পারে, রূপকল্পনায় সংহত প্রতিমার মতো সৌন্দর্যকে সাকার করে, শব্দ ও ছন্দের সংগীতে অপূর্ব মায়াজাল-সৃজনেও পটু হয়ে থাকে। মন্ত্র, ইমেজ, সংগীত, যে-কোনো একটির বা অনেকগুলির সাজাত্যেই কবিতা পরম উৎকর্ষে এবং চিরচমৎকারিত্বে উত্তীর্ণ হয়। পূর্বোক্ত বঙ্গভূমি কবিতা স্মরণ করে বলতে পারি, অপূর্বপ্রতিমানির্মাণক্ষম কল্পনা অক্ষয়কুমারের ছিল না তা নয়। অনেক সময়ে বিচ্ছিন্ন এক-একটি ছত্রেও তার সুন্দর পরিচয় পেয়েছি—

কোথা গেল নাহি জানি
মরুর উপর দিয়ে নবনীল মেঘখানি।

অথবা—

স্ফুরিল কাকলী মুখে, সহসা উড়িল টিয়া—
উড়িছে হরিৎপক্ষে স্বর্ণরৌদ্র আলোড়িয়া।

কিন্তু, প্রায়শঃই অনাহূত তত্ত্বভাবনার আক্রমণে এ সৌন্দর্য পরাভূত হয়েছে। আমাদের সর্বশেষ ঐ উদ্‌ধৃতি যে কবিতা থেকে (এষা, সান্ত্বনা, ৫) সেটি আদ্যন্তই সুবিহিত একটি ইমেজ, পিঞ্জরের বিষণ্ণ শুককে অবাধ নীলাকাশে মুক্তি দেওয়ার সহজ সুন্দর কাহিনী। কবিতার ভিতরেই কবিতার ভাষ্য টীকা থাকবে এ কামনা রসিকের ছিল না, না থাকলেই তো ঐ শৃঙ্খলমুক্ত টিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ভাবনা বেদনা কল্পনার আশ্চর্য মুক্তিলাভ হ'ত। কবি কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌ ব'লেও পরিচিত হবার লোভ শেষ পর্যন্ত সংবরণ করতে পারেন নি, তাই শেষ কয় ছত্রে বলেছেন—

এই মৃত্যু! এই মুক্তি! হে দেব, হে বিশ্বস্বামী,
আমিও তো বদ্ধজীব, আমিও তো মুক্তিকামী!
আমিও কি ফেলি দেহ, বিস্ময়ে আতঙ্কহীন,
অসীম সৌন্দর্যে তব হইব আনন্দে লীন?

চমৎকার একটি কবিতাকে অকারণে মাটি করা হয়েছে। কবিতায় তত্ত্বের স্থান নেই এমন কথা কখনোই বলি নে, কিন্তু কবিতার মূল রসপ্রেরণার শক্তিতে সেটি কবিতার অঙ্গীভূত হওয়া চাই, অর্থাৎ জৈব প্রক্রিয়ায় ভাব আবেগ কল্পনা তত্ত্ব এগুলি একদেহ লাভ করা চাই। (নইলে কবিতা লেখা কেন?) অসংহত আবেগ বা অজীর্ণ তত্ত্বকথা মাত্র সম্বল ক'রে 'কবিতা' কতখানি ব্যর্থ হতে পারে তার নানা দৃষ্টান্ত বিশেষ দুর্লভ নয়; এখানে 'সুপ্তগ্রাম। দ্বিপ্রহরা অমানিশীথিনী' ইত্যাদি (এষা, শোক, ১১) কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি।—

আমার রয়েছে কর্মফল,
তাই আমি হতেছি বিহ্বল পাগলের প্রায়।

আমিও আমার কর্মশেষে
পলাইব তার মতো হেসে জানি না কোথায়।
জীর্ণ দেহ করি পরিহার
নব দেহ ধরিয়া আবার আসিব কি তবে?
মানুষ মানুষ পুনঃ হয়
পশু পক্ষী অন্য জীব নয়, কে আমারে কবে।...
না না, না না, কর্মে আছে ধারা—
কত গ্রহ রবি শশী তারা রয়েছে আকাশে।
সে আমার নিশ্চয় কোথায়
বসিয়া আমার অপেক্ষায় গভীর বিশ্বাসে।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে কবিপ্রিয়ার মৃত্যুর পরে রচিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দের এষা কাব্যে মুদ্রিত, এই কবিতায় বা কাব্যাংশে (এষা, অশৌচ, ৯) 'চিত্রা'র 'মৃত্যুর পরে' (৫ বৈশাখ ১৩০১) অবশ্যই মনে পড়ে। ভাবনা-বেদনার মিল কোন্‌খানে আর প্রকাশে কত তফাত, বিনা বিতর্কেই তা ধারণা করা সম্ভব। কবিতার 'কাঁচা মাল' হয়তো সবই আছে, হিন্দুশাস্ত্রসম্মতও হয়েছে— প্রাণবৈদ্যুতের সঞ্চারে সবটা এক দেহে এক জীবনে জেগে ওঠে নি; কবিতা হতে পারত, হয় নি।

কবি অক্ষয়কুমারের লোকখ্যাতি বিশেষভাবে এষা কাব্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।—

মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ?
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্মদান?

এই মর্মন্তুদ বেদনায়, শোকে, সংশয়ে, অবশেষে সান্ত্বনায় এই কাব্যের ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে।

কল্পনার হাতে নূতন করে সৃজিত না হলে (এ দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা কবিপ্রতিভাকে তথা কল্পনাকে মানসভূমির প্রজাপতি ব'লে নির্ধারণ করেছেন) বস্তু যে কতদূর অবস্তু হয়ে ওঠে কাব্যালোকে, সে আমাদের অজানা নয়। অক্ষয়কুমারের পরিণত এবং পরিমার্জিত কাব্যগুলিতেও সেরূপ 'বাস্তবতা' আছে। এষার 'মৃত্যু' পর্যায়ে প্রথম-দ্বিতীয় কবিতা যেমন তার সাক্ষ্যবাহী, পূর্ববর্তী শঙ্খ কাব্যের 'পঞ্চদশ বর্ষ গত' তারই বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। শেষোক্ত কাব্যের 'পিতৃহীন' কবিতাতেও বাস্তবতা যথেষ্ট এবং মুমূর্ষু দেহীর নানারূপ আক্ষেপ-বিক্ষেপ, শ্বাসকষ্ট, এমন-কি 'কণ্ঠের ঘর্ঘরধ্বনি', এসবেরও উল্লেখ আছে; তবে ঠিক-ঠিক কবিতার লক্ষণ ফুটেছে শেষ কয়েকটি ছত্রে যখন শ্মশানপ্রত্যাগত পুত্র—

প্রভাতে ফিরিছে গৃহে স্বপ্নাতুর-মত,
গলে শোকউত্তরীয় দোলে,
প্রতিবেশী জনে জনে বুঝাইছে কত—
দ্বারে এসে ডাকে 'পিতা' ব'লে।

বাস্তব দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা সার্থক রূপে ফুটে উঠেছে তেমনি কয়েকটি বাৎসল্যভাবের রচনায়, শঙ্খ কাব্যের অন্তর্গত 'আদর' বা 'মানিক' কবিতায়, অথবা অন্যত্র অন্য সংকলনে। অবশ্য, 'আদর' কবিতার ভাবভঙ্গীতে,

কেবল ইংরেজ কবি হুড্ নয়, দ্বিজেন্দ্রলালকেও মনে পড়ে, আর 'মাণিক' স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'কে।—

পাঁচ বছরের আমি, হ্যাঁগো বড়ো মামী,
আর ক বছর পরে বড়ো হব আমি ?[৫]
বড়ো হলে দেখো তুমি আমি ও মহিম
দুজনে ঘোরাব শুধু সোনার লাঠিম। (১৩১৭)

যার তুলনা—

এখনো তো বড়ো হই নি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।...
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা। (১৩১০)

অতুলনা হল মাণিকের সর্বশেষ উক্তি—

রোজ তুমি যাবে, নেবে যা ইচ্ছে মামী!
তোমার ও কাকাতু'টা নিয়ে যাব আমি ?

এখন আমরা এষার প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। একটি কবিতায় (এষা, সান্ত্বনা, ৭) ডাণ্টে গেব্রিয়েল রসেটির *The Blessed Damozel* কবিতার রূপকল্প এবং কলাকৌশলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করছি। সম্ভবতঃ পূর্বেও কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকবেন। অন্য দিকে ভাওয়াল কবি গোবিন্দ দাস বা রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতার কথাও মনে ওঠে না তা নয়। যেখানকার যে প্রভাব কার্যকর হয়ে থাক্ বা না'ই থাক্, কাব্য হিসাবে এষার উৎকর্ষ কতদূর সেইটেই আমাদের বিচার্য বিষয়। মিলটন অথবা শেলির অপূর্ব শোককাব্যের সমমর্যাদা পাবে না সে কথা অন্যে বলেছেন। এই এষা বা অন্বেষণীয়া 'এ নারী কোনও কবিপ্রিয়া বা কাব্যের আদর্শরূপা নহে, ধ্যান-কল্পনার ভাববিগ্রহও নহে' এ কথা বলেছেন কবি ও সমর্থ ক্রিটিক মোহিতলাল। মনস্বী বিপিনচন্দ্র যা বলেছেন তার সার কথা এই যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর বিশ্বজনীনতা একাধারে সমন্বিত না হলে উৎকৃষ্ট কবিতা হয় না। আর 'যে লোক শোককে আমারই নিজস্ব ভাবে, সে কদাপি তাহার বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শ্রেণীর শোক তামসিক।' তমঃ আবরক, প্রকাশক নয়। 'শোকের আঘাতে মানুষ যেমন কখনো কখনো দৃষ্টিহীন হয়, সেইরূপ কখনো কখনো দিব্যদৃষ্টিও লাভ করে।' সেই দিব্যদৃষ্টির পরিচয় 'এষা'য় কতটা রয়েছে, তা নিয়েই সে কাল এবং এ কালের মধ্যে মতভেদ হতে পারে। তত্ত্বে দ্বিমত না হলেও তার প্রয়োগে বা নিদর্শন-নির্দেশেই যা-কিছু বাদ বিবাদ। (মিশরের চিত্রাক্ষর-পাঠেও এত মতভেদের অবকাশ নেই।) বিপিনচন্দ্রের মতে, কবি 'এষাকে যে শোকের উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে।...

৫ এই দু ছত্রে ছড়ার ছন্দের ঝঙ্কার সুন্দর বেজে উঠেছে। পরে সে ভুল ভেঙে যায়।

এষার শ্রেষ্ঠত্বের মূল তত্ত্বটি এই।' তবে 'বৈষ্ণব কবিগণ যে বিরহের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন তাহার অনুরূপ কোনো কিছু জগতের আর কোনো সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেমন জলের তুলনা হয় না, বৈষ্ণব কবিগণের বিরহচিত্রের সঙ্গে এষারও সেইরূপ কোনোই তুলনা হয় না। অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ; ইহার মধ্যে সেই নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু নাই।... এ কালে তাহা ফুটিতে পারে না।' আমরা বলি, এ কালেও তা ফোটে।

ফলতঃ, টেনিসন রসেটি গোবিন্দ দাস ও রবীন্দ্রনাথ, এঁদের অল্লাধিক প্রভাব ও সাদৃশ্য বিচার-বিবেচনা না করেও বলা যায়, অক্ষয়কুমারের পূর্ববর্তী কাব্যনিচয়ে তাঁর কবিকল্পনার যে সীমা বা সামর্থ্য লক্ষ্য করা গেছে, অতিপ্রবল শোকের অভিঘাত সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে তার প্রসার বা পরিধি কোনো দিক দিয়েই বেড়ে যায় নি। শোকের অতিশয়িত বেদনাবোধ থেকে তা হয়তো সচরাচর হয়ও না। শোক শান্তিতে পরিণত হয়েছে যে কালগত বা মনোগত দূরত্বে পৌঁছে সেখানেও কবির ঐ চিত্তস্থিতি যতটা নিষ্ক্রিয় নৈতিকবোধ এবং তিতিক্ষা, শাস্ত্র বা গুরু -উপদিষ্ট আস্তিক্যবুদ্ধি, ততটা সক্রিয় সজীব সৃজনশক্তি নয়। সুতরাং প্রবল শোকের পরিণত শান্তিতেও অতলস্পর্শ কোনো গভীরতা বা নিবিড়তার সন্ধান মেলে না; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমতলভূমি ছেড়ে মুক্তপক্ষ কল্পনার কোনো সুদূরবিহার সম্ভবপর হয় না; এবং কিংবদন্তীশ্রুত লোক-লোকান্তরের ভাবনা, কল্পস্বর্গের বর্ণনা— সেও শেষ পর্যন্ত কথার কথা ব'লেই মনে হয়। অর্ধ শতাব্দের ব্যবধানে আজ আমাদের ধারণায় আসে না, সেদিনের রসিকচিত্তে এষার আবেদন কত প্রবল বা কিরূপ ছিল। সেই রসিকসমাজ শক্তিশালী ভাওয়াল-কবিকে অনেকটা উপেক্ষাই করেছে, প্রাচীন দ্বিজেন্দ্রনাথ আর নবীন দেবেন্দ্রনাথকে নিয়েও বিশেষ উল্লসিত হয় নি, এবং দ্বিজেন্দ্রলালকেও বেশি সমাদর করেছে তাঁর নাট্যকৃতির জন্যই। নানা কারণে রবীন্দ্র-ভাগ্য অন্যরূপ— তিনি কবি হিসাবে একই কালে প্রগাঢ় ভক্তি ভালোবাসা আর অপরিমিত অক্লান্ত নিন্দাবাদ উভয়ই অর্জন করেছেন।

অক্ষয়কুমারের যেগুলি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, বঙ্গসাহিত্যে চির-আদরণীয় হয়ে থাকবে প্রসাদগুণে, গাঢ়বদ্ধ শব্দ এবং ছন্দ -যোজনার সুষমায়, বাস্তবনিষ্ঠ বিশদ কল্পনার স্বচ্ছতায়, আর পরম্পরাগত বিশ্বাস-নিষ্ঠার আধারে দরদী ভাবুক হৃদয়ের যুগোচিত আবেগের সুন্দর মধুর সংযত প্রকাশে। বঙ্গবাণীর শততার বীণাযন্ত্রে একটি নূতন তার তিনিও যোজনা করে গেলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের কবিতাবলীর রচনাকাল প্রায়ই জানা যায় না। কোনো কোনো কবিতা বার বার সংস্কৃত হওয়াতে, প্রকাশকালের পারম্পর্যে প্রতিভা-বিকাশের বিচারও গবেষণাসাধ্য। বর্তমান পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডে প্রত্যেক কবিতার সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল -নির্দেশ সমুচিত হয়েছে, 'ভুল' কাব্যের বহু কবিতার রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে না থাকলেও সূচীপত্রে পাওয়া যাবে— আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, ভাবী সংস্করণে অন্যান্য কবিতার রচনাকাল -সংকলনেও যত্ন করা কর্তব্য, তা ছাড়া, সবিস্তার অথবা সংক্ষিপ্ত যেমনই হোক, কবির জীবনকথা -সংযোজনও অপরিহার্য। সুযোগ্য সম্পাদকের বিভিন্ন ভূমিকা থেকে কবিজীবনের অনেক তথ্যই আহরণ করা যায় সত্য, কিন্তু সেগুলি এবং অন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পূর্ণ অচ্ছিন্ন আকারে এই গ্রন্থের সূচনায় বা শেষে থাকলে বিশেষ একটা সুবিধা আছে সন্দেহ নেই।

কানাই সামন্ত

ON THE EDGES OF TIME. Rathindranath Tagore. Orient Longmans, Calcutta 13. Rupees 12.50

রবিতীর্থে। শ্রীঅসিতকুমার হালদার। পাইওনিয়ার বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা

জীবনের ঝরাপাতা। সরলা দেবীচৌধুরানী। সাহিত্য সংসদ্‌, কলিকাতা ৯। চার টাকা

স্মৃতিচিত্রণ। শ্রীপরিমল গোস্বামী। প্রজ্ঞা প্রকাশনী, কলিকাতা ৩। ছয় টাকা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের স্মৃতির সূত্রে পিতার জীবনের অনেকগুলি ঘটনার একটি মালা গেঁথেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরাট জীবন রেখাচিত্রে আজ সুপরিজ্ঞাত, কিন্তু যথাযোগ্য সমাবেশে সে চিত্র এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি। এর একটি কারণ, যাঁরা রবীন্দ্রজীবন লিখেছেন তাঁরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে বাইরে থেকে আর দূর থেকে দেখেছেন, কবির প্রতিভায় তাঁদের দৃষ্টি এমন অভিভূত হয়েছে যে অনেক সময়েই তাঁরা সামাজিক মানুষটিকে দেখতে পান নি। আবার, যাঁরা বিস্তর পরিশ্রম করে তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, সেই তথ্যের তলে চাপা পড়ে গিয়েছে মানুষটি। একদিকে অস্পষ্ট রেখাচিত্র, অন্যদিকে তথ্যের প্রাচুর্য। কিন্তু রেখাচিত্রে ও তথ্যে জৈবনিয়মে মিলেমিশে গেলে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মানুষের সৃষ্টি হয়ে ওঠে, এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনীর বেলায় তা ঘটে নি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইখানাকে সে দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে ভিতরের দিক থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। স্বল্পপরিজ্ঞাত বা অপরিজ্ঞাত তথ্যগুলোকে কলমের এক-আধ টানে সজীব করে তুলে পাঠকের চোখের সামনে এনে ধরে দিয়েছেন, পূর্ণ রেখাচিত্রকে আঁকবার প্রয়াস পান নি তিনি। সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। আমার মনে হয় ভালোই করেছেন, কারণ রেখাচিত্রকে আঁকবার প্রয়াস পেলে মনোরম তথ্যগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। বরঞ্চ চিত্তাকর্ষক তথ্যগুলোর দীপ্তিতে মাঝেমাঝে আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ মানুষটি। অস্পষ্ট রেখাচিত্রের লোভে তথ্যগুলো হারাতে আমরা রাজি নই।

ইচ্ছা ছিল কতক কতক অংশ উদ্ধার করে পাঠককে আমাদের আনন্দের ভাগ দিই, কিন্তু তাতে উদ্ধার করতে হয় অনেক, আর যেহেতু বইখানা ইংরেজিতে লিখিত, সেইজন্য সে লোভ সংবরণ করলাম। লেখক ইংরেজিতে লিখে বাঙালি পাঠককে বঞ্চিত করেছেন সত্য, কিন্তু অবাঙালি পাঠকের উপকার হবে। তার প্রয়োজন ছিল। আশা করি লেখকের কলম এখানেই থামবে না, আরো এই রকম মনোরম স্মৃতিকথা রচনা করে ভাবী জীবনীকারের পথ সুগম করে তুলে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন।

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তার পরে তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে অবস্থান করেছেন। পারিবারিক ও কর্ম-সূত্রে সংশ্লিষ্ট থাকায় রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে জানবার সুযোগ তাঁর হয়েছে। 'রবিতীর্থে' তাঁর সেই পরিচয় ও অভিজ্ঞতার বিবরণী। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কৌতূহলী তাঁদের অবশ্যই বইখানা ভালো লাগবে। যাঁদের কৌতূহল ব্যাপক, দেশের সমকালীন চিত্রকলা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রতি যাঁদের ঔৎসুক্য তাঁরাও

উপকৃত হবেন বইখানা পড়ে। প্রসঙ্গত দেশের সমকালীন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ও ঘটনাও এসে পড়েছে বইখানার মধ্যে।

সরলা দেবীচৌধুরানী সাহিত্যে ও রাজনীতিতে স্বনামে খ্যাত। কিন্তু তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের খ্যাতিও কম নয়; শ্বশুরকুলও তাঁর খ্যাতিমান। তাঁর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল কংগ্রেসের প্রথম আমলের সেক্রেটারি ছিলেন; মাতা মহর্ষিতনয়া স্বর্ণকুমারী দেবী; রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাতুল; আর স্বামী হচ্ছেন রামভূজ দত্তচৌধুরী— পঞ্জাবের একজন জননায়ক। এহেন তিন জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনী চিত্তাকর্ষক না হয়ে পারে না। হয়েছেও তাই। তাঁর জীবনের ঝরাপাতা কুড়িয়ে সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনীতি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনেক স্মর্তব্য বিবরণ লিখিতআছে তাতে।

বিবাহ পর্যন্ত জীবনকাহিনী তিনি নিজে লিখেছেন, পরবর্তী অংশ অপরের রচনা। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তাঁর বাল্যকালের কথা, বিশেষ করে যেখানে মহর্ষিপরিবারের অন্দরমহলের বিবরণ আছে। এসব কথা জীবনস্মৃতি ছেলেবেলা কিম্বা ঘরোয়া বা জোড়াসাঁকোর ধারে-তে পাই নি।

"আমি যখন প্রায় পাঁচ বছর বয়স থেকে জন্মপুরীতে ফিরে এসে তার হাওয়ায় মানুষ হতে লাগলুম, তখন সে পুরী জম্‌জম্ গম্‌গম্ করছে। প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক। কর্তাদাদা মহাশয়ের ছেলেমেয়ে, জামাই-বউ, নাতি-নাতনি, দাস-দাসীতে বাড়ি ভরা। যে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বার জন বামুন-ঠাকুর ভোর থেকে রান্না চড়ায়। যে প্রকাণ্ড রান্নাঘরের দু পাশে দু ভাগ করা মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত ঢালা হয়, যে ভাত স্তূপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে। তারই পরিমাণে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে দিনে সেই ভাতব্যঞ্জন ও রাত্রে লুচি-তরকারী লোক গুণে গুণে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে মহলে মহলে ঘরে ঘরে দিয়ে আসে বামুনেরা।

"এ বাড়ির একটা প্রথা উল্লেখযোগ্য এখানে। যেমন যেমন একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব হয়, অমনি অন্নপ্রাশনের পর থেকে তার জন্যে এক সেট নতুন জয়পুরী সাদা পাথরের থালাবাটি ও গেলাসের অবতারণা হয়। সাদা পাথরের বাসন দাসীদের হাতে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিঃশেষ হলে ক্রমে মুঙ্গেরের কালো পাথরের সেট তার স্থান পূরণ করে। আমরা তাতেই খেতে অভ্যস্ত। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে কাঁসা-পিতলের বাসনের মর্যাদা জানি নে, সে শুধু সরকার বামুন ঝি চাকরদের ব্যবহার্য বলে জানি; মহর্ষির নাতনিদের কেউ কেউ শ্বশুর-গৃহবাসের পূর্বে তার ব্যবহারে রপ্ত হয় নি। কাঁচের বাসনের চলন ছিল না তখন। চায়ের পেয়ালা পর্যন্ত ছিল না, কারণ চা খাওয়া ছিল না। আমাদের দুধের বরাদ্দ ছিল। প্রত্যেক বালক-বালিকার জন্য দাসীদের জিম্মে করা এক-একটি রুপার বাটি থাকত— তাতে করে দুধের ঘর থেকে দুধ এনে ছেলেদের দেওয়া হত। দুধের ঘর ও রান্নাঘর আলাদা।

"ঘরে ঘরে যে বামুন-ঠাকুরেরা খাবার দিয়ে যেত সেটা হল সরকারী রান্নাঘরের যোগান, এর উপরে প্রতি মহলে তোলা উনুনে গিন্নীদের নিজের নিজের রুচি ও স্বামীর ফরমাস অনুযায়ী বেসরকারী বিশিষ্ট রান্না আলাদা করে হত। সরকারী ও বেসরকারী রান্নায় আকাশপাতাল তফাত থাকতো। বড় হয়ে ছাত্রদের মেসের দাল-মাছের বর্ণনা শুনে আমাদের ছেলেবেলাকার রান্নাঘর থেকে আসা দাল-ঝোলের কথা মনে পড়ত।

"বাড়ির উত্তরে অনেকখানি খোলা জায়গা ছিল— সেটা হল গোলাবাড়ি। অর্থাৎ সেখানে ধান দাল প্রভৃতি শস্যরাজি সঞ্চিত থাকত। ঘি, তেল, নুন, চিনির ভাঁড়ার বারবাড়িতে অন্যত্র, তাও সরকারদের হাতে। তারাই প্রয়োজনমত এসব জিনিষ বামুনদের বের করে দিত। বাড়ির ভিতরে গিন্নীদের হাতে ছিল শুধু তরকারী ও ফল-মিষ্টির ভাঁড়ার।

"সকাল বেলায় ৭টার সময় ঘণ্টা বাজে দালানে উপাসনায় যাওয়ার জন্য। বউঝিয়েরা বিবাহের সময় উপার্জিত স্ব স্ব চেলি পরে সেখানে যান। নাতনিরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাদামশায়ের কাছ থেকে একখানি করে যে চেলি উপহার পায়, তাই পরে তাদের দালানে যেতে হয়। সেই হল নাতনিদের দীক্ষার চিহ্ন। বিনা চেলিপরা খুব ছোট মেয়েরাও দালানে যেতে পারে কিন্তু যেতে বাধ্য নয়। নাতিরা উপনয়ন না হলে দালানে বসার অধিকারী হয় না। অনধিকারে তারাও গিয়ে ব্রহ্মসংগীত শুনতে পারে ও শোনে। বিষ্ণু হলেন তখনকার গায়ক।

"দাদামশায় বাড়ি থাকলে উপাসনা ও উপদেশ খুব জমে। নয়ত বাঁধাগতের মত হয়। সেখান থেকে এসে, যে যার ঘরে গিয়ে পট্টবস্ত্রখানি খুলে তুলে রেখে সাদাসিধে কাপড় পরে ভাঁড়ার ঘরে আসেন।

"মামী-মাসীদের প্রাতঃকালীন ভাঁড়ার ঘরের বৈঠকটি বেশ জমে। উপরেই ভাঁড়ার ঘর— তাঁরা সেখানে বসে সবাই মিলে তরকারী কোটেন। দাসীরা মাছ কোটে নীচে রান্নাঘরের কাছে।

"এই তরকারী কোটার আসরে বড়-মাসীমা, সেজো মাসীমা ও ছোট মাসীমা, বড় মামী, নতুন মামী ও ন-মামী এবং সরোজা দিদি (বড় মামার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা) ও সুশীলা দিদি (সেজো মাসীমার জ্যেষ্ঠা কন্যা)— এই কয়জনের নিত্য উপস্থিতি দেখতে পেতুম। দিদিও যেতেন। আমার মা কখনো আসতেন না।

"পূজার মন্দিরে যেমন দুটি প্রকোষ্ঠ থাকে, একটি বহিঃপ্রকোষ্ঠ যেখানে সকলে যায়, একটি অন্তঃপ্রকোষ্ঠ যার ভিতর কেবল পুরোহিত ঢোকেন, মাসীদের ভাঁড়ারেও তেমনি দুটি ভাগ ছিল। বহির্ভাগে যেখানে তরকারি সাজানো, বানান ও বণ্টন করা হত সেখানে সবাই এসে বসতেন, কাজ করুন আর নাই করুন। অন্তর্ভাগে শুধু বড় মাসীমা প্রবেশ করতেন। আমরা ছোটরাও বাইরে বড়দের কোল ঘেঁষে এসে বসে পড়তুম, সিমলে বাড়িতে মার মজলিসের মত এখানে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, এখানে আকৃষ্ট-চিত্তে বড়দের কার্যকলাপ দেখতুম ও তাঁদের গল্প-গুজব শুনতুম। ওদিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ-পরায়ণা বড় মাসীমার দিকেও আমাদের চোখ থাকত। সেখানে থাকের পর থাকে ভাঁড়ের পর ভাঁড়ে নানারকম চর্ব্যচোষ্য লুকান থাকত। এক একদিন এক একটি কিছু বের করে এনে— আমসত্ত্ব, তিলকুটা, আনন্দ নাড়ু, সুজির নাড়ু, সন্দেশ বা যা হয় কিছু— আমাদের হাতে একটু একটু করে দিয়ে বড় মাসীমা আমাদের সবার হৃদয় কেড়ে নিতেন। তাঁর আজীবনের মটো ছিল—

কারেও করো না বঞ্চিত
সবারে দিও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

তাই সবারই প্রিয় ছিলেন তিনি।

"কর্তাদাদামশায় বাড়ি থাকলে তাঁর জন্যে দুটি-একটি বিশেষ রান্না শুক্ত মাসীদের হাতে এই ভাঁড়ার ঘরের বহিঃপ্রকোষ্ঠেই হত। সেজো মাসীমা প্রসিদ্ধ সুপাচিকা ছিলেন।

"মাসীমারাই ঘরকন্নার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। মা নিজের মহলে নিজের লেখা-পড়া বই-রচনার কাজে সদা রত থাকতেন। দৈবাৎ কখনো কোনো উৎসবাদি উপলক্ষ্য ছাড়া এদিকে নামতেনও না।"

এমনভাবে ঘরের কথা লিখতে মেয়েরাই পারে। জীবনের ঝরাপাতার প্রধান ঐশ্বর্য এমনি-সব ঘরের কথা— পিতৃকুলের মাতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের। এই দিক থেকে বিচার করলে বইখানাকে মূল্যবান সামাজিক ইতিহাস বলে গণ্য করতে হয়।

এ যুগে জন্মে রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিয়ে কারো পক্ষে বোধ করি জীবনস্মৃতি লেখা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের বিরাট জীবন আমাদের সমাজের সকল অংশকে স্পর্শ করেছিল। পরিমল গোস্বামীর স্মৃতি-চিত্রণেও রবীন্দ্রনাথ বারংবার এসে পড়েছেন। পরিমলবাবুর পিতা বিহারীলাল গোস্বামী সুকবি ও আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে টানতে চেয়েছিলেন। পরে পরিমলবাবু শান্তিনিকেতনে যান চিত্রকলা শিখতে। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়— সে যোগ শেষ পর্যন্ত ছিল।

কিন্তু বইখানার আসল রস স্নিগ্ধ মধুর কলমে অঙ্কিত জীবনের চিত্র। ইংরেজিতে যাকে sweetness and light বলে— সেই পরম দুর্লভ গুণ পরিমলবাবুর সব রচনাতেই আছে— স্মৃতিচিত্রণে তা বিস্তারিত ভাবে বিদ্যমান। বস্তুত ঐ sweetness and light-ই হচ্ছে এই চিত্র, করুণ-কোমল সূক্ষ্মরেখায় বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে। খুব সম্ভব এই অংশটিই বইখানার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এক সময়ে তিনি খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন। এমন সময়ে একজনের কাছে শুনলেন যে কলকাতায় আশ্চর্য ওষুধ বেরিয়েছে ম্যালেরিয়ার। তিনি তখনি কলকাতায় রওনা হলেন।

কলকাতায় পৌঁছে ওষুধের দোকানে না গিয়ে খাবারের দোকানে গিয়ে উঠলেন এবং দীর্ঘকালের অনাহারক্লিষ্ট রুগীর লোভ নিয়ে পেট ভরে সন্দেশ রসগোল্লা খেলেন। এই ভাবে ক'দিন পথ্য আহার করে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে ওষুধের টাকা পথ্যে ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন অগত্যা দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য পথ্যের গুণ— ম্যালেরিয়া সেরে গেল। সেই থেকে তিনি ব্যাধিমুক্ত, অবশ্য ঐ ব্যাধিটি। এ বর্ণনা এমন সরস ফুটে উঠেছে যে সন্দেশের চেয়ে তা কম উপভোগ্য নয়।

তার পরে যখন তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বসলেন তখন তাঁর জীবনক্ষেত্রে একে একে দেখা দিতে লাগল বন্ধুর দল যাঁরা পরবর্তীকালে জীবনের নানাক্ষেত্রে গ্রন্থখানার বাহন। পল্লীনদীর মসৃণ স্রোতে ডিঙি নৌকা যেমন অবাধে ভেসে যায় তেমনি ভেসে চলেছে পরিমলবাবুর কাহিনী অধ্যায়ের পরে অধ্যায়ে। পাঠক জানতেও পারে না কখন দশম পৃষ্ঠা থেকে একশত পৃষ্ঠায় এসে পড়েছে। বই শেষ হয়ে আসছে দেখে, পুরাতন প্রিয়বন্ধুর বিদায়ের সময় উপস্থিত হল ভেবে যখন সে বিষাদ অনুভব করে তখনি মনে প'ড়ে যায় যে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে বাধা নেই। বইখানা যে বারবার ঘুরে ফিরে পড়া চলে তার কারণ ঐ sweetness and light। এমন ভাবে মাধুর্য আর স্নিগ্ধদীপ্তির সমাবেশ যিনি ঘটাতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহ গুণীব্যক্তি।

পাবনা জেলার সাতবেড়ে গ্রামে পরিমলবাবুর জন্ম। তার পরে তিনি এলেন পোতাজিয়ায়, সেখানে

তাঁর পিতা ছিলেন হেডমাস্টার। আর একটু বেশি বয়সে এলেন ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে। এই তিনটি স্থান নিয়ে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের জগৎ।

সমস্ত বইখানা হাস্যরসে, চিন্তায়, fantasyতে, নানাবিধ চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। স্মৃতিকথার সার্থকতা যে স্মরণীয় বিষয়ের গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে না, করে লেখকের কলমের ও দৃষ্টির শক্তির উপরে পরিমলবাবুর স্মৃতিচিত্রণ তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শিশুপরিবেশ। সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যাত। ফলে যেমন বাহিরের দিক থেকে বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে মানুষ নিজেকে যোগযুক্ত বলে জেনেছে, তেমনি মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার আবিষ্কারের ফলে অন্তরের দিক থেকেও মানুষ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর সঙ্গে নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে। এসব যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা এ কথা আজ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে শুধু আকৃতিতেই মানুষ নিজের দেহের মধ্যে প্রাণীদেহের লক্ষ বৎসরের বিবর্তন বহন করছে তাই নয়, অন্তরের গহনেও মানুষ পশুমনের বিবর্তনকে নিত্যই রূপ দিয়ে চলেছে। মানুষ আর পশুর সংযোগস্থলে রয়েছে শিশু। মানবশিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন প্রবৃত্তির দিক দিয়ে তার সঙ্গে নবজাত পশুর কোনো প্রভেদ থাকে না। সমস্ত শৈশব ধরে মানবশিশুকে পশুপ্রবৃত্তি থেকে মানবপ্রবৃত্তিতে উত্তীর্ণ হবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়। তাই মানবশিশুর শৈশব এত দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময়। পশু জন্মেই পশুত্বে অধিষ্ঠিত হয়, কিন্তু মানবশিশুকে সাধনার দ্বারা মানুষ হতে হয়। মানুষের আকৃতিগত বিবর্তন মাতৃগর্ভেই ঘটে থাকে। মানুষের ভ্রূণের আকৃতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীর ভ্রূণের মতোই কিন্তু মাতৃগর্ভবাসের স্বল্পকালের মধ্যেই তার আকারের বিবর্তন ঘটে, সে পূর্ণাবয়ব মানবশিশুতে পরিণত হয়। আর মানবশিশুকে তার জন্মক্ষণ থেকে লালন করে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উন্নীত করে তার পরিবেশ। সে পরিবেশের উপাদান মাতার অতন্দ্র স্নেহ, পিতার সতর্ক দৃষ্টি, পরিবারবর্গের সহানুভূতি, ভ্রাতাভগ্নীর সাহচর্য, বিদ্যালয়, সমাজ এবং মানুষের হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতার ঐতিহ্য। এই পরিবেশ যদি অনুকূল হয় তবে শিশুর মানবত্বে উত্তরণ সহজ হয়। প্রতিকূল পরিবেশ চিরকালের জন্য তাকে পঙ্গু করে রাখতে পারে।

মনোবিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল যে সুচিরসঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডারের সঙ্গে যথাসম্ভব পরিচয় করিয়ে দেবার নামই শিক্ষাদান। কিন্তু শিশুর মনস্তত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে এ কথা বোঝা গিয়েছে যে জানার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। তার জ্ঞানের পিপাসাও প্রায় অনন্ত। কাজেই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে শিশুকে শিক্ষা দেবার অর্থ হল তার পরিবেশটিকে এমন করে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে তার অনন্ত জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটাবার উপাদান সে নিত্যই খুঁজে পায়। আগে শিক্ষকের দায়িত্ব ছিল শিশুকে শিক্ষা দেওয়া, আজ তাঁর দায়িত্ব হয়েছে শিশুকে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করা। উপযুক্তভাবে পরিবেশ রচিত

হলে শিশু আপনিই জ্ঞান আহরণ করতে থাকে। জ্ঞান উপর থেকে তার উপর চাপিয়ে দিতে হয় না। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাই তথাকথিত 'শিশুশিক্ষা'র আয়োজন না করে একটি 'শিশুপরিবেশ' রচনা করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত সমীরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শিশুপরিবেশ' নামক গ্রন্থে শিশুর মনোবিকাশের সম্বন্ধে এইসব নূতনতম আবিষ্কারের আলোচনা অতি সুন্দর ভাষায় বিন্যস্ত করে পরিবেশন করা হয়েছে। বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দেশের মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং শিক্ষাবিদ্দের গবেষণার ফলশ্রুতিকে আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বাংলাভাষার একটি দিকের আলোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সমীরণবাবু শান্তিনিকেতনের শিক্ষাসত্রে বহুদিন ধরে অধ্যাপনা করছেন। শিশুপরিবেশ এবং শিশুর মনোবিকাশ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্বকেই তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করে নিতে পেরেছেন। এই গ্রন্থে তার বিশেষ পরিচয় আছে। শিশুপরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রাধান্য সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। অথচ তাঁর বলার ভঙ্গি অত্যন্ত সরল এবং আলোচনার পারম্পর্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, তাঁর নিজস্ব চিন্তায় উদ্ভাবিত মাতৃপর্ব ইত্যাদি শিশুজীবনের ভাগগুলি মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে টিকবে কি না সে সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাঁর বক্তব্য বোঝাবার পক্ষে এ-বিভাগগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

'শিশুপরিবেশ' পাঠের পর কিন্তু একটি বিষয়ে অতৃপ্তি থেকে যায়। খেলার সাহায্যে শিশুর মনোবিকাশ বিশেষ করে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির সচেতনতা-বৃদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বাভাবিকভাবেই মাদাম মণ্টেসারির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এবং শিশুপরিবেশ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দানের আলোচনা করেন নি। শান্তিনিকেতনের যে পরিবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার ছেলেদের জন্য আলাদা ছুটির কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে ছুটি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সে পরিবেশটির আলোচনা করলে গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি হত বলে আমার ধারণা। আর এ আলোচনার অধিকারও গ্রন্থকারের রয়েছে। খেলার সাহায্যে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির সচেতনতা -বৃদ্ধির একটি স্বকীয় পদ্ধতি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করেছিলেন। বিদেশের লোকেদের তো দূরের কথা দেশের লোকেদের কজনই বা সেসব খবর জানেন। আশা করি, সমীরণবাবু ভবিষ্যতে এসব নিয়ে নূতন গ্রন্থ রচনা করে পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবেন।

এই গ্রন্থ পড়ে বাংলাভাষার বিপুল সম্ভাবনার কথা আবার নূতন করে বোঝা গেল। বাংলাভাষা যে এসব আলোচনার পক্ষে পরিপূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে গ্রন্থের সর্বত্র তার পরিচয় আছে। সমীরণবাবু সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং প্রকাশ ক্ষমতাকে তিনি বিশেষভাবে অধিগত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি যুগের ভাষা তাঁর আদর্শ।

অমিয়কুমার সেন

ডাকঘর নাটকের গান[১]

বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে,
নীল আকাশে পাড়ি দেব খ্যাপা হাওয়ার স্রোতে ॥
আমের মুকুল ফুটে ফুটে যখন পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
মাটির আঁচল ভ'রে ভ'রে—
ঝরাই আমার মনের কথা ভরা ফাগুন-চোতে ॥
কোথা তুই প্রাণের দোসর বেড়াস ঘুরি ঘুরি—
বনবীথির আলোছায়ায় করিস লুকোচুরি।
আমার একলা বাঁশি পাগলামি তার পাঠায় দিগন্তরে
তোমার গানের তরে—
কবে বসন্তেরে জাগিয়ে দেব আমাতে আর তোতে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II পা -র্সা । র্সা -ণা ণা -ধা I পধা -পা । মা -া গা -া I
বা ০ হি র্ হ ০ লে ম্ আ ০ মি ০

I মা -া । পা -া পা -া I ধা -পা । মা -া গা -মা I
আ ০ প ন্ ভি ০ ত র্ হ ০ তে ০

I { পা -না । না -া না -া I ধনা -া । (-া -া -া -পা) } I না -া না -র্সা I
নী ল্ আ ০ কা ০ শে ০ ০ ০ ০ ০ পা ০ ড়ি ০

I না -া । র্সা -া -া -া I না -া । র্সা -া ণা -া I
দে ০ বো ০ ০ ০ খ্যা ০ পা ০ হা ও

I ধা -া । পা -া মা -া II
য়া র্ স্রো ০ তে ০

II { মা -গা । মা -ণা ণা -া I ধা -া । ধা -া না -া I
আ ০ মে র্ মু ০ কু ল্ ফু ০ টে ০

---

১ রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে ডাকঘর অভিনয়ের নূতন পরিকল্পনা করেন। এজন্য কয়েকটি নূতন গান রচনা করেন। গীতবিতান, তৃতীয় খণ্ড (আশ্বিন ১৩৫৭ বা পরবর্তী মুদ্রণ) দ্রষ্টব্য।

I না -া । র্সা -া -া -া I র্সা -র্মা । র্মা -া র্গা -র্মা I
ফু ০ টে ০ ০ ০ য ০ খ ন্ প ০

I র্রা -র্জ্ঞা । র্রা -া র্সা -র্রা I না -া । র্সা -া -া -া I
ঢ়ে ০ ঝো ০ রে ০ ঝো ০ রে ০ ০ ০

I না -া । র্সা -র্রা র্সা -র্রা I র্সা -র্রা । র্রর্সা -া ণা -ধা I
মা ০ টি র্ আঁ ০ চ ল্ ভো ০ রে ০

I পধা -পা । পা -া -া -া } I সা -া । রা -া রা -া I
ভো ০ রে ০ ০ ০ ঝ ০ রা ই আ ০

I গা -া । -া -া -া -া I রা -া । গা -া গা -া I
মা ০ ০ ০ ০ র্ ম ০ নে র্ ক ০

I মা -া । -া -া -া -া I পা -ধা । পা -র্সা র্সণা -া I
থা ০ ০ ০ ০ ০ ভ ০ রা ০ ফা০ ০

I ণা -ধা । পধা -পা মপা -মা II
গু ন্ চো০ ০ তে০ ০

II সা -া । রা -া রা -া I রা -া । গা -া গা -া I
কো ০ থা ০ তু ই প্রা ০ ণে র্ দো ০

I মা -া । -া -া -া -া I মা -া । মা -পা পা -া I
স ০ ০ ০ ০ র্ বে ০ ড়া স্ খু ০

I -া -া । -া পা -ধা -া I পা -া । -া -া -ধা -ণা I
০ ০ ০ রি ০ ০ ঘু ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া । -া -া -া -া I ধা -া । ধা -া ধা -া I
রি ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ ন ০ বী ০

I ধা -না । না -া র্সা -র্রা I না -া । -া র্সা -া -া I
থি র্ আ ০ লো ০ ছা ০ ০ য়া ০ য়

I না -া । র্সা -র্রা র্সা -ণা I পধা -পা । মা -গা মা -া I
ক ॰ রি স্ লু ॰ কো ॰ চু ॰ রি ॰

I -া -া । -া -া মা গা I মা -া । মা -গা ণা -ধা I
॰ ॰ ॰ ॰ আ মার্ এ ক্ লা ॰ বাঁ ॰

I ধা -া । -া -া -া -না I র্সা -র্মা । র্মা -া র্গা -া I
শি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ পা গ্ লা ॰ মি ॰

I র্গা -র্মা । -র্রা -া -া -র্সা I না -া । র্সা -া না -া I
তা ॰ ॰ ॰ ॰ র্ পা ॰ ঠা য়্ দি ॰

I র্সা -র্রা । না -া র্সা -া I র্সা -র্রা । রর্সা -ণা ণা -ধা I
গ ন্ ত ॰ রে ॰ তো ॰ মা র্ গা ॰

I পধা -পা । মপা -মা মা -গা I গা -া । মা -া গা -া I
নে র্ তং ॰ রে ॰ ক ॰ বে ॰ ব ॰

I মা -া । গা -া মা -া I পা -া । ধা -া না -া I
স ন্ তে ॰ রে ॰ জা ॰ গি ॰ য়ে ॰

I না -া । র্সা -া -া -া I না -া । র্সা -া ণা -া I
দে ॰ বো ॰ ॰ ॰ আ ॰ মা ॰ তে ॰

I পধা -পা । মপা -মা গা -মা II II
আ র্ তোং ॰ তে ॰

—

স্বীকৃতি। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'পদ্মা' চিত্রের ব্লক ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সংশোধন। চতুর্দশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা পৃ ২৬৬ ছত্র ১— 'দুষ্মন্ত' স্থলে 'মাতলি' হইবে। শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থাবলী

কবিতা

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় ॥ চার্বাকের উক্তি ॥ প্রকাশক শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০। দেড় টাকা।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ পুষ্পরাণী ॥ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমন্দির ট্রাস্ট, ভদ্রকালী, হুগলী। সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীকানাই সামন্ত ॥ উষসী ॥ জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। তিন টাকা।

শ্রীকানাই সামন্ত ॥ ইন্দ্রধনু ॥ জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। দুই টাকা।

শ্রীকানাই সামন্ত ॥ রূপমঞ্জরী ॥ জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। তিন টাকা।

শ্রীকানাই সামন্ত ॥ নীরঞ্জনা ॥ এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা ১২। চার টাকা।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ ॥ নতুন মিছিল ॥ গ্রন্থগৃহ, কলিকাতা ১২। দুই টাকা।

শ্রীগোপাল ভৌমিক ॥ বসন্তবাহার ॥ গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা ২৯। দেড় টাকা।

শ্রীচন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায় ॥ রোদনভরা এ বসন্ত ॥ সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২০। এক টাকা।

দিনেশ দাসের কবিতা ॥ পাণ্ডুলিপি, কলিকাতা ২৯। আড়াই টাকা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী ॥ কাকলি ॥ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। এক টাকা।

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ফসলের গান ॥ স্টারলাইট পাবলিকেশনস্‌, কলিকাতা ২৬। আট আনা।

শ্রীপুষ্পল ॥ চৈতালী ॥ লাহিড়ী প্রেস প্রকাশনী, চিরিমিরি, মধ্যপ্রদেশ। আড়াই টাকা।

মাও ৎসে তুং ॥ আঠারোটি কবিতা ॥ ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি, কলিকাতা ১৩। দুই টাকা।

শ্রীমৃগাঙ্ক রায় ॥ সমুদ্রকন্যা ॥ সারস্বত লাইব্রেরি, কলিকাতা ৬। দেড় টাকা।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥ মিষ্টি মন ॥ সাহিত্যতীর্থ, কলিকাতা ৬। দুই টাকা।

শ্রীরাম বসু ॥ দৃশ্যের দর্পণে ॥ প্রকাশক দেবকুমার বসু, কলিকাতা ২৯। এক টাকা।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দরদী ॥ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, বার্নপুর। দেড় টাকা।

শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ সোনার হরিণ ॥ কৃত্তিবাস প্রকাশনী, কলিকাতা ৩। দেড় টাকা।

শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত ॥ শিশিরবিন্দু ॥ সাধারণ পাব্‌লিশার্স, কলিকাতা ১২। এক টাকা।

শ্রীসমীরণ গুহ ॥ বিভাবরী ॥ সাহিত্যলোক, কলিকাতা ৮। পাঁচ সিকা।

শ্রীসমীর ঘোষ ॥ অনেক দিন ॥ স্টারলাইট পাবলিকেশনস্‌, কলিকাতা ২৬। এক টাকা।

শ্রীসাহানা দেবী ॥ নীরাজনা ॥ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। চার টাকা।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ॥ জ্বলন্ত তলোয়ার ॥ কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা ১২। আড়াই টাকা।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী ॥ একান্তা ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। মূল্যের উল্লেখ নাই।

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ একা এবং কয়েকজন ॥ সাহিত্য প্রকাশক, কলিকাতা ৪। দুই টাকা।

শ্রীসুশীল রায় ॥ পাঞ্চালী ॥ এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা ১২। দুই টাকা।

শ্রীসুহৃদ রুদ্র প্রকাশিত ॥ সমকালীন বাংলা কবিতা ॥ কলিকাতা ৬। তিন টাকা।

শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ॥ দূরান্তিক। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা ১২। দুই টাকা।

শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ॥ শোহিনী ॥ আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। দুই টাকা।

প্রত্যাবর্তন

শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮১ শক

চিঠিপত্র শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল সন্ধ্যার সময় একলা অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছি; আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; দক্ষিণের বাতাস বইচে বেগে। হেনকালে নানাবিধ অর্ঘ্যভার বহন করে ঝগড়ু বেহারার অপ্রত্যাশিত অভ্যাগমে বিস্মিত হয়ে উঠলুম। তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই বুঝলেম এ তোমার কাছ থেকেই আসচে। আসন্ন বিদায়কালে তোমার হাত থেকে এই সব ভোজ্যসামগ্রীর উপহার আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল, ইচ্ছা করতে লাগল সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে কিছু দিই যাকে তুমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারো। মনে পড়ল পুনশ্চ বইখানা। কেননা ও বই তোমার ভালো লেগেছে। সেটাকে পুনশ্চ দিতে গেলে তোমার মনে হতে পারে অলমতি বিস্তারেণ। সে কথাটা বর্ত্তমানে কেন সম্পূর্ণ খাটে না, তা বুঝিয়ে বলি। এই দ্বিতীয় সংস্করণে কতকগুলি নতুন লেখা যোগ করা হয়েছে। তা ছাড়া কতকগুলি মিলহীন কবিতা দিয়ে পরিশেষের ক্ষতিপূরণ করে দেব। তার বিলম্ব আছে, কেননা পরিশেষের পরিশেষ হবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমি একান্ত ইচ্ছা করচি এবং আশা করচি গৌরীপুরে গিয়ে তুমি আনন্দে থাকবে। দেখবার ক্ষুধা তোমার দুই চক্ষু পূর্ণ করে আছে। তুমি দেখতে জানো। পল্লিশ্রীর আহ্বান তোমার মনকে উৎসুক করে তুলবে। নিশ্চয় তোমার আসন পড়বে কোনো একটা খোলা জানালার কাছে। সেখান থেকে কী দেখতে পাবে সে আমার কল্পনাদৃষ্টির সামনে নেই। পুঞ্জীভূত শ্যামলতার একটা আভাস আমার মনে আসে। কোনো গাছে নতুন পাতা ওঠবার সময় এখনো আছে কোনো গাছের পরিণত পাতায় গাঢ় রং ধরেছে। আমার মনে পড়ে আমাদের শিলাইদহের কুঠিবাড়ি। আমি থাকতুম তেতলার ঘরে। দূরপ্রসারিত তরঙ্গায়িত সবুজের মাথা পেরিয়ে দেখা যেত দূর পদ্মার একটি ক্ষীণ রেখা; নৌকোগুলো তটের তলায় প্রচ্ছন্ন থাকত, কেবল মাস্তুলের চূড়াসংলগ্ন স্ফীত পালের কিয়দংশ শরতের বৃষ্টিরিক্ত অলস মেঘের মতো নীল আকাশের গায়ে গায়ে চলত ভেসে। আর কখনো বা উজানের মুখে ডাঙা বেয়ে চলত গুণ কাঁধে নিয়ে নতদেহ মাল্লার দল। সেই নদীরেখার ওপারে দেখা যেত পাণ্ডুবর্ণ বালুচরের বিস্তার, আকাশের নীলিমার সঙ্গে আপন গৌরিমার যুগলতা প্রকাশ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। বৈশাখে শস্যশূন্য মাঠের ধূসরতার মাঝে মাঝে তরুচ্ছায়ায় আবিষ্ট এক একটি গ্রাম— পিণ্ডীকৃত গাছগুলোর নিবিড়

আবেষ্টন ভেদ করে এক-একটা তালজাতীয় গাছ আপন স্বাতন্ত্র্য উচ্ছ্রিত করেচে মেঘলোকে। আমাদের বাগানে বিলম্বে ফলবার আমগাছে তখন বোল ধরেচে, দখিন বাতাসের বেগে দূরের থেকে তার গন্ধ মৃদু হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করচে। হঠাৎ কখনো ব্যর্থ সন্ধানে কোনো একটা ভ্রমর ভন্ ভন্ করতে করতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। নদীর ধার দিয়ে একটা বাঁকাচোরা পথ গ্রামগুলির সামনে দিয়ে কোনো একটা বড় রাস্তার সঙ্গে মিলন লক্ষ্য করে চলেচে। এই গ্রামের রাস্তার দুই ধারে আম জাম কাঁঠাল আমার আমলে আমার হুকুমে লাগানো হয়েচে।

রাস্তার বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঁকা ভঙ্গী উপর থেকে দেখতে পেতুম। বাংলা দেশের এই সুকোমল শুশ্রূষার পরিবেষ্টনের মধ্যে থেকে আমি তখন সাধনার জন্যে গল্প লিখচি, প্রবন্ধ লিখচি, লিখচি ক্ষণিকা চিত্রা আরো কত কি। তারি ফাঁকে ফাঁকে বাংলা পল্লিগ্রামের যে স্পর্শ আছে তা আমার পাঠকেরা ঠিক বুঝতে পারবে না। আমার সেই সেদিনকার কল্পনা তোমাদের গৌরীপুরের উপরে আরোপ করচি। ঠিক মিলবে না বোধ করি। ওখানকার পল্লী বোধ করি ঐশ্বর্য্যের সোনার শৃঙ্খলে বন্দিনী। তা হোক্ মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়বার অবকাশ আছে হয়তো। বুঝতেই পারিনে অর্থহীন সংস্কার নিজে সৃষ্টি করে কঠিন উৎপীড়নের জাল বিস্তার করাকে মানুষ কেন যে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা বলে কল্পনা করে। নিজেকে নানা বিচিত্র বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করতে যারা অভ্যস্ত, তারা কোনো কালে কোনো বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার অধ্যবসায়কে উদ্‌বুদ্ধ করবে কোন বুদ্ধিতে? আপনার লোককে যারা বেঁধেছে পরের হাতের বাঁধন তাদের খুলবে না। থাক্‌গে ওসব তর্ক। আপাতত নিজের শরীরটাকে সুস্থ করে তোলবার সাধনা সম্পূর্ণ মন দিয়ে গ্রহণ কোরো। যে শরীরটাকে অযাচিত দানরূপে পেয়েছ সেটার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে তোমার দায়িত্ব আছে।

তোমার পত্রোত্তরে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, খ্যাতি অর্জ্জন করবার জন্যে কোনোদিন আমি কোনো রকম উদ্যোগ করিনি। জয়ন্তী প্রভৃতি ব্যাপারে আমি আরাম বোধ করিনি একথা নিশ্চিত জেনো। আমি জনতার সমাদর কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি বলেই আমি জনপ্রিয় হতে পারিনে। মানুষকে খুসি করতে পেরেচি এবং তারা আমাকে খুসি করতে চায় এর প্রমাণ পেলে নিঃসন্দেহ আমার আনন্দ হয়। কিন্তু সেটা চেষ্টাকৃত যদি হয় যদি অকৃত্রিম না হয় তবে তার চেয়ে বিতৃষ্ণাজনক কিছু হতে পারে না। কবির সত্যকার দণ্ডপুরস্কার কালের হাতে। মৃত্যুর ওপার পর্য্যন্ত তার জন্যে সবুর করতে হয়— অসময়ে সেটাকে ছিনিয়ে নেবার মতো বেহায়াগিরি আর কিছু নেই। বিধাতার দান অমনিই অনেক পেয়েছি, আরো নাই বা পেলুম। ইতি ১১ বৈশাখ ১৩৪১

দাদা

২০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি হাত দেখিয়ে গ্রহবিচার করিয়ে আমার চরিত্র এবং জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে অনেক খবর পেয়ে থাকো, কেন এ সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারলে না যে আমি কিছুকাল থেকে নানাবিধ কর্ম্মে, রচনায়,

আতিথ্যসৎকারে, দুশ্চিন্তায়, দৈহিক দুর্ব্বলতায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছি। এই জন্যে অনেককাল কাজের চিঠি ছাড়া অন্য সকল চিঠি লেখাই বন্ধ হয়ে আছে। শুধু কাজের ভিড়ের কৈফিয়ৎই যথেষ্ট নয়, বস্তুত আমার দেহ এখন কর্ম্মবিমুখ হয়ে উঠেছে, সামান্য কর্ত্তব্যকেও গুরুভার বলে মনে হয়। সম্পূর্ণ ছুটির জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। আমি চতুরাশ্রমে জীবনের ভাগকে বিশ্বাস করি— আমার বানপ্রস্থের বয়স হয়েচে— কিন্তু এ যুগে তার ব্যবস্থা নেই। ঘরের মধ্যেই যথাসম্ভব বানপ্রস্থ রচনা করতে হয়। আমার বানপ্রস্থ দায়িত্ববিহীন অকাজের মধ্যে— যে কাজে কোনো কৈফিয়ৎ নেই— যাতে বিশ্বের বা নিজের হিতও হবে না অহিতও হবে না— যাতে হৃৎপিণ্ডেও ধাক্কা লাগে না, মস্তিষ্কেও আলোড়ন চলে না— অর্থাৎ যা প্রাচীন বয়সের শৈশবতা। সাহিত্যে একটা খ্যাতি পেয়েছি তার কাছে আমার দায় আছে, সে দায় বাঁচিয়ে চলতে হয়— কিন্তু যদি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একটা ছবি আঁকতে থাকি— তাহলে যা তা আঁকতে দ্বিধা করি নে। লোকে যদি বলে আমি ছবি আঁকতে পারিনে, তবে তাতে সঞ্চিত যশের অপচয় ঘটে না। তাই যখন কর্ত্তব্যের দায়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন মানুষের কাছ থেকে অকারণ বৈরিতায় মন ব্যথিত হয়ে থাকে, তখন সেই অবসাদের সময় চিঠিপত্র লিখতে চেষ্টা করলে লেখনীকে গুরুভার বলে মনে হয়। তখন যেমন তেমন করে ছবি আঁকতে আমার বাধে না। তাই আমার জীবনযাত্রাপথের শেষ প্রান্তে যখন আলো ম্লান হয়ে এসেছে তখন ইচ্ছা করে ছবি এঁকে সময় নষ্ট করি। সময় নষ্ট করবার অধিকার আমার হয়েচে। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাদ্দের অনেক বেশি কাজ করেছি— এখন যদি কর্ম্মশালার দ্বার বন্ধ করি তাহলে বেতন কাটা যাবে না।

তোমার কোনো একটা পত্রে জনশ্রুতির কথা লিখেচ যে, আমি সীতার নিন্দা করেচি। এমন অদ্ভুত অপবাদ বাংলা দেশেই সম্ভব। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সন্দীপ বলে একটা মানুষ খাড়া করেছিলুম তার চরিত্রে ভদ্রতার আদর্শ নেই। সীতার সম্বন্ধে সে যদি এমন কিছু বলে থাকে যা সীতার পক্ষে সম্মানকর নয় তা হলে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী বলা মূঢ়তা। দ্রৌপদীকে কীচক নিঃসন্দেহে অপমান করেছিল, দুঃশাসন সভাস্থলে তার বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিল এ কথাও মহাভারতে পড়েছি; বেদব্যাসকে সে জন্যে বাঙালী সমালোচকও নিন্দা করেনি, আমার বেলাতেই যে তাদের বুদ্ধি যায় বিগড়ে তার কারণ তুমি জিজ্ঞাসা কোরো আমার জন্মনক্ষত্রকে। আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেচি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলা দেশে আমার জন্ম না হয়— এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন— আমি ব্রাত্য আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্ম্মসঙ্গত।

সিংহলে লোকেরা আমাকে পেয়ে খুসি হয়েছিল। আনন্দ দিয়েছি, আনন্দ পেয়েছি। কবির পুরস্কার এইটুকুই। বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো, বোলো অলিখিত পত্রোত্তরের জন্যে তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাকে কিছুমাত্র যেন পীড়ন না করে। আমি জানি এই তার ত্রুটি ঔদাস্যবশত নয়, চিঠি লেখায় তার হাত পাকা হয়নি সেই সঙ্কোচেই। জীবনে অনেক চিঠি লিখেচি। কিন্তু আমার চিঠি লেখার শক্তি প্রায় বাসন্তীর কাছাকাছি এসে পৌচেছে— এই জন্যেই চিঠি লেখা সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যবোধ প্রতিদিন শিথিল হয়ে আসছে। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৪১

দাদা

আর্থিক উন্নতি

ভবতোষ দত্ত

অর্থনীতির আলোচনার প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আর্থিক উন্নতির পথ এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রায় অন্তহীন আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ঠিক কী উপায়ে একটা দেশের বা সমাজের আর্থিক উন্নতি বা অবনতির পরিমাপ করা যেতে পারে সে বিষয়ে অর্থনীতি বা সমাজনীতি -বিশারদেরা এখনও একমত হতে পারেন নি। প্রথম দৃষ্টিতে প্রশ্নটা অত্যন্ত সহজ বলেই মনে হবে। ভারতবর্ষ গরীব দেশ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আমাদের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ, এই ধরণের সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত থেকে মনে হতে পারে যে আর্থিক উন্নতি বা সমৃদ্ধির সংজ্ঞা এবং পরিমাপ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ং-প্রমাণিত। কিন্তু আধুনিক কালের অর্থনীতির আলোচনায় এই বিষয়ে বহু তর্কের উদ্ভব হয়েছে এবং যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থিরসিদ্ধান্তে আসা সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এটাও আবিষ্কৃত হয়েছে যে আর্থিক উন্নতির সংজ্ঞা বা পরিমাপের মাপকাঠি শুধু অর্থনীতির যুক্তিসমষ্টি থেকে পাওয়া যাবে না।

আর্থিক উন্নতির সমস্যাটাকে আমরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে সহজ করেই দেখি এবং তাই সমাজের সমস্যাটাও সহজ বলে মনে করি। আমার নিজের বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যদি আমি পুরোপুরি অবহিত থাকি তা হলে গতবছরের তুলনায় আমার আর্থিক অবস্থা ভালো হয়েছে কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার পারা উচিত। আমি যদি নিজের সম্বন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, তা হলে আমার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সমাজের সম্বন্ধেও এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হবে না। প্রথম বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে ভারতবাসীর সমষ্টিগত আর্থিক উন্নতি হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে কতটা হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে কোনো পদ্ধতিগত তর্কের অবকাশ আছে বলে অনেকেরই মনে হবে না।

কিন্তু একটু গভীর ভাবে সমস্যাটা বিচার করলেই দুটো মূল প্রশ্ন জেগে উঠবে। প্রথমত, একজন ব্যক্তি কি সব সময়েই বলতে পারে তার আর্থিক উন্নতি হয়েছে কি না? এবং দ্বিতীয়ত, যদি ধরে নিই যে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক উন্নতির পরিমাপ আলাদা ভাবে করা সম্ভব, তা হলেও সমাজের সমষ্টিগত উন্নতির পরিমাপ সম্ভব কি না।

খুব সহজ একটা উদাহরণ নিয়ে আরম্ভ করা যাক। যদি একজন লোক যেসব এবং যে-পরিমাণ জিনিস ব্যবহার করে তার সবগুলিরই বেশি বেশি পেতে আরম্ভ করে তা হলে আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে তার আর্থিক উন্নতি হয়েছে। অবশ্য জিনিসগুলির কোনোটিরই এমন হলে চলবে না যে তার কম পরিমাণ পেলেই লোকটি খুশি হয় এবং বেশি পরিমাণ পেলে বিব্রত হয়। বিভিন্ন জিনিসের সমষ্টি-তুলনা সম্বন্ধে গণিতবিদের প্রণালী অবলম্বন করে আমরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হতে পারি এবং বলতে পারি যে, যদি লোকটির ভোগ্য বা অধিকৃত জিনিসগুলির অন্তত একটিরও পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অন্য কোনোটাই কমে না যায়, তা হলে সে আগের চেয়ে বেশি জিনিস পাচ্ছে এবং তার আর্থিক উন্নতি হচ্ছে।

কিন্তু এত সহজ উদাহরণ বাস্তবজীবনে নাও মিলতে পারে। একমাত্র যে ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিবিশেষ

সম্বন্ধে এই জাতীয় একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি সেটা হল যেখানে ব্যক্তিটির অর্জিত টাকার পরিমাণ বেড়েছে এবং কোনো জিনিসেরই দাম বদলায় নি। সব জিনিসের দামই যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং আমার আয় যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সব জিনিসই আমি আগের চেয়ে কিছুটা বেশি কিনতে পারি। আয় বাড়ার ফলে সব জিনিসই আমি প্রকৃত পক্ষে বেশি বেশি কিনছি কি না, সে প্রশ্ন অবান্তর। আমি যেসব জিনিস অধিকতর পরিমাণে কিনতে পারি সেটাই বড় কথা; যদি আমি অন্য কোনো রকমের দ্রব্যসমষ্টির দিকে যাই, তা হলে বুঝতে হবে যে আমি সব জিনিস বেশি করে কিনবার যে আনন্দ তার চেয়েও বড় আনন্দ পাচ্ছি এবং আগের চেয়ে ভালো আছি নিশ্চয়ই।

যদি ব্যক্তির আয় বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দামও বদলায় এবং বিশেষত যদি এমন হয় যে আগে যেসব জিনিস পাওয়া যেত এখন আর তার সব পাওয়া যায় না এবং এখন যা পাওয়া যায় তার সব আগে পাওয়া যেত না, তা হলে বিভিন্ন আয়ের সময়ে আমাদের দুটো বিভিন্ন ভোগ্যবস্তুর সমষ্টির তুলনা করতে হয়। এখানে পূর্ববর্ণিত সহজ পন্থায় আর্থিক উন্নতির পরিমাপ পাওয়া যাবে না। কথা উঠবে, যার আর্থিক উন্নতির পরিমাপ করছি তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখলেই তো হয় যে আগেকার তুলনায় সে যে জিনিসগুলি নতুন বা বেশি করে পাচ্ছে তার কাছে সেগুলির ব্যবহারের বা অধিকারের মূল্য যে জিনিসগুলি কমে গিয়েছে বা পাওয়া যাচ্ছে না, তার চেয়ে বেশি না কম। যুদ্ধের আগে যে দু-বেলা ভাত খেয়েছে সে এখন আটার রুটি খেয়ে যদি বলে যে ভাতের চেয়ে চাপাটি অনেক ভালো এবং অন্য কোনো দিকে তার দ্রব্যভোগের কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে, তা হলে সমস্যাটা সহজ হয়ে যায় বলে মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম নৈয়ায়িকরা বলবেন যে এই তুলনার মূল্য বেশি নেই, কারণ যে-লোক যুদ্ধের আগে ভাত খেয়ে আনন্দ পেত এবং যে আজকাল সাগ্রহে চাপাটি খেয়ে যাচ্ছে তারা ঠিক একই লোক হয়তো নয়। দ্রব্যবিশেষের অপ্রাচুর্যে, আয়-পরিবর্তনে এবং বাজারদরের পরিবর্তনে লোকটির পছন্দ-অপছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি সবই হয়তো বদলে গিয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে তুলনার কোনো মানে হয় না।

আর্থিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক তর্কে না গেলেও চলে। যদি আমি বর্তমানে মনে করি যে আমি আগের চেয়ে ভালো আছি, তা হলেই যথেষ্ট। তুলনাটা ঠিক বর্তমান আর অতীতের মধ্যে নয়, তুলনাটা হয় বর্তমান এবং অতীতের স্মৃতির মধ্যে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অতীতের তৎকালীন স্বরূপের চেয়ে অতীতের বর্তমানকালীন স্মৃতি অনেক বেশি মনোহর। এটা প্রত্যেকেই নিজের মনকে যাচাই করে বুঝতে পারবেন। আমি আগের চেয়ে ভালো আছি এ কথাটা অনেকে হয়তো বলতে চান না নানারকম কুসংস্কারের জন্য— ভালো আছি বললেই কোনো শনিগ্রহ কুপিত হয়ে পড়বেন এই ভয় অনেকেরই আছে। আগের চেয়ে ভালো আছি এ কথা স্বীকার না-করাটা জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বও হতে পারে— যাদের দৃষ্টিভঙ্গি আশাভঙ্গ এবং নৈরাশ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত তারা উন্নতির পরিমাপ করতে স্বভাবতই অক্ষম হয়ে পড়ে। আর অনেক ক্ষেত্রে তুলনাটাই অসমভাবে হয়। অতীতের কঠিন সমস্যাগুলির কথা লোকে ভুলে যায়, অতীতের ছোট আনন্দগুলির উপরেই নজর পড়ে বেশি। বর্তমানের অশেষ কষ্ট নিয়ে যিনি অবিরাম-ভাবে নালিশ করছেন তাঁকে যদি দেখিয়েও দেওয়া যায় তাঁর বাড়িতে গরমের দিনে আগে তালপাতার পাখা ছাড়া কিছু দেখা যেত না, কিন্তু এখন তাঁর তিনটে বৈদ্যুতিক পাখা আছে, তাঁর বসবার ঘরে তক্তপোষ আর ক্যানভাসের ডেক্‌-চেয়ারের বদলে

একটা সোফা-কৌচের সেট দেখতে পাচ্ছি, তাঁর বেকার ছেলে দুটি এখন রোজগার করছে, তা হলেও তাঁকে সহজে বোঝানো যাবে না। চালের দর ট্রামের ভিড় ইত্যাদি নিয়ে নালিশ তিনি করে চলবেনই।

উপরের উদাহরণ থেকে এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে বিজলিপাখা আরামকেদারা ইত্যাদির সংখ্যা বাড়লেই সুখবৃদ্ধি হয়, চালের দামের বৃদ্ধি সত্ত্বেও। কার কিসে সুখ বলা শক্ত ; কেউ কম খেয়েও গরমে আরাম চান, কেউ হয়তো দু থালা ভাত খেতে পারলে মেজেতেই শুয়ে দিন কাটাতে রাজি আছেন। এখানে প্রধান কথা হল যে, নিজের সুখের বিচার অনেকেই নিজে করতে পারেন না। কারণ অতীতের স্মৃতি তাঁর কাছে ক্রমেই বেশি মনোহর হয়ে উঠছে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনাটা ঠিক পক্ষপাতহীন ভাবে হচ্ছে না।

আর-এক ধাপ অগ্রসর হয়ে অনেকে বলেছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক উন্নতি হয়েছে কি না সে সম্বন্ধে তার মত জিজ্ঞাসা না করে, তার বাহ্যিক আচরণ থেকে কিছুটা হয়তো বোঝা যেতে পারে। কোনো কোনো বিশেষ অবস্থার ব্যক্তির আচরণ থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হতে পারে। যদি দশ টাকা দিয়ে আমি একটা কোনো দ্রব্যসমষ্টি (বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন পরিমাণ) স্বেচ্ছায় কিনি তা হলে বলতে পারি যে, দশ টাকা বা তার চেয়ে কম দামে আরও যতরকমের দ্রব্যসমষ্টি কেনা যায় তার সবগুলির চেয়ে আমার কেনা সমষ্টিই আমার কাছে ভালো, এটা আমি আমার আচরণ দিয়ে প্রমাণ করেছি। গত বছরের দশ টাকা দিয়ে আমি যে দ্রব্যসমষ্টি কিনেছিলাম, এবারে যদি দশ টাকা বা তার চেয়ে কম দামেই সেই সমষ্টি পাওয়া যায়, অথচ আমি দশ টাকা খরচ করি অন্য একটা দ্রব্যসমষ্টির জন্য, তা হলেও আমার আচরণ দিয়ে আমি প্রমাণ করেছি যে আমি আগের চেয়ে ভালো আছি। দশ টাকা খরচ করে আগের মত ভালো আমি থাকতে পারতাম, কিন্তু আগেকার দ্রব্যসমষ্টি না কিনে যদি আমি আর-একটা সমষ্টি কিনি, তা হলে এই দ্বিতীয় সমষ্টিকে নিশ্চয় আমি প্রথম সমষ্টির অপেক্ষা ভালো মনে করি। যদি আমার মনোভাব রুচি পারিবারিক বা সামাজিক সংস্থানে কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে, তা হলে এ ক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

কিন্তু গত বছরে আমি দশ টাকা দিয়ে যে দ্রব্যসমষ্টি কিনেছিলাম এবারে যদি তার দাম বারো টাকা হয়ে থাকে, এবং এ-বছরে যদি আমি দশ টাকা খরচ করে অন্য একটা দ্রব্যসমষ্টি কিনে থাকি, তা হলে কি হল কিছুই বলা যায় না। গত বছরে যা কিনতাম তার দাম কিছু বেড়ে যাবার পরে যদি এবার অন্য কিছু কিনি, তা হলে হতে পারে যে আমি প্রথম সমষ্টির চেয়ে দ্বিতীয় সমষ্টিটি বেশি পছন্দ করি বলেই সেটি কিনছি ; আবার, এমনও হতে পারে যে প্রথম সমষ্টিটির দাম বেড়ে যাওয়াতে আমি খানিকটা অনিচ্ছায় দ্বিতীয় সমষ্টিটি কিনছি। আমার আচরণ দেখে কেউ এখানে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত গোলমালের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি জিনিসগুলির দাম যোগ দিয়ে বলি-না কেন যে অধিকতর মূল্যবান দ্রব্যসমষ্টিই ভালো। বিভিন্ন কালের মধ্যে এই জাতীয় তুলনার কোনো অর্থ নেই, কারণ জিনিসপত্রের দাম বদলায় এবং ব্যবহারের গুরুত্ব বদলায়। দাম বদলানোর প্রভাবটাকে বাদ দেবার জন্য যদি কোনো প্রকারের মূল্যসূচী ব্যবহার করতে চাই তা হলেও বিভিন্ন জিনিসের গুরুত্ব নিরূপণের সমস্যা উঠবে। এমনকি একই সময়ে যদি বিভিন্ন দ্রব্যসমষ্টির মোটমূল্য তুলনা করে কোন্‌টি ভালো

কোন্‌টি ভালো নয় এই বিচার করতে চাই তা হলে আবার একটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়— জিনিসের বাজারদর এবং ব্যক্তি ও সমাজের কাছে জিনিসের গুরুত্ব এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কতটা।

এই সম্পর্কটা খুবই কাছাকাছি হত যদি প্রত্যেক লোকের পছন্দ-অপছন্দ এবং ক্রয়ক্ষমতা ঠিক এক হত। সে ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসের জন্য যে দাম দিতে চাইতাম, আর একজনও সেই দামই দিতেন, আমি যে দামে যে জিনিস যতটা কিনতাম, আর একজনও তাই কিনতেন। এ কথা অবশ্য অনায়াসে বলা যায় যে, বিভিন্ন লোকের পছন্দ-অপছন্দ একই রকম কি না সেটা অবান্তর ; সামাজিক নীতি নির্ণয়ে আমাদের ধরে নেওয়া উচিত যে প্রত্যেকেরই রুচিবোধ এক রকম। কেউ যদি বলে যে, অনেক জিনিস পেয়েও তার তৃপ্তি হয় না, তা হলে সমাজের উচিত তার এই মনোভাবকে অবহেলা করা। কিন্তু আমরা যদি এ রকম একটা মূলনীতি গ্রহণ করি তা হলে সেটা আসবে আমাদের সামাজিক ঔচিত্যবোধ থেকে, বিশ্লেষণী যুক্তি থেকে নয়।

ব্যক্তির সমস্যা থেকে সমাজের সমস্যার দিকে চোখ ফেরালে দেখতে পাই যে, অনেক নূতন প্রশ্ন উঠছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রাচুর্যবৃদ্ধির পরিমাপ আমরা পেয়েছি— কোনো জিনিসের কমতি না হয়ে অন্তত একটা জিনিসের পরিমাণ বৃদ্ধি ; যদি সব জিনিসেরই পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তা হলে সিদ্ধান্তের জোর আরো বাড়ে। প্রাচুর্যবৃদ্ধিতে আর্থিক উন্নতি হয় এটা মেনে না নিলে অর্থনীতির আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। যেখানে প্রাচুর্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না, সেখানেও আমরা দেখেছি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হতে পারে। সমাজের সমস্যার মূল প্রশ্ন হল, কি উপায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক উন্নতির পরিমাপ থেকে একটা সামাজিক যোগফল পাওয়া যাবে। আমাদের এমন কোনো মাপকাঠি নেই যা দিয়ে আমরা একজনের সমৃদ্ধির সঙ্গে আর-একজনের সমৃদ্ধির বা আর্থিক অবনতির তুলনা করতে পারি। একজনের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-একজনের আয় কমে যায়, তা হলে এই দু জনের সমাজের মোট আর্থিক উন্নতি হয়েছে কি না এই প্রশ্নের কোনো সার্থক উত্তর নেই। রামবাবু যত সুখেই থাকুন-না কেন, শ্যামবাবু যদি গরিব হয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে রামবাবুর সুখ এবং শ্যামবাবুর অ-সুখ যোগ দিয়ে একটা নীট্‌ যোগফল পাবার কোনো উপায় আজ পর্যন্ত কারো জানা নেই।

কিন্তু এখানেও কিছুদূর যে অগ্রসর না হওয়া যায় তা নয়। ঠিক যেভাবে আমরা ব্যক্তির সমৃদ্ধির পরিমাপ পেয়েছিলাম সেভাবেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজের আর্থিক উন্নতির একটা মাপকাঠি পাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যদি কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সমাজের প্রত্যেক লোকের আলাদাভাবে আর্থিক উন্নতি হয়েছে, তা হলে অনায়াসে বলতে পারি যে সমাজেরও আর্থিক উন্নতি হয়েছে। এবং আর-এক ধাপ গিয়ে বলা যায় যে সমাজের কোনো লোকেরই আর্থিক অবনতি না হয়ে যদি অন্তত একজনেরও আর্থিক উন্নতি হয়, তা হলেও সমাজ সমৃদ্ধতর হয়েছে। অবশ্য, একজনের উন্নতিতে অপরের ঈর্ষার উৎপত্তি হলে এবং সেটার কোনো সামাজিক গুরুত্ব দিতে গেলে এতেও গোলমাল হবে।

সামাজিক মোট আর্থিক উন্নতির এই মাপকাঠি প্রয়োগ করতে গেলে যে ঘটনাসংস্থান প্রয়োজন সেটা পাওয়া যাবার সম্ভাবনা কম। কারোই আর্থিক অবনতি হয় নি এ রকম চমৎকার আর্থিক পরিকল্পনা কোনো দেশ নিতে পারবে এ রকম সম্ভাবনা নিকট-ভবিষ্যতে আছে বলে মনে হয় না। পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত যে রকম আর্থিক প্রচেষ্টাই হোক-না কেন, কারো-না-কারো সমৃদ্ধি কমবার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আলাদা আলাদা উন্নতির যোগফল উন্নতিই; এবং অবনতিহীন উন্নতির যোগফলও উন্নতি। কিন্তু অবনতি আর উন্নতির যোগফল মাপতে গেলে মাপকাঠি দরকার, এবং এই মাপকাঠি ব্যক্তির বেলা এবং সমাজের বেলা সর্বত্রই দুষ্প্রাপ্য।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সমস্যাটাকে সহজ করে আনা যায়। যদি বিশেষ কোনো পরিকল্পনার ফলে সমাজের কারো কারো ক্ষতি হয় এবং কারো কারো লাভ হয় তা হলে একটা হিসাব করা যেতে পারে। যদি যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা যাঁদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের সব ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েও কিছুটা লাভ নিজের হাতে রাখতে পারেন তা হলে আমরা সেই অবস্থায় উপনীত হই যেখানে কারো ক্ষতি হয় নি এবং কারো লাভ হয়েছে। কোনো পরিকল্পনা সকলের পক্ষেই গ্রহণীয় হবে যখন পরিকল্পনাপ্রসূত মোট সম্পদ থেকে যাঁদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ করেও উদ্‌বৃত্ত সম্পদ থেকে যাবে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে এই ক্ষতির পরিমাপ কি করে হবে এবং ঠিক কি শাসনতান্ত্রিক উপায়ে এই ক্ষতি পূরণ করা হবে। এটা অর্থনীতির সমস্যা মাত্র নয়। যে-কোনো সরকারি কর্মচারী অনায়াসে বলে দিতে পারবেন এই লাভক্ষতি মাপামাপি, কার ক্ষতি হয়েছে সেটা বার করা এবং লাভবানদের লাভ থেকে যাঁদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ করা প্রায় একটা অসম্ভব কাজ।

যাঁরা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব তুলেছিলেন তাঁদের অনেকে অবশ্য বলেছেন যে, ক্ষতিপূরণ করবার মত মোট সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে কি না এটা দেখলেই হল, বাস্তবপক্ষে ক্ষতিপূরণের কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের যুক্তির মূল হল বহুসংখ্যক অনিশ্চিত ঘটনার সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধীয় গাণিতিক নীতি। এঁরা বলেন যে, যদি অসংখ্য আর্থিক প্রচেষ্টা নানা দিকে আরম্ভ হয় তা হলে একটিতে যাদের ক্ষতি হবে আর-একটিতে তাদের লাভ হবে। এভাবে অসংখ্য প্রচেষ্টার ফলের সম্মিলিত প্রভাবে প্রত্যেকেরই ক্ষতির দিকটা পুষিয়ে যাবে; যদি প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা থেকে মোট সম্পদ বাড়ে তা হলেই প্রচেষ্টাগুলি গ্রহণীয়।

কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকারভেদে এটা খুবই সম্ভব যে পরিকল্পনার প্রত্যেকটি বা বেশির ভাগ প্রচেষ্টা থেকে সমাজের কোনো একটি বিশেষ অংশেরই উপকার হচ্ছে; সে-ক্ষেত্রে উপরের নিয়ম খাটবে না। দ্বিতীয়ত, যে ব্যবস্থাই হোক-না কেন, সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং সেই পরিবর্তন গ্রহণীয় কি না এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। তা ছাড়া সমস্যাটা ঠিক বর্তমান অবস্থা আর-একটা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে তুলনার নয়। বর্তমান অবস্থাতেও আয়বণ্টন পরিবর্তন করে বিভিন্ন রকমের সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-সংস্থান পাওয়া যেতে পারে; আর পরিবর্তিত অবস্থায় নানা রকমের আয়বণ্টনের ব্যবস্থা হতে পারে। আয়বণ্টন-ব্যবস্থার কোন্‌টি গ্রহণীয় এই সমস্যার সমাধান বা এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে সমাজের আর্থিক উন্নতির ঠিক কোনো সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না।

আবার তা হলে প্রশ্ন উঠবে, আয়বণ্টন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কে নেবে এবং নেওয়া হবে কি উপায়ে? একনায়ক-শাসনব্যবস্থায় এসব সমস্যার সমাধান সবচেয়ে সহজ। দেশের ডিক্টেটর আয়বণ্টন বিষয়ে যে মূলনীতি নেবেন তার উপরে ভিত্তি করেই অন্য-সব ব্যবস্থা হবে— কোন্ জিনিসের উৎপাদন প্রয়োজন এবং কতটা করে ভাগে পড়বে সেটা এই একনায়কীয় মূলনীতি থেকেই পাওয়া যাবে। যদি দেশের শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হয়, তা হলেও একটা বণ্টনসম্বন্ধীয় মূলনীতি প্রয়োজন; এই মূলনীতি জনমতসম্মত

হওয়া উচিত, কিন্তু ঠিক কি ভাবে জনমতসম্মত মূলনীতি আবিষ্কৃত হবে সেটা বলা কঠিন। যদি দুটি মাত্র বিকল্প মূলনীতির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয় তা হলে দেশে গণভোট নিয়ে কোন্ নীতিটি গ্রহণীয় সেটা সহজেই বার করে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনটি বা ততোধিক গ্রহণযোগ্য এবং গ্রহণসাধ্য নীতির মধ্যে যদি একটিকে বেছে নিতে হয় তা হলে অসুবিধা হতে পারে। তিনটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোটসংখ্যা যদি হয় যথাক্রমে শতকরা চল্লিশ, পঁয়ত্রিশ ও পঁচিশ, তা হলে প্রথম প্রস্তাবটি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে এটা যেমন ঠিক, শতকরা ষাট জন ভোটার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে এটাও তেমনি ঠিক।

ভোটের ব্যাপারে আরো অনেক সমস্যা ওঠে এবং সেগুলি 'আনুপাতিক ভোট' ইত্যাদি ভোটপ্রথা সংস্কারের প্রস্তাবগুলির উপরেও প্রযোজ্য। অনেক সময় আমরা ভোট দিই নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ যাচাই করে নয়, বরং বেশির ভাগ লোক কোন্‌দিকে ভোট দিচ্ছে সেটা দেখে। আমাদের ভোট দেবার স্বাধীনতা আইনত অব্যাহত থাকলেও আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিককে সহজে অবহেলা করতে পারি না। ঘটনা-সংস্থানে এটা খুবই সম্ভব যে অল্প ভোটাধিক্যে যে মূলনীতি গৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল সেটা 'বিপুল ভোটাধিক্যে' গৃহীত হয়ে গেল। যেদিক জিতছে বলে আমরা দেখছি বা মনে করছি সেদিকে যাবার একটা প্রবণতা অনেকের মধ্যেই আছে। এই প্রবণতার জন্য শতকরা পঞ্চান্ন যদি শতকরা পঁচাশিতে গিয়ে দাঁড়ায় তা হলে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু শতকরা পঁয়তাল্লিশ যদি শতকরা বাহান্নতে গিয়ে দাঁড়ায় তা হলেই ভোটের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে।

এ কথার অর্থ এই নয় যে, আর্থিক উন্নতির জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে একনায়ক সমাজ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। একনায়ক সমাজে মূলনীতি আবিষ্কার বা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন সহজ, কিন্তু যে মূলনীতি সমাজকে গ্রহণ করানো হবে সেটার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুই বলা যাবে না। একনায়ক সমাজের কর্তা এমন নীতি অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন যাতে তাঁর নিজের সমৃদ্ধি বাড়ে, বা তাঁর নিজের রাষ্ট্রীয় অধিকার আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়, বা পরদেশ-আক্রমণের জন্যই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনা করা হয়। যে সমাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রকে সব চেয়ে উঁচু স্থান দেয়, সে সমাজে গণতন্ত্রের মূল্য হিসাবে কোনো কোনো দিকে সমস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি বা রূপপরিবর্তন মেনে নিতে হবে। আর্থিক সমস্যার সংখ্যাল্পতা এবং বাস্তবক্ষেত্রে সমস্যার সহজ সমাধানের সম্ভাব্যতাই আর্থিক ব্যবস্থার বাঞ্ছনীয়তার একমাত্র প্রমাণ নয়।

গণতন্ত্র এবং একনায়কত্বের মধ্যে গণতন্ত্র বেছে নেবার পরে এবং বিভিন্ন বণ্টনব্যবস্থার মধ্যে একটিকে কোনো উপায়ে বেছে নেবার পরেও আর-একটা জটিল সমস্যা থেকে যায়। দেশের আর্থিক উন্নতির পরিমাপ যদি দীর্ঘকালকে জড়িয়ে নিয়ে করা হয় তা হলে বর্তমান আর ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি বৎসরের (বা অন্য কোনো সময়চক্রের) মধ্যে সম্পদবণ্টনের একটা সমস্যা ওঠে। আজ অনেকটা বেশি খেয়ে কাল অনেকটা কম খাওয়া, আজ অল্প-একটু বেশি খেয়ে কালও কিছুটা বেশি খাওয়া, আজ কিছুটা কম খেয়ে কাল অনেকটা বেশি খাওয়া ইত্যাদি পন্থার মধ্যে কোন্‌টা বেশি গ্রহণীয় এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে দেবেন। ফলে, সমাজের পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর কি হবে সেটা বলা কঠিন। আমরা যদি আগামী পঁচিশ বছরের কথা ভাবি এবং আর্থিক উন্নতির মোট দীর্ঘকালীন রূপ বিচার করতে যাই তা হলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল জুড়ে সম্পদবৃদ্ধির যে নানা রকম বিকল্প গতিপথ পাওয়া যেতে পারে তার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় সে-সম্বন্ধেও একটা সামাজিক মূলনীতি আবিষ্কার বা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

আর্থিক উন্নতির কালব্যাপী গতিপথ কি রকম হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক সমাজে সে প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করা কঠিন। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল্য অনেকেই এত বেশি মনে করবেন যে এই প্রশ্নের উত্তরদান সহজ করে আনবার জন্য তাঁরা গণতন্ত্র ছেড়ে একনায়কত্বের দিকে যাবেন না। আর, আমরা আগেই দেখেছি যে সমস্যা সহজ করে আনতে পারাটাই কাম্যতার লক্ষণ নয়।

কিন্তু এখানে আরো একটি সমস্যা আছে। যদি কোনো গণতান্ত্রিক উপায়ে— ভোট নিয়ে বা জনপ্রতিনিধিদের মত নিয়ে— স্থির করা হয় যে বর্তমানে কিছুটা কষ্ট করে (অর্থাৎ ভোগ কমিয়ে বা বাড়তে না দিয়ে) ভবিষ্যতের ভোগ্যবস্তু -উৎপাদন বাড়ানো হবে, তা হলে গণতান্ত্রিক সমাজেও অনেকটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হবে। ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকালীন ত্যাগ সামাজিক নীতি হিসাবে যাঁরা অনায়াসে গ্রহণ করবেন, তাঁরাও ব্যক্তিগত আচরণের সময় নিজেদের বর্তমান সুবিধাটা বাড়াতে চাইবেন। দেশসুদ্ধ লোক চাল মজুত করে রাখলে সকলেরই অনিষ্ট হয়, এটা মেনে নিয়েও আমরা প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় চাল মজুত করতে অনায়াসে চেষ্টা করি। এই ধরণের আচরণ দুটো কারণ থেকে হয়। প্রথম কারণ হীন স্বার্থবুদ্ধি— সবাই যেখানে ত্যাগস্বীকার করছে সেখানে আমি যদি আমার ভোগ অব্যাহত রাখি তা হলে কী আর ক্ষতি, এ জাতীয় যুক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেকের মনেই ওঠে। দ্বিতীয় কারণ আত্মরক্ষার চেষ্টা— আমি যদি নিশ্চিত হই যে কেউ চাল মজুত করবে না, তা হলে আমিও না করতে পারি ; কিন্তু এই নৈশ্চিত্যবোধ আমার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে। সমাজের দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণের সংগতি রাখতে গিয়ে আমি হয়তো দেখতে পাব যে শুধু আমিই ঠকেছি।

এই ব্যক্তিগত আত্মরক্ষামূলক আচরণ সামাজিক মঙ্গলের পরিপন্থী হলে সেটার প্রতিকারের একমাত্র উপায় আত্মরক্ষামূলক আচরণের প্রয়োজন যাতে না হয় সে রকম অবস্থা আনা— অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আচরণের উপরে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ নয়, এটার মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির আত্মরক্ষামূলক আচরণের প্রয়োজন দূরীভূত করা। আমাকে যদি সরকার নিশ্চিত করে যে অন্যের সমাজবিরোধী কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে, তা হলে আমার সমাজবিরোধী কাজের উপরে নিয়ন্ত্রণও আমি সহজেই মেনে নেব।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণ ভালো না মন্দ এটা কিছুটা উৎপাদন ও বণ্টন -ব্যবস্থার পরিচালনার সমস্যা এবং কিছুটা সামাজিক নীতির সমস্যা। যদি সমাজের বেশির ভাগ লোক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণ না চান, তা হলে গণতান্ত্রিক সমাজে এর উপরে আর কোনো যুক্তি চলে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, সেই সমাজে দীর্ঘকালব্যাপী দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি এবং বণ্টনসাম্য অসম্ভব। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি সব চেয়ে ভালো তার উত্তর পুরোপুরি অর্থনীতি থেকে মিলবে না, কিন্তু কোন্ রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে কোন্ অর্থনৈতিক নীতির সামঞ্জস্য নেই, কোন্‌টা কোন্‌টার সঙ্গে পরস্পরবিরোধী সেটা সহজেই দেখানো যায়।

ভারতবর্ষে আর্থিক পরিকল্পনার রূপায়ণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণের বৃদ্ধি দেখে, বা দেখতে, যাঁরা উৎসাহ বোধ করেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কারোই কিছু বলবার নেই যদি তাঁরা দ্রুত এবং বহুলপরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বণ্টনসাম্য না চান। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রসারের অসুবিধা এবং কুফল অনেক আছে

এবং এগুলিকে প্রাধান্য দেওয়াটা অসমীচীন এ কথা বলা চলে না। অন্যদিকে, যাঁরা ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থিক উন্নতির হারে সন্তুষ্ট নন এবং ভবিষ্যতে দ্রুততর এবং অধিকতর উন্নতি দেখতে চান তাঁদের বিরুদ্ধেও কিছু বলবার নেই, যদি তাঁরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বৃদ্ধিতে বিচলিত না হন। যুক্তির অভাব ঘটে সেখানেই, যেখানে আর্থিক উন্নতির লক্ষ্য এবং আশা প্রায় গগনস্পর্শী, আয়বণ্টনের অসাম্যে যেখানে প্রচুর অসন্তোষ, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রের বিস্তারের সমালোচনায় যেখানে চতুর্দিক মুখর।

উপসংহারে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আর্থিক উন্নতির সংজ্ঞা দেওয়া বা পরিমাপ করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন, যদি আমরা সামাজিক মঙ্গল সম্বন্ধে কোনো একটি মূলনীতি গ্রহণ না করি। এই মূলনীতি থেকেই আমাদের পেতে হবে নানা প্রশ্নের উত্তর— কোন্ জিনিসের উৎপাদন বাড়াব, কোন্‌টার কমাব; সমাজের কাদের আয় বেশি বাড়ানো দরকার, কাদের আয় বেশি না বাড়ালেও চলে, কাদের আয় কমিয়ে আনাই উচিত; নানা জিনিসের উৎপাদন এবং ভোগের কালব্যাপী গতিপথ কি রকম হবে, ইত্যাদি। এই মূলনীতি একমাত্র অর্থনীতির সমস্যা নয়, এটা রাষ্ট্রীয় নীতির সমস্যা, সমাজনীতির সমস্যা, দেশের লোকের ঔচিত্যবোধের সমস্যা। কোন্ সমাধান সব চেয়ে ভালো সেটা সব সময়ে হয়তো নাও বোঝা যেতে পারে; আর এটাও সম্ভব যে একদিক দিয়ে দেখলে যে সমাধান সব চেয়ে ভালো অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বাঞ্ছনীয় হবে না। তা ছাড়া সব চেয়ে ভালো সমাধান যেটা, সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে নিয়োগ করার পথেও অনেক বাধা থাকতে পারে। তাই সামাজিক সমস্যার সমাধানে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা কী হবে বা কী হওয়া উচিত তার অনুসন্ধান শেষপর্যন্ত 'যথাসাধ্য ভালো'র অনুসন্ধানে গিয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনীতি বিভাগ
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

'ঘরেও নহে পারেও নহে'

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যখানি একান্ত নিঃসঙ্গ, ইহার কোনো দোসর নাই। এমন নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধারণত দু-তিনটিতে মিলিয়া অল্প সময়ের ব্যবধানে ঝাঁক বাঁধিয়া আসে— তাহারা এক জাতের পাখী, এক নীড়ের অধিবাসী, এক লক্ষ্যের যাত্রী। কিন্তু খেয়া কাব্যের বেলায় দেখি সে নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহার সঙ্গী নাই, তাহার আশেপাশে আগেপিছে বৎসর কয়েকের ব্যবধানেও খুব উল্লেখযোগ্য কাব্য নাই।[১]

কাব্য নাই, কিন্তু কলমের অবসরও নাই, এই সময়টাতে অজস্র গদ্যরচনা— প্রধানত ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত— দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যেন এই কয় বছর কবির কলম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারক ও সমাজসংস্কারকের কলম গ্রহণ করিয়াছেন। এই গদ্যরচনার দুস্তর প্রান্তর অতিক্রম করিতে করিতে এক-একবার ইহাকেই নিয়ম ও খেয়ার মতো কাব্যকেই নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতে থাকে। আসলে গদ্যের প্রান্তরটাই যে নিয়মের ব্যতিক্রম ইহা সব সময়ে মনে থাকে না। রবীন্দ্রকাব্যের বিশাল জগতে এত বিস্তৃত এমন একটানা গদ্যের প্রান্তর আগেও আর নাই, পরেও আর পাওয়া যাইবে না। অবশ্য পরবর্তীকালে পূরবী কাব্যের আশেপাশে আগেপিছে আর-একটি গদ্যরচনার প্রান্তর পাওয়া যাইবে, কিন্তু সে প্রান্তর এমন বিশাল নয়, আর পূরবী কাব্যখানাও এমন নিঃসঙ্গ নয়।[২]

এখন, খেয়ার এই নিঃসঙ্গতা মনে প্রশ্ন না জাগাইয়া পারে না, আর সেই প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া এই নিঃসঙ্গতা ও খেয়া কাব্যের রহস্য-কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারা যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

নিঃসঙ্গ খেয়া কাব্যের দোসর নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাহার তুলনা আছে। বাংলাদেশের জনমানবহীন বৃক্ষবনস্পতিহীন বিশাল প্রান্তরের প্রান্তে নদীতীরবর্তী খেয়াঘাটের নিঃসঙ্গ ছায়াবটের রাজকীয় মহিমা খেয়া কাব্যের যথার্থ তুলনা। দূরদূরান্ত হইতে দৃশ্যমান, ক্লান্ত পথিকের লক্ষ্য, খেয়াযাত্রীর আশ্রয় এই ছায়াবট বাংলাদেশের বহুপরিচিত দৃশ্য। ইহাকে খেয়া কাব্যের তুলনা বলিলাম বটে কিন্তু আরও একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার আকাশের পটে যতই পোঁচের পর পোঁচ কালি বুলাইয়া দিতে থাকে পরিচিত ছায়াবট ততই রহস্যময় হইয়া ওঠে, অবশেষে এক সময়ে অন্ধকারের পটে তারাগুলি যখন পূর্ণ দীপ্যমান হইয়া ওঠে আমাদের পরিচিত ছায়াবট তখন দেখা-না-দেখার প্রান্তে, থাকা-না-থাকার

---

১ খেয়া কাব্য প্রকাশ ১৯০৬ আষাঢ়। পূর্ববর্তী কাব্য: নৈবেদ্য ১৯০১, শিশু ও স্মরণ ১৯০৩; পরবর্তী কাব্য: গীতাঞ্জলি, প্রকাশ ১৯১০।

এ সব ছাড়া সামান্য কিছু গান ও কবিতা এই সময়ের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু এই স্বল্পতা রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের ধর্ম নয়। পদ্যের প্রাচুর্যের স্থলে এই পর্বটায় দেখিতে পাওয়া যায় গদ্যের প্রাচুর্য।

২ পূরবী প্রকাশ ১৩২৫ শ্রাবণ; পূর্ববর্তী কাব্য: পলাতকা ১৯১৮, শিশু ভোলানাথ ১৯২২।

পূরবী যে খেয়া কাব্যের মত নিঃসঙ্গ নয় তার প্রধান কারণ, এই সময় রবীন্দ্রকাব্য-জগতে পশলায়-পশলায় গানের বর্ষণ চলিতেছে। প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৯২৫) সেই দিব্যবারি সঞ্চিত।

প্রান্তে এক রহস্যভয়াল মূর্তি গ্রহণ করে ; তাহা আকাশের কি পৃথিবীর মন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না ; তাহার পরিচিত সত্তার মধ্যে কোথা হইতে যেন অপরিচয়ের প্রক্ষেপ ঘটিয়া দৈবী সত্তার আবির্ভাব ঘটে। ছায়াবট অবশ্যই খেয়া কাব্যের তুলনা, কিন্তু তাহা অন্ধকার নিশীথের ছায়াবট।

অন্ধকার নিশীথের উল্লেখ নিছক অলংকার মনে করিবার কারণ নাই— এ ক্ষেত্রে ইহা পরম বাস্তব, আর খেয়া কাব্যের ব্যাখ্যায় ইহার বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। খেয়া কাব্যে পঞ্চান্নটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে তেইশটি কবিতা, প্রায় অর্ধেক, রাত্রি-বিষয়ক। প্রদোষের তরল অন্ধকার, গভীর রাত্রির নিকষ অন্ধকার, শেষযামের ধূসর অন্ধকার এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো একখানি কাব্যে রাত্রির অন্ধকার এতগুলি কবিতার বিষয় হইয়া ওঠে নাই। এখানে আবার দেখি কবি-স্বভাবের ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম দেখিলেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এমন কেন হইল। কবির মনের মধ্যে কোনো কারণে অন্ধকার নামিয়াছে কি ? মনের অন্ধকারকেই তিনি নিসর্গে ও মানবসংসারের যত্রতত্র দেখিতেছেন কি ? যদি তাহাই হয় তবে আর-একটা প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইয়া ওঠে, কি সেই মনের অন্ধকার, কেন সেই মনের অন্ধকার। এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য যে, কবি চিরকাল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের উষালোকের স্মৃতি মনের মধ্যে ধারণ ও বহন করিয়াছেন, আকাশের রবি তাঁহার মিতা, অন্ধকারের তিনি কেহ নহেন। তবে এখানে রাত্রির অন্ধকার এমন মুখ্যতা লাভ করিল কেন ?

প্রথম কবিতাটি শেষ খেয়া, উপসংহারের কবিতাটি খেয়া, দুটিতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ; অন্ধকারে কাব্যের সূচনা, অন্ধকারে সমাপ্তি। অনাবশ্যক নামে অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাটিতে অন্ধকারকে প্রহরে প্রহরে চিহ্নিত করিয়া দেখা হইয়াছে, শোকাভিভূত ব্যক্তি যেমন কখনো কখনো স্মৃতির সিন্ধুক খুলিয়া শোকের মুদ্রাগুলি সযত্নে গণনা করে, অনেকটা তেমনি।

'গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো · · ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে · · অমাবস্যা আঁধার দুইপহরে'। প্রথমে গোধূলি, তার পরে ভরা সাঁঝ, অবশেষে একেবারে আঁধার দুই-পহর—তাহাও আবার অমাবস্যার। অন্ধকার একেবারে থরে থরে সজ্জিত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, 'লক্ষ দীপের' সূচিকাঘাতেও এ অন্ধকার অটুট। এ কেমন অন্ধকার, এ কিসের অন্ধকার ?

আর-একটি কবিতা দিঘি। দিঘির গভীর কালো বোবা জলের দিকে চাহিয়া কবির রাত্রির অন্ধকারকে মনে পড়িয়া যায়।—

> ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
> গভীর ভয়ংকর,
> তুমি নিবিড় নিশীথ-রাত্রি বন্দী হয়ে আছ—
> মাটির পিঞ্জর।

অন্ধকার মনের মধ্যে না থাকিলে সর্বত্র অন্ধকারের ছাপ তিনি দেখিবেন কেন ?

প্রশ্ন অনেক তোলা হইয়াছে, এবারে একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাক।

২

ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর আগে আমরা কবিকে দেখিয়াছিলাম পদ্মাতীরের প্রসন্ন আলোকে, জীবন যেখানে উজ্জ্বল। সে জীবনের ভরা ফসল পাইয়াছি সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি কাব্যে। এমন অনেকদিন

গেল, একটা যুগ। তার পরে কবির কল্পনা ক্রমে জীবনের প্রসন্ন আলোক পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীনকালের ছায়াচ্ছন্ন দুর্গম পথে প্রবেশ করিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও পুরাকালে মানসভ্রমণের ফলে কবি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন সে ফসল ভরা আছে কথা, কল্পনা, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে। এখানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দান অপ্রাসঙ্গিক হইবে, শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে কবিকল্পনা আবার যখন জীবনের প্রসন্ন আলোকে প্রত্যাবর্তন করিল, সেই পুরাতন পদ্মাতীরে ফিরিয়া আসিল, তখন সব কেমন যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে বোধ হইল কবির কাছে। যে কবি মানসভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন আর যে কবি প্রত্যাবর্তন করিলেন তাঁহারা যেন এক ব্যক্তি নন। সেদিন যাহাকে অভ্রান্ত মনে হইয়াছিল আজ তাহার ত্রুটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, সেদিনকার বৃহৎ আজ অকিঞ্চিৎকর, সেদিনকার বাস্তব আজ ছায়াময়, সেদিনকার সব প্রযত্ন প্রচেষ্টা আজ নিতান্ত নিরর্থক মনে হইল কবির কাছে। মানসভ্রমণে যে আদর্শলোককে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন আর যে বাস্তবলোক তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত এ দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? এ দুইকে মিলাইবার উপায় কোথায়? মানসভ্রমণের অন্তে কয়েক বছর তাঁহার কল্পনার জগতে আদর্শ ও বাস্তবের একটি নিদারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছে। এই সংঘর্ষের বিবরণ ও প্রমাণ খেয়া কাব্যে। আগেকার দিনে যাহাকে বাস্তব মনে হইয়াছিল তাহা অপসৃত, অথচ নূতনও কিছু গড়িয়া উঠিল না। কবি যেখানে পা রাখিতে যান দেখেন সেখানে শূন্যতা, যাহাকে ধরিতে যান দেখেন সেখানে আশ্রয় নাই। পুরাতন আশ্রয়ও যাহার গিয়াছে নূতন আশ্রয়ও যাহার গড়িয়া ওঠে নাই, 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে'— খেয়া সেই হতভাগ্যের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই দোটানা অভিজ্ঞতা একপ্রকার অনিশ্চয়তা, একপ্রকার অস্পষ্টতা— ইহা অন্ধকারের সমতুল। খেয়া কাব্যে অন্ধকার যে বহুস্থানে image-রূপে ব্যবহৃত তাহার মূল এইখানে।[৩]

৩

কিন্তু অন্ধকার ও অনিশ্চয়তাকে তো মানুষ চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে না; অন্ধকারের মধ্যে আলোকের, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তার, সন্ধান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তখন আলোর ও নিশ্চয়তার সন্ধানে সে অন্তরের মধ্যে তাকায়। অবসৃত পরিচিত জগতের স্থানে ও বদলে তখন সে একটা নূতন জগৎ গড়িতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টা অনেকটা বিশ্বামিত্রের নূতন জগৎ গঠন-চেষ্টার অনুরূপ। বাস্তবের বদলে গঠিত বাস্তবের বিকল্প সাহিত্যে symbol বা symbolism নামে পরিচিত। আসল যখন হস্তচ্যুত তখন তৎস্থলে নূতন একটা-কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ কোনো রকমে কাজ চালাইয়া লয়; যে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে না তাহার শেষ আশ্রয় দাঁড়ায় নাস্তিক্য। খেয়া কাব্যে 'ঘরেও নহে

৩ এই সময়ের এদিকে ওদিকে, ১৯০১ হইতে ১৯০৮-৯ সালের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও তৎসংক্রান্ত মতামতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি বিস্ময়কর। এই পরিবর্তনের কারণ ও ইহার প্রভাব সম্বন্ধে এখনো তেমন আলোচনা ঘটে নাই। 'রবীন্দ্রজীবনী'তে সামান্য কিছু আভাস আছে মাত্র। ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইলে কবিজীবন সম্পর্কে, তথা খেয়া সম্বন্ধে, অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে কবির মানসভ্রমণ। অন্য গৌণ কারণ থাকা অসম্ভব নয়, হয়তো তৎকালের আবহাওয়ায় কিছু সমর্থন ছিল কবির মতামতের।

পারেও নহে' অবস্থায় কবির মনে তখন অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা, পুরাতনের আশ্রয়চ্যুত শিথিল মুষ্টিতে তখন নূতন কিছুকে আশ্রয় করিবার দুর্জয় সংকল্প।[৪]

মনের এহেন অবস্থায় তিনি বিকল্প জগৎ গড়িবার মানসে পুরাতন জগতের সহিত একটা অতিরিক্ত মাত্রা, একটা নূতন dimension, যেন যুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ অতিরিক্ত মাত্রাতেই কবির সান্ত্বনা ও খেয়া কাব্যের মৌলিকতা। খেয়া কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতা ঐ নূতন মাত্রা-সমাবেশের ফলে এমন-এক অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে, পূর্ববর্তী কাব্যে যাহার সাদৃশ্যের একান্ত অসদ্ভাব।

এবারে এই নূতন মাত্রা বলিতে কি বুঝি আর তাহার সংযোগে অভিনবত্বই বা কেমন ভাবে ঘটে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্ববর্তী রচনার আশ্রয় লইয়া তুলনার সাহায্যে বিষয়টা বুঝাইতে হইবে।

'কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে ধ'রে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে' —পত্রসংখ্যা ১৬, ছিন্নপত্র

এই চিত্রখণ্ডের সহিত নিম্নলিখিত চিত্রখণ্ডের দুস্তর ব্যবধান নাই—

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে ?··
তারে যে কখন্ কটাক্ষে চায়
কিছু তো পারি নে জানতে।

—দুই বোন, ক্ষণিকা

একটিমাত্র পদক্ষেপে এক চিত্রখণ্ড হইতে অন্য চিত্রখণ্ডে পৌছানো সম্ভব। এবারে খেয়া হইতে একটি চিত্রখণ্ড উদ্ধার করিতেছি, সেই জলের ঘাট, সেই জল ভরা, সেই পল্লীবধূ, সবই এক অথচ এক নয়।—

ওরা চলেছে দিঘির ধারে।
ওই শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণঝংকারে।··
দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হয়ে গেছে বারি।

—ঘাটের পথ, খেয়া

স্পষ্টত ইহা আর-এক বস্তু; আগে ছিল একটি হইতে অপরটিতে রূপান্তর, এখানে জন্মান্তর। সহৃদয় পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারে কেবল লৌকিক জল ভরার কথা বলা হইতেছে না, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া

৪ প্রাচীন হিন্দুসংহিতার বিধিনিষেধ ও অনুশাসনের প্রতি এই সময় তাঁহার যে একটা আস্থার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই সংকল্পের অন্তর্গত, যে-কোনো একটা আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যান এই রকম যেন তাঁহার ভাব।

আরও কিছুর ইঙ্গিত করা হইতেছে। এই 'আরও কিছু'টাই নূতন মাত্রা, ইহাই নূতন সংযুক্ত হইয়াছে। আর এই সংযোগের ফলেই খেয়া কাব্যের কবিতাগুলির কিছু অধিক গুরুত্ব।

এমনতর আরো কয়েকটি চিত্রখণ্ড বা ভাবখণ্ড লওয়া যাক।—

তোমরা নিশি যাপন করো,
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহো—
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।· ·
আঁধার-আলোয় সাদায় কালোয়
দিনটা ভালোই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইকো কোনো ঝগড়াঝাঁটি।

—বিদায়, ক্ষণিকা

বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই—
কাজের পথে আমি তো আর নাই।· ·
তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।

—বিদায়, খেয়া

এই দুই ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে আছে অতিরিক্ত মাত্রাটির সংযোগ।

আবার আর-এক জোড়া দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—

আমি হব না, ভাই, নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।

—জন্মান্তর, ক্ষণিকা

আর—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,

—পথের শেষ, খেয়া

এ দুয়ের মধ্যে শিল্পোৎকর্ষের ব্যবধানের প্রসঙ্গ না তুলিয়াও বলা যায় যে প্রথমটা একটা সাময়িক attitude বা মেজাজ মাত্র, দ্বিতীয়টা তার চেয়ে অনেক গভীর— এ ব্যবধান জন্মান্তরের, রূপান্তরের নয়।

আরও একজোড়া উদাহরণ লওয়া যাক—

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়!
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।

—মেঘমুক্ত, ক্ষণিকা

আর—

ওগো, এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।· ·
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাই-নে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
মিটে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

—বর্ষাপ্রভাত, খেয়া

এখানেও ব্যবধান জন্মান্তরের, আর অতিরিক্ত মাত্রাটার সংযোগই তাহার কারণ।

ঐ যে গোড়ায় বলিয়াছি আদর্শ ও বাস্তবের ঠিকে মিলিতেছে না বলিয়া কবিসত্তার গভীরে একটা ভাঙাগড়া চলিতেছে, সেই সাময়িক অরাজকতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের আশায় কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্থলে জগতের স্বরূপ আবিষ্কার -প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য নয়, যতদিন স্বরূপ আবিষ্কৃত না হইতেছে ততদিন symbol ব্যবহার করিয়া কাজ চালানো ছাড়া আর উপায় কি? এ যেন পুরাতন ইমারত ভাঙিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে নূতন গড়িবার সময়ে কাঠ ও বাঁশের ভারা বা ফ্রেম ব্যবহারের মত। এখন এই ভারাটাতে কোনোরকমে ঠেকা কাজ চলিয়া যায় বটে কিন্তু স্থায়িত্ব বা স্থায়িত্বের গৌরব কখনো তাহা পায় না। সাহিত্যে symbol তথা symbolismএর তদ্রূপ অবস্থা। symbolism অসময়ের সহায়, চিরকালের নির্ভর নয়।

রবীন্দ্রনাথও চিরকাল symbolismএর উপরে নির্ভর করেন নাই, বলাকায় আসিয়া সাময়িক ভারার বাঁশ-কাঠ সরাইয়া ফেলিয়া নবনিকেতনে গৃহপ্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু এখনো তার দশ বছর বিলম্ব—এখন সবে ১৯০৬ সাল, বলাকার প্রকাশ ১৯১৬ সালে।

৪

আদর্শে ও বাস্তবে সামঞ্জস্যবোধের অভাব হইতে দুঃখের উৎপত্তি— অন্তত খেয়া কাব্যে দুঃখানুভূতির কবিতাগুলির মূল সামঞ্জস্যবোধের অভাবে। আর খেয়া কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয় দুঃখাত্মক কবিতা। চিত্রা কাব্যের 'সুখ অতি সহজ সরল' হইতে, ক্ষণিকা কাব্যের 'সত্যেরে লও সহজে' হইতে, কবি অনেক দূরে

আসিয়া পড়িয়াছেন। জীবনপ্রবাহ গভীরতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন 'সুখ অতি সহজ সরল' না হইতেও পারে। জীবনপ্রবাহ যখন ঝরনার চেয়ে উদার ও গভীর ছিল না— সূর্যের আলোয় যখন শুধু জলের উপরিভাগ মাত্র নয়, জলের তলাকার নুড়িগুলা শুদ্ধ ঝল্‌মল্‌ করিত— তখন 'সুখ অতি সহজ সরল' ছিল সত্য। কিন্তু গভীর ও উদার জীবনপ্রবাহের উপরিতলের ঊর্মিগুলি রৌদ্রে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করিয়া উঠিলেও রৌদ্ররশ্মি গভীরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। এখানে সুখ সহজও নয়, সরলও নয়, অনেক সময়ে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিতে থাকে। আর, 'সত্যেরে লও সহজে'? অন্ধকার যেখানে ঘন-সন্নিবিষ্ট (মনে রাখিতে হইবে খেয়ার প্রায় অর্ধেক কবিতা অন্ধকারের পটে আঁকা) সত্যোপলব্ধি সেখানে সহজ নয়।

তখন রাত্রি আঁধার হল,
সাঙ্গ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম,
আসবে না কেউ আজ।

—আগমন, খেয়া

তার পরে দুর্যোগের রাত্রির প্রহরে প্রহরে দুঃখের আঘাতে ভুল ভাঙিতে থাকে, সংস্কারের দেয়ালে কৈশিক ফাটলপথে সত্যের অস্পষ্ট মূর্তি চোখে পড়িতে থাকে। কখনো রাজার দূতকে বাতাস, কখনো 'চাকার ঝন্‌ঝনি'কে 'মেঘের গরজনি' মনে হয়; অবশেষে 'দুঃখরাতের রাজা' যখন আসিয়া উপস্থিত হন তখন আর সাড়ম্বর অভ্যর্থনা করিবার সময় থাকে না। যখন তিনি আবার রাত্রিশেষে বিদায় লন তখন দেখা যায় যে, মালাটি না রাখিয়া গিয়া তরবারির গুরুদায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

এই দুঃখবোধ খেয়া কাব্যের বৈশিষ্ট্য, আর ইহার মূলে আদর্শ ও বাস্তবে সমন্বয়ের অভাব এ কথা আগে বলিয়াছি। পূর্ববর্তী রবীন্দ্রকাব্যে ঠিক এই শ্রেণীর দুঃখবোধের প্রকাশ নাই। এখন হইতে পরবর্তী সব কাব্যে দুঃখবোধের মেঘ কখনো ঘন কখনো স্বচ্ছ ছায়া ফেলিতে থাকিবে। কিন্তু দুঃখ যদি আদর্শ ও বাস্তবে সমন্বয়ের অভাবজাত হয়, তবে কি বুঝিতে হইবে যে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে ইহার সুষ্ঠু ও যথোচিত সমন্বয় হয় নাই? হয়তো তাই। কিন্তু তাহা প্রবন্ধান্তরের প্রসঙ্গ।

৫

যেখানে আরম্ভ করিয়াছিলাম সেখানে ফিরিয়া গিয়া শেষ করি। ঐ যে কবি একবার স্বল্পকালের জন্য একটা আদর্শলোকের সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন, যে জগতের শুভ্র শাশ্বত আলোক কবির চক্ষুকে বাস্তবান্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহারই প্রত্যক্ষ প্রভাব খেয়া কাব্যে। কিছুকালের জন্য কবির দৃষ্টির axis বা মেরু যেন বদলিয়া গিয়া জীবনের রূপ তাঁহার কাছে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।—

ওগো, তোরা বল্‌ তো এরে
ঘর বলি কোন্‌ মতে।

—অবারিত, খেয়া

বাস্তবাস্কের দৃষ্টিতে আপন ঘর আর আপন নয়, এবং শেষপর্যন্ত

গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারই এই ডোর।

—বন্দী, খেয়া

এ শৃঙ্খল শুধু কবির আপন হাতে গড়া নয়, একটি বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া বিশেষ মনোভাবের তাড়নায় গড়া।

একটা আদর্শ যতই মহৎ হোক তাহার খুব কাছাকাছি গিয়া পড়িলে গায়ে আঁচ না লাগিয়া পারে না, সেই দীপ্যমান আলোকের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি সাময়িকভাবে অন্ধ না হইয়া পারে না, মানুষের পক্ষে (সে মানুষ যতবড়ই হোক-না) প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আদর্শকে দেখা বাঞ্ছনীয় নয়। হৃদয়ের ছোটো জলাশয়টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আদর্শের মৎস্যচক্র ভেদ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আদর্শকে দেখিতে গেলে সংকট না ঘটিয়া যায় না।

শেলি নিজ কবিজীবনের সংকট ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

Had gazed on Nature's naked loveliness,
Actaeon-like, and now he fled astray
With feeble steps o'er the world's wilderness

—ADONAIS

শেলির সংকট ও ট্রাজেডি এর চেয়ে সুষ্ঠুতর ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই। হয়তো দীর্ঘতর আয়ু লাভ করিলে জীবনসংকট হইতে মুক্ত হইয়া শেলি স্থৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেন। দীর্ঘতর আয়ুর অধিকারী রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত স্থৈর্য ও শান্তিতে (সামগ্রিক নয়) প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দুঃখবোধের মেঘখানা একেবারে অপসারিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ছায়া স্বচ্ছতর হইয়া আসিয়াছে— মেঘের ফাটল বিস্তৃততর হইয়াছে। আলোছায়ার দোরোখা বসনের মধ্যে আলোর ভাগটাই বেশি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ খেয়া কাব্যের আলোচনার অন্তর্গত নয়, অনেক পরবর্তীকালের সেই পরিণতি— বারান্তরের জন্য তাহা রহিল। এখানে আমরা কবিকে 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে'-অবস্থায় দেখিয়া বিদায় লইলাম।

বাংলা কাব্যে মিস্টিক ধারা

নলিনীকান্ত গুপ্ত

বাংলার ভাষা, বাঙালীর কাব্য যখন সর্বপ্রথম ফুটে উঠল, যে বাণী যে মন্ত্র স্বাগত করল সেই নবীন উষা, তা নিয়ে এল একটা বিশেষ ভাব, একটা বিশেষ ভঙ্গি। তা হল হৃদয়ের আকুতি, মর্মের অনুভূতি, অন্তরাত্মার কণ্ঠ (lyric cry)—এ তো বটেই। এই স্বরূপ পরিধান করল একটা বিচিত্র রূপকের বা প্রতীকের গৈরিক বাস।

এই আদিরূপ হল যাকে বলা হয় 'মিস্টিক' এবং যাকে লক্ষ্য করে আমরা নাম দিয়েছি সান্ধ্যভাষা। কারণ এসব হল আধ্যাত্মিক বা আন্তরাত্মিক উপলব্ধির কথা এবং তাকে প্রকাশ করা হয়েছে একটা আলো-আঁধারি রীতির সহায়ে। লোকাতীত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সব বলা হয়েছে লোকায়ত এবং ইন্দ্রিয়গত উপকরণ আশ্রয় করে— সুতরাং এসে গিয়েছে একটা তির্যক্‌ভাষণ, ইঙ্গিত, লক্ষণা, ধ্বনির সমাবেশ। লোকান্তরের, আন্তর-চেতনার কথা বলে এ যে কেবল ধর্মের কাহিনী তা নয়; দেখা যায় এর মধ্যে অ-ধর্মের বস্তুও যথেষ্ট আছে। আচ্ছা, ফলেন পরিচীয়তে— নমুনা দেখাই তবে কি ধরণের বস্তু এই আদিকাব্য, কি ধরণের চেতনা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে— কবি অর্থাৎ আচার্য, সিদ্ধাচার্য, কাহ্নুপাদ বলছেন—

অহ ণ গমই উহ ণ জাই
বেণিরহিঅ তসু নিচ্চল পাই।
ভণই কহ্নু মন কহবি ণ ফুট্টই
নিচ্চল পবণ ঘরিণি ঘর বত্তই॥

নীচে সে নামে না, উপরেও ওঠে না— অদ্বিতীয় সে পেয়েছে সেখানে নিশ্চলতা। কাহ্নু বলছে, মন সেখানে কখন টুটে না— নিষ্কম্প পবন যেখানে সেখানে ধরণী অধিষ্ঠিত।

যথেষ্ট মিস্টিক— নিহিতার্থক— নয় কি? আরো শুনুন

এবং কালবিঅ লই কুসুমিঅঅরবিন্দএ
মহুঅরূএ সুরঅবীর জিংঘঅ মঅরংতএ॥

এই যে কালের বীজ থেকে কুসুমিত অরবিন্দ, মধুকরের মত হে বীরভোগী, তার মরকন্দ ঘ্রাণ কর।

সহস্র বৎসর পার হয়ে এই যে বাণী আসছে আমাদের কানে, তা কি সমানে আমাদের মর্মে গিয়ে পৌছয় না? আজকের বিংশ শতাব্দীর মিস্টিক কবি যে বলেছেন[১]

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি—

এর মূল প্রতিরূপ কেমন সুন্দর পাই আমরা চর্যাকারের এই জমকে—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী—

সোনায় ভর্তি যে করুণার নৌকা, রুপার স্থান তাতে আর নাই।

---

১ জনৈক রসজ্ঞ সমালোচক কথাটা আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন।

এখানে সিদ্ধাচার্যদের একটা বিশেষ প্রতীকের বা আলেখ্যের উল্লেখ করতে চাই। মানুষের যে অন্তঃসত্তা, যে অন্তর্যামী, যে আন্তর উত্তর দিব্যরূপ পাই তাই আবার তার ইষ্টদেবতা বা ইষ্টদেবী। সিদ্ধাচার্যেরা তাকে দেখেছে একটা অপরূপ অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে, বলেছে সে হল এক অছুৎ বালিকা— সে ডোম্বী, সে শবরী— তার স্থান হল নগরের বাহিরে—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া

হে অস্পৃশ্যা বালা, তোমার কুঁড়েঘর তো নগরের বাহিরে।

নগর হল এই সমৃদ্ধ সুশোভিত সুমার্জিত দেহ-মন-প্রাণের বাহ্য প্রকৃতি— অজ্ঞানময়ী রাজ্ঞী হয়ে প্রকট তিনি। কিন্তু আসল রানী ভিখারিনী পরিত্যক্তা অপরিচিতা দুঃস্থা। যে সাধকের দৃষ্টি খুলেছে তার সকল আদর গিয়ে পড়েছে এই উপেক্ষিতার উপর। কিন্তু আজ বলতে চাই, মানুষের চেতনা, কবিচিত্ত অনেকখানি বদলে গিয়েছে এই আঁধারের যুগ থেকে, মানুষের বাহ্য চেতনায় অনেকখানি আলো এসেছে, সেখানে পর্যন্ত ডোম্বী তার কালো রঙ থেকেই আলো ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে— কালীকে যে ঘোরা তিমিরবরণী বলা হয় তা কি কতকটা অনুরূপ হেতুর জন্যই নয়? আরো, এসব সাধনায় পরকীয়া-প্রীতির যে প্রতীক-রহস্য তারও অর্থ একটা মেলে না? স্বকীয়া হল নিম্নতর প্রকৃতি, ঊর্ধ্বতন প্রকৃতিই পরকীয়া। সিদ্ধাচার্যদের গুপ্তভাষ (কোড) ক্রমে ব্যক্ত হয়ে সহজ ভাষ হয়ে উঠেছে— সহজ ভাষার মধ্য দিয়ে কবিচিত্ত প্রকাশ করতে চেয়েছে অন্তরতম ঊর্ধ্বতম উপলব্ধি। এই ভাবেই মানুষের ঘটেছে চেতনার ক্রমবিবর্তন।

বাঙালীর কবিচিত্তের আদিরূপ এই ধরণের একটা নিবিড় দুরাসাদ্য পূত গঙ্গোত্রী যেন। ইউরোপীয় কোনো সাহিত্যে এর তুলনা পাই না। সেখানে কাব্যের উদ্‌ভব লোকায়ত অনুভূতি দিয়ে। গ্রীক বা লাতিন বা ইংরেজী ফরাসী আধুনিকতর ভাষায় কবিচিত্ত দুলে উঠেছে কামের, অর্থের, বড় জোর ধর্মের প্রেরণায়; মোক্ষের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ কবিচেতনা, যে-কবিচেতনা জিনিসকে দেখে একটা সাধারণের বিপরীত, অন্তঃপ্রজ্ঞ— ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ-দৃষ্টি দিয়ে তা পাশ্চাত্যের আবহাওয়ায় বিরল। দান্তের মধ্যে, খৃষ্টীয় মিস্টিকদের মধ্যে, তারো আগে গ্রীক Mysteriesএর মধ্যে একটা ছায়া পাই, কিন্তু প্রথমত তা হল অতি ক্ষীণ গোপনধারা— বেণীভূতপ্রতনুসলিলা, এবং দ্বিতীয়ত তার উৎসে পৌছলে যাই আমরা মিশর দেশে এবং আরো প্রাচ্যে। কারণ এ ধারার মহিয়সী মূর্তি হল বৈদিক গাথা।

তা হলেও স্বীকার করতে হবে, পৃথিবীর গতি, মানবচেতনার প্রবৃত্তি কালস্রোতে ক্রমশই বহির্মুখী হয়ে উঠেছে, পুষ্ট সমৃদ্ধ মার্জিত ও প্রখর হয়ে চলেছে তার ঐহিক আধারে। এবং বাঙালীর চেতনাও কালধর্মকে অতিক্রম করে নি। তাই তো দেখি এই যে মূলধারা ক্রমে তা ফল্গুধারায় পরিণত হয়েছে— মন্দাকিনী ক্রমে ভোগবতী হয়ে তলিয়ে গিয়েছে। অন্য কথায়, শিক্ষিত সমাজে, অভিরূপভূয়িষ্ঠ বুদ্ধিগরিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে তার স্থান আর হয় নি— স্থান হয়েছে অতি-সাধারণের 'লোকসাহিত্য' হিসাবে। কিন্তু বাংলার বৈশিষ্ট্য এই যে, ধারাটি লুকিয়ে গিয়েছে বা নীচে পড়ে আছে বটে, তবে একান্ত হারিয়ে যায় নি— এমন চিত্ত, এমন চেতনা সর্বদাই ছিল একে যা জীইয়ে রেখেছে।

চর্যাপদকর্তাদের যুগ বলা হয়ে থাকে খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি। তার পরে এ ধারা ক্ষীণতর হয়ে বিরল হয়ে গিয়েছে; তখন বাঙালীর কাব্যপ্রেরণা ক্রমে ফুটে উঠল মঙ্গলকাব্যে— মঙ্গলকাব্যে চেতনা উপরে ভেসে উঠল, তা হল ধর্মবিষয়ক এবং সমাজবিষয়ক। মঙ্গলকাব্যের প্রাচুর্য কয়েক শতাব্দী

ভরে রেখেছে— সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি। কিন্তু এই সঙ্গেই পিছনে, কতকটা অন্তরালে চলেছে, প্রসার পেয়েছে বাঙালীর সান্ধ্য চেতনা ও কাব্যপ্রেরণা।

চর্যাপদের শেষে পরে যে রূপ ধরেছে এই অধ্যাত্ম-সাহিত্যের ফল্গুধারা, তার নমুনা চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদে— দুয়ের মাঝে হয়তো শতাব্দী দুয়েকের ফাঁক আছে, চর্যাপদাবলী ক্রমেই তলিয়ে গিয়েছে; তবুও মনে হয় একটা ক্ষীণ ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্রমরূপান্তরিত ঐতিহ্য বরাবর চলে এসেছিল। চণ্ডীদাস যখন এলেন তিনি বললেন—

কূলের উপরে কূলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে ঢেউয়ের বসতি
ইহা জানে কেউ কেউ॥

কিম্বা

মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরীতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ॥

আরো এক ধাঁধা এই—

সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ॥
যে জন চতুর সুমেরুশিখর
সুতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥

সুর বাচন পেয়েছে নূতন ভঙ্গি— তবুও এরই মধ্যে পাই না কি একটা রেশ যা এসেছে এই প্রাচীনতর বাক্য হতে—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী—

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে বালিকা শবরী। কিম্বা অনুরূপ ধারার এই যে—

মহারস পানে মাতেল রে তিহুমন সএল উএখী
পঞ্চ বিষয় রে নায়করে বিপথ কবী ন দেখী।

মহারস-পানে সে মাতিল, সকল ত্রিভুবন উপেক্ষা করে— পঞ্চ বিষয়ের নায়ক সে, তার বিপক্ষ তো কাউকে দেখি না।

সিদ্ধাচার্যদেরই কি জের টানছে না চণ্ডীদাসের—

রসের পিরীতি　　　রসিক জানয়ে
　　　রস উদ্গারিল কে ?
সকল ত্যজিয়া　　　যুগল হইয়া
　　　গোলোকে রহিল কে ?

একটা সমতুল সাধনার ক্রম, একটা আন্তর ইন্দ্রিয়ের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবকে ভাষাকে অনুরূপ ছাঁদে অনুপ্রাণিত করছে এ যুগ অবধি। তবে পার্থক্যটিও লক্ষণীয়। চণ্ডীদাসে এসে মনে হয় গঙ্গা যেন অন্ধকার পর্বতগুহা, অর্ধাবৃত গিরিকন্দর পার হয়ে সমতলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে পৌছেছে। পাই এখানে সান্ধ্য অনুভূতি ও ভাষণের মধ্যে মনোময় চেতনার সহজ স্বচ্ছ ঔদার্য ও নির্মলতা। এ দুই-তিন শতাব্দীর ভিতর দিয়ে কবিচিত্তের উপর জাগত বুদ্ধির একটা প্রলেপ এসে গিয়েছে। প্রহেলিকা দূর হয় নি, কারণ যে জগতের, যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তা প্রহেলিকাময়। তবুও এখানে প্রবেশ করলে পরিচিত আবহাওয়ার কিছুটা স্পর্শ পাই।

চণ্ডীদাসের পরে তাঁর উত্তরাধিকারী-স্বরূপ পাই একটা বিপুল ও বিস্তৃত সৃষ্টি—বিপুল তাকে বলব, যদিও উচ্চবর্ণের পোষাকি সাহিত্য সেদিকে তেমন নজর দিতে পারে নি। আমি বলছি বাংলার বাউলদের কথা। গোড়ায় বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী (রাধাকৃষ্ণবিষয়ক), তার পর মাঝখানে মঙ্গলকাব্য, রামায়ণী মহাভারতী কথা, শেষে ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত—এই তো পূর্বতন বাংলাকাব্যের পাদত্রয়। আধুনিক বাংলার প্রথম পাদ হলেন রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিম, দ্বিতীয় পাদে রবীন্দ্রনাথ—যিনি কালিদাসের উপমা অনুসরণ করে বলব, হিমালয়ের মত বঙ্গসাহিত্যের মানদণ্ডরূপে এক পার হতে অপর পার অবধি বিরাজমান। কিন্তু এহ বাহ্—সবটা না হলেও ; অর্থাৎ এই বাহ্ পরিপুষ্টি ও বিভূতির পশ্চাতে ফল্গুধারাটিও মনে হয় বয়ে চলেছে সমানে।

বাউলের অধ্যাত্মসাধনা ও কাব্যসৃষ্টির দিকে আজকাল অনেকেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন—অন্তরাল থেকে তাকে বাহিরে, শিক্ষিত বিদ্বান সুধী -সমাজে আসন দিয়ে অভ্যর্থনা করবার একটা প্রেরণা এসেছে। বাউল শুধু বাউরিয়া জিনিস নয়, যাকে মনে হত উদ্ভট অসংলগ্নতা তার মধ্যে আবিষ্কার করছি নিবিড় সুসংগতি। চণ্ডীদাস থেকে এক রকম ডুবসাঁতার দিয়ে এল যে গুপ্তবিদ্যা বা অন্তরঙ্গ অতীন্দ্রিয়-পরতার ধারা তা ফুটে উঠল এই ভাষায় ও ভাবে—

এই মানুষ সেই মানুষে আছে।
কত মুনিঋষি চারযুগ ধ'রে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
　　　আলোকে ব'সে ॥

অচিন দলে বসতি-ঘর,
দ্বিদল-পদ্মে বারাম তার,
দল-নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবে অনায়াসে ॥
আমার হ'ল কি ভ্রান্তি, মন,
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন,
সিরাজসাঁই কয় ঘুরবি, লালন,
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

এ ধরণের তত্ত্ব ও তান বাংলার নিভৃত আকাশে-বাতাসে মিশে আছে। শোনা যাক তবে আরো একটু গূঢ়বিদ্যার রহস্য—

চন্দ্রে সুধা, পদ্মে মধু,
বলো যুগল হয় কি ক'রে।
চন্দ্র থাকে গগন 'পরে,
পদ্ম সরোবরে ॥
কাম যেথা প্রেম সেথা,
দেখ না নজর ক'রে।
দুধেতে হয় ঘি উৎপন্ন মথনের জোরে ॥

আচ্ছা, আরো একটি ধাঁধা শোনাতে চাই, শুনুন—

সোনার মানুষ ভাসছে রসে।
যে জানে সে রস-পন্থী,
দেখতে পায় সে অনায়াসে ॥
তিন শ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি,
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে ॥
পিতামাতার নাই ঠিকানা,
অচিন দলে বসতখানা,
আজগুবি তার আওনা-যানা
কারণবারির যোগবিশেষে ॥
অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়
দেখতে যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে, থেকো সদায়
ত্রিবেণীতে থেকো বসে ॥

তার পরে এগিয়ে চলি— বিদেশী চেতনার প্লাবনে ভেসে গেল এসব। মন বুদ্ধি, বহির্বিষয়ক জ্ঞান পুঞ্জীভূত হয়ে চলল। বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা সর্বতোভাবে একান্তভাবেই আধুনিক হয়ে উঠল। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই যে সব দিক্‌পাল, তাঁদের চেতনায় ও সৃষ্টিতে বহির্মুখী জ্ঞান বিপুল হয়ে উঠেছে— তার শুভ পরিণাম এই যে, আধুনিক জগতে তিষ্ঠিবার, ভবিষ্যৎ জগতের দিকে অভিযান করবার আয়ুধ আমরা সম্যক্ আহরণ করেছি। তবে এঁদের মধ্যে প্রাচীনতর দীক্ষার ফল্গুপ্রবাহ নিভৃতে রয়ে গিয়েছে। এবং আবার তা বাঙ্ময় হয়ে সুষ্ঠু রূপ নিয়ে নিঃসৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এবং রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। এই অন্তঃশীলা ধারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকট হয়েছে আবার— পেয়েছে মানসোচিত রূপায়ণ, আধুনিক তাত্ত্বিক বা দার্শনিক বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের আকার।

কবির অতিপরিচিত সেই

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

অথবা

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।

কিম্বা এই আরো—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনী উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে।

আরো আগে, আরো গহনে-গভীরে প্রহেলিকার গর্ভে—

এসেছিল মন হরিতে মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে, আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনারি মাধুরী আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে কী ভরিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।

চর্যাপদের হেঁয়ালী থেকে এই আধুনিকের হেঁয়ালী অনেক দূর বটে, কিন্তু উভয়ের রয়েছে একটা

অন্তরাত্মাগত সগোত্র। ভাষা মার্জিত শাণিত হয়ে উঠেছে, ভাব চিন্তাগর্ভ হয়ে উঠেছে, চেতনায় এসেছে একটা ঔদার্য ও বিশ্বমুখিতা। তবুও একটা পুরাতনী সনাতনী মূর্ছনা, অনাহত বাণী একটা সমানে প্রতিরণিত হয়ে উঠেছে এখানেও। একটা বিদ্যুৎগর্ভ মন্ত্র, অন্তরাত্মাগত চিন্ময় বাক্— অতিলৌকিক রহস্যের সঙ্গে, সত্যতম সুন্দরতম নিভৃত অত্যাশ্চর্যের সঙ্গে, আমাদের পরিচয় ও সংযোগ ঘটিয়ে দেয় যা— তাই তো হবে ভাবী কাব্য ও কবিত্ব।

আমাদেরই মধ্যে আজকের সাধক-কবি যখন বলছেন শুনি—

তোমার ধ্রুব নীহারিকা
লেখে মোদের ভালের লিখা··
আজ অবনীর দীপালিকায় মাগো,
কোন্ অলকা আলোর মালা রাখে!

অথবা আরো ঘনরহস্য যে জমে উঠেছে 'নীরাজনা'র কবির বাক্যে—

আভা ঘনায়িছে কার?
নিশীথের স্তব্ধ প্রাণ বিনিস্পন্দ পদপ্রান্তে তার।
অনবগুণ্ঠিত করি' তারে
আনে শেষ খেয়াখানি রজনীর বিদায়ের পারে।

কবিতাটির বাকিটুকুও বলি, এমন মায়াজাল রচনা করেছে সে—

অন্তরাল
ভাঙি' আবরণ-জাল
আসে সন্নিকটে,
ওঠে ভেসে সান্দ্রীভূত মুহূর্তের তটে
সুগোপন
অব্যক্ত ইঙ্গিত কোন?
বহে ধরি হালটিরে
চলে ধীরে ধীরে
রাজহংস-তরীখানি
দুটি পক্ষে দাঁড় টানি'।

অথবা এই কবিরই আরো গহনের দুর্গ্রাহ্য বস্তু যদি চান—

অন্তরীক্ষ-আবাহন অগ্নি-চক্র-তীরে,
উঠিল অলক্ষ্যে ঢাকি' দিগম্বর ছায়া;
মৃণ্ময়ী নয়নে কাঁপে স্বর্ণ-মৃগ-মায়া,
ঊর্ণনাভ জাল রচে আপনারে ঘিরে।

ভবিষ্যতের কাব্য— শ্রেষ্ঠ কাব্য— হবে এই ধরণেরই, অর্থাৎ যাতে প্রকাশ করে অচিন্ত্য অনুভূতি,

লোকাতীত রহস্য। চলিত ভাষা মুখ্যত তৈরি হয়ে উঠেছে চলিত অনুভূতির চাপে ও প্রেরণায়— সুতরাং তার নৈসর্গিক গড়নই হয়েছে যেন স্থূল আধারের প্রতিফলন করবার জন্যে। কিন্তু বৈদিক ঋষি যেমন বলছেন মানুষী বাক্ হল বাক্‌শক্তির নিম্নতম (চতুর্থ) রূপ— তার আছে সূক্ষ্ম আরো তিনটি রূপ। আমাদের চেতনা যত গভীরে যত উর্ধ্বে যায়, যত নিভৃতলোকে আমাদের স্থিতি গতি হয়, আমাদের অনুভবের অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয় ভিন্ন বাক্যে ও ছন্দে।

বাঙালীর আদি কবিরা বৈদিক ঋষি কবিদের মতই চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে একটা দ্বৈত ভাষায়। ভাষার শিশুকাল তখন, গাঢ়-গভীর অভিজ্ঞতা তার ভিতর দিয়ে সহজভাবে সোজাসুজি প্রকাশ করবার উপায় ছিল না— অবশ্য তাঁদের ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আজ সময় এসেছে যখন ভাষার একটা ক্রমপরিণতি ক্রমোন্নতি হয়েছে, মানুষের আধারের মধ্যেও একটা সংযোজক চেতনা ও প্রেরণা গড়ে উঠেছে, যার ফলে অন্তরকে বাহিরে সে সুষ্ঠুরূপে স্বাভাবিকরূপে শরীরী করে ধরতে পারে। যে সুর যে ভাব দিয়ে বাঙালীর চিত্ত-বেদ তার অভিসার বা অভিযান আরম্ভ করেছে এবং যাকে সে গোপনে আশ্রয় দিয়ে এসেছে তাকে আবার নবরূপ নবমহিমা দিয়ে স্পষ্ট করে ধরতে হবে।

বলা হয়ে থাকে ইংরেজী সাহিত্য বা কাব্যের পিছনে, ইংরেজের শিক্ষা-দীক্ষার পিছনে, তার জর্মন (টিউটনিক) তার ফরাসী-লাতিন (রোমক) সংস্কৃতির পিছনে আছে প্রচ্ছন্ন কেল্‌টিক-চেতনা, অর্থাৎ তার তর্কবুদ্ধি তার কর্মকৌশল ছাড়া এবং ছাড়িয়ে রয়েছে একটা অতীন্দ্রিয়পরতা, মিস্টিক-ধারা ; তার শ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষীদের ভাবে ও ভাষায় এ জিনিসের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়, এ জিনিসটির ছায়াসম্পাত দিয়েছে তার কবিত্বের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবুও সেখানে এ জিনিস রয়েছে পিছনে, গোপনে, একটা গৌণ-প্রতিধ্বনি (overtone কি undertone) হয়ে।

আমার মনে হয়, বাংলার কবিচেতনার মধ্যে এই অতীন্দ্রিয়পরতা, অতিলৌকিকতা তার স্থূলচিত্তে বহিঃপ্রজ্ঞায় কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হলেও বয়ে গিয়েছে তার স্বভাবের মধ্যে, তার ধমনীর ছন্দে। ভবিষ্যতে এই ধারাই যদি তার প্রধান ধারা হয়ে ওঠে, এই খাতেই যদি চলে তার কবি-অনুভূতি ও কবি-উপলব্ধি, তা হবে তার প্রকৃতির অনিবার্য পরিণাম।

রচনা ও রচয়িতা

শ্রীরাজশেখর বসু

আমরা যেসব বস্তু নিত্য ব্যবহার করি তার অধিকাংশের উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন মেটানো। এইসব বস্তুর কতকগুলি অতি প্রাচীন, তাদের উদ্‌ভাবক বা প্রবর্তকের নাম আমাদের জানা নেই। যেমন তীর-ধনুক, পোড়ামাটির বাসন, গাড়ির চাকা, কাপড় বোনার তাঁত ইত্যাদি। কতকগুলি বস্তুর প্রবর্তকের নাম আমরা জানি এবং সসম্মানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত বস্তুর পরিবর্তন করতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাতে তাঁদের মর্যাদাহানি হবে তাও মনে করি না। আমরা চাই, যা কাজের জিনিস তা আরও কাজের উপযুক্ত হক, আরও ভাল হক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত প্রথম ব্যাকরণের জন্যে পাণিনির নাম জগদ্‌বিখ্যাত, কিন্তু পরবর্তী ব্যাকরণকারগণ পাণিনির অন্ধ অনুকরণ করেন নি। প্রথম বিজলী বাতির উদ্‌ভাবক এডিসন এবং প্রথম সার্থক এয়ারোপ্লেনের নির্মাতা রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের নির্মিত বস্তুর সঙ্গে আধুনিক বস্তুর সাদৃশ্য খুব কম।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উপযোগিতা বা utilityই অগ্রগণ্য, তার উদ্‌ভাবকের কীর্তি অতি গৌণ। কে প্রথমে তৈরি করেছিলেন তা অনেকেই জানে না, যারা জানে তারাও ব্যবহারকালে স্মরণ করে না। কিন্তু যেসব বস্তুর মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান অথবা ভাব বা রসের উৎপাদন, তার সঙ্গে রচয়িতার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। রচয়িতা যদি অজ্ঞাত হন তথাপি তাঁর কৃতির উপর অন্যের হস্তক্ষেপ স্যাক্রিলেজ তুল্য অপরাধ গণ্য হয়। কেউ যদি অ্যাপোলো বেলভিডিয়ার বিগ্রহ বা অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি আরও ভাল করে গড়তে চায়, কিংবা কালিদাস শেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথের রচনার সংস্কার করতে চায়, তবে সে উন্মাদ গণ্য হবে।

বেদের এক নাম শ্রুতি, কারণ গুরুশিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে আর শুনে শুনে বেদাধ্যয়ন হত। প্রাচীন ভারতের লিপির প্রচলনের পরেও বেদাভ্যাসের এই পদ্ধতি বজায় ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সহজে প্রশংসা করেন না, কিন্তু তাঁরাও মেনেছেন যে অন্তত তিন হাজার বৎসর যাবৎ বেদবিদ্যা মুখে মুখেই চলে এসেছে এবং অপরিবর্তিত আছে। শুধু তার বাক্য নয়, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে তার উচ্চারণ বা পঠনরীতিও প্রায় যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। এই আশ্চর্য ঘটনার কারণ, বেদের প্রতি ভারতবাসীর অসীম শ্রদ্ধা। বাঙলা দেশে বেদচর্চা প্রায় লোপ পেয়েছিল, সেজন্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে শুদ্ধ পাঠ শেখবার জন্যে কাশী পাঠিয়েছিলেন। এখনও ব্রাহ্ম উপাসনায় প্রাচীন রীতিতে উপনিষদাদির শ্লোক উচ্চারিত হয়।

শুধু বেদ নয়, সংস্কৃত কাব্য পাঠের রীতিও অতি প্রাচীন এবং সর্বত্র প্রায় একরকম। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণে বিকার এসেছে। শুনেছি কোনও এক পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সংস্কৃত বাক্য রচনার যেমন গৌড়ী আর বৈদর্ভী রীতি আছে তেমনি বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণকে গৌড়ী রীতি রূপে মেনে নিতে দোষ কি? এই উক্তির জন্য তিনি ধমক খেয়েছিলেন। আমরা সংস্কৃত কবিতা সুর করে পড়তে জানি না, নীরস গদ্যের মতন পড়ি; কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে সুর করে পড়াই রীতি। বিহারী উত্তরপ্রদেশী মরাঠী গুজরাটী এবং দ্রাবিড় পণ্ডিতরা প্রায় একই সুরে সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করেন। এই চিরাগত রীতির কারণও সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ।

আমাদের দেশের অনেক ওস্তাদ মনে করেন, গান-বাজনা গুণিজনের সচ্ছন্দ বিহার বা কসরতের ক্ষেত্র, যদি নির্দিষ্ট সুর আর তাল মোটামুটি বজায় রাখা হয় তবে কর্তব বা সুর ভাঁজায় গায়কের চিরন্তন অধিকার আছে। গান যদি বেওয়ারিস হয় কিংবা গানের বাক্য যদি তুচ্ছ আর সুরের বাহন মাত্র হয় তবে কর্তবে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু রচয়িতা যদি কবিতার সঙ্গে তাল মান লয় যোগ করে গান রচনা করেন তবে তার অলংকরণের অধিকার গায়কের থাকে না। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরকে বাগর্থ তুল্য সম্পৃক্ত বলেছেন। কবি যখন গান রচনা করেন তখন বাক্ আর অর্থের সঙ্গে সুরও সম্পৃক্ত করেন, অর্থাৎ কবিরচিত গানে কবিতার সঙ্গে সুরের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় বন্ধন ঘটে।

রবীন্দ্রকাব্যের বাক্যের পরিবর্তন যেমন গর্হিত, রবীন্দ্রসংগীতের সুরের পরিবর্তন বা অলংকরণও তেমনি গর্হিত। মনা লিসার বাঁকা হাসি যদি ভাল না লাগে তবে অতি বড় চিত্রবিশারদেরও তা সোজা করার অধিকার নেই। যিনি মনে করেন, নির্দিষ্ট রীতিতে না গেয়ে রবীন্দ্রসংগীত আরও শ্রুতিমধুর করে গাওয়া যেতে পারে, তাঁর উচিত অন্য গান রচনা করে তাতে নিজের সুর দেওয়া।

ভারতীয় শিক্ষাচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

পৃথিবীর শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনো মৌলিক দান আছে কি না? তাঁর কাব্য আলোচনা ক'রে এ কথা প্রমাণ করা শক্ত নয় যে স্বদেশী বিদেশী আধুনিক প্রাচীন বহু প্রভাব অঙ্গীকার ক'রেও কবি হিসাবে তিনি অবিসম্বাদিতভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাগুলির মধ্যে স্থানগ্রহণ করেছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-রচনা বা শিক্ষাশিল্প-উদ্ভাবন সম্বন্ধেও ঐ রকম দাবি করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না?

ভারতীয় চিন্তা

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাচিন্তা ও কর্মের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে বিচ্ছিন্ন ও অনেক সময়েই মূল্যের দিক দিয়ে অপ্রধান যেসব তত্ত্ব ও তথ্য আহৃত হয়েছে তা থেকে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা প্রত্যক্ষরূপ গ'ড়ে তোলা অসম্ভব। আশ্রমশিক্ষার পরিবেশ, জীবনধারা, গুরুশিষ্যের পরস্পরের প্রতি মনোভাব ইত্যাদি বিষয় রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন কালিদাসের নাটক থেকে, কয়েকটি উপনিষদের আরম্ভে ও শেষে শিষ্য আবাহন শিক্ষারম্ভ শান্তিপাঠ প্রভৃতির মধ্যে অন্তরঙ্গ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উচ্চতম আদর্শ ও ব্রত উদ্‌যাপনের যে ভাবগুলি ফুটে উঠেছে তাই থেকে। কিন্তু এইসব উপাদান মিলিয়ে যা পাওয়া যায় তা মোটামুটি একটা আভাসের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া আশ্রমশিক্ষা ছিল শুধু বিশেষভাবে চিহ্নিত বর্ণ ও ব্যক্তিদের জন্য, তা আধুনিক অর্থে লৌকিক (secular) ছিল না। আশ্রম-শিক্ষার যুগেও ভারতের নগরে-গ্রামেও কোনো লৌকিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল কি না, কবে থেকে এই ধরণের বিস্তৃততর শিক্ষার সূত্রপাত হল। এবং এই নূতন ব্যবস্থায় আশ্রমশিক্ষার কোন্ কোন্ নীতি গৃহীত ও পালিত হয়েছিল— এইসব প্রশ্নের সদুত্তর আমার জানা নেই। আশ্রমযুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরাজদের ভারত অধিকারের সময় পর্যন্ত কয়েক সহস্র বৎসর ধরে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যবসায়কে কোনো বিশেষ আদর্শ বা নীতি প্রভাবিত করেছিল কি না? নানা ক্ষয় ক্ষতি বিপর্যয় ও অবস্থা-বৈপরীত্যের মধ্যেও এমন-কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব কি না যা বিশেষভাবে 'ভারতীয়'? যা বাইরে রূপায়িত না হলেও সমস্ত শিক্ষাচেষ্টার অন্তরে অধিষ্ঠিত ছিল? যে আদর্শ বা নীতি যথাযথভাবে পালন করা সাধ্যাতীত হলেও বরাবরই ভারতের শিক্ষকেরা যাকে সসম্মানে স্বীকার করে এসেছেন?

শুধু পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত নয়। জীবনকে গড়ে তোলার কাজে, নূতন চেতনা ও প্রেরণার জগৎ তৈরি করার কাজে ভারত কি কোনো মৌলিক পথ ও প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছে? কোথায় পাওয়া যাবে জীবনবিকাশ চরিত্রগঠন ক্রিয়াকৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ, মূলনীতি আবিষ্কার, সেই নীতি যথাযথ প্রয়োগের উপদেশ? যদি বলা যায় ভারত তার লৌকিক শিক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে কখনোই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মত সচেতন হয়ে ওঠে নি— কাজেই সেসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বা সূক্ষ্ম বিতর্ক এ দেশে কখনো ছিল না— তা হলে সে কথা মেনে নিতে হবে। কিন্তু শিক্ষাকে জীবনের অপর পর্যায়গুলি থেকে স্বতন্ত্র না করে সমস্ত জীবনযাপনকেই যদি একটা মহৎ অব্যবহিত শিক্ষাসাধনের অন্তর্গত করে দেখা যায়,

তা হলে স্বীকার করতে আপত্তি হবে না যে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম নিপুণ পর্যাপ্ত ও সুসম্বদ্ধ চিন্তার নিদর্শন ভারত দেখিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। শুধু ধর্মসম্প্রদায়গত সাধনায় নয়, লৌকিক জীবনের সমস্ত আত্মসংগঠন আত্মোন্নতি চেষ্টার ব্যাপারে উপনিষদ্ ও গীতার প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব। ভারতের শিক্ষা ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায়গুলির সমস্ত প্রয়াসকে যে কয়েকটি উপনিষদ্ ও বিশেষ করে গীতার বিচিত্র আদর্শ বরাবর প্রভাবিত করেছে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকলেও তা মেনে নেওয়া অসংগত হবে না। বুদ্ধির বাধায় বা বাইরের বিপ্লবে গীতার আদর্শ হয়তো বারবার ব্যাহত বা আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু আর কোনো গ্রন্থ আমরা জানি না যা ভারতীয় জীবনসাধনাকে এতদিন ধরে এত বিস্তৃতভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে ভারতের শিক্ষাদর্শ খুঁজলে তা অসংগত হবে বলে মনে করি না।

এবং আধুনিক ভারতে যে মনীষীরা লুপ্ত ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করেছেন এবং এ দেশের শিক্ষার মধ্যে তা প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সকলেই প্রধান কয়েকখানি উপনিষদ্ ও গীতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। গান্ধীজীকে রীতিমত একজন শিক্ষাবিৎ হিসাবে ধরে নিলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে। শিক্ষায় তাঁর দানকে প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণ বলা যায়। তার মধ্যে কোনো সুসম্বদ্ধ চিন্তাধারার খোঁজ করা ভুল। কাজেই যদিও তাঁরও চিন্তা গীতার ভাবে বিশষভাবে ভাবিত, তবুও তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা তিনজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষানেতার কথা আলোচনা করব: বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। দেখা যাবে এ তিনজনেরই চিন্তার মূল ভিত্তি ও কাঠামো গীতার মধ্যেই আছে। উপনিষদের প্রভাব এ তিনজনের উপরই যথেষ্ট প্রবল। এমন-কি গীতা ও উপনিষদের ভাবধারার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুধাবন করে দেখলে বোঝা যায় যে রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথও মনেপ্রাণে উপনিষদ্ বাণীর দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট। কিন্তু গীতা বেদ-উপনিষদেরই সূত্রসংকলন গ্রন্থ। তাই গীতার সাহায্যে ভারতীয় শিক্ষার মূল ও সর্বজনগ্রাহ্য তিনটি সূত্রের বিবরণ দিয়ে পরে প্রত্যেক শিক্ষানায়কের বিশেষ ঝোঁকটি বিশ্লেষণ করে দেখলেই হবে।

সূত্র তিনটি হল এই। প্রথম, আত্মবোধ বা সমস্ত বাধা সরিয়ে আত্মশোধনের দ্বারা নিজের অন্তরতম সত্তা— মনের মানুষটিকে প্রকাশিত করা। ইন্দ্রিয় সংযম, কামক্রোধলোভ প্রভৃতি জয় ও জ্ঞানের দ্বারা অহংকারের ভ্রান্তিনাশ করলে ভিতরের উজ্জ্বল সত্তা আপনি প্রকাশিত হয়। সকলের মধ্যেই এই আত্মা থাকেন ধূমে আবৃত বহ্নি বা মলে আচ্ছন্ন মুকুরের মত— ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ। জ্ঞান দিয়ে এই অজ্ঞান নাশ করলে সূর্যের মত উজ্জ্বল জ্ঞান আপনি প্রকাশ পায়:

> অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।
> জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
> তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

এর ফলেই সাম্য ও অনাসক্তি লাভ করে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারে:

> যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্
> নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

দ্বিতীয় সূত্র হল এই আত্মবোধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব, বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ হওয়া।

শুদ্ধ অন্তরাত্মা প্রকাশিত হলে আপনা থেকেই সর্বজীবকে নিজের মধ্যে ও নিজেকে সর্বজীবের মধ্যে দর্শন করে—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

আর তৃতীয় সূত্র হল নিজের মধ্যে ও অপরসকলের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরের মধ্যেই সমস্ত কিছুকে দেখতে পাওয়া—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি

যে বিশেষ সাধনার দ্বারা এই বিশ্ববোধ ও ঈশ্বরদর্শন একই সঙ্গে সম্ভব তা হল প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবার সমন্বয়, যাকে অন্য নামে বলা যায় ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম। গীতায় অনেক রকম যোগের বিবরণ আছে। তার মধ্যে এই তিনটিই প্রধান ও অপরিহার্য। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ তিনজনেই এই তিনরকম যোগেরই সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন —

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথ ময়ি॥

পরিপ্রশ্নের দ্বারা, জিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের বা বিবেকের দ্বারা পাওয়া যাবে আত্মতত্ত্ব, সেবার দ্বারা কর্মের দ্বারা লাভ হবে বিশ্বতত্ত্ব ও প্রণিপাত অর্থাৎ ভক্তি শ্রদ্ধা কল্পনা ও রসোপলব্ধির দ্বারা লাভ হবে পরমতত্ত্ব। যে এই তিনটিই সম্যক্‌ভাবে করতে পারবে সে নিজের আত্মায় বিশ্বকে দেখবে এবং 'ময়ি' অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেও বিশ্বকে দেখবে।

আত্মসাধনার এই তিনরকমের প্রক্রিয়া বা প্রৈতিকে শুধু ধর্মসাধনা বা আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালী হিসাবে দেখলে এর অর্থব্যাপ্তিকে অন্যায়ভাবে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। জীবনের তথাকথিত আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সমস্ত প্রয়াসের মধ্যেই এই তিনটি প্রৈতির ছন্দ ও প্রভাব দেখা যায়। শিক্ষায় এর প্রথম দুটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত শিক্ষাবিদের দ্বারাই স্বীকৃত, যদিও এই স্বীকৃতির প্রকারভেদ আছে। শিক্ষার্থী তার নিজের প্রকৃতি প্রবণতা ও সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করবে ও তার সাহায্যে বহির্জগতের সঙ্গে জানা অনুভব ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নানারকম যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে, ব্যক্তি আত্মোন্মেষের দ্বারা সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হবে ও তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারবে— এই দুরকম প্রয়াসের কোনোটিকেই বাদ দেবার উপায় নেই, দুটির সামঞ্জস্য বিধানেই শিক্ষার পূর্ণ সার্থকতা সম্ভব—এই মত আধুনিক শিক্ষার জগতে সর্বজনসম্মত। তৃতীয় প্রয়াসটির স্বীকৃতি ছিল ইওরোপের ক্যাথলিকদের শিক্ষাচিন্তায়। কিন্তু আধুনিক জগতের শিক্ষাসংস্কারের একটি মূলনীতি ছিল শিক্ষাকে ধর্মমতের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ ঐহিক বা secular করে তোলা। এখন সমস্ত পাশ্চাত্ত্যদেশে এবং তাদের অনুকরণে ভারতেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঐহিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার ফলে আজ এই তৃতীয় প্রয়াসটিকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে দাবি করলে তার বিস্তৃত সমর্থন পাবার আশা খুবই কম। কিন্তু কোনো আদর্শ বা নীতির দিকে ঊর্ধ্বমুখী একটা প্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন আজ পশ্চিম দেশের অনেক শিক্ষানায়করাই আবার বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। তাই নানাকণ্ঠে দাবি উঠেছে অন্ততঃ কোনোরকম নৈতিক শিক্ষা চারিত্র গঠন বা আদর্শগত জীবন -যাপনের ব্যবস্থা শিক্ষাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

ভারতের নিজস্ব শিক্ষাচিন্তার একটি লক্ষণ এই যে ঐ তৃতীয় প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে কোনো শিক্ষার পরিকল্পনাকে কখনো সে সত্যশিক্ষা হিসাবে মেনে নিতে পারে নি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে না হোক, অন্ততঃ ভারতের কল্পনায় ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের চিন্তায় বরাবর সেই প্রাচীন আশ্রমের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা ও সাধন শিক্ষার অত্যাজ্য অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। আধুনিক ভারতের যে তিনজন শিক্ষানেতার নাম করেছি তাঁরা তিনজনেই ঐ তিনটি সূত্রকেই গ্রহণ করেছেন এবং এই সূত্রগুলির রূপায়ণ যে গীতায় বর্ণিত তিন রকমের যোগ, যথা: জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের মূলনীতিগুলির সুসমঞ্জস অনুসরণের দ্বারাই সম্ভব তাও স্পষ্টভাবেই মেনে নিয়েছেন। তার মানে এ নয় যে তাঁরা শিক্ষাকে ধর্মনীতি ও চর্যার কঠোর শাসনে অর্পণ করবার চেষ্টা করেছেন। তার মানে হচ্ছে এই যে ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা তিনজনেই এই সত্যই পুনরাবিষ্কার ও স্বীকার করেছেন যে, জীবনকে কৃত্রিম কতকগুলি প্রাচীরে বিভক্ত করা বুদ্ধির কাজ নয়; ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব মূলসূত্র আত্মোন্নয়ন ও ইষ্টলাভে সাহায্য করে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও অবস্থার উপযোগী ক'রে সেইগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তার তুলনা

ভারতের শিক্ষিতসমাজের অনেকেই শিক্ষাব্যাপারে এই গীতার সূত্র ও যোগের আলোচনাকে অপ্রসন্ন ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুসরণে তাঁদের ধারণা যে, এসব এ ক্ষেত্রে অবান্তর ও অচল। কিন্তু কৌতুক ও কৌতূহলের বিষয় এই যে উনিশ শতকের শেষ কয়েক বৎসর থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাচিন্তা যে পথে চলেছে তাতে এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে তাদের ঐতিহ্য ও পরিবেশের অনুকূল এক ধরণের জ্ঞান ও কর্মযোগই শিক্ষায় তাদের আধুনিকতম উদ্ভাবন। প্রাণতত্ত্ব বা Biology, বিভিন্ন ধরণের মনস্তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক এক্স্‌পেরিমেণ্ট এবং মনঃসমীক্ষণ বা psycho-analysis ও psychiatry প্রভৃতির দ্বারা মানুষের মূল প্রকৃতি বা Original Nature ও তার ব্যক্তিত্বের অন্তরতম রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টাকে জ্ঞানযোগের পাশ্চাত্য সংস্করণ বললে অসংগত হবে না। এবং শিক্ষায় ওদের নূতন সূত্র: learn by doing, নূতন প্রক্রিয়া যথা: প্রোজেক্ট বা ডিউইর activity programme—যার প্রভাব আজ আমাদের দেশের বুনিয়াদি শিক্ষায় ও সরকার-প্রবর্তিত সমস্ত সংস্কারপ্রস্তাবে লক্ষণীয়—তাকে এক ধরণের কর্মযোগ বলা যাবে না কেন?

এই আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শনের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

১. আত্মার স্বয়ংসম্পূর্ণতা (perfection) স্বীকার ও বাহ্য বহুস্তর আবরণ উন্মোচনের দ্বারা সেই আত্মাকে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ভারতীয়; কিম্বা গ্রীকদর্শনকে যদি ভারতের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত বলে স্বীকার না করা যায়, প্লেটো প্লটিনাসের আত্মতত্ত্বকে যদি তাঁদের নিজস্ব বলেই ধরে নিতে হয় তা হলে বলা যাক প্রাচ্য। কারণ ক্রীশ্চ্যান-মতে মানুষের ভিতর খুঁজলে যে অন্তঃপ্রকৃতি পাওয়া যাবে তা মানুষের আদিম পাপ বা Original Sin-প্রসূত, অতএব পতিত এবং সবরকমে দোষযুক্ত, তাকে দমন ক'রেই রাখতে হবে। তা সত্ত্বেও সেণ্ট টমাস্ একুইনাস প্রভৃতি যেসব ক্রীশ্চ্যান মনীষী

Unfoldment বা আবরণমোচন-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ধারণার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা স্পষ্টতই গ্রীকচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। তা ছাড়া আধুনিকযুগের পাশ্চাত্য শিক্ষাচিন্তায় মানুষের মূল প্রকৃতি বা original natureকে জানবার ও শিক্ষায় কাজে লাগবার ব্যাপক চেষ্টা শুরু হয়েছে, রুশো প্রমুখ মনীষীদের শিক্ষায় আদিম পাপের কুসংস্কার শিক্ষাচিন্তা থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-ই মূল প্রকৃতি এখনো আত্মতত্ত্ব থেকে অনেক দূরে, যদিও একদিন হাতড়াতে হাতড়াতে এই শাস্ত্র আত্মতত্ত্বে পৌঁছোবার সম্ভাবনা আছে। আপাতত secularismএর দোহাই দিয়ে আত্মতত্ত্বকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। আধুনিক ভারতের শিক্ষাচিন্তা বলতে যদি বুঝি বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাচিন্তা তা হলে স্বীকার করতে হবে যে এই আত্মতত্ত্ব ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য।

২. আত্মবিস্তার ও একাত্মতাসাধনের দ্বারা বিশ্বের সার্বিক তত্ত্ব বা চেতনায় পৌঁছোনো— universalisation of consciousness— ইয়োরোপীয় দর্শনে অপরিচিত নয়। ইয়োরোপীয় কোনো কোনো শিক্ষানেতা এই সার্বিক তত্ত্ব ব্যবহারের যে চেষ্টা করেছেন তার আলোচনা আগেই একটি প্রবন্ধে[১] করা হয়েছে। একথা বললে ভুল হবে না যে এই তত্ত্বেরও মূল উৎস সম্ভবত ভারত। কিম্বা তা যদি নাও হয় তবু এই তত্ত্বের যে বিস্তৃত ও গভীর উপলব্ধি বিশ্লেষণ ও সাধন ভারতে হয়েছে তার পাশে সমস্ত পাশ্চাত্য চেষ্টাকে অপরিস্ফুট ও প্রাথমিক বলেই মনে হবে। অতএব এই প্রচেষ্টাও ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩. অভীপ্সা ও আত্মোন্নয়নের চেষ্টার দ্বারা নিজের ঊর্ধ্বতন সত্তা, আদর্শ বা তত্ত্বকে লাভ। আদর্শবাদ ইয়োরোপীয় শিক্ষাকেও বহুকাল প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ডেমোক্রেসির যুগের ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে যে-কোনো আদর্শের অবশ্যমান্যতার একটা বিরোধ আছে এমনি একটা কল্পনা যা খুব যুক্তিযুক্ত নয়— আজ সমস্ত জগতে প্রসারলাভ করেছে। কোনো কিছুই অবশ্যমান্য নয়— সমস্ত authoritarianismকে আজ দূর করে দিতে হবে— এই হল আধুনিক ডেমোক্র্যাটদের হুংকার। কিন্তু তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিপত্তি, তা আগেই বলা হয়েছে। ভারতে শিক্ষার মধ্যে এই বিশেষ দিকটিকে কখনোই অস্বীকার করা হয় নি এবং আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় একে উপযুক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। ধর্মশিক্ষার সমস্ত বিপদ ও বিভ্রম এড়িয়েও কেমন করে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের শিক্ষার মধ্যেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির ঐশ্বর্য্য সঞ্চারিত করা যায় তার ইঙ্গিত তিনজন আধুনিক মনীষীর চিন্তা ও কাজের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

৪. আত্মতত্ত্বলাভের পথে মানুষের ইন্দ্রিয় বোধ প্রবৃত্তি মন বুদ্ধি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটির শোধন ও ক্ষমতাগুলির বিকাশসাধন সম্বন্ধে যোগশাস্ত্র ও গীতার অন্তর্গত ইঙ্গিতগুলির ব্যবহার অর্থাৎ আগেই যা উল্লেখ করা হয়েছে সেই জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ভক্তিযোগের নীতিগুলির প্রয়োগ। এবং বিশ্বতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব -লাভের ব্যাপারে— অর্থাৎ প্রসার ও উৎকর্ষলাভের জন্যও ঐ তিনটি প্রক্রিয়ারই ব্যবহার। Appreciation বা মূল্যবোধ বা গীতার ভাষায় শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা শ্রেয়কে লাভ— যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। যে যা শ্রদ্ধা করে তাই হয়ে যায়। তার পর একাত্মতা সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নিজের ভিতরে ও বাইরের সব কিছুর মধ্যে প্রবেশলাভ ও সেই সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। এবং কাজের

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮০ শক।

মধ্য দিয়েও সমস্ত তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ। এই তিনটি প্রক্রিয়ার সচেতন ব্যবহারও ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বিশেষ লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া যায়।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার এই সাধারণ লক্ষণগুলি স্বীকার করে নিলেও দেখা যাবে এই সূত্র ও প্রক্রিয়াগুলির অর্থদ্যোতনার ঝোঁকে ও সংশ্লেষণে তিনজন শিক্ষাচিন্তকের প্রত্যেকেরই স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। সেই প্রভেদ আলোচনা করবার আগে তিনজনেরই কিছু কিছু রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত করা হল।

বিবেকানন্দ

Education is the manifestation of the perfection already in man.... Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind; suggestion is the friction which brings it out. ..

The Hindu concentrated on the internal world, upon the unseen realms in the self and developed the science of yoga. .. The world is ready to give up its secrets if we only know how to knock, how to give the necessary blow. The strength and force of the blow comes through concentration.

The infinite ocean is the background of me as well as you. Mine also is that infinite ocean of life, of power, of spirituality as well as yours. Therfore, my brethren, teach this life-saving, great, ennobling, grand doctrine (Sraddha) to your children even from their very birth.

Do you not hear what modern scientific men say? What is the cause of evolution? The animal itself: its will. Continue to exercise your will and it will take you higher. The will is almighty.

অনুবাদ

মানুষের ভিতরে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আপনা থেকেই আছে তাকে প্রকাশ করাই হচ্ছে শিক্ষা।··চকমকি পাথরে আগুনের মত জ্ঞানশক্তি মনে থাকেই, বাইরে থেকে কোনো ইঙ্গিত ঘর্ষণের কাজ করে সে আগুনকে জ্বালিয়ে দেয়।··

হিন্দুরা অন্তর্জগতে আত্মার অদৃশ্য অঞ্চলগুলিতেই তাদের সমস্ত অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত করেছিল এবং তার ফলে গড়ে তুলতে পেরেছিল যোগশাস্ত্র।··জগৎ তার সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দিতে প্রস্তুতই আছে, শুধু যদি আমরা জানি কেমন ভাবে দোর ঠেলতে হবে, ঠিক প্রয়োজন মত আঘাতটি কেমন ভাবে দিতে হবে। এই আঘাতের শক্তি ও বেগ পাওয়া যায় যোগ বা অভিনিবেশের দ্বারা।

তোমাদের ও আমাকে ঘিরে আছে এক অনন্ত সমুদ্র। যেমন তোমাদের তেমনি আমারও আছে প্রাণ শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার এই মহাসমুদ্র। তাই বলি, বন্ধুগণ, শিশুদের জন্মমুহূর্ত থেকে তাদের এই মহৎ সুন্দর বাণী (শ্রদ্ধা)— এই জীবনরক্ষাকর চিত্তোৎকর্ষকর তত্ত্ব শেখাও।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা কি বলে তোমরা শোনো নি? বিবর্তনের কারণ কি? ·প্রাণী নিজেই: তার ইচ্ছাশক্তি। তোমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করতে থাকো, তাই তোমাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবে। ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্।

র বী ন্দ্র না থ

বাংলা ১৩১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'তপোবন' প্রবন্ধে লিখছেন:

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের (পাশ্চাত্ত্য অর্থে) যোগ নয়, বোধের যোগ। গীতা বলেছেন ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।· ·এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা। অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতে দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী! সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।

'মানুষের ধর্মে'র ভূমিকা থেকে নীচের অংশটুকু দেওয়া হল:

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।· ·তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না।

'মানবসত্য' থেকে—

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। ·তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা।

'মানুষের ধর্ম' থেকে—

মানুষের সাধনা ও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা।· ·অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে।· ·মানুষ আপন চৈতন্যকে

প্রসারিত করেছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে, আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে তাঁর নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্য ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

'মানবসত্য' থেকে—

মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ।· যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

শ্রী অ র বি ন্দ

১৯২১ সালে আর্য্য পত্রিকায় প্রকাশিত A True National Education প্রবন্ধ থেকে:

India has seen always in man the individual a soul, a portion of the Divinity enwrapped in mind and body, a conscious manifestation in Nature of the universal self and spirit. Always she has distinguished and cultivated in him a mental, an intellectual, an ethical, dynamic and practical and aesthetic and hedonistic, a vital and physical being, but all these have been seen as powers of a soul that manifests through them and grows with their growth, and yet they are not all the soul, because at the summit of its ascent it arises to something greater than them all, into a spiritual being, and it is in this that she has found the supreme manifestation of the soul of man and his ultimate divine manhood, his paramartha and highest purushartha.

And equally then our cultural conception of humanity must be in accordance with her ancient vision of the universal manifesting in the human race.... searching for perfection through the development of the powers of the individual and his progress towards a diviner being and life.

Life Divine থেকে:

The limitation of the universal 'I' in the divided ego-sense constitutes our imperfect individualised personality. . But the liberated soul extends its perception of unity horizontally as well as vertically. Its unity with the transcendental One is incomplete without its unity with the Cosmic Many.

Our evolution in the Ignorance with its chequered joy and pain of self-discovery and world-discovery, its half fulfilments, its constant finding and missing, is only our first state. It must lead inevitably towards an evolution in the knowledge, a self-finding and self-unfolding of the Spirit, a

self-revelation of the Divinity in things in that true power of itself in Nature which is to us still a Supernature.

অনুবাদ

ভারত ব্যক্তিমানুষের মধ্যে বরাবর দেখেছে আত্মা, দেহমনের আচ্ছাদনে ভগবত্তত্ত্বের কণিকা, প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বসত্তা ও আত্মার সচেতন প্রকাশ। মানুষের মধ্যে তার চিত্ত বুদ্ধি বিবেক ইচ্ছা ও কর্মশক্তি, রস ও সুখানুভূতি, প্রাণ ও শারীরতত্ত্ব মিলিয়ে যে সত্তা তার সম্যক্ বিশ্লেষণ ও উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা ভারত চিরকালই করেছে— কিন্তু এই সমস্ত দিকগুলিকেই দেখা হয়েছে আত্মার বিভিন্ন শক্তি হিসাবে— যে আত্মা এইগুলির মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত ও বর্ধিত হয়। তবুও এইসব মিলিয়েও আত্মার পূর্ণতালাভ হয় না, কারণ সব কিছুর উপরে চূড়ায় সে উঠে যেতে পারে সকলের চেয়ে বড় এক অধ্যাত্ম সত্তায়। এবং এই তত্ত্বের মধ্যেই ভারত দেখেছে মানুষের আত্মার মহত্তম প্রকাশ, তার চরম দিব্যজীবন সম্ভাবনা, তার পরমার্থ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

ঠিক একইভাবে বিশ্বতত্ত্ব মানুষজাতির মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার যে দর্শন প্রাচীনকালে ভারতে হয়েছিল তারই অনুসরণ করে আমাদের মানুষের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কথা ভাবতে হবে। বুঝতে হবে যে এই বিশ্বশক্তি ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতাগুলি ফুটিয়ে তুলে তাকে এক দিব্যতর সত্তা ও জীবনের দিকে চালিত করেই নিজের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সার্বিক অহংকে আমাদের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন অহংতত্ত্বের মধ্যে সীমিত করেই তৈরি হয়েছে আমাদের প্রত্যেকের অসম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা।··· কিন্তু মুক্ত আত্মা তার ঐক্যানুভূতিকে প্রেরণ করে আশেপাশে চার দিকে আবার খাড়া উপরের দিক। সর্বাতিগ একের সঙ্গে এর ঐক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় যতক্ষণ না এ পায় বিশ্বের বহু ও বিচিত্রের সঙ্গে যোগ।

এই অবিদ্যার মধ্যে আমাদের বিবর্তন— যা আত্ম-আবিষ্কার ও বিশ্ব-আবিষ্কারের সমস্ত সুখদুঃখের দ্বারা বিচিত্র— তার আংশিক সাফল্যও বারংবার নানারকমের পাওয়া ও হারানো মিলিয়ে সেই হল আমাদের প্রাথমিক অবস্থা। এর মধ্য থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বিদ্যার মধ্যে বিবর্তনে— যা রূপায়িত হবে আত্মার আত্ম আবিষ্কার ও উন্মোচনে, উচ্চতম অধ্যাত্মসত্তার দ্বারা সমস্ত জিনিষের অন্তরস্থ দিব্যভাবের প্রকাশে, প্রকৃতির মধ্যেও তার সেই সত্যতম শক্তির লীলায় যা এখনো আমাদের বোধ ও চেতনার অতীত।

তিনজনের তুলনা

উদ্ধৃতিগুলির সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাচিন্তার কতকগুলি দুরূহ সমস্যা সম্বন্ধে তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করা সহজ হবে। বিবেকানন্দ বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবেন নি, তাঁর পক্ষে তার সুযোগও ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব থেকে ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই শিক্ষা চিন্তা ও রূপায়ণে দীর্ঘকাল নিজেকে ঐকান্তিকভাবে নিযুক্ত রেখেছিলেন। শিক্ষাতত্ত্বের সূত্র ও ইঙ্গিত শুধু তাঁর প্রবন্ধে নয়, তাঁর অনেক গানে, তাঁর নাটকের অনেক চরিত্রে ও সংলাপে

এবং শান্তিনিকেতনে-প্রবর্তিত অনেক রীতিনীতি ব্যবহারের মধ্যে জীবন্ত রূপ পেয়েছে। তিনি শুধু ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর বক্তব্যকে ভাবমূর্তিগুলিকে সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবনসৃষ্টির মধ্য দিয়ে লোকচেতনার সামনে প্রত্যক্ষ উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনিই ভারতীয় শিক্ষার পুনরুদ্ভাবকদের মধ্যে অগ্রণী, এবং তাঁর দান পৃথিবীর যে-কোনো শিক্ষানায়কের সঙ্গে তুলনায় অদ্বিতীয়। কিন্তু সমস্যাগুলির দার্শনিক বিশ্লেষণে ও পূর্ণতম ব্যাখ্যানে শ্রীঅরবিন্দের দানের তুলনা নেই। এবং সুখের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অদ্ভুত মনীষা ও intution- এর দ্বারা যে যে সত্য আবিষ্কার করেছেন ও ব্যবহার করেছেন, তার প্রত্যেকটিই শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায় সমর্থিত হয়েছে। শুধু তফাত এই যে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা সম্বন্ধে রচনায় অনেক তত্ত্বের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ ও পূর্ণযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি উচ্চ ও দুরূহতর প্রয়াস ও প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে যা রবীন্দ্রনাথে নেই। কারণ রবীন্দ্র-কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে সকলের জন্য বললে ভুল বলা হবে, কিন্তু সমাজের সংস্কৃতিসচেতন ও গ্রহণশীল বেশ একটা বড়ো অংশের জন্য। পণ্ডিচেরীতে প্রবর্তিত শিক্ষা শুধু উচ্চতম আধ্যাত্মিক অধিকারীদের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব।

আধুনিক শিক্ষার সূক্ষ্ম সমস্যা বা মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে এই :

১. আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব যখন সেই এক অদ্বিতীয় আত্মার সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা হল তখন শিক্ষার লক্ষ্য ও পন্থাও কি সকলের পক্ষেই এক হবে? কিম্বা সেখানে বহু আদর্শ ও পথের সম্ভাবনা আছে? অব্যয় অবিকার অদ্বৈততত্ত্বের দ্বারা আমাদের শিক্ষাচিন্তা প্রেরিত হবে, না আপেক্ষিকতা ও বৈচিত্র্যবাদের দ্বারা? Absolutism আর relativism-এর মধ্যে কোনটা আমরা গ্রহণ করব?

২. বৈচিত্র্য ও আপেক্ষিকতা যদিই গ্রহণ করি তবে একথাও স্বীকার করি কিনা যে প্রবহমানকালের অভাবিতের প্রকাশে এখনকার বৈচিত্র্য আরো বিচিত্র হতে পারে। অর্থাৎ টাইপগুলোর অদল-বদল বিবর্তনের দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে নূতন রূপ নূতন টাইপের উদ্ভবের সম্ভাবনা— emergence of the new— মানি কি না। যদি মানি তাহলে শিক্ষাকেও বহমান বিবর্তমান করে তুলতে হবে। কোনো-একমতের অবশ্যমান্যতা স্বীকার করলে চলবে না।

৩. ব্যক্তি বদলায় বা তাকে বদলানোই শিক্ষার দায়িত্ব— এ কথা স্বীকার করলে প্রশ্ন আসে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এই সুসংগত ক্রমিক পরিবর্তন হবে কোন্ কেন্দ্র ঘিরে? অহং বা ego, মন বা বুদ্ধি বা হৃদয়, মূল প্রকৃতি প্রভৃতির কোনটিকে বিবৃদ্ধির ক্ষেত্র বা মাধ্যম বলে ধরা হবে? কোন্ অংশ বা তত্ত্ব পরিণামশীল? তার সঙ্গে অপরিণামী আত্মার (যদি তার অস্তিত্ব থাকে) সম্বন্ধ কি? বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই একই প্রশ্ন। সেখানেও বিবর্তন বা evolution চলছে কি না।

৪. মানুষের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বোধ ও সহজ চৈতন্যের উপরস্তরের কোনো তত্ত্ব, তাকে অতিপ্রাকৃত (super-natural) বা অতিচেতন (super-Conscient) যাই বলি, স্বীকার করা দরকার কি না। অর্থাৎ এই বিজ্ঞানের যুগে যুক্তির নাগালের উর্ধ্বে কোনো সত্তা বা তত্ত্বের স্বীকৃতি লোকমুখে জেনে সেই দিকে অগ্রসরের কোনো চেষ্টা করা উচিত বা মানুষের জগতে যে সব উৎকর্ষ ও সংস্কৃতি-সম্পদ্ এখনই লাভ করা গেছে শিক্ষার অভীপ্সাকে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব? Humanismএর ঐতিহ্য আমাদের কাম্য না আধ্যাত্মিক অলৌকিক প্রতিশ্রুতির অনুবর্তন করব?

এখানে লক্ষণীয় এই যে আমাদের তিনজন মনীষীই পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদের দ্বারা প্রভাবিত। হিন্দুশাস্ত্রে

জন্মান্তরবাদ আছে, গীতায় কেমন করে দেহী নববস্ত্র পরিধানের মত ক'রে জন্মান্তর গ্রহণ করে এবং যোগভ্রষ্ট তার প্রয়াসপূরণের অনুকূল অবস্থা পরজন্মে পায়— অর্থাৎ মানবজীবনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা কেমন করে পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। মানবসমাজ, শুধু তাই কেন, পৃথিবীর অন্য সমস্ত প্রাণও যে কতকগুলি বিশেষ নিয়মে বিবর্তিত হয়ে চলেছে বৈচিত্র্য ও পূর্ণতার দিকে এইটেই পাশ্চাত্ত্য চিন্তার দান। এই দান তিনজনেই গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা— যেমন বসুন্ধরা— অনেক প্রবন্ধ এবং তাঁর *Religion of Man* বিশেষ করে বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই বিবর্তনবাদের সূক্ষ্মতর ও পূর্ণতর বিবৃতি শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত চিন্তার— *Life Divine* প্রভৃতি তাঁর বহু গ্রন্থের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে আছে। এখানেও শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে অনেক দূর অতিক্রম করে গেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যতদূর অগ্রসর হয়েছেন তার মধ্যে দুজনের মধ্যে আছে সম্পূর্ণ মিল। সেই ক্ষেত্রেও তত্ত্ব-উদ্ঘাটনে শ্রীঅরবিন্দ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লৌকিক রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী।

বিবেকানন্দ বিবর্তনবাদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিয়ে ভাবেন নি। কেন্দ্রস্থ কোন্ সত্তার বিবর্তন সম্ভব ও ব্যক্তিবিশেষে সেই বদল স্বতন্ত্র ও বিচিত্র হবে কি না— এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো উক্তি আমি জানি না। সমাজ বা বৃহত্তর মানবসত্তাকেও ভগবানের প্রকাশ হিসাবে বিবেকানন্দ দেখেছেন— সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার দ্বারা সেই, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'এর সেবার উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু শিক্ষায় ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতিক্রিয়া ও সম্বন্ধবন্ধন কেমন হবে ও কেমনভাবে কাজে লাগাতে হবে তা তিনি ভাববার অবকাশ পান নি। তবু এ কথা বলা যায় যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃ সহানুভূতি ও সেবার ভাবে ভাবিত এবং এই হিসাবে গান্ধীজীকে তাঁর মানস উত্তরাধিকারী বলা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ বিবর্তনের কেন্দ্রে রেখেছেন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে চৈতন্য স্ফুলিঙ্গকে তিনি নাম দিয়েছেন psyche বা চৈত্যপুরুষ— তাকে। আত্মা অবিকারী অমর, এই চৈত্যপুরুষও অমর কিন্তু পরিণামশীল। Involution বা অন্তবর্তনের দ্বারা শুধু এই পৃথিবীর জীবদের মধ্যেই এই শক্তি বা সত্তা প্রবেশ করেছে, বহুদিন অনাবিষ্কৃত থাকবার পর এ ক্রমশ প্রকাশিত হয়, জ্যোতিকণা থেকে আরম্ভ করে সূর্যের মত দীপ্তিমান্ হয়। ভগবানের সৃষ্টিলীলা একে নিয়েই। আত্মায় তিনি থাকেন অবিকার সাক্ষী, অথচ তাঁরই ইচ্ছায় এই চৈত্যপুরুষ জন্ম থেকে জন্মান্তরে, ' লোক থেকে লোকান্তরে, নিজেকে নিজের একান্ত স্বকীয়ভাবে বিবর্তিত করে চলে। এই হল সৃষ্টিলীলা। কাজেই এই তত্ত্বে আছে এক ও অদ্বিতীয়ের সঙ্গে বহু ও বিচিত্রের মিলন।

বাইরে যে বিরাট বা-বৃহৎ তারও আছে এই রকম চৈত্যপুরুষ ও আত্মা দুটি তত্ত্ব। এ ছাড়াও আছে ব্যক্তি ও বিশ্ব সব কিছুর ঊর্ধ্বে পরম তত্ত্ব— transcendental Self.

এই তিনটি তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ দেহ প্রাণ ও মন -স্তর পেরিয়ে ক্রমশ আরো উপরের স্তরে বিবর্তিত হবে, মনের পর আসবে অতিমানসের সৃষ্টিলীলা এবং তার পর আরো তিনটি ঊর্ধ্বতর শক্তি— এই হল শ্রীঅরবিন্দের সমাধান। এত বিস্তৃত ও সূক্ষ্মভাবে শ্রীঅরবিন্দ এই তত্ত্বের বিবরণ দিয়েছেন যে স্বল্পতম ইঙ্গিত ছাড়া এখানে আর-কিছু দেওয়া সম্ভব নয়।

দেখা যাবে এই সমাধানে পাশ্চাত্য মনের কতকগুলি সঙ্গত দাবি স্বীকৃত হয়েছে ; এবং যেখানে তাদের অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা সেই ফাঁক পূরণ করা হয়েছে। ব্যক্তির স্বকীয়তা ও পরিণতির বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয়েছে

অথচ সেটা যে একেবারে সমস্ত নিয়মের বাইরে যদৃচ্ছার রাজ্যে নয়— শাশ্বত সার্বিক সত্তা ও সর্বাতিগ সত্তার সঙ্গে তার যে একটা সম্বন্ধ আছে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থাপিত হয়েছে সৃষ্টির কতকগুলি মূল সূত্রের ভিত্তিতে। এই তিনটি তত্ত্বের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় কোনো অত্যাচার বা আরোপের কথা ওঠে না, কারণ আসলে তারা একই তত্ত্ব, এবং সম্বন্ধলীলাটা শুধু বৃহত্তর আত্মীয়তাজ্ঞানের, প্রেমের। আর পাশ্চাত্ত্য মন যা প্রকাশিত সৃষ্টি তার মধ্যেই শুধু অদলবদলের দ্বারা যে নূতনত্ব প্রত্যাশা করেছে তার ভ্রান্তি দূর করা হয়েছে নূতন সৃষ্টির উৎস সর্বাতিগের প্রভাব ও তার সময়মত হস্তক্ষেপকে সৃষ্টির লীলার মধ্যে স্বীকার করে। তারই ফলে humanism-অধিকৃত অঞ্চলেই মানবউৎকর্ষ থেমে থাকবার দরকার নেই, আরো উচ্চতর— এবং তার ফলে ব্যাপকতর— সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানুষ পেতে পারবে। পদার্থবিদ্যার জগতে— আলো তাপ ধ্বনি বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি সম্বন্ধে 'অব' ও 'অতি', infra ও ultra পর্যায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করতে দ্বিধা করে নি। আত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই তাদের যত কৃপণতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে তাকে স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও এই কথা মানাই যুক্তিযুক্ত যে আজ যা অবচেতন বা অতিচেতন মহলের তত্ত্ব, ভবিষ্যতে তা উপলব্ধ হবার কোনো বাধাই নেই। এমন কি বিবর্তনের পূর্ব ধাপগুলি মনে রাখলে তাই হওয়াই যে যুক্তিযুক্ত তা স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কাব্যে নাটকে শান্তিনিকেতন রচনায় এই ভাব ও সূত্রগুলিই স্বাধীনভাবে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রীঅরবিন্দের রচনা প্রকাশের আগেই আত্মপ্রকাশ করেছে। একুশ বৎসর বয়সে সদর স্ট্রীটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের যে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়েছিল— নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ প্রভাতসঙ্গীত ইত্যাদি যার সাক্ষ্য বহন করছে এবং তাঁর সমস্ত পরবর্তী বিকাশকে যা একটি অনন্য ও মৌলিক বীজমন্ত্রের মত প্রভাবিত করেছে— সেই উপলব্ধি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' অনুভবের সগোত্র, উপনিষদের ব্রাহ্মধর্ম নির্বাচিত অংশগুলির সমপর্যায়ের এ কথা বলেও স্বীকার করতে হবে যে তা একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। এবং এই কেন্দ্রীয় উপলব্ধিই তাঁর জীবন ও শিক্ষাদর্শনের সমস্ত চিন্তা ও ভাবসূত্রগুলিকে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কারের পর্যায়ে তুলে ধরেছে। অন্তরাত্মা হয়ে উঠেছেন তাঁর জীবনদেবতা, যার সৌন্দর্য ও মহিমা রবীন্দ্রকাব্য পাঠকের কাছে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মত অন্তরঙ্গ ও স্পষ্ট। তাঁর নানা গানে এই জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর চৈত্যপুরুষের আকর্ষণ বিকর্ষণ বিরহমিলনলীলা— এই 'সাইকি'র যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণতালাভের যে চিত্র পাওয়া যায়, তার তাত্ত্বিক কাঠামোকে অতিক্রম ক'রে. অভিষিক্ত করে যে রসগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে সত্যকার জগৎসৃষ্টির পর্যায়ে ফেললে দোষ হয় না। সাইকিক জগতের সমস্ত আস্বাদ ও অভিজ্ঞতা তিনি বাস্তবজগতে নামিয়ে এনেছেন। এই জগতের পূর্ণতা ও শুদ্ধতার রস, অথচ তার অনন্ত বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের সম্ভাবনা, এর মধ্যে প্রাণ মন আত্মার স্বাধীনতা সহজতা সাহস— এর অনন্তব্যাপ্তি ও ভূমার ঐশ্বর্য ভোগ— এ সমস্তই তিনি অন্তত তাঁর অনুরাগী পাঠকদের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করেছেন। অন্তরাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মাধুর্য পাই তাঁর 'ওগো অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম', 'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহপ্রাণ কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান' ইত্যাদি গানে। আত্মবিবর্তনের ছবি

পাই 'কবে আমি বাহির হলেম', 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' ইত্যাদিতে। নূতন জন্ম নূতনত্বের প্রত্যাশা পাই 'আবার যদি ইচ্ছা করো, ইত্যাদিতে। বিশ্ববোধের ও বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনের বহু গানের মধ্যে মনে পড়ছে 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া— বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া' ও 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো'। 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন', 'ওরে মন সহজ হবি' প্রভৃতির মধ্যে স্বাধীন অবাধ অভিযান, সংস্কারমুক্তির সহজতা ইত্যাদি রস পাই। তা ছাড়া সেই সর্বাতিগ transcendental তত্ত্ব যা বোঝা শক্ত কিন্তু যা 'প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ'— তাকে তিনি রসস্বরূপ জেনে তাঁর সংগীতরসের মধ্যে কত সহজ করে এনে দিয়েছেন আমাদের কাছে এই সব গানে: 'প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার মাঝে অমনি ফোটে তারা।···তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে কী গৌরবে হৃদয়-অন্ধকারে' 'তুমি একলা ঘরে বসে বসে', 'সীমার মধ্যে অসীম তুমি', এবং বিশেষ করে 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নিচে, আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে' ইত্যাদি গানে।

তা ছাড়া প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষায় জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কর্মযোগের অনেক ব্যবহার-সূত্রের ইঙ্গিত তিনি অনেক জায়গায় দিয়েছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি বিশেষ রস ও ভঙ্গিমার 'আনন্দযোগ' (তিনি নিজেই এই নাম ব্যবহার করেছেন) জীবনে ও শিক্ষায় তাঁর মৌলিক দান। অথর্ববেদে, উপনিষদে, গীতায় ভূমার আনন্দ, প্রাণের আনন্দ, ব্রহ্মবিহারের আনন্দের বর্ণনা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদেরই সংসার-জীবনের মধ্যে একেবারে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীলভাবে আনন্দের রসমূর্তিগুলিকে আমরা পেয়েছি, চিনেছি, সেগুলি স্থায়ীভাবে মানুষের জীবনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারার আশ্বাস পেয়েছি ঋষি কবিরই দাক্ষিণ্যে।

আরো এক শ্রেণীর দার্শনিক মতবিরোধের চমৎকার সমাধান হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই মৌলিক সংশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ও উপযানে (approach)। পশ্চিমের একাডেমিক আলোচনায় শিক্ষাদর্শনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে একাধিক রকমে। প্রধান শ্রেণী হল তিনটি; Idealism বা আদর্শবাদ, naturalism বা স্বভাববাদ ও pragmatism বা ব্যবহারবাদ। এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় humanism বা মানবতাবাদ, supernaturalism বা অতিপ্রাকৃতবাদ, realism বা বাস্তবতাবাদ। কিন্তু সত্য কোনো প্রতিষ্ঠাবান্ শিক্ষাবিদের অস্তিত্ব নেই যিনি একটিমাত্র মতবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যাঁর চিন্তায় ও কাজে একাধিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটে নি। তবু এ কথা ঠিক যে অন্তত প্রথম তিনটি মতবাদের ভেদকল্পনায় কিছুটা সার্থকতা আছে। এই তিনটির প্রত্যেকটির কতকগুলি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, উপযান ও ক্রিয়াকৌশল আছে, যথা আদর্শবাদে শ্রদ্ধা বা ঊর্ধ্বদৃষ্টি, কোনো প্রামাণ্য তত্ত্বকে মূল সত্যকে বা সর্বময় কর্তৃত্বকে স্বীকার করা ও মানা, বাধ্যতা সংযম ইত্যাদি গুণাভ্যাস।

স্বভাববাদে আত্মস্বভাবের উপর অসংকোচ আস্থা, স্বাধীন আত্মপ্রকাশ, নির্ভীকভাবে নিজের সংকল্পকে অনুসরণ, সত্যকার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই নিজের ক্ষমতাগুলিকে, মূল্যবোধ ও বিচারবিবেচনাশক্তি গড়ে তোলবার সুযোগ, সমাজের ও প্রকৃতির মধ্যে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মবিকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। আর ব্যবহারবাদে আছে কোনো আদর্শ বা নিজের প্রকৃতিকে নির্ণায়করূপে ব্যবহার না করে লোকসমাজে ব্যাবহারিক পরীক্ষার দ্বারা, নানাভাবে নিজের জ্ঞান মতামত অভিজ্ঞতা ইত্যাদির যাচাইএর দ্বারা, কর্মক্ষেত্রের সফলতা-বিফলতার মাপকাঠিতে প্রত্যেক ধারণার মূল্য নির্ণয়ের দ্বারা এমন কতকগুলি সত্য ধারণা ও মনোভঙ্গি আবিষ্কার যা শক্তিমান ও ফলপ্রসূ, যা সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমাজজীবনে ক্রিয়াশীল হবেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে নিজের জীবনে শান্তিনিকেতনে দেখিয়েছেন কেমন করে মানুষ তার নিজের স্বভাবকে অবাধ মুক্তির মধ্যে ছেড়ে দিয়েও নিজের চেয়ে যা উচ্চতর তার প্রতি নম্রতা ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে পারে। এটা যে সে পারে এবং পারাই উচিত তার কারণও আছে তার স্বভাবের মধ্যেই তার ঊর্ধ্বগতির প্রবণতায়, অভীপ্সায়। তাই স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে গুরুর উপস্থিতির কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই। ফাল্গুনীর তরুণদলের মত দুঃসাহসিক স্বাধীনতাবাদীদের গুরু সর্দার— যে কোনোকালেই সর্দারি করে না। উদ্ধত পঞ্চক অতি সহজ শ্রদ্ধায় নত দাদাঠাকুরের কাছে। এবং রবীন্দ্রনাথের 'গুরু' 'দাদাঠাকুর' 'ঠাকুরদা' শ্রেণীর চরিত্ররা অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ হয়েও কখনো কোনো কঠিন অপরিবর্তনীয় মতামত বা ধারণার শিকলে নিজেদেরও বাঁধেন নি, অপর কাউকেও বাঁধবার চেষ্টা করেন নি। ধ্রুবসত্যে আস্থার সঙ্গে চিরনূতনের প্রত্যাশাকে কত সহজে মেলানো যায় তা তাঁদের ব্যবহারে সুস্পষ্ট। আর সুস্পষ্ট তাদের কাছে যারা রবীন্দ্রনাথের চিরনূতনের গানগুলি হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন— 'যা চিরপুরাতন বারে বারে তাই নূতন'— রবীন্দ্রনাথের এই বাণী যাদের মর্মস্পর্শ করেছে। চারপাশের সমস্ত মানুষের সঙ্গে একটি সহজ সুন্দর যোগসাধন ক্ষমতা কেমন স্বাভাবিকভাবে ফুটেছে ডাকঘরের অমল-এর মধ্যে। আবার যাকে চোখে দেখা যায় না যা প্রজ্ঞানের দ্বারাই প্রাপ্তব্য সেই অরূপতত্ত্ব কেমন করে অহংকার নাশ করে আত্মসমর্পণের দ্বারা পেতে হয় তার দৃষ্টান্ত দেখি সুদর্শনার ট্রাজিক আত্ম আবিষ্কারে। লাঞ্ছিত পতিতজীবনের মধ্যে কেমন করে আনন্দযোগ সাধন করতে হয় তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত নন্দিনী। আর absolute এর মধ্যে relative, চিরন্তনের মধ্যে নূতন, ঐক্যের মধ্যে বিচিত্র, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মিলিয়ে চরম স্বাধীনতা ও উদ্ভাবনশীলতা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ জীবন্ত রসরূপ পাই ফাল্গুনীর নবযৌবনের দলে, তাদের কথায়, গানে।—'আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের মিলবে না কূল', 'চলার বেগে পায়ের তলার রাস্তা জেগেছে' (dynamism, pragmatism), 'চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে', 'জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান' ইত্যাদি।

শুধু যুক্তি দিয়ে যে সংশ্লেষণ দুরূহ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রস-চেতনার মধ্যে তার অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন। আদর্শবাদের শ্রদ্ধা, স্বভাববাদের সহজতা স্বাধীনতা স্বকীয়তা ও ব্যবহারবাদের সামাজিকতা প্রয়োগসিদ্ধতা নিত্য পরীক্ষা ও উদ্ভাবনশীলতা— সমস্তকেই তিনি বিনাবিরোধে একটি উদার উপযানের মধ্যে সংহত করেছেন। এবং শান্তিনিকেতন-রচনায় তাঁর সমস্ত নীতি ও ক্রিয়াকৌশল এই অপূর্ব সংশ্লেষণের, এই মৌলিক আনন্দযোগের সাক্ষ্য বহন করছে। যে তত্ত্বগুলি শিক্ষা ও জীবন বিবর্তনের মূল সূত্র হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে সেগুলির রসরূপ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের চিত্তে সঞ্চারিত করেছেন তিনিই, ব্যক্তিগত জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়েও তারই চেতনা তিনি আধুনিক মানুষের চিত্তে পৌছিয়ে দিয়েছেন। 'অন্তরাত্মা'র আবেদন কেমন করে বিশ্বচিত্তে আন্দোলন তুলেছিল গীতাঞ্জলির মধ্য দিয়ে, আর বিশ্বমানবের আবেদনে কেমন করে কবি নিজকণ্ঠে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন দেশে দেশে তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু জীবনের মধ্যে এইসব প্রেরণা ও তত্ত্বের স্থায়ীরূপসৃষ্টির প্রয়াস তিনি পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর শান্তিনিকেতন সাধনাকে যে আচার্য জগদীশচন্দ্র 'যুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা' বলে অভিহিত করেছিলেন তা অযৌক্তিক নয়। এই নূতন জীবনরূপ-সৃষ্টিতে তিনি কতদূর সফল হয়েছিলেন তা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে হরপার্বতীর প্রেম

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সংস্কৃত কবিতার সংকলন-গ্রন্থগুলিতে আমরা পার্বতী-মহেশ্বরকে লইয়া পূর্বরাগ প্রণয় পরিণয় সম্ভোগ প্রেম-কলহ মান-অভিমান কলহান্তর সব জিনিসেরই বর্ণনা দেখিতে পাই। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' দেখিতে পাই বিবাহের পূর্বে পার্বতী যখন তপস্বী শিবের শুশ্রূষায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সমাধির খানিকটা অন্তরায়ভূতা জানিয়াও মহাদেব পার্বতীকে নিষেধ করেন নাই, কারণ—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥

বিকারের হেতু বর্তমান সত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্ত বিকারগ্রস্ত না হয় তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। পরবর্তী কালের সকল কবিরা কিন্তু তপস্বী মহাদেবের এই ধীরত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। শ্রীহর্ষদেবের রচিত একটি কবিতায় দেখিতে পাই, শঙ্কর-আরাধনের সময় স্তনভারে নম্রতাপ্রাপ্ত মহাদেবের পাদাগ্রে স্থিত গৌরীকে মহাদেব তাঁহার সস্পৃহলোচনত্রয়ের দ্বারাই দর্শন করিতেছিলেন; ফলে গিরিজাও পুলক ও স্বেদোদ্‌গমে উৎকম্পিতা হইয়া অত্যন্ত লজ্জাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মস্তকধৃত শিথিল কুসুমাঞ্জলি দূর হইতে মহাদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াই চলিয়া গেলেন।

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুঃ স্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং
শম্ভোঃ সস্পৃহলোচনত্রয়পথং যান্ত্যা তদারাধনে।
হ্রীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্‌গমোৎকম্পয়া
বিশ্লিষ্যন্ কুসুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোঽন্তরে পাতু বঃ ॥[১]

বিবাহ-সময়ে গৌরীর বর্ণনায় ভাসের একটি কবিতায় পাই, প্রত্যাসন্ন বিবাহের মঙ্গলবিধিতে দেবার্চনায় ব্যস্ত ছিলেন গৌরী; দেবার্চনা করিতে গিয়া সামনে দেখিতে পাইলেন ভাবী স্বামী গঙ্গাধর শিবের অঙ্কিত আকৃতি; পার্বতীর প্রবল হাস্য রোষ ও লজ্জা উপস্থিত হইল; তথাপি বৃদ্ধস্ত্রীগণের বচনে কোনও রূপে প্রিয়ের প্রতিকৃতিতে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি।—

প্রত্যাসন্নবিবাহমঙ্গলবিধৌ দেবার্চনব্যস্তয়া
দৃষ্ট্বাগ্রে পরিণেতুরেব লিখিতাং গঙ্গাধরস্যাকৃতিম্।
উন্মাদস্মিতরোষলজ্জিতরসৈর্গৌর্যা কথঞ্চিৎচ্চিরা-
দ্বৃদ্ধস্ত্রীবচনাৎ প্রিয়ে বিনিহিতঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ পাতু বঃ ॥[২]

বিবাহ-কালে শিবের বেশ ও আভরণাদি লক্ষ্য করিয়া বা বিসদৃশ রূপ-গুণ লক্ষ্য করিয়া পার্বতীর দৃষ্টিতে যে যুগপৎ বহুভাবের উদয় তাহার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এইসকল বিসদৃশ রূপ-গুণের কথা বাদ দিয়া বিবাহ-সময়ে প্রথম স্বামি-দর্শনে কুমারীর দৃষ্টিতে যে বিচিত্র ভাবমিশ্রণ তাহাও চমৎকার হইয়া দেখা দিয়াছে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে।—

---

১ সূক্তিমুক্তাবলী; সদুক্তিকর্ণামৃত ও সুভাষিতভাণ্ডাগারেও ধৃত।
২ সদুক্তিকর্ণামৃত; সুভাষিতরত্নকোষ এবং সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারেও ধৃত।

আদৌ প্রেমকষায়িতা হরমুখব্যাপার-লোলা শনৈ
র্ব্রীড়াভারবিঘূর্ণিতা মুকুলিতা ধূমোদ্‌গমব্যাজতঃ।
পত্যুঃ সম্মিলিতা দৃশা সরভসব্যাবর্তনব্যাকুলা
পার্বত্যাঃ পরিণিতিমঙ্গলবিধৌ দৃষ্টিঃ শিবায়াস্তু বঃ॥

প্রথমেই শিবের প্রতি অনুরাগিণী পার্বতীর নয়ন-দুইটি নবপ্রেমে অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; তদুপরি শিবের আননে স্থাপিত হওয়ায় দৃষ্টি হইল চঞ্চল; আবার লজ্জাভারেও বিঘূর্ণিত— বিবাহকালে ধূমোদ্‌গমের ছলে মুকুলিতা; আবার পতির চক্ষুতে চক্ষু পড়িতেই চক্ষু দুইটি তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লওয়ায় ব্যাকুল; সব জিনিস মিশ্রিত হইয়া গৌরীর চক্ষু-দুইটিতে দেখা দিয়াছে একটি বিচিত্র ভাববিহ্বলতা। এই বর্ণনা পরবর্তী কালের কিলকিঞ্চিৎ-ভাবাশ্রিত রাধার চক্ষু-দুইটির বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

হরগৌরীকে লইয়া যে একটি অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিকল্পনা ইহা তত্ত্ব এবং সাধনা উভয় দিক হইতেই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক। তত্ত্বের দিক হইতে শিব শুভ্র জ্ঞানমাত্রতনু, গৌরী প্রকাশাত্মিকা। এই জ্ঞান ও প্রকাশ একই অদ্বয় সত্যের দুই অর্ধ; অর্ধনারীশ্বর পরম অদ্বয়-তত্ত্বেরই বিগ্রহ। কালিদাস এই পার্বতী-পরমেশ্বরকে বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত (বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ) বলিয়াছেন। তন্ত্র-সাধনার দিক হইতে প্রত্যেক জীবদেহই একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি; দেহের বামার্ধ হইল শক্তিতত্ত্ব বা নারীতত্ত্ব; দক্ষিণার্ধ হইল পুরুষতত্ত্ব; প্রত্যেক পুরুষ তাহার বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ; প্রত্যেক নারীও তাহার বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ। নারী কখনও বিশুদ্ধা নারী নয়, নারীতত্ত্ব প্রাধান্যের জন্যই সে নারী; পুরুষ তেমনই বিশুদ্ধ পুরুষ নয়, পুরুষতত্ত্ব প্রাধান্যের দ্বারাই তাহার পুরুষত্ব। এই নারী-পুরুষের যুগলতত্ত্বও হইল বাম-দক্ষিণে মিলিত অর্ধনারীশ্বর-তত্ত্ব। কিন্তু কবিগণ এই তত্ত্ব ও সাধন-রহস্যকে আদিরসের বিস্তারে নানারূপে ঢালিয়া লইয়াছেন। পার্বতীর সঙ্গসুখ ত্যাগ মুহূর্তমাত্রও অসম্ভব বলিয়াই মহাদেব তাঁহাকে একেবারে নিজদেহে যুক্ত করিয়া অর্ধাঙ্গিনী করিয়া লইয়াছেন। সংস্কৃত কবিগণকে অনুসরণ করিয়া কবি ভারতচন্দ্রও 'অন্নদামঙ্গলে' বলিয়াছেন—

হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হর-গৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥
দুই জনে সহাস্য-বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হইলা দুই অর্ধঅঙ্গে॥

কিন্তু মহাদেব একদিন স্মিতমুখে অর্ধাঙ্গিনী গৌরীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ব্যর্থ হইল আমাদের এই এক দেহ ধারণ—ইহাও তো মস্ত বড় এক বিড়ম্বনা রূপেই দেখা দিল! দুই দেহ বামে দক্ষিণে মিলাইয়া এক করিয়া লইবার ফলে হাস্য-পরিহাসে রসালাপ প্রভৃতি তো দূরের কথা— এখন যে আর একের পক্ষে অন্যের মুখাবলোকনও সম্ভব হইতেছে না!—

আশ্লেষাধরবিম্বচুম্বন-সুখালাপ-স্মিতান্যাসতাং
দূরে তাবদিদং মিথো ন সুলভং জাতং মুখালোকনম্।
ইত্থং ব্যর্থকৃতৈকদেহঘটনোপন্যাসয়োরাবয়োঃ
কেয়ং প্রেম-বিড়ম্বনেত্যবতু বঃ স্মেরোঽর্ধনারীশ্বরঃ॥[১]

১ সুভাষিতাবলিতে শূরবর্ধন কবির বলিয়া গৃহীত, সদুক্তিকর্ণামৃতে কস্যচিৎ' বলিয়া গৃহীত।

ভগীরথ নামক কবির নামে প্রচলিত একটি পদে দেখি—

মিশ্রীভূতাং তব তনুলতাং বিভ্রতো গৌরি কামং
দেবস্যাসীদবিরলপরীরম্ভজন্মা প্রমোদঃ।
কিং তু প্রেমস্তিমিতমধুরস্নিগ্ধমুগ্ধা ন দৃষ্টির্
দৃষ্টেত্যন্তঃকরণমসকৃত্তাম্যতি ত্র্যম্বকস্য ॥

ত্র্যম্বকের ছিল 'অবিরল-পরিরম্ভজন্মা প্রমোদ'; কারণ গৌরীর তনুলতাকে নিজের দেহে লইয়াছিলেন মিশ্রীভূত করিয়া; কিন্তু তাহাতে প্রিয়ার 'প্রেমস্তিমিতমধুরস্নিগ্ধমুগ্ধা দৃষ্টি'র আস্বাদন সম্ভাবনা কোথায়—তাই ব্যথিত হইতেছে ত্র্যম্বকের অন্তঃকরণ।

এই অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজশেখরের একটি কবিতায় বালগুহের (কার্তিকের) চিত্ত-সংশয় চমৎকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।—

অম্বেয়ং নেয়মম্বা ন হি খরকপিশং শ্মশ্রু তস্যা মুখার্ধে
তাতো হয়ং নৈষ তাতঃ স্তনমুরসি পিতুর্দৃষ্টবান্নাহমত্র।
কেয়ং কো হয়ং কিমেতদ্ যুবতিরথ পুমান্ বস্তু কিংস্যাত্তৃতীয়ম্
শম্ভোঃ সংবীক্ষ্য রূপাদপসরতি গুহঃ শঙ্কিতঃ পাতু যুষ্মান্ ॥[১]

বাম্য অবলম্বনে গৌরীর মানিনী অভিমানিনী -মূর্তি এবং তাঁহার অসূয়াবশে কুপিতা নায়িকা-মূর্তি আমরা দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি শিবের বক্ষঃস্থলে স্ফটিকমণিশিলামণ্ডলের স্বচ্ছদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে পড়িয়াছে পার্বতীর ছায়া; শিবের বুকে নারীর ছায়া দেখিয়া পার্বতী সংশয়ান্বিতা হইয়া উঠিলেন; শিব যতই বলিতেছেন, 'এ তুমিই, এ তুমিই' পার্বতী তাহাতে আশ্বাসিতা না হইয়া অসূয়াযুক্তাই হইয়া উঠিলেন; অসূয়ার কারণ স্বরূপে পার্বতী বলিতেছেন, 'আমার বাম কর্ণে কুবলয়, ঐ নারীর যে দেখিতেছি দক্ষিণ কর্ণে কুবলয়!' শিব উত্তরে আর কি বলিবেন, হাসিয়া পার্বতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

বক্ষঃপীঠে নিরীক্ষ্য স্ফটিকমণিশিলামণ্ডলস্বচ্ছভাসি
স্বাং ছায়াং সাভ্যসূয়া ত্বমিয়মিতি মুহুঃ সত্যমাশ্বাসিতাপি।
বামে মে দক্ষিণে হস্যাঃ শ্রবসি কুবলয়ং নাহমিত্যালপন্তী
দত্তাশ্লেষা সহাসং মদনবিজয়িনী পার্বতী বঃ পুনাতু ॥[২]

চক্রপাণি কবির একটি শ্লোকে দেখিতে পাই হরের মুখে অন্য রমণীর নাম শুনিয়া কুপিতা গৌরীর একটি চিত্র।—

তস্যা নাম ময়া কথং কথমপি ভ্রান্ত্যা সমুচ্চারিতং
জানাস্যেব মমাশয়ং তব কৃতে গৌরি প্রসন্না ভব।
ক্ষান্তিঃ স্বীক্রিয়তাং দয়াবতি ময়ি ক্রোধঃ পরিত্যজ্যতা-
মিত্যেবং বহু জল্পতঃ স্মররিপোঃ প্রেমাঞ্জলিঃ পাতু বঃ ॥[৩]

---

১ সুভাষিতরত্নকোষ

২ শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, পিটার্ পিটার্‌সন্ সম্পাদিত; সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারেও ধৃত।

৩ সদুক্তিকর্ণামৃত, হরশৃঙ্গার।

কুপিতা গৌরীকে শিব বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রেমাঞ্জলি ধরিয়া বলিতেছেন, 'তাহার (সেই নারীর) নাম কোনও রকমে ভ্রান্তিবশেই আমি উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছি; হে গৌরি, তোমার জন্য আমার হৃদয়ভাব তুমি নিজেই তো জান, সুতরাং তুমি প্রসন্না হও; তুমি ক্ষান্তি স্বীকার কর, হে দয়াবতি, আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর।'

মহাদেবের সন্ধ্যাঞ্জলি যে গৌরীর মনঃপূত কার্য ছিল না তাহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি; মহাদেব সতিনী গঙ্গাকে যে মাথায় রাখিতেন তাহাতে গৌরীর আপত্তি হইবারই কথা। মহাদেব যে সমুদ্রমন্থনে বিষপান করিয়াছিলেন সেই ঘটনাটিকেও একটি গূঢ়ার্থ দান করা হইয়াছে। একজন কবি গৌরীর খণ্ডিতা-রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাং যৎ প্রণিপত্য লোকপুরতো বদ্ধাঞ্জলি র্যাচসে
ধৎসে যচ্চ নদীং বিলজ্জ শিরসা তন্নাম সোঢ়ং ময়া।
শ্রীর্যাতামৃতমন্থনে যদি হরিং কস্মাদ্বিষং ভক্ষিতং
মা স্ত্রীলম্পট মাং স্পৃশেতি গদিতো গৌর্যা হরঃ পাতু বঃ॥[১]

ইহা যেন সেই পরবর্তী কালের বাঙলা বৈষ্ণব সাহিত্যের 'ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক'রই প্রাক্‌ রূপ। সন্ধ্যাকে প্রণতি জানাইয়া শিবের যে বদ্ধাঞ্জলি তাহা আসলে ছলে অন্য নায়িকার প্রসাদ যাচ্ঞা; বিলজ্জের ন্যায় শিব গঙ্গাকে তো শিরে বহন করেনই; এখানে আবার নূতন জানিতে পারিতেছি যে অমৃতমন্থনে শ্রী আবির্ভূতা হইয়া হরিকে বরণ করিয়াছিলেন এই দুঃখেই হর বিষপানে জীবনত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং গৌরী কুপিতা হইয়া ঠিকই বলিয়াছেন, 'হে স্ত্রীলম্পট, আমাকে তুমি ছুঁইও না'।

গঙ্গাকে লইয়া মহাদেবকে গৌরীর নিকটে বহুভাবে জবাবদিহি করিতে হইয়াছে; শুধু জটাবন্ধনে নয়, বক্রোক্তিবন্ধনেও গঙ্গাকে বহু সময়ে গৌরীর নিকট হইতে লুকাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।[২]

মান-অভিমানের পরে অনুনয়-বিনয় করিয়া পিনাকীকে পার্বতীর ক্রোধ উপশম করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে, এ দৃশ্য আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহাতেই কুপিতা গৌরী 'কলহান্তরিতা' হইয়া

---

১ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার, সুভাষিতাবলিতেও ধৃত।

২ এষা তে হর কা সুগাত্রি কতমা মূর্ধ্নি স্থিতা কিং জটা
হংসঃ কিং ভজতে জটাং নহি শশী চন্দ্রো জলং সেবতে।
মুগ্ধে ভূতিরিয়ং কুতো হত্র সলিলং ভূতিস্তরঙ্গায়তে
যশ্চৈবং বিনিগূহতে ত্রিপথগাং পায়াৎ স বঃ শঙ্করঃ॥
কেয়ং মূর্ধ্যন্ধকারে তিমিরমিহ কুতঃ সুভ্রু কান্তেন্দুযুক্তে
কান্তাপ্যত্রাস্তি কাচিন্নমু ভবতু ময়া পৃষ্টমেতাবদেব।
নাহং দ্বন্দ্বং করোমীত্যপনয় শিরসস্তূর্ণমেনামিদানী-
মিথং প্রোক্তো ভবান্যা প্রতিবচনজিতঃ পাতু বশ্চন্দ্রচূড়ঃ।
ধন্যা কেয়ং স্থিতা তে শিরসি শশিকলা কিংনু নামৈতদস্যা
নামৈবাস্যাস্তদেতৎ পরিচিতমপি তে বিস্মৃতং কস্য হেতোঃ।
নারীং পৃচ্ছামি নেন্দুং কথয়তু বিজয়া ন প্রমাণং যদেন্দু-
র্দেব্যা নিহ্নোতুমিচ্ছোরিতি সুরসরিতং শাঠ্যমব্যাদ্বিভোর্বঃ।—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

ওঠেন নাই। শিবকে বার বার গৌরীর পদে নত হইতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলিয়া শ্রীরাধার পদধারণ করাইয়া শ্রীজয়দেব কবি বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তৎপূর্বে সংস্কৃত কবিগণ বহুবার শিবের দ্বারা গৌরীর পদধারণ করাইয়াছেন। গৌরীর পদে আনত দৃষ্টির কথা তো অনেকই পাওয়া যায়। ভাস কবির নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে দেখি—

নখদর্পণসংক্রান্তপ্রতিমাদশকান্বিতঃ
গৌরীপাদানতঃ শম্ভুর্জয়ত্যেকাদশঃ স্বয়ম্ ॥[১]

শম্ভু গৌরীর পদানত হইয়া আছেন; গৌরীর পদের দশটি নখ-দর্পণে দশটি শিবের প্রতিমা দেখা যাইতেছে; তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্বয়ং শম্ভু যেন একাদশ শিব রূপে শোভা পাইতেছেন।

অজ্ঞাতনামা অন্য একজন কবির একটি শ্লোকে দেবীর পদনখের মহিমা কীর্তন করা হইতেছে।—

লাক্ষারাগং হরতি শিখরাজ্জাহ্নবীবারি যেষাং
যে তন্বন্তি স্রজমধিজটামণ্ডলং মালতীনাম্।
প্রত্যুৎসর্পদ্বিমলকিরণৈর্যৈ স্তিরোধানমিন্দো-
র্দেব্যাঃ স্থাণৌ চরণপতিতে তে নখাঃ পান্তু বিশ্বম্ ॥[২]

শিব গৌরীর পদে নত হইয়াছেন; ফলে হরশিরস্থিতা জাহ্নবীর জলে গৌরীর পদের নখগুলির লাক্ষারাগ ধৌত হইতেছে; আর মহাদেবের জটামণ্ডলে সেই শুভ্র নখগুলি মালতীমালার শোভা ধারণ করিয়াছে; আর সেই নখগুলি হইতে যে বিমল কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে তাহাতে চন্দ্রের তিরোধান ঘটিয়াছে।

শ্রীহর্ষরচিত একটি শ্লোকে দেখি, গৌরী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া শিবকে বলিতেছেন, 'দূরে সর ওহে দারুবনে অভিসারকারী; এখন তোমার সব মিথ্যা চাটুবাক্য পরিত্যাগ করো; আবার যদি সেই তুমি এবং পুনরায় সেই আমি (হইব) তাহা হইলে চন্দ্র ভূতলে যাইবে।' গিরিসুতা এই কথা বলিলে মস্তকচূড়ার চন্দ্রকে ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত করিবার ছলে শশিমৌলী শিব মস্তক দেবীর পাদপদ্মে নত করিলেন।—

দূরে দারুবনাভিসারক মৃষা চাটূনি মুঞ্চাধুনা
ভূয়স্ত্বং পুনরস্ম্যহং যদি তদা চন্দ্রঃ ক্ষিতিং যাস্যতি।
ইত্যুক্তঃ শশিমৌলিরদ্রিসুতয়া চূড়েন্দুভূলুণ্ঠন-
ব্যাজব্যঞ্জিতপাদপদ্মপতনপ্রীতপ্রিয়ঃ পাতু বঃ ॥[৩]

গোত্রানন্দ কবি লিখিত একটি সমজাতীয় শ্লোক পাইতেছি।—

ক্রীড়াসরোষগিরিজাচরণারবিন্দং
বন্দে যদগ্রপতিতা হরিণাঙ্কলেখা।
কামাপহস্তিতবৃষধ্বজ ধৈর্যলক্ষ্মী
পাতাবভগ্নবলয়ার্ধনিভা বিভাতি ॥[৪]

ক্রীড়াতে রোষযুক্তা হইয়া উঠিয়াছেন যে গিরিজা তাঁহার চরণারবিন্দের সামনে পতিত হইয়াছে চন্দ্রলেখা;

১ সুভাষিতরত্নকোষ

২ সদুক্তিকর্ণামৃত। ৩ ঐ; সুক্তিমুক্তাবলীতে কবির নাম আছে হর্ষপণ্ডিত। ৪ সুক্তিমুক্তাবলী

অর্ধনারীশ্বর
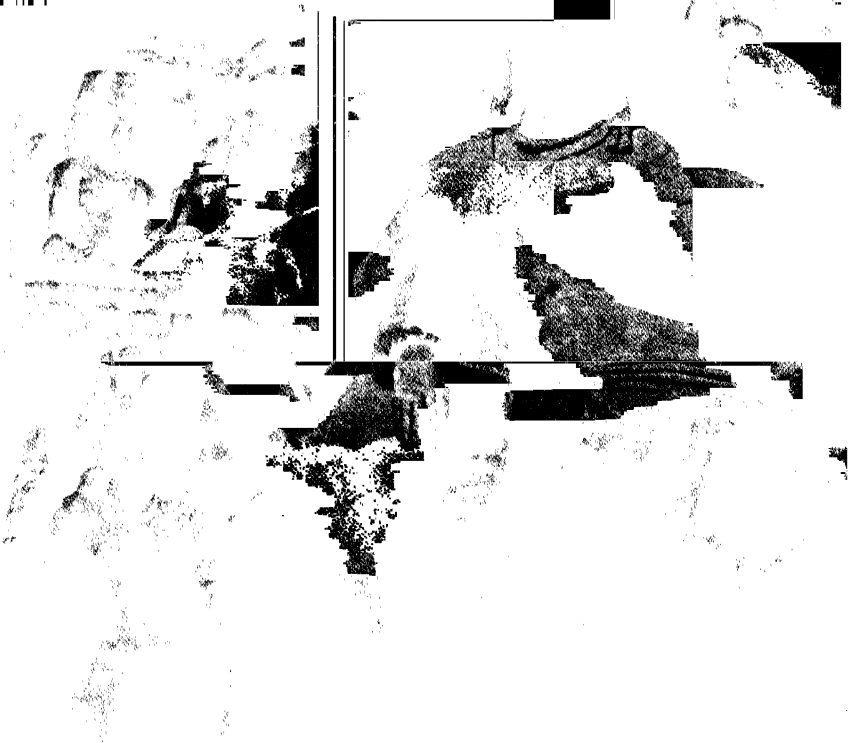
এলিফ্যাণ্টা গুহা

দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামে অপসারিত বৃষভধ্বজের ধৈর্যলক্ষ্মীর বলয়ার্ধ ভূমিতে পতিত হইয়া ভগ্ন ভাবে শোভা পাইতেছে।[১]

উমাপতিধর এই পাদপতনের আরও অনেক বিস্তার করিয়াছেন।—

চূড়াভস্মকণাঙ্কিতাবিব জটাপত্রাঞ্চলেনামৃশন্
নেত্রাগ্নিদ্যুতিতাপিতাবিব করৈঃ সিঞ্চন্ সুধাদীধিতেঃ।
নাগশ্বাসকলঙ্কিতাবিব মুহুর্গঙ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্
মানিন্যাশ্চরণৌ গিরীন্দ্রদুহিতুর্ভূত্যৈ গিরিশো হস্ত বঃ ॥[২]

গিরীন্দ্র-দুহিতা মান করিয়াছেন, সেই মানিনীর চরণযুগলে পতিত হইয়াছেন গিরিশ শিব। এই পতনের ফলে শিবের চূড়া-ভস্মের দ্বারা কলঙ্কিত হইল যে গিরিজার চরণযুগল তাহা যেন জটাপত্রাঞ্চলের দ্বারা শিব মুছিয়া দিতেছিলেন ; আবার গিরিজার চরণযুগল হরের নেত্রাগ্নিদ্যুতিদ্বারা তাপিত হইতেছিল— সঙ্গেসঙ্গেই চন্দ্রের সুধাস্নিগ্ধ কিরণ-সিঞ্চনে সেই তাপ দূর করা হইতেছিল ; আবার হরের গললগ্ন সর্পের শ্বাসের দ্বারা কলঙ্কিত হইতেছিল যে চরণযুগল তাহাকে সঙ্গেসঙ্গেই করা হইতেছিল গঙ্গাজলের দ্বারা ক্ষালন। এই ভাবেই চলিতেছিল মানিনী গিরিজার মানভঙ্গের চেষ্টা।

পার্বতীর পত্নীরূপের যেমন বিবিধ চিত্র দেখিতে পাইলাম তেমনই আবার মাতৃরূপেরও কিছু কিছু চিত্র দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখিতে পাই স্তন্যদাত্রী পার্বতীর মাতৃরূপ। ষড়ানন শিশু কার্তিক তাহার দুই আনন ব্যাবৃত করিয়া গিরিজার স্তনযুগল পান করিতেছে।

অপর-একটি শ্লোকে কলহব্যাপৃত দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশের ঝগড়া মিটাইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত জননীর হাস্যময়ী মূর্তিখানি অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে—

শৈলরাজতনয়াস্তনযুগ্ম-
ব্যাপৃতাস্যযুগলস্য গুহস্য।
শেষবক্ত্রকমলানি মলং বো
দুগ্ধপানবিধুরাণি হরন্তু ॥[৩]

হে হেরম্ব কিমম্ব রোদিষি কথং কর্ণৌ লুঠত্যগ্নিভূঃ
কিং তে স্কন্দ বিচেষ্টিতং মম পুরা সংখ্যা কৃতা চক্ষুষাম্।
নৈতত্তেঽপ্যুচিতং গজাস্য চরিতং নাসাং মিমীতে হম্ব মে
তাবেবং সহসা বিলোক্য হসিতব্যগ্রা শিবা পাতু বঃ ॥[৪]

---

১ তুলনীয়— প্রণয়াকুপিতপ্রিয়াপদলাক্ষাসন্ধ্যাগনুবন্ধমধুরেন্দুঃ। তব্বলয়কনকনিকষগ্রাবগ্রীবঃ শিবো জয়তি। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

২ সূক্তিমুক্তাবলী। তুলনীয়—

উদ্বাহারোপিতার্দ্রাক্ষতনিজপদয়োঃ সঙ্গতামিন্দুমৌলাবনম্রে
যাং সুধাংশোর্ব্যধিত কিল কলাং তূর্ণমেবান্নপূর্ণাম্।
সক্তানামক্ষতানামমৃত দৃগনলোপাধিতঃ পক্বভাবান্
নানার্থৈরন্নপূর্ণা প্রণতজনততেঃ পূর্ণতামাতনতু ॥
—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

৩ সুভাষিতাবলি। ৪ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

মা পার্বতী গণেশকে ডাকিলেন— 'হে হেরম্ব'; গণেশ বলিল— 'কি মা'; মা বলিলেন— 'কাঁদ কেন?' 'কার্তিক আমার দুই কান মলিয়া দিয়াছে।' মা কার্তিককে ধমক দিয়া বলিলেন— 'স্কন্দ, তোমার এ কি কাজ?' কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল— 'ও প্রথমে আমার চক্ষুগুলির (ষড়াননের দ্বাদশ চক্ষুর) সংখ্যা করিতেছিল।' গণেশকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন— 'এটাও তোমার উচিত হয় নাই গজানন।' গজানন বলিল— 'ও যে মা আমার নাসা মাপিতেছিল!' তখন দুইজনকেই দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

দেবী পার্বতীর আমরা আবার আর-একটি রূপ দেখিতে পাই শিবের নিকটে নৃত্যশিক্ষাভিলাষিণী লাস্যময়ী রূপে। শিবই নটরাজ— নৃত্যের আদিগুরু; লাস্যময়ী পার্বতী এই নটরাজের শিষ্যা। শিব তাই নানা ভাবে পার্বতীকে নৃত্যশিক্ষা দান করিয়াছেন। বিদ্যাপতির হরপার্বতী সম্বন্ধীয় পদে আমরা এই হরপার্বতীর নৃত্যের কথা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। একটি শ্লোকে দেখিতেছি হর পার্বতীকে হাতে ধরিয়া নৃত্যের প্রতিটি জিনিস শিক্ষা দিতেছেন।—

এবং স্থাপয় সুভ্রু বাহুলতিকামেবং কুরু স্থানকং
নাত্যুচ্চৈর্নম কুঞ্চয়াগ্রচরণৌ মাং পশ্য তাবৎ ক্ষণম্।
এবং নর্তয়তঃ স্ববক্ত্রমুরজেনাম্ভোধরধ্বানিনা
শম্ভোর্বঃ পরিপান্তু নর্তিতলয়চ্ছেদাহতাস্তালিকাঃ॥[১]

শিব প্রথমে পার্বতীকে দেখাইয়া দিতেছেন, 'হে সুভ্রু, বাহুলতাকে এইভাবে রাখ, এই বিশেষ ভঙ্গিতে অবস্থান কর; বেশি নমিত হইও না, চরণের অগ্রভাগ কুঞ্চিত কর— কিছুক্ষণ আমাকে দেখ।' শিব এইভাবে উপদেশ দিতেছেন, নিজের মুখ-মুরজের দ্বারাই মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিতেছেন, তাল দিয়া দিয়া নৃত্যের লয়চ্ছেদ দেখাইয়া দিতেছেন।

অপর-একটি শ্লোকেও পার্বতীকে নৃত্যশিক্ষাদানের ব্যাপারে হরের আচার্য হইবার বর্ণনা পাই। মহেশের এই যে 'আচার্যক' তাহা 'নানাভাবরসাত্মক'। নৃত্যকালে অভিনয় ভঙ্গ হইলে আচার্য শিব রোষ প্রকাশ করিতেছেন, ঠিক ঠিক সম্পাদিত হইলে প্রশংসা করিতেছেন; নিজের হাত দিয়াই সব ভঙ্গি শিক্ষা দানকালে পার্বতীর অঙ্গস্পর্শহেতু রোমাঞ্চিত হইতেছেন, নৃত্যের দ্বারা শৈলতনয়া খিন্না হইয়া পড়িলে গাঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতেছেন— এই ভাবে পার্বতীকে তিনি নৃত্যশিক্ষা দান করিতেছেন।

বিশ্লিষ্টেঽভিনয়ে রুষং রচয়তঃ সম্পাদিতে শংসতো
রোমাঞ্চং বহতঃ স্বহস্ত-রচিত-স্থানক্রিয়া-স্পর্শজম্।
খিন্নাং শ্বাসয়তশ্চ শৈলতনয়াং গাঢ়ৈঃ সমালিঙ্গনৈ-
র্নানা-ভাবরসাত্মকং পশুপতেরাচার্যকং পাতু বঃ॥[২]

অপর একটি শ্লোকে ভর্তার নৃত্তানুকারের সময়ে পার্বতীর পাদপদ্মশোভা বর্ণিত হইয়াছে। পার্বতীর নিজতনুর স্বচ্ছলাবণ্যবাপীতেই জাগিয়াছে এই পদ্মশোভা। জঙ্ঘা এই পদ্মের কাণ্ড, উরু নাল, নখকিরণেই বিচ্ছুরিত কেশরশোভা; অলক্তকের আভাতে এখানে বিকশিত কিশলয়শোভা, আর পায়ের মঞ্জুমঞ্জীরই হইল ভৃঙ্গ।—

১ সুভাষিতরত্নকোষ; সদুক্তিকর্ণামৃতে যোগেশ্বর কবির নামে ধৃত। ২ সূক্তিমুক্তাবলী।

জঙ্ঘাকাণ্ডোরুনালো নখকিরণলসৎকেসরালীকরালঃ
প্রত্যগ্রালক্তকাভা-প্রসর-কিশলয়ো মঞ্জুমঞ্জীর-ভৃঙ্গঃ।
ভর্তুর্নৃত্তানুকারে জয়তি নিজ-তনু-স্বচ্ছ-লাবণ্য-বাপী
সম্ভূতাম্ভোজশোভাং বিদধদভিনবো দণ্ডপাদো ভবান্যাঃ॥[১]

হরপার্বতীকে অবলম্বন করিয়া আর অনেকগুলি শ্লোক পাওয়া যায় 'প্রশ্নোত্তরে'র। এই 'প্রশ্নোত্তর' শ্লোক বিষ্ণু-লক্ষ্মী বা রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও কিছু কিছু পাওয়া যায়— বেশিই পাওয়া যায় হর-পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া। এ-জাতীয় প্রশ্নোত্তরের বৈশিষ্ট্য হইল বক্রোক্তি এবং শ্লেষোক্তির সাহায্যে প্রশ্নকারীকে উত্তরকারীর নির্বাচনীকরণের চেষ্টা। বচন-চাতুর্যই এখানে সর্বাধিক আস্বাদনীয়, যদিও সেই বচন-চাতুর্যের ভিতর দিয়া হর-গৌরীর জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিকও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

কস্মাৎ পার্বতি নিষ্ঠুরাসি সহজঃ শৈলোদ্ভবানাময়ং
নিঃস্নেহাসি কথং ন ভস্মপুরুষঃ স্নেহং বিভর্তি ক্বচিৎ।
কোপস্তে ময়ি নিষ্ফলঃ প্রিয়তমে স্থাণৌ ফলং কিং ভবেদ্
ইত্থং নির্বচনীকৃতো গিরিজয়া শম্ভুশ্চিরং পাতু বঃ॥[২]

শম্ভু পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন তুমি নিষ্ঠুর, হে পার্বতি?' পার্বতী উত্তর করিলেন, '(প্রস্তরদেহ) পর্বত হইতে যাহার উৎপত্তি তাহার পক্ষে তো ইহাই সহজ।' শম্ভু বলিলেন, 'তুমি স্নেহহীন কেন?' উত্তর হইল, 'ভস্মপুরুষ তো কখনও স্নেহ (স্নেহপদার্থ) ধারণ করে না।' শম্ভু বলিলেন, 'আমাতে তোমার কোপ সবই নিষ্ফল': উত্তর হইল, 'স্থাণুতে আর (স্থাণু=মহাদেব; স্থাণু=অচল) কি ফল হইবে?' এই ভাবেই গিরিজা কর্তৃক শম্ভু নির্বচনীকৃত হইলেন।

আবার—

স্বেদস্তে কথমীদৃশঃ প্রিয়তমে তন্নেত্রবহ্নের্বিভো
কস্মাদ্ বেপিতমেতদিন্দুবদনে ভোগীন্দ্রভীতের্ভব।
রোমাঞ্চঃ কথমেষ দেবি ভগবন্ গঙ্গাম্ভসাং শীকরৈর্
ইত্থং ভর্তরি ভাবগোপনপরা গৌরী চিরং পাতু বঃ॥[৩]

গৌরীর ভাব-বিহ্বলতার জন্য নানাবিধ দেহ-বিকার দেখা দিয়াছে; তাহা লক্ষ্য করিয়া মহাদেব বলিতেছেন, 'প্রিয়তমে, তোমার এমন ঘাম কেন?' গৌরী বলিলেন, 'হে বিভো, তোমার নেত্রবহ্নির জন্য।' প্রশ্ন হইল, 'হে ইন্দুবদনে, তোমার এত কম্প কেন?' উত্তর হইল, 'হে ভব, সর্পভয়ে।' 'হে দেবি, এত রোমাঞ্চ কেন?' 'ভগবান্, গঙ্গাজলের কণা দ্বারা।' এইভাবেই প্রিয়তমের নিকট হইতে সব ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন গৌরী।

ভারতীকবির একটি শ্লোকে দেখি—

কস্ত্বং শূলী মৃগয় ভিষজং নীলকণ্ঠঃ প্রিয়ে হহং
কেকামেকাং কুরু পশুপতি নৈব দৃশ্যে বিষাণে।

---

১ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

২ সুভাষিতরত্নকোষ; সদুক্তিকর্ণামৃতে ভোজদেবের নামে ধৃত।

৩ ঐ; সদুক্তিকর্ণামৃতেও ধৃত।

স্থাণুর্মুগ্ধে ন বদতি তরু র্জীবিতেশঃ শিবায়া
গচ্ছাটব্যামিতি হতবচাঃ পাতু বশ্চন্দ্রচূড়ঃ ॥

এখানে দেবী প্রশ্নকারিণী আর চন্দ্রচূড় হইলেন উত্তরদাতা। 'তুমি কে?' 'আমি শূলী (শূলধারী মহাদেব; অপরপক্ষে শূল-বেদনা আছে যাহার)।' 'তবে কিছু ঔষধের খোঁজ কর।' 'আমি নীলকণ্ঠ (শিব, ময়ূর)।' 'তবে একটি কেকাধ্বনি কর।' 'আমি পশুপতি (শিব, মৃগ)।' 'তোমার তো বিষাণ দুইটি দেখিতেছি না!' 'আমি স্থাণু (শিব, অচল বৃক্ষ)।' 'তরু তো কখনও কথা বলে না।' 'আমি শিবার (গৌরী, শৃগালী) প্রাণনাথ।' 'তবে তুমি বনে যাও।' শুধু শ্লেষার্থকে অবলম্বন করিয়াই দেবী এখানে চন্দ্রচূড়কে হতবাক্ করিলেন।

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই রসিকতারও নানা রকম আছে। একটি শ্লোকে অপর্ণা রসিকতা করিয়া অজ শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা তোমার পিতা-মাতা কোথায়?' হিমালয় নিজেই তো অপর্ণার পিতা, তিনি কোথায় এ প্রশ্নের দ্বারা পার্বতীও অসুবিধায় পড়িবেন মনে করিয়া শিব আবার পাল্টা অপর্ণাকে প্রশ্ন করিলেন,—'আচ্ছা বল তো, কোথায় থাকেন আমার শ্বশুর-শাশুড়ী!'

ক্ব তিষ্ঠতস্তে পিতরৌ মমেবে-
ত্যপর্ণয়োক্তে পরিহাসপূর্বম্।
ক্ব বা মমেব শ্বশুরৌ তবেতি
তামীরয়ন্ সস্মিতমীশ্বরো হব্যাৎ ॥[১]

আবার—

ন ক্রোধঃ ক্রিয়তাং প্রিয়ে স তু ভবন্মৌলিস্থ-গঙ্গোদরে
মুগ্ধে মানমপূজিতং ত্যজ কৃতং যুস্মন্নিয়োগদ্বয়ম্।
বক্ত্রে শ্লেষমমুং নিরাকুরু কদাহশ্লিষ্টোঽসি বক্ত্রে ময়া
বামাঙ্গ্যেতি হৃতোত্তরঃ স্মরহরঃ স্মেরাননঃ পাতু বঃ ॥[২]

শিব বলিলেন, 'হে প্রিয়ে, ক্রোধ করিয়ো না', দেবী উত্তর করিলেন, 'সে (ক্রোধ নামক দানব) তো তোমার মস্তকস্থিত (সতীন) গঙ্গার উদরে।' শিব বলিলেন, 'হে মুগ্ধে, তোমার এই অপূজিত মান পরিত্যাগ কর।' দেবী উত্তর করিলেন, 'তোমার নিয়োগদ্বয় পালন করিলাম (দেবী 'মানমপূজিতং ত্যজ'কে গ্রহণ করিলেন 'মা নম' অর্থাৎ 'নত হইয়ো না', এবং 'পূজিতং ত্যজ', অর্থাৎ 'পূজিতকে ত্যাগ কর' এই ভাবে)। শিব শ্লেষের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমার মুখে ঐ শ্লেষকে ছাড়'; দেবী বলিলেন, 'তুমি মুখে আমা কর্তৃক কখন অশ্লিষ্ট (আলিঙ্গিত) হইয়াছ?' নিরুত্তর শিব মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

---

১ শার্ঙ্গধরপদ্ধতি

২ তুলনীয়—

কিং গৌরি মাং প্রতি রুষা নমু গৌরহং কিং
কুপ্যামি কং প্রতি ময়ীত্যনুমানতোঽহম্।
জানামি সত্যমনুমানত এব স ত্ব-
মিথং গিরো গিরিভুবঃ কুটিলা জয়ন্তি ॥
সদুক্তিকর্ণামৃত, রুদ্র কবির।

'সুভাষিতাবলিতে'[১] একসঙ্গে পরম্পরাবদ্ধ বহু প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই। ইহা ঠিক প্রশ্নোত্তর নয়, শিব-পার্বতীর সংলাপ।

অয়ি সংপ্রসীদ পার্বতি শিবো হপি
তব পাদয়ো নিপতিতোঽহম্।
শিব ইতি কথং হি জল্পসি
সরুধিরগজচর্মসংবীত॥

শিব বলিলেন, 'অয়ি পার্বতি, প্রসন্না হও, আমি শিব হইয়াও তোমার পদযুগলে নিপতিত হইয়াছি।' দেবী বলিলেন, 'রক্তাক্ত গজচর্মে আচ্ছাদিত হইয়া নিজেকে শিব বলিতেছ কেন?'

শিব ইতি যদি তব গদিতে
দ্বিগুণো রোষো ভবাম্যহং স্থাণুঃ।
স্থাণুরসি সত্যমেতচ্চেতসি
ভবতো ন কিঞ্চিদপি॥

শিব বলিলেন, 'শিব এই কথা বলিলে যদি তোমার দ্বিগুণ রোষ হয়, তাহা হইলে আমি স্থাণু।' দেবী বলিলেন, 'তুমি স্থাণু এ কথা সত্য; কারণ তোমার চিত্তে কিছুই নাই।'

ত্যজ রুষমবেহি মানিনি
মামীশ্বরমর্চিতং ত্রিভুবনস্থ।
ত্র্যম্বক যদীশ্বরস্ত্বং
নগ্নঃ কিং ধূলিধূসরিতঃ॥

শিব বলিলেন, 'হে মানিনি, রোষ ত্যাগ কর, আমাকে ত্রিভুবনের অর্চিত ঈশ্বর বলিয়া জানিয়ো।' দেবী বলিলেন, 'হে ত্র্যম্বক, তুমি যদি ঈশ্বরই, তবে এমন নগ্ন এবং ধূলিধূসরিত কেন?'

সম্প্রতি কিমত্র বক্ষ্যসি
পশুপতিরেষো হস্মি পাণ্ডুরকপোলে।
পশুপতিরেব ন গণয়সি
যুক্তাযুক্তানি যস্মাত্ত্বম্॥

শিব বলিলেন, 'হে পাণ্ডুকপোলে, আমি পশুপতি। সম্প্রতি এ-বিষয়ে তুমি কি বল?' দেবী বলিলেন, 'পশুপতিই বটে, যেহেতু তুমি যুক্তাযুক্ত কিছুই গণনা কর না।'

মুগ্ধে ভ্রমসি কিমেবং
সত্যমিমং মাং ভবং বিজানীহি।
সত্যং ভবো হসি শঠ হে
যেনাতিবিচিত্ররূপো হসি॥

'হে মুগ্ধে, কেন তুমি এমন ভ্রম করিতেছ? সত্যই এই আমাকে ভব বলিয়া জান।' 'হে শঠ, তুমি সত্যই ভব, যে-কারণে তুমি অতিবিচিত্ররূপ!'

১ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার। ২ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার। ৩ পিটার্সন্ সম্পাদিত।

পণ্ডিতবাদস্তব যদি
লোকে হ্যহং ত্র্যম্বকো বিদিত এষঃ।
অম্বা হ্যেকাপি ন তে
প্রজল্পসি ত্বং কুতস্তিস্রঃ॥

'এত যদি তোমার পণ্ডিতবাদ, এই আমি লোকে ত্র্যম্বক নামে বিদিত।' 'তোমার অম্বা (মা) তো একটিও নাই, তিনটির কথা কোথা হইতে বলিতেছ?'

বাদো মহানিহৈব হি তথা
বিজানীহ্যনঙ্গদহনং মাম্।
দগ্ধমিদমঙ্গমঙ্গং
ত্বয়া মমৈবেদৃশৈশ্চরিতৈঃ॥

'এখানে আরও একটি বড় কথা আছে, আমাকে তুমি অনঙ্গ-দহন বলিয়া জানিয়ো।' 'তোমার এইরূপ চরিতের দ্বারা তোমা কর্তৃক আমারই প্রতি অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে।'

এইসকল কলহালাপের মূল কারণ হইল মহাদেবের সন্ধ্যাকে প্রণামরূপ অপরাধ; সেই দোষ-ক্ষালনের জন্যই যত অনুনয়। এই অনুনয় দেখিতেছি শেষপর্যন্ত সফল হইয়াছে, দেবী আলিঙ্গনের দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা ব্যঞ্জিত করিয়াছেন।—

সন্ধ্যাপ্রণামদোষাদ্ যো হ
ন্থনয়তি তং বিজিত্য পার্বত্যা।
আলিঙ্গিতশ্চ সরভসমুরসা
বৈ হরন্তু দুরিতং বঃ॥

হরপার্বতীর এই-জাতীয় বাগ্-বিতণ্ডা আরও অনেক লক্ষ্য করিতে পারি। বাণভট্টের সমসাময়িক শ্রীময়ূর কবির রচিত এই জাতীয় একটি বাগ্-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। এখানে হরপার্বতী পাশা খেলিতে বসিয়াছেন, পাশা খেলা লইয়াই সব কথা।

বিজয়ে কুশলস্ত্র্যক্ষো
ন ক্রীড়িতুমহমনেন সহ শক্তা।
বিজয়ে কুশলো হস্মি ন তু
ত্র্যক্ষোঽক্ষদ্বয়মিদং পাণৌ॥

পার্বতী সখী বিজয়াকে বলিতেছেন, 'হে বিজয়ে, (পাশাখেলায়) ত্র্যক্ষ (ত্রি-অক্ষিযুক্ত শিব) কুশল, আমি ইঁহার সহিত খেলা করিতে সক্ষম নই।' শিব বলিলেন, 'আমি বিজয়ে (সমর-বিজয়ে, হে বিজয়ে,) কুশল ঠিকই, কিন্তু আমি তো এখন ত্র্যক্ষ নই, অক্ষদ্বয়ই আমার হাতে আছে।'

কিং মে দুরোদরেণ প্রযাতু
যদি গণপতির্ন তে হভিমতঃ।
কঃ প্রদ্বেষ্টি বিনায়কমহিলোকঃ
কিং ন জানাসি॥

পার্বতী বলিলেন, 'এই দুরোদর (পাশা) দিয়া কি হইবে— যাউক' ; 'দুরোদর' শব্দে শিব বুঝিলেন লম্বোদর গণেশকে— 'যদি গণেশ তোমার অভিমত না হয় (তবে তাহাই হোক)।' গৌরী আবার উত্তর দিলেন, 'সর্প সন্ধান করে এমন কোন্ ব্যক্তি বিনায়ককে (গণেশকে, পক্ষে মণিহীনকে অর্থাৎ, মণিহীন সর্পকে ? নায়ক অর্থ এখানে হারের মধ্যমণি, অর্থাৎ মণি) দ্বেষ করে তাহা কি তোমার জানা নাই ?'

বসুরহিতেন ক্রীড়া ভবতা সহ
কীদৃশী ন জিহ্রেষি।
কিং বসুভিন্নমতোঽমূন্
সুরাসুরানেব পশ্য পুরঃ॥

দেবী বলিলেন, 'ধনহীন তোমার সঙ্গে আর কি রকম খেলা— তোমার কি লজ্জা করে না ?' শিব বলিলেন, 'বসুভিন্ন' (ধনহীন, অনুচরহীন) কি বল,— সম্মুখে ঐসব সুরাসুরকে দেখ।'

চন্দ্রগ্রহণেন বিনা নাস্মি রমে
কিং প্রবর্তয়স্যেবম্।
দেব্যৈ যদি রুচিতমিদং
নন্দিন্নাহূয়তাং রাহুঃ॥

দেবী বলিলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ ব্যতীত, অর্থাৎ চন্দ্রকে খেলায় বাজি না রাখিলে, আমি আর খেলিব না ; কেন আর খেলায় এ-রূপ অগ্রসর হইতেছ ?' শিব বলিলেন, 'দেবীর যদি তাহাই ভালো লাগে (অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ভালো লাগে) তবে হে নন্দিন্, তুমি রাহুকে ডাকিয়া আন।'

হা রাহৌ নিকটস্থে সিতদ্রংষ্ট্রে
ভয়কৃতি রতিঃ কস্য।
যদি নেচ্ছসি তত্ত্যক্তঃ
সংপ্রত্যেবৈষ হারাহিঃ॥

দেবী বলিলেন, 'হায়, সিতদ্রংষ্ট্র ভয়ংকর রাহু নিকটস্থ হইলে কাহার তাহাতে ভালো লাগে ?' উত্তরে শিব 'হা রাহৌ' পদদ্বয়কে 'হারাহৌ' (সাপের হার) রূপে একপদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, —'যদি তুমি তাহা ইচ্ছা না কর তবে এই এখনই এই সাপের হার ত্যাগ করিলাম।'

আরোপয়সি মুধা কিং
নাহমভিজ্ঞা তদঙ্কস্য।
দিব্যং বর্ষসহস্রং স্থিত্বৈবং
যুক্তমভিধাতুম্॥

দেবী বলিলেন, 'আমার বাক্যে তুমি ভুল অর্থ আরোপ করিতেছ কেন ? তোমার সেই অঙ্ক (বলয়াদি ভূষণ) সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ নহি।' শিব বলিলেন, 'দিব্য সহস্রবর্ষ, এইখানেই (অঙ্কে—কোলে) থাকিয়া এ কথা বলা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।'

পশুপতির সহিত এইরূপ বক্রোক্তির ফলে হর্ষবশে দেবীর আঁখির তারকা তরল হইয়া তাঁহার আননশ্রীকে বর্ধিত করিয়া তুলিল।

আর-একরূপ প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই পার্বতী ও লক্ষ্মীর মধ্যে— পরস্পরের সৌভাগ্যের তুলনা অবলম্বনে নারীজনোচিত সম্ভাষণে। একটি শ্লোকে দেখি—

ভিক্ষুঃ ক্বাস্তি বলের্মখে পশুপতিঃ কিং নাস্ত্যসৌ গোকুলে
মুগ্ধে পন্নগভূষণঃ সখি সদা শেতে চ তস্যোপরি।
আর্যে মুঞ্চ বিষাদমাশু কমলে নাহং প্রকৃত্যা চলা
চেত্থং বৈ গিরিজাসমুদ্রসুতয়োঃ সম্ভাষণং পাতু বঃ॥

সমুদ্রসুতা লক্ষ্মী গিরিজাকে বলিলেন, কোথায় 'ভিক্ষু' (ভিখারী শিব)? গৌরী লক্ষ্মীকে উত্তর দিলেন, 'বলির যজ্ঞে' (বিষ্ণুর বামন অবতারে বলি রাজার যজ্ঞে ভিক্ষু হইয়াছিলেন)। লক্ষ্মী বলিলেন, 'কোথায় পশুপতি'? গৌরী বলিলেন, 'তিনি কি গোকুলে নাই!' লক্ষ্মী বলিলেন, 'তোমার স্বামী সর্পভূষণ'। গৌরী বলিলেন, 'তোমার স্বামী তো তাহার উপরে (শেষনাগের উপরে) সর্বদাই শুইয়া আছেন।' লক্ষ্মী শ্লেষ-সহকারে বলিলেন, 'আর্যে, বিষাদ ত্যাগ কর।' এখানে বিষাদ কথার লক্ষ্য দুইটি, একটি খেদ, অপরটি বিষ খান যিনি সেই 'বিষাদ' শিব। গৌরী উত্তর দিলেন, 'হে কমলে, আমি তো প্রকৃতিতেই 'চলা' (চঞ্চলা, পক্ষে লক্ষ্মী) নহি!'

অনুরূপ আর-একটি শ্লোকে দেখি—

ভিক্ষার্থী স ক্ব যাতঃ সুতনু বলিমখে তাণ্ডবং ক্বাদ্য ভদ্রে
মন্যে বৃন্দাবনান্তে ক্ব নু স মৃগশিশু নৈব জানে বরাহম্।
বালে কচ্চিন্ন দৃষ্টো জরঠবৃষপতি র্গোপ এবাস্য বেত্তা
লীলা-সংলাপ ইত্থং জলধি-হিমবৎ-কন্যয়ো স্ত্রায়তাং বঃ॥

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গেল সেই ভিক্ষু?' পার্বতী উত্তর দিলেন, 'বলির যজ্ঞে।' লক্ষ্মী বলিলেন, 'কোথায় হইবে আজ তাণ্ডব?' পার্বতী উত্তর দিলেন, 'মনে হয়, বৃন্দাবনের প্রান্তে।' লক্ষ্মী বলিলেন, 'কোথায় সেই মৃগশিশু?' পার্বতী বলিলেন, 'বরাহের (বিষ্ণু-বরাহের) কথা আমি জানি না।' লক্ষ্মী বলিলেন, 'সেই জীর্ণবৃষপতিকে তুমি কি কোথাও দেখ নাই?' পার্বতী বলিলেন, 'গোপেরাই তাহার সন্ধান জানে।'

আমরা উপরে কালিদাসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবির রচিত বহু কবিতা উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী পার্বতী কি ভাবে অঙ্কিতা হইয়াছেন তাহার একটু বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা করিলাম। কবিতাগুলির অনেক কবিতা অজ্ঞাতনামা কবিগণ কর্তৃক রচিত, সুতরাং এইগুলির রচনাকাল স্থির করিবার উপায় নাই। অনেক কবিতা ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে পাওয়া যায় বলিয়া এই কবিগণ দ্বাদশ শতকের এবং তৎপূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়, তৎপরবর্তী নহেন। ভাসের নামে যে দুই-একটি শ্লোক পাইতেছি তাহা যদি প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভাসের হয়, তবে কালিদাসের পূর্ববর্তী রচনাও কিছু কিছু পাইতেছি।

উপরের আলোচনা লক্ষ্য করিলে আমাদের পূর্বোক্ত মতই সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হইবে যে,

সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেবীর অসুরনাশিনী মূর্তির তেমন প্রসিদ্ধি বা জনপ্রিয়তা নাই; সেখানে প্রাধান্য বিচিত্রভাবে বর্ণিতা দেবীর মধুর-রসাশ্রিতা মূর্তির। দেবীর অসুরনাশিনী রূপ যে একেবারেই পাওয়া যায় না তাহা নহে, সমগ্র সংস্কৃত সংকলন-গ্রন্থগুলির ভিতরে চারি-পাঁচটি শ্লোকে মাত্র তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমরা বাঙলা সাহিত্যে এবং অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তরের প্রসঙ্গেই এত আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলাম। আশা করি আমাদের এই আলোচনার ভিতর দিয়া আমাদের উক্তি স্পষ্টভাবে সমর্থিত হইয়াছে যে, দেবীর মানবীয় রূপায়ণ দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভাষা-সাহিত্যে আসিয়াই ঘটে নাই— তাহার সহস্র বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত কবিগণও দেবীকে আমাদের সমাজ-জীবন এবং গার্হস্থ্যজীবনের পটভূমির উপরেই বিচিত্রবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। মুখ্য পার্থক্য হইয়াছে এই যে, সংস্কৃত কবিগণ প্রায় সকলেই সমাজের উচ্চকোটি-সম্ভূত এবং অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এই জন্য দেবীকে অবলম্বনে সেখানে সমাজের নিম্নস্তরের চিত্র পাই কম। দেবীর দুঃখ-দারিদ্র্যময় সংসারের যে চিত্র পাই তাহা অনেক স্থানে প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, ঠিক বাস্তব সংসারের বর্ণনা নয়। কিন্তু বাঙলার এবং অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের কবিগণ সমাজের সকল স্তর হইতেই উদ্ভূত, তাই তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের যুগের নিজেদের সমাজ ও পরিবারের চিত্র দেবীকে অবলম্বন করিয়াই জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কবি রামেশ্বরের শিবায়নে বর্ণিত দরিদ্র কৃষকপত্নী পার্বতী যে কৃষকস্বামীর নিকটে আর কিছু নয় শুধু দুই হাতের দুই গাছি শাঁখার জন্য আব্দার জানাইয়াছিলেন তাহা কালিদাস শ্রীহর্ষ রাজশেখর— এমনকি উমাপতিধরের বর্ণিত দুর্গার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। অবশ্য আশ্চর্যভাবে একটি শ্লোক শুধু লক্ষ্য করিতে পারি যেখানে দেবী শিবকে ত্রিশূল ভাঙিয়া লাঙল গড়িয়া হাল চাষ করিতে বলিয়াছেন।—

রামাদ্ যাচয় মেদিনীং ধনপতে বীজং বলাল্লাঙ্গলং
প্রেতেশান্মহিষং তবাস্তি বৃষভঃ ফালং ত্রিশূলং তব।
শক্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দো হস্তি গোরক্ষণে
খিন্নাহং হর ভিক্ষয়া কুরু কৃষিং গৌরীবচঃ পাতু বঃ॥

গৌরী শিবকে বলিতেছেন, 'রামের (পরশুরামের) নিকট হইতে তুমি কিছু ভূমি মাগিয়া লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বীজ, আর বলরামের নিকট হইতে লাঙল; প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার নিজেরই তো বৃষ রহিয়াছে— আর তোমার ত্রিশূলই তো ফাল; আমি নিজে তোমাকে (মাঠে) অন্ন দিয়া আসিতে পারিব; স্কন্দ গোরক্ষণে শক্ত; হে হর, ভিক্ষায় আমি খিন্ন, তুমি এইবারে কৃষি কর।'

বাঙলা সাহিত্যের শিবায়নে আমরা গৌরীর শিবের প্রতি যে অনুরোধ দেখি এই শ্লোকটির প্রত্যেক কথার সহিত তাহার মিল রহিয়াছে। পুরাণাদির মধ্যেও শিবের কৃষকরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্র শিবের শস্যের সহিত যোগ যজুর্বেদেই লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন করিয়াই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; ইহার ভিতরে কবির সমসাময়িক যুগের স্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্লোকটি আধুনিক-সংকলন 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারে' ধৃত, কবির নাম নাই; সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ণয় করিবারও সুযোগ নাই; তবে শ্লোকটি অর্বাচীন কালে লিখিত বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের বিশিষ্ট ছাপ না পড়িলেও

দেবীর মানবীকরণ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ নাই। সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কালিদাসই দেবীকে তাঁহার 'কুমারসম্ভব' কাব্যে অনেকখানি স্থান দিয়াছেন; তাই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজ-চিত্রের যে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু অন্যান্য কবিগণ দেবী সম্বন্ধে কেহও কোনো কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহারা তাঁহাদের রচিত বিবিধ ধরণের কাব্যের ভিতরে নমস্কার-শ্লোক বা আশীর্বচন রূপেই এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন। একে প্রকীর্ণরূপে রচিত, তদুপরি একটা প্রথাবদ্ধতার প্রভাবে লিখিত; সুতরাং যুগসমাজের স্পষ্ট প্রভাব এখানে আশা করিতে পারি না। কিন্তু এইসব শ্লোকের মধ্যে দেবীর পূর্বরাগ, বিবাহ, নবোঢ়ারূপ, নব-সম্ভোগ, প্রেম-কৌটিল্য, মান অভিমানের যে বর্ণনা পাই তাহার আস্বাদনে সর্বদাই যে মানবীয় রসের প্রাধান্য তাহা অবশ্যস্বীকার্য। মানবীয় দাম্পত্য প্রেমকেই তাহার সকল রূপে হরগৌরীর ভিতর দিয়া কবিগণ রূপায়িত করিয়াছেন— পাঠক-সাধারণের আস্বাদনের ভিতরেও সেই মানবীয় প্রেমরসেরই প্রাধান্য। কতগুলি শ্লোকের মধ্যে যে গার্হস্থ্য চিত্র ফুটিয়াছে চিত্র হিসাবে স্থানে স্থানে তাহাকে নিখুঁত বলা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। মানবীয় ছাঁচে ঢালিয়া যুগলপ্রেমের বর্ণনা পরবর্তী কালে আমরা বিশেষভাবে পাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই রাধা-কৃষ্ণের ধারাটির সমৃদ্ধি অনেক পরবর্তী কালে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকও আমরা পাই বটে,[১] কিন্তু তাহার অধিকাংশই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক বা তাহার কাছাকাছি সময়ে লিখিত। সেই কারণে মনে হয় রাধা-কৃষ্ণের যুগলপ্রেমের অনেক বর্ণনা হরপার্বতীর যুগলপ্রেমের বর্ণনা হইতে গৃহীত। আমরা পার্বতীর যে খণ্ডিতা রূপ দেখিয়াছি, সেই খণ্ডিতা নায়িকার রোষপ্রশমনের জন্য পদানত নায়কের যে প্রেমাকুলতা দেখিয়াছি তাহাকেই স্থানে স্থানে পরবর্তী কালের রাধার খণ্ডিতারূপ ও রাধার ক্রোধপ্রশমনের জন্য পদানত কৃষ্ণের অনুনয় প্রকাশ প্রভৃতির প্রাক্-রূপ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে— আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে আসলে হরপার্বতীর প্রেম বা রাধাকৃষ্ণের প্রেম বলিয়া বিশিষ্ট কোনো জিনিস নাই; আসল জিনিস হইল ভারতীয় কবি-মনে ধৃত ভারতীয় প্রেম। এই প্রেমের প্রকাশে কবি-মনের কতগুলি বিশেষ প্রবণতা ও ভঙ্গি ছিল; সেই প্রবণতাই হরপার্বতীকে অবলম্বন করিয়া এবং পরবর্তী কালে রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

---

১ দ্র' লেখকের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থ।

স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ ? - ১৯৩২

রথীন্দ্রনাথ রায়

স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যসাধনার অধ্যায়টি আজ বাংলাসাহিত্যের এক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী মাত্র। তাঁর সাহিত্যজীবনের এক কোটিতে বঙ্কিমচন্দ্র, আর-এক কোটিতে রবীন্দ্রনাথ। এই দুই মহৎ প্রতিভার রশ্মিচ্ছটায় স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যকীর্তি স্বভাবতই স্মৃতি ও শ্রুতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাহিত্যজীবন ছাড়াও তাঁর একটি বৃহত্তর সামাজিক জীবন ছিল। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাগরণের সেই প্রথম যুগে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা, 'সখীসমিতি' ও 'মহিলা শিল্পমেলা'র প্রতিষ্ঠা স্বর্ণকুমারীর জীবনের প্রধান কীর্তি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে (কলকাতা) স্বর্ণকুমারীই একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর এই কর্মবহুল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তৎকালীন নারী-জাগরণের একটি মূল্যবান অধ্যায়। কিন্তু, সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারীর এ যুগের সম্ভবত একমাত্র পরিচয় 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবেই। অবশ্য, বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'ভারতী' শুধু একটি পত্রিকাই নয়, বাংলা সাহিত্যের একটি কীর্তিভাস্বর পর্বও বটে। স্বর্ণকুমারীর রচনাগুলি আজ পত্রিকাটির ঐতিহাসিক খ্যাতির আড়ালে সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচকের কাছে স্বর্ণকুমারীর রচনাগুলির তাৎপর্য কম নয়। কোনো কোনো রচনার সাহিত্যিক মূল্যের কথা বাদ দিলেও, তাঁর রচনাবলীতে বাংলা-সাহিত্যের যে বিচিত্র যুগলক্ষণ আত্মপ্রকাশ করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

স্বর্ণকুমারীর রচনাবলীর পরিধি ও বৈচিত্র্য কম নয়। উপন্যাস ছোটগল্প গাথা গীতিকবিতা নাটক-প্রহসন ও বিবিধ গদ্যরচনা প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ তাঁর অজস্র দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসের পরিধিই সর্বাধিক। স্বর্ণকুমারীর ঔপন্যাসিক প্রতিভা প্রধানত বঙ্কিমযুগের ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক— দু শ্রেণীর উপন্যাসেই এ যুগের বাংলা উপন্যাসের যুগলক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর সর্বপ্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) ঐতিহাসিক উপন্যাস। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রধানত দুটি ধারা সক্রিয় ছিল— ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস ও সমাজসমস্যামূলক পারিবারিক উপন্যাস। উনিশ শতকীয় বাংলা উপন্যাসের দুটি ধারারই প্রাণপুরুষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমপর্বের কথাসাহিত্যের নবনির্মিত পথে যাঁরা সেদিন যাত্রা শুরু করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এই যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে দুটি দিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। ইতিহাসের মধ্যে জাতীয়জীবনের শৌর্য-বীর্য-গৌরবকে এই যুগের কবি ও কথাসাহিত্যিকেরা নূতন করে আবিষ্কার করেছিলেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপনার এই আবেগ-চঞ্চল মুহূর্তে অতীত ইতিহাসের সংঘাতময় অধ্যায়-গুলিকে নূতন ভাব-সত্যে রঞ্জিত করা হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি-প্রসঙ্গে এই যুগের দেশ-কালের বিশেষ ভাবপ্রবাহটির কথা মনে রাখতে হবে। দেশাত্মবোধ ছাড়াও এই যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতারা ইতিহাসের মধ্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রোমান্স-রস আবিষ্কার করেছিলেন।

ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের প্রতি এই আকর্ষণের মধ্যে নিগূঢ় কারণ ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভাবাদর্শের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে বাঙালির মানসজীবনে যে অভিনব রোমান্স-রসের তৃষ্ণা জেগেছিল, ইতিহাসের সুদূরপ্রসারী বর্ণময় পটভূমিকা, বীরোচিত মুহূর্তের রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা ও কুহেলিকামণ্ডিত অতীতযুগের কাহিনী-রস স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পরিতৃপ্ত করেছিল।

'দীপনির্বাণ' উপন্যাসের উপহার-পত্রে স্বর্ণকুমারী তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মূল অভিপ্রায়টিকে নির্দেশ করেছেন—

আর্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি',
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙেছে কপাল।

রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতায়, বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকে বীরযুগ (Heroic age) ও দেশপ্রেমের যে উদ্দীপনাময় বর্ণোজ্জ্বল রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে তারই ছায়াপাত ঘটেছে। 'দীপনির্বাণে'র কেন্দ্রীয় ঘটনা হল মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৃথ্বীরাজের পরাজয় কাহিনী। সেই কাহিনীর সঙ্গে চিতোর-রাজের পারিবারিক জীবনের আখ্যায়িকা সংযুক্ত হয়ে কাহিনীকে জটিল করে তুলেছে। 'দীপনির্বাণ' স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস। কাহিনীবিন্যাসে ও চরিত্রসৃষ্টিতে বহু অপরিণতির চিহ্ন আছে। ইতিহাস ও কল্পনার ভারসাম্য মোটেই রক্ষিত হয় নি। বহু অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণায় কাহিনীর মূল লক্ষ্য দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে, চরিত্রগুলিও নির্জীব নিষ্প্রাণ পুতুল মাত্র। 'দীপনির্বাণ' কাঁচা হাতের লেখা হলেও তখনকার কালে প্রশংসিতও হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলেই মনে করেছিলেন[১]।

'মিবাররাজ' (১৮৮৭) ও 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাস দুটির মূল কাঠামোটি টডের রাজস্থানের ইতিহাস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 'মিবাররাজ' উপন্যাসটিকে 'বিদ্রোহ' উপন্যাসের ভূমিকা বলা যায়।—একই কাহিনীর যেন দুটি অংশ। ভীল ও রাজপুতদের সম্পর্ক ও বিরোধের কাহিনী এই দুটি উপন্যাসের প্রধান ঐক্যসূত্র। 'মিবাররাজ' উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত, বিশ্লেষণের চেয়ে বিবৃতি এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। রাজপুত্র গুহা, ভীলরাজ মন্দালিক ও ভীলরাজপুত্র উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র। গুহা ও ভীলপুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কিরূপে ধীরে ধীরে জাতিগত বিরোধের ভিত্তি প্রশস্ত করেছিল তারই আভাস উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়। 'মিবাররাজ' উপন্যাস তথ্যবিন্যাসে ও ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায় নিঃসন্দেহে 'দীপনির্বাণে'র চেয়ে পূর্ণতর প্রতিশ্রুতির পরিচয় দেয়। আসলে 'মিবাররাজ' একটি বিবৃতিসর্বস্ব ছোটগল্প, পরবর্তী উপন্যাস 'বিদ্রোহে'র কথামুখ মাত্র। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসের ঘটনা দুই শত বৎসর পরবর্তীকালের। পূর্ববর্তী উপন্যাসের মত এখানেও ভীল ও রাজপুত-বিরোধের কাহিনী

১ 'দীপ-নির্বাণ' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুন মামার রচনা। তিনি লিখিলেন, 'জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?' কৈফিয়ৎ: হিরণ্ময়ী দেবী, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।

বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করতে হলে পরবর্তী উপন্যাসটিকে স্বর্ণকুমারীর একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলা যায়। এই উপন্যাসে তিনি সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সোনার কাঠির সন্ধান পেয়েছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস -বিচারে ইতিহাস ও কল্পনা— কার অধিকার কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এ বিষয়ে নানা বিতর্ক ও মতভেদের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার স্থান আছে এবং সে স্থানটি নিতান্ত গৌণও নয়। কিন্তু সেই কল্পনার মধ্যেও একটি বিশেষ ধরণের নিয়ন্ত্রণ আছে, কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস কল্পনার নিজস্ব মহিমা দেখানোর ক্ষেত্র নয়। ঐতিহাসিক যুগজীবন ও পটভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রের উদ্ভাবন করা উচিত। কিন্তু ইতিহাস ও কল্পনার মধ্যে এই জাতীয় সামঞ্জস্যবিধান করা উচ্চাঙ্গের শিল্পশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। ইতিহাসের ক্ষীণসূত্র অবলম্বন করে উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত কল্পনাবিলাস এ যুগের অধিকাংশ গদ্য আখ্যায়িকার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোনো গুণই তাদের ছিল না। ১৮৭৫-১৯০০ পর্যন্ত কালের অধিকাংশ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামাঙ্কিত গ্রন্থ এই পর্যায়েই পড়ে। জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী আশ্রয় করে এ যুগের কথাসাহিত্যিকেরা স্বেচ্ছাচারী কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তার ফলে, ঐতিহাসিক তথ্য -সন্নিবেশ সম্পর্কে তাঁরা যেমন নিরঙ্কুশ হয়েছেন, তেমনি সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসমূলক 'কাল্পনিকতা' তাঁদের বাস্তব-পরিমিতিবোধকে আচ্ছন্ন করেছে।

স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ভীল রাজপুত বিরোধের কার্যকারণ সম্পর্ককে এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বংশগত শত্রুতা ও প্রতিহিংসাবৃত্তির প্রচ্ছন্ন স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে তরুণ রাজা নাগাদিত্যের প্রতি আনুগত্যবোধ— ভীলজাতির এই জটিল ও মিশ্র মনোভাব উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। জঙ্গুর বৈরনির্যাতন -সংকল্প ও জুমিয়ার নাগাদিত্যের প্রতি স্নেহপ্রীতির আকর্ষণ— এই দুই বিপরীত প্রবাহ কাহিনীটিকে আবর্তচঞ্চল করে তুলেছে। নাগাদিত্য ও সুহারের প্রেমকাহিনীটির সূক্ষ্ম সুকুমার রূপটিকে লেখিকা সতর্কতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এই অভিশপ্ত প্রেম যেমন রাজার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করেছে, তেমনি ভীলদের প্রতিহিংসাকে বহ্নিমান করে তুলেছে। নাগাদিত্যের পারিবারিক জীবন ও বৃহত্তর রাষ্ট্রবিপ্লবকে একই সূত্রে আবদ্ধ করে লেখিকা ঐতিহাসিক উপন্যাসকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে, কিন্তু এখানে চরিত্রগুলির সম্পর্কবৈচিত্র্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। পর্যবেক্ষণদক্ষতায়, বিশ্লেষণনৈপুণ্যে এবং ইতিহাস ও কল্পনার সুষম সমন্বয়ে 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি সে যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

'ফুলের মালা' (:৮৯৪) উপন্যাসটির ঐতিহাসিক অংশটি অপেক্ষাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ, কিন্তু রোমান্সের আতিশয্য ঔপন্যাসিক মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছে। চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলাদেশ উপন্যাসটির পটভূমিকা রচনা করেছে। বঙ্গেশ্বর সেকেন্দার শাহ ও যুবরাজ গিয়াসুদ্দিন— পিতাপুত্রের বিরোধ-কাহিনী উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। উপন্যাসের এই মূল ধারার সঙ্গে দিনাজপুরের রাজবংশের কাহিনীকে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মূলকাহিনীর সঙ্গে শাখাকাহিনীর গ্রন্থন তেমন নিবিড় নয়। গণেশদেব বা গিয়াসুদ্দিন, দুজনের কারও পারিবারিক জীবনের ছবি তেমন পরিস্ফুট হয় নি। চরিত্রগুলিও রোমান্সের কুয়াশায় আবৃত। মোট কথা

পূর্ববর্তী উপন্যাস 'বিদ্রোহে' স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, 'ফুলের মালা' উপন্যাসে তা সর্বাংশে রক্ষিত হয় নি।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাস -প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্বর্ণকুমারী বঙ্কিম-প্রভাবিত যুগের ছত্রছায়ায় বসে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় মানবজীবনের যে সুগভীর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কবিকল্পনার উত্তাপে তথ্যাশ্রয়ী ইতিহাসকে বিগলিত করে বিশেষ 'সত্য'কেই পরিবেশন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস গবেষণা শুরু হয়েছে মাত্র, তাই উপন্যাসরচনায় ঐতিহাসিক তথ্য ও যাথার্থ্য রক্ষা করা এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের ছিন্নসূত্রগুলিকে কল্পনার সাহায্যে এমনভাবে সংযোগ করেছেন যা অধিকাংশ স্থলেই ইতিহাসানুগ হয়ে একটি 'ঐতিহাসিক রস' সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "· ·লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।"[১] বঙ্কিমচন্দ্র এই বিশেষ রসের অবতারণায় সার্থকতা লাভ করেছেন। তাই তিনি ইতিহাসের কলকোলাহলের সঙ্গে বাঙালির পারিবারিক জীবনকে সূত্রান্বিত করে নূতন ধরণের রোমান্স সৃষ্টির পথনির্দেশ করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের নির্দেশ ও প্রেরণা নিয়েই উপন্যাস রচনা শুরু করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত কল্পনাপ্রসারতা ও সৃষ্টিক্ষমতা তাঁর ছিল না, তাই তিনি ঐতিহাসিক যাথার্থ্য ও তথ্য সন্নিবেশের দিকেই অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যভূমিকে ছেড়ে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ'-এর ইতিহাস-অংশ অপেক্ষাকৃত গৌণ, ইতিহাসকে আশ্রয় করে তিনি পারিবারিক জীবনের রোমান্সকেই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'য় অতিরিক্ত তথ্যানুগত্য উপন্যাস-অংশকে দুর্বল করে ফেলেছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-সমৃদ্ধি বা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক যাথার্থ্য, কোনোটিই নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে যেন স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ভাষা ও বিশ্লেষণশক্তির দিক থেকে স্বর্ণকুমারী অনেক সময় রমেশচন্দ্রকে অতিক্রম করেছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া স্বর্ণকুমারী অনেকগুলি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির উপরেও গত শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। সে যুগের সামাজিক উপন্যাসও রোমান্সের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। তাই সামাজিক উপন্যাসের মধ্যেও রোমাঞ্চকর ও অলৌকিক ঘটনার অভাব ছিল না। দ্বিতীয়ত, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত বিতর্কবাহুল্যও অনেক সময়ে উপন্যাসের সহজ রস ও স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত করত। প্রথম শ্রেণীর চূড়ান্ত উদাহরণস্থল দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাসগুলি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্রুটি রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে খুব বেশি

---

১ ঐতিহাসিক উপন্যাস: 'সাহিত্য'।

পরিস্ফুট হয়েছে। মোটকথা, রোমাঞ্চকর অতি-নাটকীয় ঘটনা ও ধর্মসমাজ সম্পর্কিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা এ যুগের সামাজিক উপন্যাসগুলিকে সহজ ও স্বাভাবিক হতে দেয় নি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই যুগধর্মের এই প্রবল প্রবাহের মধ্যেও তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'ও সম্ভবত এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'ছিন্নমুকুলে' (১৮৭৯) অসম্ভব ও অতি-নাটকীয় ঘটনার অভাব নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাসের টেকনিকটিই সামাজিক উপন্যাসে প্রয়োগ করা হয়েছে। বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সমতলবাহিনী সহজ প্রবাহ এখানে অনুপস্থিত; চরিত্রগুলিও বৈচিত্র্যহীন— পূর্বাপর একই রকম উঁচু সুরে বাঁধা। 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮) 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা সংগত নয়, বরং অনেকটা সামাজিক উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত। হাজী মোহম্মদ মহসীনের জীবনবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে আখ্যায়িকাটি রচিত হয়েছে। কাহিনীটি শিথিলবিন্যস্ত, মূল ঘটনার সঙ্গে খাঁজাহান কাহিনীটির সম্পর্ক খুব নিবিড় নয়। তত্ত্বালোচনা ও দৈবশক্তির প্রাধান্য উপন্যাসটির সহজগতিকে বারবার রুদ্ধ করেছে। মহসীন যেন এক জ্যোতির্লোকের অধিবাসী, রক্তমাংসের মানবসত্তা ফুটে উঠতে পারে নি। বিবৃতিসর্বস্ব ঘটনা চরিত্রের অন্তর্জীবন ফুটিয়ে তুলতে কোনো সাহায্যই করে না, অথচ ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাব নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার টেকনিকেই স্বর্ণকুমারী তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস রচনা শুরু করেন।

সামাজিক উপন্যাসে নিজস্ব রীতির সর্বপ্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'স্নেহলতা' (প্রথম খণ্ড ১৮৯০; দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯৩) উপন্যাসে। শুধু তাই নয়, লেখিকা তৎকালীন সমাজচিত্র হিসেবে উপন্যাসটির মূল্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।[১] 'স্নেহলতা' উপন্যাসে জগৎবাবুর পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সামাজিক ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লেখিকার মতে উপন্যাসটি বঙ্গসমাজে আধুনিক চিন্তাধারার সূত্রপাতকালীন ছবি। উপন্যাসটির আরম্ভ মন্দ নয়, তৎকালীন পারিবারিক জীবনের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজ-সম্পর্কিত তর্কবিতর্ক ও তার বিবিধ সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করেছে, অনেকগুলি অনাবশ্যক চরিত্রও আছে। স্নেহলতার স্বামী মোহনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের দশ বছর পরের ঘটনা। এর কেন্দ্রীয় ঘটনা হল বিপত্নীক চারুর সঙ্গে বিধবা স্নেহলতার সম্পর্ক ও তার পরিণতি। প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের শিল্পগত মূল্য অনেক বেশি। প্রথম খণ্ডের মধ্যে অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্র অযথা জটিলতার সৃষ্টি করে কাহিনীর গতিকে কুয়াশাচ্ছন্ন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনীর বাহুল্যবর্জিত ঋজুগতি অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। মাঝে বিধবাবিবাহ ও সমাজসংস্কার নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে। স্নেহলতার প্রতি

---

১ 'নিবেদন' অংশে বলা হ'য়েছে (১৩১৪ ফাল্গুন): "অধুনা বঙ্গসমাজে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব, যেরূপ কার্যকলাপ শতস্রোতে প্রবাহিত— তাহারই পূর্বতন চিত্র, তাহারই সূত্রপাত উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে। অতএব যুগান্তর ব্যবধানে বর্তমানের সহিত অতীতের যে সন্ধি, নূতন চিত্রপাতে পুরাতনের যে অপূর্ব সৌসাদৃশ্য, এক কথায় কালপ্রবাহে সমাজের ভাব ও কার্যপরম্পরার যে ধারাবাহিক ক্রমাভিব্যক্তি স্নেহলতা পাঠে তাহা যদি নবীন পাঠক প্রত্যক্ষ করেন, তবেই লেখিকার গ্রন্থরচনা সার্থক।"

চারুর আকর্ষণ -বর্ণনার মধ্যে কোনো গভীর হৃদয়াবেগ অথবা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আভাস পর্যন্ত নেই— স্নেহলতার প্রতি আকর্ষণ যেন চারুর একটি ক্ষণিকের খেয়াল। তার ফলে বিধবাবিবাহের সমস্যাও তেমন গুরুতর হয়ে উঠতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনী বা গোবিন্দলাল-রোহিণীর সম্পর্ক বর্ণনায় যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তি ও বিশ্লেষণপ্রাচুর্যের অবতারণা করেছেন, স্বর্ণকুমারী সে পথে মোটেই অগ্রসর হন নি। স্নেহলতার আত্মহত্যা ব্যাপারটির মধ্যেও কোনো গভীর হৃদয়দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। এই অসহায় বিধবাটি নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে অনন্যোপায় হয়েই আত্মহত্যা করেছে। দীর্ঘ উপন্যাসটির মধ্যে ঘটনাবর্ত কম নেই, কিন্তু সংহতি ও সমগ্রতার অভাব আছে।

'কাহাকে ?' (১৮৯৮) স্বর্ণকুমারী দেবীর ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উপন্যাসটিতে একজন উচ্চশিক্ষিতা নায়িকার প্রেমজীবনের বৈচিত্র্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নায়িকা নিজের মুখেই তাঁর কাহিনী বলেছেন। স্থান কাল ও অবস্থা -ভেদে প্রণয়াস্পদের পরিবর্তন কতকগুলি তীক্ষ্ণ অথচ মিতবাক বিশ্লেষণের সাহায্যে সূচিত হয়েছে। শৈশবে পিতাই ছিলেন তাঁর সর্বস্ব, পরবর্তীকালে বাল্যসঙ্গী ছোটু তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। দশ বৎসর পরে নায়িকা যখন যুবতী তখন ব্যারিস্টার ভগ্নীপতির এক তরুণ বন্ধু রমানাথ তাঁর হৃদয়ে নূতনভাবে প্রেমানুভূতি সঞ্চারিত করেছে। রমানাথের সঙ্গে অন্য নারীর আসক্তির সন্ধান পেয়ে তিনি নিদারুণ মানসিক আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই সময় বিলেত-ফেরত ডাক্তার বিনয়কুমার তাঁকে চিকিৎসা করেছে। ডাক্তারের এই সহৃদয়তা নায়িকাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নায়িকার নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভর না করেই তাঁর পিতা বাল্যসঙ্গী ছোটুর সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার ও ছোটু যে অভিন্ন, এ বিষয় জানার সঙ্গেসঙ্গেই এক মিলনমাধুর্যের মধ্যে উপন্যাসটি পরিসমাপ্ত হয়েছে।

উপন্যাসটির মধ্যে লেখিকার শিল্পকুশলতার বহু নিদর্শন আছে। কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঐক্যরচনায় তিনি সামঞ্জস্যবোধ ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাস একটি সংগীতের সূক্ষ্ম ভাবলীলার উপরে ভিত্তি করেই যেন গড়ে উঠেছে। শৈশবে বাল্যসঙ্গী ছোটুর মুখে শোনা "হায়! মিলন হল, যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেল"! গানটি নায়িকার বালিকাচিত্তে যে আনন্দমুগ্ধ কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল, সেই গানই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে তাঁর হৃদয়াবেগ ও সুকুমার প্রেমানুভূতিকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। উপন্যাসের প্রারম্ভে এই গান, প্রেমানুভূতির রূপপরিবর্তনগুলির মূলেও এই গান, এমনকি উপসংহারের মধ্যেও নায়িকার শৈশবশ্রুত সংগীতটিই আবার ফিরে এসেছে— গানের মত উপন্যাসটিও যেন 'সমে' ফিরে এসেছে।

উপন্যাসটির আর-একটি বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে মেয়েটি এ কাহিনী বলেছেন, তাঁর সুর এই স্বল্পপরিসর উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নায়িকার উক্তিতে উপন্যাস রচনা করা বাংলা সাহিত্যে নূতন ব্যাপার নয়, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও একাধিক উপন্যাসে এই রীতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সর্বত্র তিনি সার্থক হতে পারেন নি— মাঝে মাঝে পুরুষের বিচারবুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি অনুভূতি পর্যন্ত নারী চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। উপন্যাসে সমস্ত কিছু অতিক্রম করে নারীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করেছে— মেয়েলি হাতের স্পর্শ স্বর্ণকুমারীর এই উপন্যাসটিকে বাস্তব-রস-সমৃদ্ধ করে তুলেছে। প্রেম

বিবাহ ও জীবন-সম্পর্কিত মতামতগুলিও নারীর বিশেষ মনোভাবের দ্বারাই রঞ্জিত। অথচ নায়িকার পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার অভাব নেই। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রেম ও বিবাহের বিচিত্র তথ্যগুলিকেও জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। উচ্চশিক্ষা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য আত্মবিশ্লেষণ— কোনো কিছুই চরিত্রটিকে পুরুষোচিত করে তোলে নি, সর্বত্রই নারীসুলভ কমনীয়তা একটি লঘুস্পর্শ সৌকুমার্যের সৃষ্টি করেছে।

'কাহাকে ?' উপন্যাসটির দশম পরিচ্ছেদে জর্জ এলিয়ট সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। জর্জ এলিয়টের উপন্যাস সমালোচনার মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসরচনার আদর্শটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। জর্জ এলিয়টের প্রথম দিকের উপন্যাসে একটি রমণীসুলভ কমনীয়তা স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে। তাঁর এই যুগের উপন্যাসের নারীচরিত্র-অঙ্কনের মধ্যেও নারীহস্তের স্পর্শটুকু লক্ষণীয়। স্বর্ণকুমারী এ বিষয়ে সম্ভবত জর্জ এলিয়টের পথই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে জর্জ এলিয়ট অতিরিক্ত তর্কবিতর্ক পাণ্ডিত্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে উপন্যাসের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত করেছেন। স্বর্ণকুমারী যশস্বিনী ইংরেজ লেখিকার দোষটি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। 'কাহাকে ?' উপন্যাসের নায়িকার দিদির মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন, "পড়েছিলুম অনেকদিন আগে; মন্দ লাগে নি। কিন্তু মাঝে মাঝে যে লম্বা লেকচার— সেইগুলোতে কেমন যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।" ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকেও উপন্যাসটির বিশিষ্টতা অস্বীকার করা যায় না। এই উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী বঙ্কিমযুগকেও অতিক্রম করে ভাবীকালের সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

৩

স্বর্ণকুমারীর রচনাসম্ভারের বৈচিত্র্য কম নয়। পরিধিতে স্বল্পায়তন হলেও তাঁর কাব্যপ্রতিভার মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। গীতিনাট্য ও গাথাকাব্য নিয়ে তিনি কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। স্বর্ণকুমারীর কাব্যে বাংলা কবিতার একটি বিশিষ্ট যুগসন্ধি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য ও আখ্যায়িকা-কাব্যের একটি ধারা তখন অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, তার পাশাপাশি বিহারীলাল-প্রবর্তিত আত্মভাবময় গীতিধারা তখন তরুণতর কবিদের আকৃষ্ট করেছে। বাংলা কাব্যের কৃত্রিম-ক্লাসিক পর্বের আখ্যায়িকা-কাব্য ঘটনাবিরল অন্তর্মুখী গীতিধারার প্রভাবে একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই রূপটিকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য বলা যায়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসীন' কাব্য (১৮৭৪) এই নূতন ধরনের রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্যের পথনির্দেশ করেছিল। মধুসূদন-রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের আখ্যায়িকা-কাব্যের তুলনায় অক্ষয়চন্দ্রের আখ্যায়িকা-কাব্য ঘটনাবিরল, বীরত্বমণ্ডিত উচ্চকণ্ঠও সেখানে অনুপস্থিত। স্বল্পপ্রসারিত আখ্যায়িকা অংশের ফাঁকে ফাঁকে অন্তর্মুখী গীতিধর্মিতা ও প্রকৃতিবর্ণনায় কবি তাঁর হৃদয়ের অংশ সংযোজন করেছিলেন। 'উদাসীন' কাব্যে কবি আখ্যায়িকার ছলে ব্যক্তিহৃদয়ের রোমান্টিক উৎকণ্ঠাই প্রকাশ করেছেন।

অক্ষয়চন্দ্রের রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কাব্য স্বর্ণকুমারী ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ— দুজনের রচনার উপরেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের 'অসামান্য উদার' রসবোধ, গান ও খণ্ডকাব্য রচনার ক্ষিপ্রতার কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। কৃত্রিম

ক্লাসিক ধারার আখ্যায়িকা-কাব্য ও রোমান্টিক গীতিকাব্যের মধ্যবর্তী একটি স্বল্পকালস্থায়ী রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্যের পর্ব লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয় চৌধুরীর এই নবপ্রবর্তিত কাব্যধারা নবীনচন্দ্র সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি কিশোর রবীন্দ্রনাথের উপরও প্রভাব বিস্তৃত করেছিল। বাংলা কাব্যের এই ধারাটি উপন্যাস ও গীতিকবিতার ক্রমবর্ধমান প্রসারের মধ্যে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর কবিতায় এই যুগের বাংলা কাব্যের মানসবিবর্তনটি সুচিহ্নিত।

স্বর্ণকুমারীর সর্বপ্রথম কাব্যসংকলন 'গাথা' (১৮৮০)। সংকলনটিতে 'শক্রসম্প্রদান' 'সাধের ভাসান' 'খড়্গ-পরিণয়' 'অভাগিনী'— চারিটি নাতিদীর্ঘ গাথা-কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গাথা-কাব্যগুলিতে উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক -রচনায় তিনি অক্ষয় চৌধুরীর পন্থানুসরণ করেছেন, কিন্তু ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'খড়্গ-পরিণয়' কবিতার নায়িকাবর্ণনায় স্বর্ণকুমারী বলেছেন—

> কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ময়ী
> দাঁড়ায়ে প্রাসাদ-শিখরোপরি ?
> মধুর ঝলকে, শুকতারা যেন,
> ঊষাতে আকাশ উজল করি।

ছন্দ ও প্রকাশরীতি 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' কাব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সার্থক গাথা-কবিতায় কাহিনীবিন্যাসের গাঢ়বন্ধতার প্রয়োজন। স্বর্ণকুমারীর গাথা-কবিতাগুলির মধ্যে এক 'খড়্গ-পরিণয়' ছাড়া অন্য কোনো কাহিনী তেমন জমে ওঠে নি। স্বর্ণকুমারীর এই গাথা-কাব্যের যুগটিকে storm and stress পর্বের রচনা বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার যুগেই গাথাগুলি রচিত হয়। গাথাগুলি বিয়োগান্ত, জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতার অভাবে সুলভ ভাবালুতা ও আকস্মিকতা কাহিনীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় কাব্যসংকলন 'কবিতা ও গান' (১৮৯৫)। এই সংকলনটির অন্তর্ভূত 'অতৃপ্ত' নাট্য-কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও লেখিকা তাঁর এই রচনাটিকে নাট্যকাব্য নাম দিয়েছেন, তবু একে নাট্যকাব্য বলা সংগত নয়। 'অতৃপ্ত' প্রকৃতপক্ষে তাঁর শেষ কাহিনী-কাব্য। কিন্তু বিশুদ্ধ কাহিনী-কাব্য রচনার প্রেরণা যেন ফুরিয়ে এসেছে, তাই তিনি এই আখ্যায়িকা-কাব্যটির মধ্যে কিছু নাটকীয় উপাদান মিশিয়ে দিয়েছেন। এই কাব্যটিতে স্বর্ণকুমারীর লিরিক-প্রতিভাটিই নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর ক্ষীণ সূত্রটি অবলম্বন করে প্রতিভার গীতিধর্মিতা তার স্বক্ষেত্র অনুসন্ধান করে চলেছে। গাথা-কবিতাগুলি ও 'অতৃপ্তি' নাট্যকাব্য আসলে একই সুরে গাঁথা— একটি অতৃপ্তি ও বিষাদময় অনুভূতি কবিমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্বর্ণকুমারীর কাহিনী-কাব্যের যুগকে এক কথায় 'অতৃপ্তির যুগ'ও বলা যায়। এই অতৃপ্তির ছায়াচ্ছন্ন ভূখণ্ডটি কবিমনের একটি মানসবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই বেদনা ও অতৃপ্তি এর চিরসহচর। কাহিনীর আচ্ছাদনের অন্তরালে গীতিধর্মিতা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় বেদনাতুর হয়ে উঠেছে। 'অতৃপ্তি' কাব্যে লিরিকেরই প্রাধান্য, কাহিনীর ক্ষীণ সূত্রটি নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে। এই ভাবালুতা ও আতিশয্যময়তা রোমান্টিক গীতিপ্রতিভার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটিও বটে। কার্লাইল একেই পরিহাস ক'রে বলেছিলেন Wertheriam। রবীন্দ্র-কাব্যের

প্রারম্ভিক পর্বটিকেও 'ভগ্নহৃদয়'এর পর্ব বলা যায়। 'অতৃপ্তি' কাব্যের শেষে স্বর্ণকুমারী এই যুগের পরিসমাপ্তির কথা বলেছেন—

অশান্তির মহারাজ্য দিয়া
কবে সেই করেছি প্রয়াণ—
সীমা বুঝি ফুরাইল হেথা,
সে যাত্রা বুঝি অবসান।

স্বর্ণকুমারী গাথা-কাব্য ও আখ্যায়িকা-কাব্যের সঙ্গে কিছু কিছু গীতিকবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু গীতিকবিতাই ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র। তাই কাহিনী-কাব্যের পর্ব শেষ হওয়ার পরে তিনি কবিতার ক্ষেত্রে গীতিকবিতা ও গানই রচনা করেন। গাথা-কবিতার ক্ষেত্রে অক্ষয়চন্দ্র ও বিহারীলালের যে প্রভাব ছিল, গীতিকবিতায় তিনি তা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিলেন। অন্তর্মুখী কবিচিত্তের একটি লঘুস্পর্শ সুষমা তাঁর গীতিকবিতায় করুণস্নিগ্ধ লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতি কবিহৃদয়ের নিগূঢ় স্পন্দনে নূতন রূপমূর্তি লাভ করেছে। কবিমনের সূক্ষ্ম সংবেদন, স্বপ্নালস্য প্রকৃতিকে রঞ্জিত করেছে। 'শারদ জ্যোৎস্নায়' কবিতাটিতে শরতের হিম জ্যোৎস্নালোকে কবি তাঁর মনের প্রতিবিম্বকেই ধরার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেই রহস্যময়ী ছায়া-শরীরিণী চিরদিনই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—

ও ছায়া কাহার ছায়া ? ও মুরতি কার মায়া ?
চিনিতে পারি নে যেন চিনি চিনি যত্ত করি !
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান,
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি !

প্রকৃতির নেপথ্যলোকে স্বর্ণকুমারী আপন মর্মবাণী আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবিমনের স্বপ্ন-বিহ্বলতা তাঁর অনেকগুলি কবিতায় একটি সূক্ষ্ম সুকুমার আবেশের সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির স্বচ্ছ দর্পণে মাঝে মাঝে সলজ্জ প্রেমের এক-একটি রেখাচিত্র প্রতিফলিত হয় :

নিশীথ ঘুমায় যবে
স্তব্ধতার সুখকোলে,
কামিনী কানন-বালা
মুখখানি ধীরে খোলে ;
লজ্জাবতী চুপে চুপে
ভালোবেসে হেসে চায়,
কে জানে বোঝে কি চাঁদ ?

প্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী চিত্র-রচনাতেও স্বর্ণকুমারীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সহজ সৌন্দর্যের এই ছবিগুলির মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়-পিপাসার কোনো আতিশয্য নেই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার মত বর্ণের ইন্দ্রজাল ও গন্ধের বিলাস নেই সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতাকে সহজ সুন্দর স্বভাবোক্তির কবিতা বলা যায়। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি বলেছেন—

মুকুলিত আম্রশাখে, পল্লবিত তরু থাকে,
কুহু কুহু কোকিল কুহরে ;
হিল্লোলিত সরো-কায়া, ঘুমায় গাছের ছায়া,
গাভী নামি' জলপান করে।

কবিতাটির চিত্ররস ও ধ্বনিমন্থরতা রবীন্দ্রনাথের 'কুহুধ্বনি' (মানসী) কবিতার প্রারম্ভিক অংশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সমসামায়িক কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) অথবা অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬০-১৯১৯) কোনো কোনো কবিতায় একই সুর নানাভাবে গুঞ্জরিত হয়েছে।[১]

স্বর্ণকুমারীর গীতিকবিতার মধ্যে প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের কবিতাগুলিই সার্থকতর। তাঁর প্রেম কবিতায় হৃদয়াবেগের প্রাবল্য নেই, এক শান্তমধুর রসাবেশই যেন এ জাতীয় প্রেমানুভূতির সহজাত ধর্ম। কিন্তু প্রেমিকপ্রেমিকার হৃদয়বৈচিত্র্য ও তার স্বল্পসংকেত রেখাঙ্কনগুলি অনুপস্থিত নয়। 'নহে অবিশ্বাস' 'থামাও বাশরী-তান' 'কেন এ সংশয় ?' 'সুখের অবসাদ' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমিকপ্রেমিকার সম্পর্কবৈচিত্র্য বর্ণিত হয়েছে। যৌবন-স্বপ্নের আত্মবিহ্বল ভাবাবেশ দু-একটি স্বল্পপরিসর ছবিতে সার্থকভাবে রূপ পেয়েছে— মিলনের উচ্ছলিত রসাবেশ সংযত-সুন্দর ক্ষণব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

এমনি চাঁদনী নিশি, পুলক-কম্পিত দিশি,
এমনি বিজন উপবনে,
মুখেতে চাঁদের আলো, দীপ্ত আঁখিতারা কালো,
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।· ·
তুলিয়া কুসুম হার সঁপিলাম করে তার,
অনন্ত খুলিল আঁখি 'পরে ;
মুহূর্তে বন্ধনচূর্ণ, অপূর্ণ হইল পূর্ণ,
স্পর্শ হল অধরে অধরে।[২]

কখনও কখনও প্রেমের উচ্চতর মহিমাও ভাবগাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছে। এই জাতীয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট—

জানি না তো ভালোবাসি কিনা, শুধু এই জানি,
একটি অব্যক্ত ভাবে রুদ্ধ যত বাণী।
একটি পরশে দেখি অনন্ত স্বপন,
একটি পরানে দেখি বিশ্ব নিমগন।
স্বর্গের সৌন্দর্য আলো বিকাশে নয়ানে,
ঈশ্বরের প্রেমরূপ একটি বয়ানে।[৩]

---

১ এই প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর 'নিদাঘে' (আভাষ), 'গ্রাম্য-ছবি' (অশ্রুকণা) 'বর্ষা-মঙ্গল' (অর্ঘ্য) ও অক্ষয়কুমারের 'শ্রাবণে' (প্রদীপ), 'মধ্যাহ্নে' (শঙ্খ) প্রভৃতি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২ অধরে অধরে।

৩ জানি না ত।

৪

স্বর্ণকুমারী কয়েকখানি নাটকও লিখেছিলেন। 'বসন্ত-উৎসব' গীতনাট্য (১৮৭৯), 'বিবাহ-উৎসব' (১৮৯২), 'কৌতুকনাট্য' (১৯০১), 'দেবকৌতুক' কাব্যনাট্য (১৯০৬), 'কনে-বদল' (১৯০৬) ও 'পাকচক্র' প্রহসন (১৯১১), 'রাজকন্যা' (১৯১৩), 'নিবেদিতা' (১৯১৭), 'যুগান্ত কাব্যনাট্য' (১৯১৮) তাঁর বিচিত্র নাট্যরচনা প্রয়াসের পরিচয় দেয়। স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত-উৎসব' গীতিনাট্য অধুনা বিস্মৃত, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। যে কালে স্বর্ণকুমারী এই গীতিনাট্য রচনা করেন তখন তাঁর পিতৃগৃহে সংগীতচর্চার প্রবল জোয়ার চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন স্থর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গেসঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম।"[১] স্বামী বিলাত যাওয়ার পর স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সংগীত ও সাহিত্য -চর্চার একজন সঙ্গিনী হলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্য -চর্চাতে আমরা তিনজন হইলাম— আমি অক্ষয় (চৌধুরী) ও রবি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার ভগিনী এখনকার ভারতী সম্পাদিকা আমাদের বাড়িতে বাস করিতে আসায় সাহিত্যচর্চায় তাহাকেও আমাদের একজন সঙ্গীরূপে পাইলাম।"[২] এই অনুকূল আবহাওয়ায় স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক প্রতিভা মুকুলিত হয়েছিল। 'বসন্ত-উৎসব' গীতনাট্যের পটভূমিকায় আছে এই সাংগীতিক পরিবেশন।

গীতিনাট্য-বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীকেই পথিকৃৎ বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এর দু'বছর পরে প্রকাশিত হয় (১৮৮১), এমনকি নাটকরচনায় স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হলেও গীতিনাটিক রচনায় তিনি তাঁর প্রতিভাবান অগ্রজের পূর্ববর্তিনী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গীতি-নাটিকা 'মানময়ী' 'বসন্ত-উৎসবে'র এক বছর পরে রচিত হয়েছিল (১৮৮০)। 'বসন্ত-উৎসব' যখন রচিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে।[৩] তবে গীতিনাট্য রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ও আনুকূল্য যে লেখিকাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা অনুমান করা অসংগত নয়। সমসাময়িক সাংগীতিক আবহাওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে বিচিত্র আঙ্গিক ও রূপকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। 'বসন্ত-উৎসব' সেই নব সৃষ্টির উল্লাসদীপ্ত প্রহরেই রচিত। পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবীর স্মৃতিচিত্রটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, "রবীন্দ্রনাথের বিলেত নিবাসকালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংগীতের এক মহাহিল্লোল হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ী তখন।"[৪]

---

১ গীতচর্চা : জীবনস্মৃতি।

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতী, কার্তিক ১৩২১।

৩ "জোড়াসাঁকো হইতেই কাব্যনাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত-উৎসবে'ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা আর রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসবের অভিনয়ও হইয়াছিল।" —কৈফিয়ৎ, হিরণ্ময়ী দেবী, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।

৪ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২৯।

প্রথম গীতিনাট্য হিসেবে 'বসন্ত-উৎসবে'র ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। স্বর্ণকুমারীর গীতিপ্রতিভাটি সর্বপ্রথম এই গীতিনাট্যেই প্রকাশিত হয়। গাথা-কাব্য রচনার মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত কাব্যসংস্কার ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর গীতিকাব্য ও গান সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। 'দেবকৌতুক' 'রাজকন্যা' 'নিবেদিতা' 'যুগান্ত কাব্যনাট্য' এর কোনোটিরই নাট্যমূল্য তেমন নয়। ঘটনার সংহতি ও চারিত্রিক দ্বন্দ্ব নেই। এগুলিকে নাটক না বলে নাট্যচিত্র বলাই সংগত। একমাত্র 'নিবেদিতা' নাটকে নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শেষদিকে ঘটনার আকস্মিকতা ও আদর্শবাদের আতিশয্য সে সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে। সামাজিক নাটকের মধ্যে 'ধরণীদেবীর আবির্ভাব ও দৈববাণী' রসাভাস ঘটিয়েছে। নারীর মহিমা ও আত্মোৎসর্গ প্রতিপাদন করাই নাটকটির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই শিল্পোৎকর্ষের পক্ষে বাধাসৃষ্টি করেছে।

কিন্তু প্রহসন-রচনায় স্বর্ণকুমারী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'কৌতুক নাট্য' কয়েকটি কৌতুককর নাট্যচিত্রের সমষ্টি। 'লজ্জাশীলা' 'বৈজ্ঞানিক বর' 'সৌন্দর্যানুরাগ' 'গানের সভা' প্রভৃতি ছোট ছোট নাট্যনকশাগুলিতে চরিত্র ও ঘটনার কৌতুককর অসংগতি হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। এই নকশাগুলির হাস্যরসের মধ্যে উদ্ভাবনের মৌলিকত্ব ও সাবলীলতা লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে'র সঙ্গে নকশা-নাটিকাগুলির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। 'কনে-বদল' ও 'পাকচক্র' প্রহসন দুটি স্বর্ণকুমারীর নাট্যপ্রতিভার সার্থকতম নিদর্শন। দুটি প্রহসনেই ঘটনা সাজানোর কৌশল প্রাধান্য লাভ করেছে। সংলাপের মধ্যেও বাক্‌চাতুর্য ও বুদ্ধির দীপ্তি হাস্যরস জমিয়ে তুলেছে। 'কনে-বদল' প্রহসনে শ্রীধর ও শশীর পূর্বনির্বাচিত পাত্রী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ললিতার কৌশলে যে কেমন করে মিলনান্তক পরিণতিতে রূপান্তরিত হল, তা সুকৌশলে দেখানো হয়েছে। ভোলানাথ চরিত্রটি সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্ষেপী প্রসঙ্গটির মধ্যে কিছু আতিশয্য আছে; 'পাকচক্র' স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ প্রহসন। সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত এই একাঙ্কিকাটি শিল্পী অসিতকুমার হালদারকে 'বিবাহযৌতুক' হিসেবে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখানেও ঘটনার কৌশলেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘটকী চরিত্রটি অত্যন্ত সজীব, তার গানগুলি কৌতুককর পরিবেশকে ঘনীভূত করে তুলেছে। স্বর্ণকুমারী যে কৌতুককর সংগীত রচনায় কতদূর পারদর্শিনী ছিলেন, ঘটকীর সংগীতটিই তা প্রমাণ করবে—

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী ও গিন্নি
আমার পায়ে পড়ে আট প্রহরে ভারে ভারে সিন্নি ;
রংবেরঙের সুগুণ সুরূপ
এক-একটি বর আস্ত তুরুপ—
আমার হাত ধরা—
আর কনে সবি, হরেক বিবি—
এমন কেউ কখনো পান নি।

স্বর্ণকুমারীর নাট্যপ্রতিভা বড় নয়, কিন্তু উল্লিখিত দুটি প্রহসন বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মূল্য ও মর্যাদার দাবি রাখে। তাঁর হাস্যরসের মধ্যে বিদ্রূপের জ্বালা নেই, সামাজিক অসংগতিগুলিকেও তিনি আঘাত করেন নি, সংস্কারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেন নি। বাঙালি পারিবারিক জীবনের

মধ্যে যে স্নিগ্ধ কৌতুকের প্রসন্ন ধারা আছে, তিনি সেই উৎসটিই আবিষ্কার করেছেন। সমসাময়িক দুজন নাট্যকার অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) প্রহসনের সঙ্গে তাঁর প্রহসন দুটির পার্থক্য অনেকখানি। স্বর্ণকুমারীর প্রহসনের আদর্শ ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রহসন। সূক্ষ্ম রসবোধ, ঘটনা সাজানোর কৌশল, চরিত্রগুলির মধ্যে হাস্যজনক অসংগতির সৃষ্টি ও মার্জিত রুচি, স্বর্ণকুমারীর প্রহসন দুটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

ভারতীর পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর বিচিত্র রচনাসম্ভার ছড়িয়ে আছে। তিনি কিছু বিদেশী গল্প ও কবিতার অনুবাদও করেছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের সেই শৈশবলগ্নে স্বর্ণকুমারী অনেকগুলি ছোটগল্পও লিখেছিলেন। প্রবন্ধ স্মৃতিকথা ভ্রমণকাহিনীগুলি আজও পুস্তকাকারে সংকলিত হয় নি। স্বর্ণকুমারীর 'পৃথিবী' (১৮৮২) নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থটি সেকালে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।[১] বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। স্বর্ণকুমারীর এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এই বিভাগের একটি মূল্যবান সংযোজন। অন্যান্য গদ্যরচনার মধ্যে তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা ও ভ্রমণকাহিনীগুলির সাহিত্যিক মূল্য আছে। স্বর্ণকুমারীর এই জাতীয় রচনাগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্নিগ্ধ প্রতিফলনে সমুজ্জ্বল। সহজভাবে কথা বলার ভঙ্গিটিও তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনার বিশেষত্ব। তিনি তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনার মধ্যে তাঁর কালের একটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ছবি এঁকেছেন, সেই ছবির আড়ালে আছে লেখিকার ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন। এই রচনাগুলির মধ্যে সে যুগের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে লেখিকার সরস বলার ভঙ্গি ও কৌতুকোচ্ছল কণ্ঠ—

"লিখিতে হইবে আমাকে সেকালের কথা? তাই ত! ইহার মধ্যে সেকেলে হইয়া পড়িলাম। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি না করিলে কিন্তু কথাটা ভুলিয়া যাইতে হয়। এই ত সেদিন— যেদিন দিদিমা বেচারীরা আমাদের একেলে-পনার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতেন, আর নব্য-নারী আমরা তাঁহাদের সেকেলে-পনার গঞ্জনা অকাতরে সহ্য করিয়া নায়িকা-দর্প অনুভব করিতাম। গঞ্জনারূপ সে ব্রহ্মাস্ত্র যদিও প্রথমাধিকার-সূত্রে আজি আমাদেরই হস্তগত, তথাপি বিনাপ্রয়োগে তাহা পেটিকাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতেছি।"[২]

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী বোম্বাইয়ে যান। বোম্বাই ভ্রমণের স্মৃতিকাহিনী সম্বলিত ডায়েরি ও ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যেও লেখিকার সহজ স্বচ্ছন্দ গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। নীলগিরি-ভ্রমণবৃত্তান্ত (সমুদ্রে) দার্জিলিং-ভ্রমণকাহিনী ও পুরীযাত্রার কাহিনীটি স্বর্ণকুমারীর ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথমবয়সের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষায় ও রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের প্রভাব ছিল, কিন্তু এ প্রভাবকে তিনি খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের পরিধি

---

১ 'ভারতী'র চল্লিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী দেবীর বান্ধবী কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী লিখেছিলেন, "পিতৃদেবও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন: তিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপনির্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এমন লিখিতে পারিয়াছেন ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। তিনি মেয়েদের বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্বয়ং আমাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন।" —মিলন-কথা, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২ 'প্রদীপ' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩০৬) স্বর্ণকুমারীর আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটির সঙ্গে উদ্ধৃত ভূমিকা অংশটি যোগ ক'রে 'সেকেলে কথা' নামে আত্মকাহিনীমূলক রচনাটি প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমপর্বের শেষার্ধ থেকে রবীন্দ্রযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের মানস-সত্যই তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে।

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে বিচিত্র কলধ্বনি জেগে উঠেছিল, মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যেই সর্বপ্রথম তার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও প্রসারতা রূপায়িত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিশিষ্ট নারীপ্রতিভা হিসেবে স্বীকার করলেও তাঁর সম্পর্কে সবটুকু বলা হবে না। বঙ্কিমপর্ব ও রবীন্দ্রপর্বের মধ্যবর্তী স্বল্পপ্রসারিত অধ্যায়টির মধ্যে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা তাই বঙ্কিম-পর্বের সংগে রবীন্দ্রপর্বের সেতুবন্ধন। 'ভারতী' পত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদনার মধ্যে যেমন এই প্রতিভাময়ীর সযত্ন-সতর্ক প্রচেষ্টার অবিস্মরণীয় চিহ্ন আছে, তেমনি 'ভারতী'ও তাঁকে রচনা করেছে।[১] 'ভারতী'র সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু ভারতী-সম্পাদনার কথা বাদ দিলেও স্বর্ণকুমারীর বিচিত্র সাহিত্যসাধনার মূল্য কম নয় এবং সে মূল্য নিরূপণের সময় আজ এসেছে।

১ "আমি ভারতীকে কতটুকু গড়িয়াছি বা না গড়ি'াছি তাহা তো আমি জানি না, ভারতী যে আমাকে 'এই আমি' করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহাই আমি জানি।" —আশীর্বাদ, স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। মিত্রালয়, কলিকাতা ১২। চার টাকা
বাংলা উপন্যাসের ধারা। শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী। নতুন সাহিত্য ভবন। ছয় টাকা

সংস্কৃতি শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য কি, সেই দুরূহ আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি থেকে লেখকের অভিপ্রেত অর্থটি বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। নিছক সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ বাদ দিলে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'সংস্কৃতির রূপান্তর' এবং 'বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ধারা'। এই দুটি প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিল্পের পরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমি আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব আমাদের সমাজ-মানসকে বিভিন্ন রূপ দিয়েছে আর তারই ফলে সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিও কালে কালে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। জাতীয় চিত্ত এইভাবে কর্ষিত হওয়ার ফলেই সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। সেই কর্ষণ ব্যক্তির দ্বারা সমাজের কর্ষণ শুধু নয়, সে কর্ষণ বিভিন্ন প্রভাবের দ্বারা সমাজজীবনের কর্ষণ। এইজন্য গ্রন্থের আলোচনাপদ্ধতি ঐতিহাসিক। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসে লেখকের গভীর প্রবেশ সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' নামে প্রথম প্রবন্ধটিকে সমস্ত বইয়েরই ভূমিকারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যখন আধুনিক সমাজ দেখা দিল, কতকগুলি সুস্পষ্ট কারণে আমাদের চিন্তা ও সৃষ্টি -ক্ষমতারও পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছিল। পল্লী ও নগরের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ফলে বাঙালি সমাজে ফাটল ধরেছে; ফলে এখনকার সাহিত্য সমস্ত দেশে পৌঁছচ্ছে না কিংবা দেশের সামগ্রিক চেতনা থেকেও সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক যুগে মধ্যবিত্তের উদ্‌ভব এবং চিন্তার ক্ষেত্রে তার বিশেষ দানেই এ যুগ সমৃদ্ধ। কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিন্তাগর্বিত স্বাতন্ত্র্যবোধ সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে বাধা ঘটায় এই সত্যটিকেও লেখক অস্বীকার করতে পারেন নি। আমাদের আধুনিক বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতি মধ্যবিত্তশ্রেণীরই সৃষ্টি। এই সংস্কৃতির দানকে অস্বীকার করা চলে না বটে, কিন্তু ক্ষোভ থেকে যায় এই যে সংস্কৃতির এই আলো দেশের অগণিত জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছল না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই যখন নগর-সভ্যতা আলাদা হয়ে উঠছিল, বিশেষ করে কলকাতায় তার বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে বাংলার পল্লীমানুষের সঙ্গে তার যোগ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। আমাদের বিদীর্ণ সমাজের চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি বিখ্যাত উপমায় দেশের এই অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আজ এই উদ্বেগ দেশের শিক্ষিত ভাবুক সমাজের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

বিমলবাবু ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের এই অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্য যে সেকালের পাঁচালী আর যাত্রার মত বাঙালি মাত্রেরই অন্তরের বাণীকে প্রতিধ্বনিত করতে পারছে না, এ কথা সত্য। তিনি বলছেন, "তখনকার সাহিত্য এত উঁচুদরের ছিল না নিশ্চয়ই কিন্তু সে সাহিত্যরস আস্বাদন করত সমাজের এক বিপুল অংশ— তখন পাঠকদের মধ্যে এমন শ্রেণীবিন্যাস হয় নি।" লেখক বর্তমান অবস্থার নাম দিয়েছেন 'অনুভূতির খণ্ডীভবন'। কথাটা বেশ ভালো। এই অবস্থাটা যতই বাস্তব হোক, আদর্শ হিসাবে চমৎকার নয়। এর প্রতিকারের নানা উপায় চিন্তা করা হয়েছে। বিমলবাবুও

একটি উপায় নির্দেশ করেছেন, শেষ পর্যন্ত সেটা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত উপায় থেকে আলাদা নয়। শিক্ষার প্রসারকেই লেখক বলেছেন এর একমাত্র উপায়। তিনি বলেছেন, "এ যুগে সমাজ বাঁচিয়ে রেখে নব নব সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন করতে গেলে বহুর চিত্তে সংস্কৃতির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন আছে।"

অর্থাৎ যে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় শহরবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু বিমলবাবুর এই সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবের একটি প্যারাডক্স আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের দানকে বাদ দিয়ে ইতিহাসকে ভাবা যায় না। রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ বাঙালি সংস্কৃতির মহৎ ফল। এই মহৎ সম্পদকে অবশ্যই আমরা হারাতে রাজি নই। কিন্তু এই সংস্কৃতির কুফল হচ্ছে বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এসেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্যিক ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করছেন। বিমলবাবুর মতে আধুনিক obscurantism হচ্ছে এর ফল।

সুতরাং প্রশ্ন এই যে কুফল এড়াতে গিয়ে কি সুফলকে বর্জন করতে হবে? আধুনিক মানবসংস্কৃতির এটা একটা নিরুত্তর প্রশ্ন। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, গণধর্মের দিকে সাহিত্য অগ্রসর হচ্ছে। এই গণধর্ম তো সামন্তযুগের সমাজধর্ম নয়। জাগ্রত ব্যক্তিচেতনার স্বাধীন চিত্তবিকাশকে কি করে জনমানসের অনুকূল করে তোলা যায়— এটাই এ যুগের সমস্যা।

প্রথম প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা একটু দীর্ঘই হল। এই প্রবন্ধটি যেমন সুলিখিত, তেমনি এরই মধ্যে লেখকের মূল মননধর্মটি প্রকাশ পেয়েছে। 'বাংলায় শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ধারা' প্রবন্ধটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতে তিনি লোকজীবনের জাগরণকে নানাভাবে দেখাতে চেয়েছেন। আধুনিক শিক্ষা কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার কি কি চেষ্টা হয়েছে— তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধটিতে। এতে বিমলবাবু একটি থিয়োরি উপস্থাপিত করেছেন, সেটা বিশেষভাবেই ভাববার মত। তিনি বলছেন, "বস্তুত বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যখনই সমাজে বা ধর্মে কোনও সংকট এসেছে, তখনই বাংলা ও বাঙালি আত্মরক্ষা করেছে, জনসাধারণ থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে।" ইংরেজ যুগে আমরা এই নীতি পালন করি নি বলেই জীবনে এসেছে সংকট। বিমলবাবু তাঁর এই মতবাদটি বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ কোনো বড়ো বইতে আলোচনা করলে বাঙালি পাঠক চিন্তার খোরাক পাবে, সন্দেহ নেই। প্রথম প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যও এর প্রয়োজন আছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থের এই দুটি প্রবন্ধই বিশেষ করে ইতিহাসাশ্রিত। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসকে তিনি কি গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে জানবার চেষ্টা করেছেন, এতে তারই প্রমাণ। লেখকের আলোচনা অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ, তাই তাঁর বক্তব্য অতিশয় পরিষ্কার। এই প্রসঙ্গে বিমলবাবুর আলোচনা-রীতির আর-একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। 'সাহিত্যের মেজাজ' 'ক্রান্তি' 'প্রবন্ধবিষয়ক প্রবন্ধ' প্রভৃতি অন্যান্য প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের সূত্র নির্ণয় করতে। এই সূত্রনির্ণয়ের চেষ্টার কথা তিনি বইয়ের ভূমিকাতেও বলেছেন। ঐতিহাসিক টয়েনবী বিশ্বের ইতিহাসে সূত্র স্থির করেছেন। বিমলবাবুও এমন কতকগুলি সূত্র বের করবার চেষ্টা করেছেন যার দ্বারা ইতিহাসের গতি বোঝা সহজসাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, এতে গভীর অধ্যয়ন এবং যুক্তিবিচারের প্রয়োজন; বিমলবাবুর রচনায়

সেটা সুস্পষ্ট। এইজন্যই বক্তব্যের মধ্যে কোনো ধোঁয়াটে ভাব নেই। 'কবিকৃতি ও সমালোচনা' ও 'কাব্যের ব্যাকরণ' এই দুটি প্রবন্ধেও লেখক কাব্যরচনার নিয়ম আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচনায় অনুভূতিমূলক যুক্তিবিচারেরই প্রাধান্য। সংস্কৃত অলংকারে কিন্তু অনুভূতির চেয়ে তত্ত্ব এবং যুক্তির শৃঙ্খলাই বেশি। বিমলবাবুর যুক্তিপন্থী মনে ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনাই আকর্ষণীয় হয়েছে।

এই আলোচনাতে বিমলবাবু আর-একবার প্রমাণ করলেন অধ্যয়নের গভীরতা। আধুনিক যুগের মানুষ হওয়ায় জীবনবর্জিত যুক্তিবাদিতা তাঁর কাছে অর্থহীন। সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে রসবিলাস বা যুক্তিবিলাস কোনোটাই তাঁর পছন্দ নয়। জীবনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিরূপে তিনি সাহিত্যকে পেতে চান। সমাজতন্ত্র-ভাবতন্ত্র-রূপতন্ত্র নামে একটি মতবাদ তিনি রোজার ফ্রাই এবং ভারতীয় অলংকার মিলিয়ে তৈরি করেছেন। অলংকারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও রসের ব্যাখ্যায় তিনি জীবন এবং সমাজের পূর্ণপ্রভাব স্বীকার করেছেন।

এ ছাড়া 'অবনীন্দ্রনাথের ছবি' এবং 'কবিসত্তম' নামে দুটি প্রবন্ধ আছে! দুটি প্রবন্ধই বিশেষভাবে পঠনযোগ্য। সব মিলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বইটায় চিন্তাকল্পনায় বাস্তববাদিতায় আদর্শবাদিতায় মিলে যে একটি বলিষ্ঠ পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাই, সেটা আজকের প্রবন্ধসাহিত্যে খুব সুলভ নয়— এ কথা বলায় কিছু অতিরঞ্জন নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধকারদের মধ্যে যে যুক্তিসিদ্ধ স্বচ্ছতা দেখতে পাওয়া যায় বিমলবাবুর রচনায় তার স্পষ্ট সাদৃশ্য আছে।

শ্রীযুক্ত অচ্যুত গোস্বামীর 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' বইটি সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য -সমালোচনার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আজকাল সমালোচকরা সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে রস এবং সৌন্দর্যের নির্বিশেষ অনুসন্ধান বর্জন করে সমাজ এবং জীবনের পটভূমিকে বিশেষ বিবেচ্য করে তুলছেন। এসব আলোচনা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে সাহিত্য এখন আর শুধু রসচর্চার ব্যাপার নয়। সাহিত্য-অধ্যয়ন এখন সামাজিক দিক পরিবর্তন এবং ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির অনুসরণের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। বিশেষ করে উপন্যাস। উপন্যাসের বিষয়বস্তু মানুষ এবং তার সমাজ। তাকে বাদ দিয়ে এর বিচার শক্ত। গান বা কবিতার মত বিশুদ্ধ সাহিত্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু উপন্যাসের বহির্জগৎ-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। এটাও স্মরণীয়— উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল রেনেসাঁসের ব্যক্তি-মুক্তির পর। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গে এর একটা যোগ আছে। প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে যেমন লেখক-ব্যক্তির অবলোপটাই ছিল বৈশিষ্ট্য, আধুনিক উপন্যাসে তেমনি ব্যক্তিসত্তার প্রক্ষেপই অন্যতম লক্ষণ। এইজন্য সমাজ এবং ব্যক্তিমানস— দুয়ের পূর্ণ সন্ধান না করলে উপন্যাস বিচার সম্পূর্ণ হয় না।

বাংলা ঔপন্যাসিকদের নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আলোচনা হলেও সমগ্রভাবে ধারা অনুসরণের চেষ্টা অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুলকায় বইটি ছাড়া আর কোথাও বিশেষ হয় নি। কিন্তু দুই গ্রন্থের পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য স্বাভাবিক ; বস্তুত পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি আছে বলেই আবার নতুনতর গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় গ্রন্থের কলা-বিশ্লেষণ এবং ঘটনাধারার পিছনে মনস্তত্ত্বসম্মত কারণ নির্ণয়ই প্রধান। লেখকমানস সম্পর্কে বা যুগজীবনের পটভূমি নিয়ে আলোচনা তিনি করেন নি। অচ্যুতবাবু লেখকদের গ্রন্থ নিয়ে প্রধানত আলোচনা করেন নি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবে গঠিত লেখকমানসই তাঁর আলোচনার বস্তু। বলা বাহুল্য,

কোনোটার দ্বারাই কোনো রীতি মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের বিচারে সাহিত্য-পাঠকেরাই লাভবান হবেন। অচ্যুতবাবুর বইয়ের নাম যদিও 'বাংলা উপন্যাসের ধারা', লেখক বঙ্কিমচন্দ্র থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের কয়েকজন প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখকদের নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছেন। এইসব লেখকের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁদের যুগ ও সমাজের বিশ্লেষণ করা হয়েছে; লেখক এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন বাঙালি ঔপন্যাসিকের লেখকমন তাঁদের সামাজিক পরিবেশেই উপযুক্ত রূপে গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে জাতীয়তা; রবীন্দ্রনাথের যুগে ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে আশাভঙ্গ, মানবিক দৃষ্টি, বিশ্বকল্যাণের উপলব্ধি; শরৎচন্দ্রের যুগে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব; প্রমথ চৌধুরীর যুগে শিল্পকৈবল্যবাদ; কল্লোল-যুগে বাস্তবতার পদসঞ্চার ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা; বিভূতিভূষণে সমাজবর্জন ও প্রকৃতি-চেতনা; তারাশঙ্করের যুগে 'বুদ্ধিজীবী মানুষের আহত গর্বের প্রতিক্রিয়া'য় রোমান্টিক পলায়ন; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে ব্যক্তির এবং সমাজের বাস্তবচেতনার পূর্ণাঙ্গরূপ— অচ্যুতবাবু মোটামুটি এই সূত্র ধরে উপন্যাসের ধারাবাহিকতা আলোচনা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমাজ ও যুগ -জীবনের জটিলতা পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় যথেষ্ট বেশি বলে এ যুগে বিভিন্ন ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করতে বহুসংখ্যক লেখকের উদয় হয়েছে। আগে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র— এই তিনজন তিনটি যুগের চেতনাকে উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন। কিন্তু গত পঁচিশ বছরে অন্তত পাঁচজন লেখককে একই সঙ্গে বিভিন্ন আদর্শের ঔপন্যাসিক রূপে দেখা গিয়েছে।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের সম্পর্কে লেখকের মূল ধারণা পাওয়া যাবে বিশেষ করে দুটি অধ্যায়ে— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা। রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জটিলতার জন্যই বোধ হয় উপন্যাস-সাহিত্যের বৈচিত্র্য হয়েছে অসাধারণ। লেখকের মতে কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যিকরাই সবপ্রথম 'মধ্যযুগীয় সংস্কার' সম্পূর্ণ বর্জন করে অকুণ্ঠচিত্তে বাস্তবকে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে রেনেসাঁসের সাধনার পূর্ণতা এতদিনে ঘটল। অতঃপর তাঁদের শিল্পকৈবল্যবাদ বাংলা সাহিত্যে বাস্তবানুসরণের দায়মুক্ত অকুণ্ঠ দুঃসাহস এনে দিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নিরঙ্কুশ বাস্তবাদীর আবির্ভাব সহজ হল। অচ্যুতবাবু শিল্পকৈবল্যবাদীদের এবং মানিকবাবুর বাস্তববাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এই বলে যে, প্রথমোক্তদের দেহচেতনা ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক আর মানিকবাবুর সাহিত্যে সেটা ছিল সমাজগত। সেজন্য তাঁর বাস্তববাদ অধিকতর সত্য এবং সার্থক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাতে লেখক প্রশংসাযোগ্য বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বলা আবশ্যক, মানিকবাবুর শেষের দিকের উপন্যাসগুলিকে তিনি একটি স্বাভাবিক পরিণাম বলে মনে করেন; তাঁর মতে এদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই।

অচ্যুতবাবুর বইটিতে নিপুণ বিশ্লেষণের পরিচয় আগাগোড়াই পাওয়া যায়। তবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সব সময়েই একটি সামাজিক তাৎপর্য এবং সে সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের সুস্পষ্ট মনোভাবই খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলছেন, "জাতীয় সাহিত্যের প্রধান ধারাটি বঙ্কিম রবীন্দ্র শরৎ প্রমথ অন্নদাশঙ্কর বুদ্ধদেব প্রেমেন এবং সর্বশেষ মানিকের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্কর যেন এই প্রধান ধারাটি থেকে শাখানদী হিসাবে বেরিয়ে গিয়েছেন।"—পৃ ২০৯। বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের বিপর্যয়ের জ্বালাহীন চিত্র রয়েছে, প্রকৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছেন তারই মীমাংসা রূপে। সুতরাং সমাজকে বিভূতিভূষণ এড়িয়ে গিয়েছেন। তারাশঙ্করও অতীত সামন্ততন্ত্রের প্রীতির আকর্ষণে বর্তমানের সমাজ-বাস্তবকে যেন পূর্ণ চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। অচ্যুতবাবুর এই সিদ্ধান্ত যে কৌতুকবহ তাতে সন্দেহ নেই। তারাশঙ্কর সমাজ বা জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় হয়তো কোনো মনোভাব বা মতবাদ প্রকাশ করেন নি ; কিন্তু যেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ, সেখানে মানব-জীবন এবং মনুষ্যত্ব (নৈতিক অর্থে নয়) সম্পর্কে গভীর রহস্যবোধের পরিচয় আছে। আমাদের মনে হয় সামন্ততান্ত্রিক যুগ এবং আধুনিক যুগের সংঘর্ষ যেখানে তিনি এঁকেছেন, সেখানে পটপরিবর্তনের মধ্যে একটা গভীর ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে, যা সাময়িককে অতিক্রম করে গিয়েছে। লাবক এই শ্রেণীর উপন্যাসকে সাহিত্যে অত্যন্ত উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। অচ্যুতবাবু যখন বলেন, তারাশঙ্করের জীবনদর্শন নেই, তখন বোধ হয় তিনি কথাটা তাঁর ব্যবহৃত সংকীর্ণ অর্থেই প্রয়োগ করেন— অর্থাৎ কোনো সুস্পষ্ট সমাজদর্শন নেই। দুঃখের বিষয়, এভাবে বলতে গেলে যাকে তিনি প্রফেট বলেছেন, তিনিও এ অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকেন না। কারণ লেখকের মতেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস উপলব্ধি-সঞ্জাত।

দৃষ্টান্তস্বরূপেই কথাটা বলা গেল। লেখকের সাহিত্যবিচার যে বিশিষ্ট মানদণ্ড অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় এবং পাঠককে নানাদিক থেকেই অনুশীলনে প্রেরণা দেবে। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধের উপরেই শুধু উপন্যাসের চরম বিচার বোধ হয় নির্ভর করে না। কারণ উপন্যাস রেনেসাঁস-পরবর্তী ব্যক্তিচেতনা এবং সমাজচেতনা দুয়ের মিলিত ফল। অচ্যুতবাবুও সেটা জানেন। সেই জন্যই লক্ষ্য করেছি, অনেক সময়েই তিনি সামাজিক পটভূমি আলোচনা করেও ব্যক্তির কল্পনা এবং অনুপম সৃষ্টিপ্রতিভার আলোচনা করতে চমৎকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বইটি পড়ে আমরা খুশি হয়েছি ; শুধু মনে হয়, লেখক বক্তব্য আরও বিশদ করলে ভালো করতেন এবং সবশেষের যে অধ্যায়ে বর্তমান উপন্যাসের আলোচনা করেছেন, সেটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, আপ্তরীতিতে রচিত।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ। হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স বিরচিত। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স। পাঁচ টাকা।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণের নাম লঙের ক্যাটালগে আছে। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও বইয়ের একটি অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন খুব সম্ভব লঙের বিবরণ নির্ভর করেই। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ বইটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। এর যে আলাদা একটা গুরুত্ব থাকতে পারে, এ কথা কারও মনে হয় নি। এজন্য সাহিত্য-সমালোচকদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। বইটা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আজও বিশেষ প্রয়োজনে কোনো বিশেষ বই ছাড়া এই সোসাইটির বই নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা হয় নি। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ছাড়াও হয়তো আরও এমন বই এতে পাওয়া যেতে পারে বাংলার সাহিত্য ও সমাজের ইতিবৃত্ত -সন্ধানে যাদের মূল্য থাকতে পারে। বর্তমান গ্রন্থখানি এ যুগের পাঠককে সেদিকেও আকৃষ্ট করলে এই বই প্রকাশের একটি পরোক্ষ উদ্দেশ্যও সাধিত হবে।

বইখানি পড়ে আরও কতকগুলি কথা মনে হল। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্‌ভব নিয়ে যে থিয়োরি চলিত আছে, বর্তমান বইটিকে প্রথম উপন্যাস রূপে স্বীকার করে নিলে সেই থিয়োরি অক্ষুণ্ণ থাকবে কি? উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পর। ইংরেজি উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েই উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। অবশ্য এই কারণটিকে সেরকম অনিবার্য বলা যায় না। সমাজ এবং জীবনের দিকে তাকাবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি যখন গড়ে ওঠে তখনই উপন্যাসের জন্ম-সম্ভাবনা। ব্যক্তিচেতনার অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাই এর অনিবার্য যোগ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাতে সমালোচনা-বুদ্ধি তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেইজন্য প্রথম যুগের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত ছোট ছোট নকশা জাতীয় রচনাতে আধুনিক উপন্যাসের প্রথম সূচনা লক্ষ্য করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস নকশারই বড় সংস্করণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আলালের ঘরের দুলাল এই জাতীয় বস্তুরই ঔপন্যাসিক আভাস। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল বিষবৃক্ষ। বিষবৃক্ষ সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস। এতেও দেবেন্দ্রের কাহিনীতে পূর্ববর্তী উপন্যাসের সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। খুব স্থূলভাবে বলতে গেলে, ভুল করা এবং ভুল ভাঙা— এই হচ্ছে বিষবৃক্ষের ভাববস্তু। পূর্ববর্তী কাহিনীগুলিকে অন্য পটভূমিতে ফেলে দেখলে এই ভাববস্তুরই উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে। স্বর্ণলতাও ১৮৭২এই প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর বাংলা উপন্যাসের গতি নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের সমাজচেতনা থেকেই উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল, এই মতটি সুসংগত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বেরিয়েছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য। যে সময়ে এই বই লেখা হচ্ছিল, তার কিছু আগে কলকাতায় খ্রীষ্টধর্মপ্রচার রোধ করার জন্য আন্দোলন চলেছে। নগরজীবনের এই দ্বন্দ্বসংঘাত সেকালের সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হচ্ছিল এবং এরই ভিতর দিয়ে উপন্যাসের উপকরণ এবং দৃষ্টি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এসব আন্দোলন কিছুই পল্লী-অঞ্চলে পৌঁছয় নি, অন্ততঃ 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' তার কোনো আভাস নেই। বইখানা পড়ে এ রকম ধারণাও জন্মে যে বাংলা দেশের পল্লী-অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে। একটা সর্বস্বীকৃত দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজ দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামে খ্রীষ্টানদের পল্লী আলাদা ছিল। এই সময়ে দেশের অভ্যন্তরে খ্রীষ্টধর্মান্তরিতদের সংখ্যা কি রকম ছিল, অনুসন্ধান করলে সেটা জানা যেতে পারে। হয়তো সংখ্যা সত্যসত্যই নেহাত কম ছিল না। সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যেই এই ধর্ম প্রবেশ করেছিল। এই বইতে একটি ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ প্রধানশিক্ষকের ভূমিকা আছে। কিন্তু তাকে ব্যবহার করা হয়েছে রানীর ভালোবাসার বিশুদ্ধতা দেখাবার জন্যই। লেখিকা খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বদাই মনে রাখলেও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি হচ্ছে I have endeavoured to show in it the practical influence of Christianity on the various details of domestic life—অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের কল্যাণকর প্রভাব দেখানো, কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখিয়ে খ্রীষ্টধর্মকে বিজয়ীরূপে দেখানো কিংবা অনুরূপ কোনো উপায়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এই বইয়ের কাহিনীতে নাটকীয়তা নেই বললেই চলে। সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে লেখিকার স্নিগ্ধকোমল মনের সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে, সে যুগের কোনো গল্পে ঠিক এ

রকমটি দেখা যায় না। বরং এই সময়ের কাহিনীমূলক রচনাতে শ্লেষ ব্যঙ্গ এবং পরিহাসের চিহ্নই ছিল সর্বত্র। সেদিক থেকে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অবিচল আকর্ষণ এবং যথার্থ ভক্ত খ্রীষ্টানের মত সপ্রেম ব্যবহারে মানুষের হৃদয়কে জয় করবার পন্থায় দৃঢ়বিশ্বাস থাকায় ভাষা এবং কাহিনীতে মাধুর্যের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু লেখিকা সম্পূর্ণ অনাসক্তি অর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য আর যাঁরা উপন্যাস লিখছিলেন, তারাই যে পেরেছিলেন এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না; কিন্তু অন্যায়কে ব্যঙ্গ করলেও অন্যায় বা পাপের একটা চেহারা অবশ্যই ফুটে ওঠা চাই। তুলনা না করে দৃষ্টান্ত হিসাবে টলস্টয়ের উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' পাপের টুকরো টুকরো ছবি আছে, কিন্তু সব মিলে পূর্ণাঙ্গ রূপটি ফুটে ওঠে নি। কারণ লেখিকা আপন ধর্মের দিকে সমগ্র মনোযোগটি নিবদ্ধ রেখেছেন।

যে আবর্তের ভিতর থেকে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি তার সঙ্গে এই বইয়ের কোনো যোগ নেই। এই কাহিনী রচনার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল এবং প্রয়োজন ছিল, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক নেই। এইজন্য বাঙালি লেখক এবং পাঠক এর সন্ধান রাখেন নি। বাংলা সাহিত্যকে এই বই কোনো দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে, এ কথাও বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি কথাও স্মরণীয়। খ্রীষ্টানদের রচনা হলেই যে বাংলা সাহিত্যের কোনো বই উপেক্ষিত হবে, এ কথা ঠিক নয়। কেরীর 'কথোপকথন' কিংবা শ্রীরামপুরের দিগ্দর্শন পত্রিকার সঙ্গে আমাদের আধুনিক শিক্ষা এবং সাহিত্যের একটা যোগ ছিল। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক বলেছেন, "বুদ্ধিজীবী বাঙালী সে সময় মিশনারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত; তাদের কোনো ভালো কাজকেও গ্রহণ করবার মতো উদারতা সেই বিদ্বেষের পরিবেশে সম্ভব ছিল না।" — এই মন্তব্য মেনে নেওয়া একটু শক্ত। নব্যবঙ্গের দল খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ততটা বিদ্বেষপরায়ণ ছিল না। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' খ্রীষ্টানের রচনা বলে উপেক্ষিত ছিল এমন সংবাদ জানা যায় না। তবে বর্তমান বইয়ের বিষয়বস্তুটাই যদি সেই সময়ে আদৃত হওয়ার পক্ষে অনুপযোগী হয়ে থাকে তা হলেও আমাদের জিজ্ঞাস্য থাকে খ্রীষ্টান সমাজের বাইরে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের মধ্যে এর প্রচারের কোনো চেষ্টা হয়েছিল কি? সে রকম সাহিত্যসচেতনতা এই গ্রন্থ রচনার পিছনে ছিল না, সে তো সুস্পষ্ট।

আশা করি এই সমালোচনাতে এমন ধারণার সৃষ্টি হয় নি যে, বইয়ের গুণগুলি অস্বীকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বরং বিস্মিত হই এই কথা ভেবে যে, ম্যালেন্স সর্বতোভাবে ধর্মপ্রচারিকাই ছিলেন সাহিত্যিক হওয়ার কোনো উৎসাহ তাঁর ছিল না। অথচ বাংলা বই পড়ে খুব ভালো বাংলা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। ম্যালেন্সের যে স্বাভাবিক শক্তি ছিল— এই বই থেকে তা বুঝতে পারা যায়। সম্পাদক বিস্তৃতভাবে তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের আলোচনা করেছেন। বাস্তববর্ণনায় চরিত্রচিত্রণে এবং ভাষায় (কিছু কিছু মিশনারী গদ্যের গন্ধ থাকলেও) 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' সত্যই বিশেষ অবধানযোগ্য বই, তাতে সন্দেহ করি না। এখানে সেসব বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। ভূমিকাতে পাঠক তার বিশদ আলোচনা পাবেন। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকুই যে, উপন্যাসের লক্ষণ এতে অবশ্যই আছে এবং সময়ের দিক দিয়েও প্রথম, কিন্তু বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের ধারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। এই ধরণের ঘটনা আমাদের সাহিত্যে অবশ্য নূতন নয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের গোড়াতে যেমন লেবেডফের উদ্যম উপন্যাসসাহিত্যের গোড়াতে তেমনি হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্সের উদ্যম।

এই বিস্মৃতপ্রায় বইটিকে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লোকচক্ষুর গোচরে এনেছেন। গদ্যভাষা-সৃষ্টির প্রায় প্রথম যুগে বাংলা ভাষার শক্তির একটা পরীক্ষা এতে হয়ে গিয়েছে। যদিও বরাবরই মিশনারীদের ঝোঁক ছিল আভিধানিক শব্দ বর্জন করে চলতি বাংলা রচনার দিকে, কিন্তু লোকজীবনের ছবি আঁকবার কাজে এই মহিলাই সম্ভবত চলতি বাংলাকে প্রযুক্ত করেছিলেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে কেরীর 'কথোপকথন' স্মরণীয়। বিভিন্ন দিক দিয়ে এই বইয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিস্তৃত ভূমিকা, লেখিকার জীবনী এবং দুর্বোধ্য শব্দের টীকা দিয়ে চিত্তবাবু বইটিকে অতি নিপুণভাবে সম্পাদনা করেছেন। এই ধরণের কাজে চিত্তবাবুর সমৃদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় বাংলা সাহিত্য -পাঠকের হয়তো অজ্ঞাত নয়। এই মূল্যবান বইটিকে উদ্ধার এবং প্রকাশিত করে তিনি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন।

শ্রীভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন। শ্রীভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে চিনেছিলেন কবি বলে। তাঁর কর্মের সাধনা যা কিছু তা কবিরই সাধনা, তার বেশী কিছু বলে তাঁর মন মানে নি। তাঁকে পাওয়া যাবে তাঁর ছন্দে, তাঁর সুরে এবং তাঁর রঙের রূপেও। কবির এই আত্মপরিচয়ের যাথার্থ্য স্বীকার না করে উপায় নেই। তবু প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও তো মানতে হয়। তত্ত্ব-প্রবন্ধের আকারে কবিগুরু নিতান্ত কম লিখে যান নি, যা লিখেছেন তার গুরুত্ব লঘু করবার কোনো শক্তিই আমাদের নেই। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজেই যদি বলে যেতেন যে তাঁর প্রবন্ধ-ভাষণাদি ফেলে দিলেও ক্ষতি হবে না, তথাপি একটি অংশও পরিত্যাগ করবার মত বাহুল্য আমরা খুঁজে পেতাম না। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধ-ভাষণ ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ করেছে ব'লে নয়, বিচিত্র রসসম্ভোগের জন্যও নয়। তাঁর তত্ত্ববাহী প্রবন্ধাদি নিয়ে একটি সামগ্রিক শিক্ষা-প্রস্তাব। প্রবন্ধ, ভাষণ, এমনকি গল্প-উপন্যাসের প্রায় সবগুলি মিলে একটি সামগ্রিক শিক্ষা-প্রয়াসের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা দেবো, শিক্ষার দর্শন লিখে যাব, শিক্ষার ধারা বা পদ্ধতি দিয়ে যাব, এসব কোনো 'কেজো' প্রচেষ্টা কবির স্বভাবজ নয়। তাই শিক্ষা-বিষয়ে সোপানে সোপানে আরোহণ করে কোনো তত্ত্বে বা শিক্ষা-দর্শনে কবি অন্যকে পৌঁছিয়ে দেন নি। অথচ, তাঁর সুরে-জানা ভুবনখানির কথা পৌঁছিয়ে দিতেই হবে তাঁর মানব-সমাজকে। সত্যের স্বভাবই হল প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সুরের ঝরনা-ধারায় যে সত্যের অবতরণ হয়েছে, তারও প্রকাশবেদনা কম নয়। প্রচণ্ড প্রকাশবেগ তাঁর, বাহিরে রূপ নিয়েছে ছন্দের, সুরের, রঙের। কিন্তু সত্য শুধু প্রকাশ চায় না, সে চায় প্রতিষ্ঠা; তাই এত সংঘাত দিকে দিকে। রবীন্দ্রনাথের ভুবন-সত্যও তাই প্রতিষ্ঠা চায়, তাঁর হৃদয়-জগৎ থেকে বাহিরে এসে মানব-জগতে সে পূর্ণ সত্য হয়ে উঠতে চায়। সব মহা অনুভূতিরই পরিণাম হল মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠার পূর্ণতায়। সত্যের মানবীয় প্রতিষ্ঠা হয় শিক্ষার দ্বারা, জনশিক্ষার দ্বারা। তাই দেখি মহাতপস্বী নেমে আসেন নিঃসঙ্গ তপস্যার আসন থেকে, তাঁর পাওয়া সত্যকে বাণীরূপে দেন তাঁর উপস্থিত ও

অনাগত অগণনিত মিত্রসমাজকে—শত্রু কেউ নেই, সকলেই মিত্র। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন শিক্ষার প্রচারে ও প্রসারে। কোনো বৃহৎ উপলব্ধির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার মানবীয় প্রয়াসকেই সমগ্রভাবে শিক্ষাপ্রয়াস বলা চলে। এই ব্যাপক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ ভাষণ ও অন্যান্য তত্ত্বভার রচনা সবই শিক্ষা-প্রস্তাব, তাঁর চিত্তে উদ্‌ভাসিত সত্যের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। কবি-সত্যের প্রকাশ যেমন ছন্দে-সুরে, রঙে-রূপে, তার মানবীয় প্রতিষ্ঠা তেমনি প্রকট তাঁর বিচিত্র রসের প্রবন্ধে গল্পে ও অন্যান্য তত্ত্ববাহী লেখায়। এগুলিকে বর্জন করা যায় কিভাবে!

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা- প্রস্তাব ও প্রয়াসকে আমরা খণ্ডিত করে দেখতে পারি, বলতে পারি এটা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে, ওটা জনশিক্ষার বিষয়, ঐ অংশটুকু স্ত্রীশিক্ষার জন্য, আরো কত কী। কিন্তু সব অংশগুলি মিলিয়ে একটি সমগ্র প্রস্তাব ও প্রচেষ্টার রূপ মূর্ত হয়ে ওঠা চাই। তা না হলে নিতান্ত খণ্ডিত সত্যের মতই রবীন্দ্র-শিক্ষা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক লেখাগুলি সমগ্র উপলব্ধির পটভূমিতেই দর্শনীয়। শিক্ষার 'দর্শন' কিছু লিখে যেতে চান নি কবি, কিন্তু তাঁর শিক্ষা- প্রস্তাব ও প্রয়াসের মধ্যে একটি সত্য-দর্শনের আভাস উপলব্ধি করতেই হবে আমাদের; তা নইলে রবীন্দ্র-শিক্ষা বিষয়ে কোনো কাজ কোনো মতামতই সার্থক হবে না। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে উদ্‌ভাসিত সত্যের মহৎভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর শিক্ষা-চিন্তা নিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি, প্রবন্ধ লিখি, তর্কবিতর্ক জুড়ে দিই, তা হলে কারো বিশেষ উপকার হবে না। কারণ, তাঁর শিক্ষা-চিন্তা তাঁর সত্য-দর্শনকে মানব-সমাজে পৌঁছিয়ে দেবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়— তাঁর শিক্ষা-চিন্তা তাঁর সত্য-উপলব্ধির একটি ক্রিয়াশীল মানবাভিমুখী ধারা মাত্র। তাঁর 'দর্শন' যথাসাধ্য দর্শন ক'রে না এলে, আমরা কেবল না-জালা দীপই উপহার দিতে পারি মানব-সমাজকে।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের লেখক ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় এই দিকটি নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন তা নইলে বইটির নাম শিক্ষা-'দর্শন' দিতেন না। বইটিতে দর্শনের দিকটি বিশদভাবে বৃহৎভাবে আলোচিত না হলেও রবীন্দ্র-দর্শনের সমগ্র ভূমিকে মন থেকে বাদ দিয়ে অনর্থক প্রবন্ধাদির সোপান গাঁথা হয় নি। লেখক বলেছেন, "রবীন্দ্রমানসের 'দার্শনিক তত্ত্ব' সর্বত্রই দ্বন্দ্বময় উপলব্ধির দ্বারা সমাকীর্ণ।" শুনেছি দ্বন্দ্বময়তার দর্শন উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন, অপরকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা তুল্যভাবে কঠিন বা আরো কঠিন। লেখক অনর্থক রবীন্দ্র-দর্শনের দ্বন্দ্বময়তা বুঝাতে আসেন নি বা রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিতে কী প্রয়াস আছে দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষের তাও বলতে যান নি। তবু, তিনি আরম্ভ করেছেন ভূমিকার পর 'রবীন্দ্র জীবন-দর্শন' অধ্যায়ে। জীবন-দর্শনের পর শিক্ষার দর্শন এবং তার পরই শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রমশঃ পদ্ধতি, পরিবেশ, শিক্ষক-গুরু প্রভৃতি 'কেজো' অধ্যায়গুলি। স্পষ্টতঃই লেখকের উদ্দেশ্য ও তাঁর চিন্তার পরিবেশন-ধারা সমুচিত হয়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষা ও দর্শনের চিন্তানায়ক জন ডিউই এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক ঐক্য আছে, আবার অনৈক্য আছে, এ কথা অনেকেরই মনে উঠেছে, লেখকও তাই বলেছেন। তবে লেখক এই ঐক্য অনৈক্যের ক্ষেত্রে লেখনীকে বড়ই ধরে রেখেছেন। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা থাকলে খুব উপকার হবে।

রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ও তোতাকাহিনীর অন্তর্নির্দেশ পাঠ করে লেখক শিশুমনের বৈজ্ঞানিক ধারণার অনেক সমর্থন পেয়েছেন। ডাকঘর কেবল শিশুচিত্তের রূপক না হতে পারে, সমগ্র মানব-চিত্তেরই

অগোচর বেদনার ভাষাগত এক প্রকাশ বলে বিবেচিত হতে পারে এই নাটিকা কাব্যটি— তথাপি শিশুর বন্ধন-মুক্তির রূপক হিসাবে এটিকে পাঠ করলে আংশিকতার কোনো ত্রুটি বোঝা যায় না। তা ছাড়া এর মধ্যে লেখক রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের দ্বন্দ্বময়তার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ লেখায় লেখক মনোবিজ্ঞান-সম্মত একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার দেখেছেন। কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি সর্বত্র কবি যে ব্যবহার করেন নি, তাও বলেছেন। খুবই ভাল হয়েছে যে, লেখক রবীন্দ্রনাথের লেখা 'পাঠ্য' পুস্তকে বিজ্ঞানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ দেখতে চান নি। কারণ, পদ্ধতির প্রতি কবির মমতা সামান্যই ছিল, মমতা ছিল শিশুটির প্রতি। পদ্ধতির পরীক্ষা পরিবর্তন যখনই হোক করা দরকার হবে, চিরন্তন থাকবে শিশুর মনটি। সুদূর অতীতে ঠাকুরমায়েদের ছড়ায় যে শিশুমন আন্দোলিত হ'ত এখনও সেই মনই আছে, পরেও তাই থাকবে। তেমনি পদ্ধতি আধুনিক থেকে আধুনিকতম হোক, পদ্ধতি এক না হয়ে বহু হোক, শিশুসত্তার সত্যটি চিরকালের। অতএব মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষা-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কার করতে হবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-প্রস্তাবে, এটা বিভ্রান্তি মাত্র। সুখের কথা লেখক তাঁর শ্রদ্ধাকে নির্মল রেখেছেন, এই বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে ও পাঠককে বাঁচিয়ে।

সমগ্র শিক্ষা- প্রস্তাব ও প্রয়াসের একটি অংশই আলোচিত হয়েছে এই পুস্তকটিতে— শিশু-শিক্ষার দিক। অন্য আলোচনার— জনশিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা ইত্যাদির— ভিড় জমানো হয় নি। বইটি সুখপাঠ্য, সরলভাব, সহজগতি। একটি বড় অভাব-মোচনের প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে বইটি পাঠক-সমাজে অভ্যর্থিত হবে আশা করি।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

স্মরণীয়। শ্রীসুশীল রায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। আট টাকা।

বঙ্গপ্রসঙ্গ। শ্রীসুশীল রায় সম্পাদিত। পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। পাঁচ টাকা।

বাংলাদেশে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে আজও এমন অনেক মনীষী আছেন যাঁদের নিয়ে গৌরববোধ করলে কেউ প্রাদেশিকতার অপবাদ দিতে পারবে না। তবে যে নেই-নেই করি সেটা তুলনায়। রাজা রামমোহনের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি যেসব বিরাট মহীরুহ দেখতে আমরা অভ্যস্ত স্মরণীয় গ্রন্থের স্মরণীয়দের সকলে তাঁদের সমকক্ষ নন। কিন্তু এই গ্রন্থে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা সেকালের মহীরুহের সঙ্গে মাথায় সমান।

এই গ্রন্থে জীবিত মনীষীদের কথাই বিবৃত হয়েছে, অবশ্য গ্রন্থপ্রকাশের পরে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লোকান্তরিত হয়েছেন।

ইতিহাস বা জীবনী থেকে এ বইয়ের ছাঁচ আলাদা। সুশীলবাবু মনীষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের মুখ দিয়ে জীবনকথা বলিয়ে নিয়েছেন। এজন্য তাঁকে প্রভূত শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, নানা-স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, আর যতদূর সম্ভব লেখক অন্তরালে থেকে সাক্ষাতের বিষয় মনীষীকে আসর

ছেড়ে দিয়েছেন। সাহিত্যসৃষ্টির এ এক বিশেষ ধরণ, এর জন্য বিশেষ এক প্রকার শক্তির আবশ্যক। সুশীলবাবু এই নূতন ধরণের জীবনী-রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পাঠক যেন ছবির গ্যালারিতে প্রবেশ করে, ছবিগুলি আবার সবাক্‌। বিষয় ও বিষয়ীর দুর্লভ সহযোগিতায় বাংলাদেশের এক শত বৎসর কাল কথা ক'য়ে উঠেছে। এই গ্রন্থে সাক্ষাৎকৃত যোগেশচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৫৯ সাল, আর আজ ১৯৫৯ সাল। এক শত বৎসর হল বই কি।

সবসুদ্ধ তেত্রিশ জন মনীষীর সমাবেশ হয়েছে গ্রন্থটিতে। তাঁদের মধ্যে আছেন সাহিত্যিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চিত্রশিল্পী বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক রাজনীতিক প্রভৃতি। তাঁদের কীর্তিবহুল জীবনকথা শুনতে শুনতে মানবমনীষার বৈচিত্র্য ঘন হয়ে জমে আসে মনের উপরে। আর বইখানা শেষ হলে মনে হয়—
"Here is God's plenty।"

একাধারে সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস এই বইখানা বাঙালি সমাজের অবশ্যপাঠ্যরূপে গণ্য হওয়া উচিত।

সুশীলবাবু বঙ্গপ্রসঙ্গ নামে বইখানি সম্পাদনা করে পাঠক-সাধারণের অশেষ উপকার করেছেন। রামমোহন থেকে বিনয়কুমার সরকার পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ জন মনীষীর রচনা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তাঁরা বাংলাদেশের ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য দর্শন ভাষা রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে চিন্তা করেছেন তার কিছুকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে এখানে। অনেক পুরাতন রচনা আছে যার মূল্য এখন কেবল ঐতিহাসিক। সে মূল্যও কম নয়। কিন্তু সজীব রচনার কাছে তারা স্বভাবতই ক্ষীণপ্রভ। সুখের বিষয়, বঙ্গপ্রসঙ্গের অধিকাংশ প্রবন্ধই সজীব অর্থাৎ তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব এখনো চলছে আমাদের জীবনে। এখানেই সম্পাদকের বাহাদুরি, তিনি জাদুঘর তৈরি করেন নি, মনীষীর সভা বসিয়েছেন। বাংলা-দেশের প্রকৃত ইতিহাস তার সাহিত্যে। বাঙালির ধর্ম রাজনীতি দর্শন ইতিহাস সমস্তই তার সাহিত্যে। এমন সাহিত্যপ্রাণ সমাজ জগতে আর দ্বিতীয়টি আছে কি না সন্দেহ। বঙ্গপ্রসঙ্গে সেই প্রকৃত ইতিহাস সমাহৃত হয়েছে। যা ছিল ছড়িয়ে, দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লোকলোচনের অন্তরালে, সুশীলবাবু তা বহু যত্নে একত্র ক'রে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এই একখানি বই পাঠ সমাধা করে উঠলে পাঠকের জ্ঞান ও আশাভরসা বৃদ্ধি পায়, নূতন দিগ্‌দর্শন লাভ ঘটে, আর সেই সঙ্গে লাভ হয় সাহিত্য-পাঠের আনন্দ। এইসব অশেষ কারণে বইখানি অমূল্য ; আর যিনি এই দুঃসাধ্য কাজটি করবার জন্য শ্রম-স্বীকার করেছেন তিনি আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

•

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা। শ্রীনরহরি কবিরাজ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা।

শ্রীনরহরি কবিরাজের "স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা" দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের নাম থেকে যে ইতিহাস আশা করা স্বাভাবিক প্রকৃতপক্ষে তা পাওয়া যাবে না। লেখক ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন বলে ভূমিকায় বলা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে যে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হল সে বইয়ের আলোচনার ধারা ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এসে থেমে

গেল কেন তা উপলব্ধি হল না। লেখক অবশ্য কৈফিয়ত দিয়েছেন, "১৯২৭ সালটিকে গুরুত্ব দিয়েছি এই কারণে যে এই বছরেই কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতার দাবিটি প্রথম গ্রহণ করেছিল।" স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড সমাপ্তির এটা কৈফিয়ত হতে পারে, ইতিহাস এখানে সমাপ্ত করবার যুক্তি হিসাবে একে মনে নেওয়া যায় না— বিশেষ করে বইয়ের নামে যখন তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই।

নরহরিবাবু তাঁর বইয়ের প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন; শেষের দিকে তাঁর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মোট ২৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র বাহাত্তর পৃষ্ঠায় তিনি ১৮৮৫-১৯২৭ সালের কথা বলেছেন। অথচ আধুনিক যুগ সম্বন্ধেই আমাদের আগ্রহ বেশি। প্রসঙ্গ বিবৃত করবার সময় সর্বত্র মাত্রা রক্ষিত হয় নি। সাতান্ন-বিদ্রোহে বাঙলার বাহিরে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ আরো সংক্ষিপ্ত করে বাঙলা দেশে বিদ্রোহের সংঘাত নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করলে ভালো হত। গান্ধীজী বাঙলার বাহিরে কোথায় কোথায় অসহযোগ আন্দোলন করেছেন এ বইয়ে তার বিবরণ প্রাসঙ্গিক নয়। ডিরোজিয়ো, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ লেখক পৃথক উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র, বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট -আন্দোলন, বুড়িবালামের যুদ্ধ, রাখীবন্ধন, হিন্দুমেলা, বরিশাল-কনফারেন্স প্রভৃতি প্রসঙ্গ একটি প্যারাগ্রাফও স্থান পায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেন ঘটনার ক্যাটালগ। এ ধরণের বই পড়ে যেরূপ উদ্দীপনা জাগা স্বাভাবিক একমাত্র সাল-তারিখ-সমন্বিত ঘটনার উল্লেখে তা হওয়া সম্ভব নয়।

নরহরিবাবুর প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী থেকে দেখা যায় তিনি আলোচ্য বিষয়ের উপর পড়াশুনা করেছেন। আমরা তাঁকে বাঙলার স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে অনুরোধ করছি। বাঙালী-পরিচালিত সংবাদপত্র স্বাধীনতা-আন্দোলনে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ ছাড়া ছাত্র-আন্দোলন ও বিদেশে বাঙালীর স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে পৃথক ভাবে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। কৃষক ও শ্রমিক -আন্দোলন সম্বন্ধে নরহরিবাবু এমন অনেক তথ্য সংকলন করেছেন যা বাঙলায় পুস্তকাকারে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে আলোচ্য বইটির বিশেষ মূল্য আছে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

কল্যাণ। বিলম্বিত ত্রিতাল

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব কী লাগি একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ॥
তুমি আছ বিশ্বেশ্বর সুরপতি অসীম রহস্যে
নীরবে একাকী তব আলয়ে ॥
আমি চাহি তোমা-পানে—
তুমি মোরে নিয়ত হেরিছ, নিমেষবিহীন নত নয়নে ॥

রচনা[১] : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা ন্‌সা -ধ্‌া -সা II সা -া সা সা । সন্‌া -রা ন্‌া -রা । -গা -া -রা সা । সা ধ্‌া -া প্‌া I
ম হা৹ ৹ ৹ বি শ্‌ শে ম হা৹ ৹ কা ৹ ৹ ৹ ৹ শে ম হা ৹ কা

I -সা সা সা সা । সা সা সন্‌া -রা । রা গা -া রা । রা -া -ন্‌া -রা I
৹ ল মা ঝে আ মি মা৹ ৹ ন ব ৹ কি লা ৹ ৹ ৹

I সা -া গগা -পা । ধা -র্সা ধা পপা । ^গরা -া সা সা॥ । সা ন্‌সা -ধ্‌া -সা II
গি ৹ একা ৹ কী ৹ ভ্র মি৹ বি ৹ স্ম য়ে "ম হা৹ ৹ ৹"

-া -া গা -া II গা পা -ধা পা । র্সা -া র্সা -া । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্রা র্সা র্সা র্সা I
৹ ৹ তু ৹ মি আ ৹ ছ বি শ্‌ শে শ্‌ শ র সু র প তি অ সী

I -ধা নধা -র্সা র্সনা । -র্রা র্সা ধা -পা । -া -গা গরা গা । পা ধা র্সা র্রা I
৹ ম৹ ৹ র৹ ৹ হস্‌ সে ৹ ৹ ৹ নী৹ র বে এ কা কী

I র্সা ধা পা -া । -গা -া -রা -া । সা সা -া -া । সা ন্‌সা -ধ্‌া -সা II
ত ব আ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ল য়ে ৹ ৹ "ম হা৹ ৹ ৹"

-া -া গা -া II গা পা -ধা পা । র্সা -া র্সা -া । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্রা র্সা র্সা র্সা I
০ ০ আ ০ মি চা ০ হি তো ০ মা ০ পা নে তু মি মো রে নি য়

I -ধা নধা -র্সার্সনা । -র্রা র্সা ধা -পা । -া -গা গরা গা । পা ধা র্সা র্রা I
০ ভং ০ হেং ০ রি ছ ০ ০ ০ নিং মে য বি হী ন

I র্সা ধা পা -া । গা -া -রা -া । -সা সা -া -া । সা ন্সা -ধ্া -সা II II
ন ত ন ০ য় ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ "ম হাং ০ ০"

-

১ মহাদেব মহেশ্বর ইত্যাদি হিন্দি গান ভেঙে এটি প্রথমে রচিত হয়। পরে কবি-কর্তৃক এই গানের রূপান্তর ঘটে— সেই কথা (প্রথম ছত্রে কথার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি) ও সুর (পরিবর্তনের ফলে ইমন-কল্যাণ রাগে ও তেওরা তালে গীত হয়) ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপির প্রথম খণ্ডে তথা চতুর্থখণ্ড স্বরবিতানে মুদ্রিত থাকায় অনেকেরই জানা আছে। বর্তমান গানের কথা ইতিপূর্বে 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০) এবং 'গান' (১৯০৮ ও ১৯০৯) পুস্তকে মুদ্রিত; স্বরলিপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে নিবদ্ধ ছিল। প্রচলিত গীতবিতানে উভয় গানই মুদ্রিত আছে।

স্বীকৃতি

প্রত্যাবর্তন॥ ১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে এই চিত্র আঁকা হয়। কার্টিজ কাগজে পেন্সিলে আঁকা মূল চিত্রের আয়তন ৮১" × ৪৭২" ইঞ্চি। বর্তমান প্রতিচিত্রে উপরে ও নীচে বাড়ির অংশ কিছুটা বাদ গিয়াছে।

বর্তমান চিত্রাধিকারী শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ। তাঁহারা এই চিত্র সংগ্রহ করার পর রবীন্দ্রনাথ উহার নিম্নাংশের বাম দিকে স্বহস্তে একটি কবিতা লিখিয়া দিয়া এই রূপকল্পনার মর্ম-উদ্‌ঘাটন করেন :

দূরে গিয়েছিলে চলি ; বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব ইত্যাদি

ব্লক বিশ্বোদয় লাইব্রেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অর্ধনারীশ্বর॥ ব্লক শ্রীঅমরেন্দ্র গোস্বামীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থাবলী

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য ॥ বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, কলিকাতা ৯। চার টাকা।

শ্রীদেবীদাস মজুমদার ॥ বিদ্যুৎ-বিশারদ ॥ স্বাক্ষর, কলিকাতা ২০। দুই টাকা।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ভাববাদ খণ্ডন ॥ ঈগল্ পাবলিশার্স, কলিকাতা ২০। দুই টাকা।

শ্রীপ্রেমময় দাশগুপ্ত ॥ ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় ॥ কসবা, কলিকাতা ৩১। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বটকৃষ্ণ ঘোষ ॥ মার্ক্সবাদ ॥ বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, হাওড়া। তিন টাকা।

সূচী : মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্র, জড়বাদ ও সমাজতন্ত্র, অভিব্যক্তি প্রগতি ও বিপ্লব, সাম্য ও স্বাধীনতা, মার্ক্সীয় অতিমূল্যবাদ, ঘন ও স্থণি।

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ ॥ পশ্চিমবঙ্গের অর্থকথা ॥ বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, হাওড়া। চার টাকা।

শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ কথার কথা ॥ স্বাক্ষর, কলিকাতা ২০। দেড় টাকা।

বিজ্ঞান

এম. আকবর আলী ॥ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ॥ দি মালিক লাইব্রেরি, ঢাকা। সাড়ে সাত টাকা।

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য ॥ শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান ॥ এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি লি., কলিকাতা ১২। ছয় টাকা।

সংগীত

শ্রীউমা দে ॥ সংগীত-পরিচয় ॥ প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ১৪। আড়াই টাকা।

স্মৃতিকথা

শ্রীনিকুঞ্জ সেন ॥ জেলখানা-কারাগার ॥ গণদীপায়ন পাবলিশার্স, কলিকাতা ৪। তিন টাকা।

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী ॥ সত্যি ভ্রমণকাহিনী ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে ॥ চক্রবর্তী চাটার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি লি., কলিকাতা ১২। তিন টাকা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পথের সন্ধানে ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ৩৭। পাঁচ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ যাঁদের দেখেছি ॥ দুই খণ্ড। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা ১। প্রতি খণ্ড তিন টাকা।

ইতিহাস

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ॥ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ৬। দশ আনা।

অনুবাদ

আচার্য বিনোবা ॥ সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি ॥ অনুবাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, কলিকাতা ১২। তিন টাকা।

আর্থার কোয়েসলার ॥ যোগী আর শাসনকর্তা ॥ অনুবাদিকা শ্রীকমল মুস্তাফি। পার্ল পাবলিকেশন্‌স্ প্রা. লি., বোম্বাই ১। পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আরভিং স্টোন ॥ প্রেম মৃত্যুহীন ॥ দুই খণ্ড। অনুবাদিকা শ্রীগীতা দেবী। পার্ল পাবলিকেশন্‌স্, প্রা. লি., বোম্বাই ১। প্রতি খণ্ড এক টাকা।

ঔপনিষৎ ॥ অনুবাদিকা শ্রীচিত্রিতা দেবী ॥ এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লি., কলিকাতা ১২। আড়াই টাকা।

কামেরন হলি ॥ শিল্পপতির আসন ॥ অনুবাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পার্ল পাবলিকেশন্‌স্ প্রা. লি., বোম্বাই ১। এক টাকা।

চেস্টার বোল্‌জ ॥ শান্তির নবদিগন্ত ॥ অনুবাদক শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ। পার্ল পাবলিকেশন্‌স্ প্রা. লি., বোম্বাই ১। এক টাকা।

জি. রামচন্দ্রন ॥ গান্ধী উপাখ্যান ॥ অনুবাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। হিন্দ্ কিতাব্‌স্ লিমিটেড, বোম্বাই। দেড় টাকা।

টমাস পেন্‌এর রাজনৈতিক রচনাবলী ॥ অনুবাদক শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্ল পাবলিকেশন্‌স্ প্রা. লি., বোম্বাই ১। পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দাদুবাণী ॥ অনুবাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার ॥ বীণা লাইব্রেরি, কলিকাতা ১২। দেড় টাকা।

কাহিনী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার ॥ কাকাবাবু ॥ দত্ত ব্রাদার্স, কলিকাতা ২৬। দেড় টাকা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ॥ ছায়ালোক ॥ দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা ১২। পৌনে তিন টাকা।

শ্রীরবিগুহ মজুমদার ॥ যতদূর পৃথিবী ততদূর পথ ॥ ডাক পাবলিশার্স, কলিকাতা ২৬। তিন টাকা।